

বিশ শতকের প্রথমার্ধের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস
(১৯১৪-১৯৫০) : আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধ

পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তী

গবেষক

অনল পাল

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ২০২১

Certified that the Thesis entitled

বিশ শতকের প্রথমার্ধের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস (১৯১৪-১৯৫০) : আন্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধ

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Udaya kumar Chakraborty. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Candidate

Prof. Udaya Kumar Chakraborty

Anal Pal

Supervisor

Dated: 9th July, 2021

Dated: 9th July, 2021

স্বীকৃতি

প্রাচীন কাল থেকেই দার্শনিক প্রস্থানের সঙ্গে সাহিত্যের স্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থান সাহিত্যিকদের বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করেছে। ঈশ্বর-চিন্তা, যুক্তিবাদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ পর্বের যোগাযোগ, সম্পর্ক কেমন তাই এই সন্দর্ভের বিষয়। বাংলায় ‘আন্তিক’ ‘নাস্তিক’ বোধ উনিশ ও বিশ জুড়ে বিবিধ, বিচিত্র রূপে-বর্ণে বিকশিত হয়েছে। গবেষণা প্রকল্পে মূলত, বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে সেই বিকাশের উভমুখী দ্বন্দ্বিক রূপরেখাটি বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কবিতা বা ছোটগল্পের কথাও কখনো কখনো উল্লেখিত হয়েছে।

গবেষণা প্রকল্পটির অভিমুখ নির্ধারণে আমার তত্ত্ববধায়ক অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমার মতো অলস ছাত্রকে দিনের পর দিন প্রশয় দিয়েছেন, তর্ক করেছেন, উৎসাহিত করেছেন। সাহিত্যে মতের মিল অপেক্ষা সবিনয় অমিল যে স্বাস্থ্যকর, তা শিখেছি তাঁর থেকে। ভাবনাগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যাচিয়ে নেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। এতো শুধু গবেষণার কথা নয়, জীবনের শিক্ষা। সন্ধান দিয়েছেন বিভিন্ন পত্রিকার, যোগান দিয়েছেন বই। শ্রদ্ধা জানাই তাঁকে। শুরুর ও শুরু থাকে, সে কাজটি করেছেন অধ্যাপক আব্দুল কাফি। অজস্র ভাবনার ইন্ধন জুগিয়েছেন তিনি, তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নানান বইপত্রের সন্ধান দিয়েছেন অধ্যাপক বরেন্দ্র মন্ডল, অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিন্হা, অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ। বিভাগের বাকি অধ্যাপকদের শ্রদ্ধা জানাই, যাঁদের ছাড়া আমরা কার্যত অসম্পূর্ণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সুচেতনা চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি

দুস্ত্রাপ্য উপন্যাসের সন্ধান দিয়েছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক সুমিত কুমার বড়ুয়া সরবরাহ করেছেন প্রয়োজনীয় বই। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী। ইউজিসি-র সৌজন্যে আর্থিক সহায়তা মিলেছিল গবেষণা শুরুর সময়, সে কথা উল্লেখ করা জরুরি।

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে চার্বাক/লোকায়াত দর্শন বিষয়ক বেশ কয়েকটি বই একবাক্যে হাতে তুলে দিয়েছেন। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরোধ মাত্রই অধুনা দুস্ত্রাপ্য পত্রিকা পড়তে দিয়েছেন। এছাড়া বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ প্রয়াত অরুণ ঘোষ, অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী ও অধ্যাপক মালিনী ভট্টাচার্যের কাছে। গবেষণা কাজে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন শিবাদিত্য দাশগুপ্ত, তরুণ পাইন। অধ্যাপক তপোব্রত ভাদুড়ি, অধ্যাপক সুব্রত সিন্হা, অধ্যাপক সুজয় মন্ডল নানা সময়ে প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কর্মক্ষেত্রের সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই, বিশেষত অধ্যাপক নন্দা মল্লিক ও অধ্যাপক পিয়ালী দত্ত চৌধুরীকে, নানান ভাবে তাঁরা সাহায্য করেছেন। সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। বন্ধু-অধ্যাপক অভিষেক ঘোষাল আনিসুজ্জামানের *ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য* থেকে জরুরি কয়েকটি লেখা পাঠিয়ে কৃতজ্ঞতার বাঁধনে বেঁধেছেন। আর বন্ধুরা— বীথিকা, সর্বজয়া, প্রলয়, যশোধরা, অনিন্দিতা, সৈকতদা, পঙ্কজদা, রাকিব, শৌভিক, বিহঙ্গ, সৌম্যজিৎ, শাক্যদা— নানাভাবে সাহায্য করেছে তাদের কেতাবি ধন্যবাদ নাই বা জানালাম। অনুজপ্রতিম অর্পণ, কস্তুরী, পূর্ণতা, অদिति বেশ কিছু লেখাপত্র সংগ্রহ করে দিয়েছে, ওদের ধন্যবাদ।

গবেষণার কাজে কিছু বই, দুস্ত্রাপ্য পত্রিকা দেখা প্রয়োজন ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার (কলকাতা), উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি (হুগলী), তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি (কলকাতা), গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার (কলকাতা)-র সৌজন্যে সেগুলি দেখার সুযোগ

হয়েছে। ঐ গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। স্কুল অব কালচারাল টেক্সট
অ্যান্ড রেকর্ডস্, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি *বিচিত্রা: বৈদ্যুতিন রবীন্দ্র-রচনাসম্ভার*
ওয়েবসাইটটি বহু তথ্য ও নথি নিমেষের মধ্যে হাতে তুলে দিয়েছে, সে কথা উল্লেখ না করা
অপরাধ তুল্য। এছাড়া ব্যবহার করেছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা) ও
বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার (যা. বি.)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সুশান্তদা,
বিভাগীয় গ্রন্থাগারের আইভিদি, হরিশদা, বিভাগের শ্যামলদা, সুকুমারদা, দিপালীদি, বিমলদা
সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আর আছে তারা; যারা ভালোবাসা আর প্রেরণা জুগিয়ে চলে নিয়ত, কোনো দাবি যাদের
নেই— তাদের কথা থাক।

সূচিপত্র

ভূমিকা	১ - ১০
পরিভাষা ও শব্দ সংক্ষেপ	১১
প্রথম অধ্যায়— আন্তিক-নাস্তিক পরিচয় ও উনিশ শতকে বাঙালির দর্শনচর্চা	১২ - ৭৭
১.১ ‘আন্তিক কে? কে নাস্তিক?’	
১.২ উনিশ শতক: ঈশ্বর চিন্তা, যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতা	
দ্বিতীয় অধ্যায়— চতুরঙ্গ, শেষ প্রশ্ন: আন্তিক-নাস্তিক প্রসঙ্গ	৭৮ - ১৭৫
২.১ চতুরঙ্গ: বিশ্বাস, সংশয়, আশ্রয়	
২.২ শেষ প্রশ্ন: তর্ক, প্রশ্ন, সংস্কার	
তৃতীয় অধ্যায়— ‘অসংলগ্ন ভবিষ্যত’: জগদীশ গুপ্তর কথন বিশ্ব	১৭৬ - ২৩২
চতুর্থ অধ্যায়— ‘তিন বন্দোপাধ্যায়’: আন্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধ	২৩৩ - ২৮৯
৪.১ পুতুলনাচের ইতিকথা: নিয়তি, স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ	
৪.২ দেবযান: মর্ত্যলাভের অফুরান আকাঙ্ক্ষা	
৪.৩ যোগদ্রষ্ট: সত্তার অনন্ত জিজ্ঞাসা	
পঞ্চম অধ্যায়— প্রসঙ্গ ‘বাস্তবতা’: অস্তি-নাস্তিবোধ	২৯০ - ৩৪১
উপসংহার	৩৪২ - ৩৫৫
গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রিকাপঞ্জি	৩৫৬ - ৩৭৬

ভূমিকা

সন্দর্ভের শিরোনাম ‘বিশ শতকের প্রথমার্ধের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস (১৯১৪-১৯৫০): আন্তিকতা ও নাস্তিকতাবোধ’। শিরোনামেই স্পষ্ট আমাদের অভিনিবেশ থাকবে বিশ শতকের প্রথমার্ধের উপন্যাসে, অথচ কালজ্ঞাপক অংশে উল্লেখ করা রয়েছে ১৯১৪ থেকে ১৯৫০। প্রথমার্ধ অর্থাৎ ১৯০০ থেকে ১৯৫০। প্রশ্নও জন্ম নেয় কেন এই তফাৎ? শিরোনামটি সম্পূর্ণ দু’রকমের বক্তব্য ও সময়কালকে চিহ্নিত করছে না? একই সঙ্গে এর উত্তর হ্যাঁ এবং না, দুই। একথা ঠিক যে একই সঙ্গে দু’রকমের সময়ের কালের কথা/প্রসঙ্গ শিরোনামে রয়েছে। সে অর্থ হ্যাঁ উত্তরটি যথার্থ। আদতে সন্দর্ভের শিরোনাম একটাই বক্তব্যকে চিহ্নিত করছে। এবারে আমরা সেই কথাই বলার চেষ্টা করবো। সন্দর্ভের শিরোনাম প্রসঙ্গে বলার আগে এরিক হবসবমের (১৯১৭-২০১২) *The Age of Extremes* (১৯৯৪) বইটির প্রসঙ্গে কিছু কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় এই অসামান্য বইটি। আবিষ্কার পরিচিত ঐতিহাসিক হবসবম তাঁর যাপিত সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন এই বইটিতে। বইটির শিরোনামের সঙ্গে একটি উপ-শিরোনাম জুড়ে দিয়েছেন হবসবম। কী সেই উপ-শিরোনাম? *The Short Twentieth Century 1914-1991*। খাতায়-কলমে উনিশ শতকের অবসান হয়েছিল ১৮৯৯ সালে, কিন্তু হবসবম বলছেন ১৯১৪ সালই উনিশ শতকের অবসান এবং বিশ শতকের সূচনা লগ্ন। সেকারণেই এই শতক ছোট। হবসবমের মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধই দুই শতকের মধ্যে বিভাজিকার কাজ করছে। দিনক্ষণের খতিয়ানের শরণাপন্ন না হয়ে হবসবম একটি ঘটনাকে বাঁক ও শতাব্দী বদলের চিহ্ন হিসেবে হাজির করেছেন। আমরাও বাংলা

সাহিত্যের চলনের সঙ্গে সেই খতিয়ানকে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছি। সেকারণে আমাদের প্রস্তাবেও বিশ শতকের প্রথমার্ধ ১৯১৪ থেকে ১৯৫০। যাকে হবসবম বলবেন ‘The Age of Catastrophe’। যদিও এখানে উল্লেখ করে রাখা প্রয়োজন হবসবমের প্রস্তাবে ‘The Age of Catastrophe’ সমাপ্তি ঘটছে ১৯৪৫ সালে। উপমহাদেশের ‘age of catastrophe’ ’৪৫ শেষ হয় না, দাঙ্গা-স্বাধীনতা-দেশভাগের কারণে তা দীর্ঘায়িত হয়। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি প্রশ্ন অনিবার্য— কেন এই তত্ত্বয়নটিকে আমরা বেছে নিলাম? দ্বিতীয়ত, হবসবমের তত্ত্বটি দিয়ে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কাল পর্বের উত্থান-পতনকে পড়ার যথার্থ্যতা আছে কিনা? কিংবা বাংলা সাহিত্যের প্রশ্নে হবসবম কতটা গ্রহণযোগ্য? এই আপত্তি বা প্রতর্ক নিয়ে আলাপের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) *Nationalism* (১৯১৭) বইটির দিকে ফিরে তাকাবো।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যান এবং সেখানে জাতীয়তাবাদ নিয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই বইয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রদত্ত বক্তৃতায় যুদ্ধ বিরোধী রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করেন। ‘জাতীয়তাবাদ’ অপেক্ষা তাঁর সমালোচনার কেন্দ্রে থাকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী নীতি। *সবুজ পত্র*-এ প্রকাশিত ‘লড়াইয়ের মূল’ প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ফলত, *Nationalism* এক অর্থে ‘ন্যাশানাল শভিনিজম’ বা ‘ইম্পিরিয়ালিজম’ বিষয়ক বই। জাতীয়তাবাদের উর্ধ্ব মানবিকতার কথা কবি বারংবার উচ্চারণ করেন। সেই সকল বক্তৃতা ১৯১৭ সালে ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। *Nationalism*— ‘Nationalism in the West’, ‘Nationalism in Japan’, ‘Nationalism in India’ শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। কিন্তু এই বইয়ের শেষে

রবীন্দ্রনাথ ‘The Sunset of the Century’ শিরোনামে *নৈবেদ্য*-এর (১৯০১) পাঁচটি কবিতা জুড়ে দেন, ইংরেজি তর্জমা করে। যেগুলি লেখা হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দিনে। প্রায় সতেরো বছর পর কেন রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করলেন তাঁর পুরোনো লেখাগুলিকে? *Nationalism*-এর শেষে কবিকৃত তর্জমায় ধরা পড়ছে সভ্যতার নতুন রূপটি। একটি তর্জমাই নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা হলো—

“THE LAST SUN of the century sets amidst the blood-red clouds of the West and the whirlwind of hatred.

The naked passion of self-love of Nation, in its drunken delirium of greed, is dancing to the clash of steel and the howling verses of vengeance.”^১

নৈবেদ্য কবিতাটি—

“শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মারো

অস্ত গেল; হিংসার উৎসবে আজি বাজে

অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী

ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী

তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে

গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীর বিধে।”^২

Nationalism-এর শেষাংশটি বোঝাচ্ছে, শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে; ঐ শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। নতুন শতাব্দীর সূত্রপাত হলো যুদ্ধ, হিংসা, ঘৃণার মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকের শেষে লেখা *নৈবেদ্য* কবিতাগুলির শরণের সঙ্গে এবং উনিশ-বিশ শতকের বিভাজন নিয়ে হবসবমের তত্ত্বের আশ্রয় মিল লক্ষ করা যায় না কি? বিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কবির চৈতন্যে আরেকবার ফিরিয়ে দিলে শতাব্দী অবসানের স্মৃতি। কিংবা তিনি হয়তো মনে

করছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধই প্রকৃত প্রস্তাবে উনিশ শতকের অবসান বার্তা, এই অনুমান কি খুব অমূলক হবে? নচেৎ কেনই বা তিনি *Nationalism*-এর অন্তে ‘The Sunset of the Century’ শিরোনামে জুড়ে দেবেন তাঁরই কবিতার ইংরেজি তর্জমা? হবসবমের ভাবনার সঙ্গে কবির ইঙ্গিতের আশ্বর্য মিল আমাদের সত্যি চমকিত করে। যদিও পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক ই.পি. টমসন (১৯২৪-১৯৯৩) ও ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ সম্পাদিত যথাক্রমে ম্যাকমিলান/পেপারম্যাক ও পেঙ্গুইন সংস্করণে ‘The Sunset of the Century’ অংশটি বাদ গেছে। পরে *Nationalism*-এর বাংলা তর্জমাও হয়েছে। অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ও কৃত্যপ্রিয় ঘোষের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *জাতীয়তাবাদ*। ঐ সংস্করণেও ‘The Sunset of the Century’ অংশটি বাদ পড়ে। সেই দিক থেকে এই তিনটি সংস্করণকে অসম্পূর্ণ বলা যায়। যদিও তা আমাদের অভিনিবেশের বিষয় নয়, এ নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা জরুরি। তবু একথা বলা অমূলক হবে না, যে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত যা ধরা ছিল ‘The Sunset of the Century’ অংশে, যা কিনা সমকাল সম্পর্কে লেখকের এক প্রকার মন্তব্য, সেটি বাদ দিয়ে তাঁরা *Nationalism* বইটির প্রতি অবিচারই করেছেন। আমাদের প্রস্তাব, ১৯১৭ সালে এসে পুরোনো কবিতাগুলির শরণ নেওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। দ্বিতীয়ত, সময় সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সন-তারিখের খতিয়ানের গুরুত্ব অস্বীকার না করেই বলা যায় যে, ঐতিহাসিক ঘটনাও মাঝেমাঝে সীমানা নির্ধারণে সহায়ক হয়। আমরা দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছি সন্দর্ভের সময়কালকে নির্দেশ করার ক্ষেত্রে। তৃতীয়ত, এটিও একটি আশ্বর্য সমাপন যে ‘জ্যাঠামশায়’, বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাস্তিক (কেবল বেদে অবিশ্বাসী অর্থে নয়) চরিত্রের আবির্ভাব এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা একই বছরে। যুদ্ধ ও মঙ্গলময় সাবেক ‘ঈশ্বর’-এর অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় সম্বন্ধহীন নয়।

‘আস্তিক’ ও ‘নাস্তিক’ এই শব্দ দুটি ‘বাইনারি’ রূপে গৃহীত হয় অনেকক্ষেত্রে, শব্দদুটির বিকাশের মধ্যে সেই সম্ভাবনার বীজ যে নেই তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে উল্লেখিত শব্দটি ‘বেদ’ কেন্দ্রিক বাইনারি তৈরি করলেও পরবর্তী কালে দর্শন শাস্ত্রে তা আরও অনেকানেক সম্ভাবনার জন্ম দেয়। সেই বিষয়ে আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। দেখার চেষ্টা করেছি, শব্দ দুটি কীভাবে ‘বাইনারি’ বা দ্বৈততাকে সরিয়ে অনেকানেক ব্যঞ্জনাতে তুলে ধরেছে। মূলত অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আস্তিক কে? কে নাস্তিক?’ শীর্ষক প্রবন্ধটিকে অনুসরণ করেছি। প্রসঙ্গত, এই কথা উল্লেখ করা জরুরি, দর্শন প্রস্থানের পাশাপাশি বাংলা কথাসাহিত্যে এই প্রসঙ্গগুলি কীভাবে উপস্থিত হয়েছে তা উল্লেখ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি ‘আস্তিক-নাস্তিক’ শব্দযুগ্ম আরও অনেক নতুন অর্থ সম্ভাবনা তৈরি করেছে। নৈতিকতা ও সৌন্দর্য প্রসঙ্গেও শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। ‘আস্তিক’ ও ‘নাস্তিক’ শব্দ দুটি দর্শন শাস্ত্রের পাশাপাশি নীতি ও নন্দনতত্ত্বের প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হয়েছে, যা আরেক ধরনের জটিলতা, বৈচিত্র্যকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে। ‘আস্তিক-নাস্তিক’ ধারণা দুটি দ্বৈততা বা ‘বাইনারি’র ইঙ্গিতকে খানিক গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে।

সন্দর্ভে আমাদের মুখ্য জিজ্ঞাসা— এক, আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধ বাংলা আখ্যানের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণে কী ভূমিকা পালন করেছে? ব্যক্তি আখ্যানকারের চৈতন্যের সংকট, সময় বড়ো অর্থে সামাজিক চৈতন্য ও সভ্যতার সংকট ও উত্তোরণের সম্ভাবনার সঙ্গে এই প্রতীকটির সম্বন্ধ কেমন? চরিত্রায়ণ ও থিমের মাধ্যমে দিয়ে এই ভাবনা কীভাবে আখ্যানের ভিতরে সঞ্চারিত হয়েছে, সেটিও আমাদের অভিনিবেশের বিষয়। দুই, সেই সূত্রে ‘আস্তিক’ ও ‘নাস্তিক’ শব্দযুগ্মটির আদি রূপ কি দেশ-কাল নিরপেক্ষ কোনো ধারণার কথা বলে না কি

সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দ্যোতনা নিয়ে হাজির হয়? তিন, বাংলা সাহিত্যে ‘বাস্তবতা’ বিষয়ক বিতর্কের সঙ্গে ‘আস্তিক’ ও ‘নাস্তিক’ দার্শনিক প্রস্থানগুলির সম্পর্ক কেমন?

সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশে কারা ‘আস্তিক’ এবং কারা ‘নাস্তিক’ সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন প্রস্থানগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের প্রধান বিষয় উনিশ শতকে বাঙালির ঈশ্বর, যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতা বিষয়ক চর্চা। সামগ্রিক ভাবে বাঙালির দর্শনচর্চার রূপরেখা দেওয়া এই অংশের উদ্দেশ্য নয়। মূলত কয়েকটি বিতর্ক ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন মানুষ যাঁদের ঈশ্বর, যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতা বিষয়ক চর্চা বাঙালি মানসে প্রভাব ফেলেছে সেগুলির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একথা স্বীকার্য উনিশ শতকে নাস্তিকতা বিষয়ক আলোচনা পূর্ণমাত্রা পায়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) চতুরঙ্গ (১৯১৪ পত্রিকা, ১৯১৬ গ্রন্থাকারে)। ‘আস্তিক’ ও ‘নাস্তিক’ বিতর্ক চতুরঙ্গ-এর পরিণতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তা এই অংশের মুখ্য আলোচনার বিষয়। উনিশ শতকে নাস্তিকতা মূলত জ্ঞানচর্চার জগতেই আবদ্ধ ছিল, সে অর্থে আখ্যানের বিষয় হয়ে ওঠেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময় পর্বে তা আখ্যানের বিষয় হয়ে ওঠার কী কোনো বিশেষ কারণ আছে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, রাজনৈতিক টানাপোড়েন কী আলাদা তাৎপর্য নিয়ে আসে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ও চতুরঙ্গ-এর গড়ে ওঠা কি নিছক সমাপতন? নাকি দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো সম্বন্ধ রয়েছে? সেই সূত্রে রবীন্দ্র-চৈতন্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল সেদিকেও অভিনিবেশ দেওয়া হয়েছে। চতুরঙ্গ প্রসঙ্গে সমালোচকদের বিভিন্ন অভিমতগুলির সঙ্গে আমরা বিবাদী সংলাপে ব্রতী হয়েছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) শেষ প্রশ্ন (১৯৩১)। শেষ প্রশ্ন ও ‘অতি-আধুনিক’ বাংলা সাহিত্য

বিষয়ক বিতর্কের মধ্যকার সম্পর্ক এই অংশে আলোচিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের বয়ানে শেষ প্রশ্ন ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যের নমুনা, সেই বিশেষ নমুনাটি পেশ করার জন্য কেন তিনি ‘আস্তিক’-‘নাস্তিক’ প্রতীকটিকে আধার করলেন? এবং কেন প্রয়োজন পড়লো আধুনিক এবং কৃষ্ণসাদিকা একটি চরিত্রের? সেই বিষয়টিতেও অভিনিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) উপন্যাস। দীর্ঘ কাল ধরেই সমালোচকদের বিশ্লেষণে জগদীশ গুপ্তর আখ্যান নিয়তি বা অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত আখ্যান, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আখ্যান ‘সত্য’ বলে মনে হয়নি। জগদীশ গুপ্ত কি নিয়তি বা অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত এক সমাজের কথাই তাঁর আখ্যানে তুলে ধরেছেন? ‘সত্য’ অর্থাৎ কিনা বাস্তবের চিহ্নবিহীন জগৎ নির্মাণ করেছেন জগদীশ গুপ্ত? নাকি বাস্তবতার-ই আরেকটি পরত উন্মুক্ত করেন পাঠকের দরবারে? প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত, মান্য রুচি এবং ‘জানা’ বিষয়ক সীমাবদ্ধতাকে কি প্রশ্ন করতে চান তিনি? এই প্রশ্নগুলিই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। সেই প্রসঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, সাবেক মঙ্গলময় ‘ঈশ্বর’-এর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর কখন বিশ্বের সম্বন্ধ কী, তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ‘তিন বন্দ্যোপাধ্যায়’ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশের বিষয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬)। সমালোচকদের বিচারে *পুতুলনাচের ইতিকথা*র চরিত্রেরা নিয়তি হাতের ‘পুতুল’। পুতুল’। ভিন্ন কারণে তাদের স্ব-ইচ্ছা, স্বাধীনতা আক্রান্ত হয়েছে অজ্ঞেয় শক্তির দ্বারা। যেটি পাঠক সমাজে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রকাশকের মন্তব্যের কারণে। আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি উপন্যাসের চরিত্রেরা মূলত শশী-ডাক্তার কি নিয়তির ক্রীড়নক মাত্র? এবং সে কি ‘নির্বাসিত’ একজন মানুষ? আমরা বিকল্প প্রস্তাব পেশ করার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় অংশের আলোচনার বিষয় বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *দেবযান* (১৯৪৪)। *দেবযান*-এর কাহিনি বিন্যাসের মধ্যে বস্তুজগতের অনুপস্থিতি ও স্বর্গলোকের উপস্থিতি চোখের পড়ার মতো। কেন্দ্রিয় দুই চরিত্রই মৃত এবং স্বর্গবাসী। যে প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে তা হলো— আখ্যানকারের দার্শনিক অভিজ্ঞানের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক কেমন? এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে এরকম অলীক, ‘ভূতুড়ে’ আখ্যান রচনার কারণ কী? *দেবযান*কে কি অলীক, ‘ভূতুড়ে’ উপন্যাস বলা যায়? সমকালের সঙ্গে উপন্যাস ও উপন্যাসিকের সম্পর্ক কেমন? এই বিষয়গুলি এই অংশে আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে। তৃতীয় অংশের আলোচ্য বিষয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *যোগদ্রষ্ট* (১৯৬০)। উপন্যাসটি ‘যবনিকা’ নামে *উল্টোরাথ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে আর গ্রন্থাকারে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। আমাদের গবেষণা প্রকল্পের কাল সীমার মধ্যে *যোগদ্রষ্ট* পড়ে না। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হলেও আখ্যানের কাল^৩ বিচার করে এটিকে আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে রেখেছি। নাস্তিকতার সঙ্গে অনৈতিকতার সম্পর্ক কেমন? নাস্তিক শব্দটি অনৈতিকের সমার্থক? এই দৃষ্টিকোণ থেকে *যোগদ্রষ্ট* উপন্যাসটি পড়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) *সংকট* গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে না থাকলেও ভিন্ন স্বরকে চিহ্নিত করার জন্যে অতি সংক্ষেপে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রগতি সম্পর্কে প্রচলিত একমাত্রিক ধারণাটির মৃদু প্রতিবাদ সতীনাথের এই উপন্যাসটি। আমাদের ‘জানা’, ‘বিশ্বাস’ সম্পর্কে বা তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আরেক কিসিমের বয়ান। এই তর্ক পরবর্তী সময়েও ভিন্ন ভাবে আখ্যানে প্রতিফলিত হয়েছে সেই ইঙ্গিতটি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ‘বাস্তবতা’র সঙ্গে ‘অস্তি-নাস্তি’বোধের সম্বন্ধ কী রকমের? বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে ‘বাস্তবতা’ বিষয়ক বিতর্কের সূত্রপাত উনিশ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধে। যদিও সেখানে বাস্তবতা অপেক্ষা নৈতিকতাই প্রাধান্য পেয়েছিল। বস্তুত, বিশ শতকেই এই বিতর্কের শুরুয়াৎ, যেটিকে মূলত দুটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। এক, প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ আক্রান্ত হন এই বলে যে, তাঁর সাহিত্য ‘বস্তুতন্ত্রহীন’, তা যথেষ্ট বাস্তবোচিত নয় এবং বৃহত্তর জনজীবনের ছাপ তাঁর আখ্যান জগতে অনুপস্থিত। দুই, এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ-ই পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্যিকদের আক্রমণ করেন ‘বিলেতের আমদানী’ করা সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন আরোও অনেকানেক সমালোচকই আধুনিক সাহিত্যিকদের সমালোচনা করেছিলেন বিভিন্ন প্রশ্নে। ফলত এই পর্বের মধ্যে নানান স্তরায়ণ লক্ষ্য করা যায় এবং বিতর্কটি হয়ে ওঠে জটিল ও বহুমুখী। তাঁদের ‘বাস্তবতা’ ও ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্য ভাবনার সঙ্গে লগ্ন হয়ে থেকে অস্তি-নাস্তি সম্বন্ধীয় বোধ, মঙ্গল-অমঙ্গলের চেতনা। এই বিতর্কটিকে কীভাবে আন্তিক-নাস্তিক বিবদমান প্রস্থান প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে সেটিই আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয়।

উপসংহারে সমগ্র সন্দর্ভটি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে যে সিদ্ধান্তগুলি উঠে এসেছিল সেগুলির কথাই আরেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। তা যে নিশ্চিত করে একটি বিন্দুতে (Point) মিলিত হবে এমন নয়, বরং চিন্তার, প্রতর্কের বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, টানাপোড়েন, বিভিন্ন পিছুটান এই অংশের আলোচ্য বিষয়। নির্বাচিত উপন্যাসগুলির বাইরে, বাংলা সাহিত্যের অজস্র উপন্যাসের মধ্যে আরও কয়েকজন লেখকের আখ্যানে ‘আন্তিকতা’ ও ‘নাস্তিকতা’ সম্বন্ধীয় বোধ কী ভাবে প্রবাহিত হয়েছে সেই বিষয়টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

মূল ভাবনাটিকে রূপদানের ক্ষেত্রে উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলির পাশাপাশি সহায়ক বা পরিপূরক উপাদান মিলেছে বিভিন্ন সমালোচকদের লেখাপত্র থেকে। আলোচ্য বা নির্বাচিত উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে তাঁদের বয়ান (Discourse) এই সন্দর্ভে ‘পূর্বপক্ষ’ হিসেবে

উপস্থাপিত করা হয়েছে। ফলত সমালোচকদের লেখাগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এক অর্থে সেগুলি এই সন্দর্ভের প্রাণ। পরিশেষে ব্যবহৃত পরিভাষা ও শব্দ সংক্ষেপে প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা জরুরি। Critical শব্দটির পরিভাষা করা হয়েছে বিবাদী, এ বিষয়ে ঋণী অধ্যাপক মালিনী ভট্টাচার্যের কাছে। ২০১৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ আয়োজিত একটি আলোচনা চক্রে তিনি বিবাদী শব্দটি Critical অর্থে ব্যবহার করেন। Death Drive (Thanatos) ও Eros-এর বাংলা করা হয়েছে যথাক্রমে মরণ প্রণোদনা ও জীবন প্রণোদনা। ইংরাজি তর্জমায় দুটি রূপ পাওয়া যায়— Death Drive ও Death Instinct অনেকেই যার বাংলা করেন মরণ এষণা। মূল জার্মানে ফ্রয়েড কখনো কখনো বিষয়টি বোঝানোর জন্য ‘Trieb’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। মূল জার্মান শব্দের দ্যোতনা এষণা অপেক্ষা প্রণোদনা শব্দটির মধ্যে ধরা যায়। এই পরিভাষাটির জন্য ঋণী অধ্যাপক আব্দুল কাফির কাছে, স্নাতকোত্তর স্তরে তিনি আমাদের ফ্রয়েড পড়াতেন।

তথ্যসূত্র ও টীকা

^১ Das; Sisir Kumar (Ed.), *The English Writings of Rabindranath Tagore*, Vol. 2, Delhi: Sahitya Akademi, 2012, p. 466

^২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কাব্যগ্রন্থ*, ৭ম খণ্ড, এলাহাবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৬, পৃ. ৮৩

^৩ আখ্যানের '৪৬-এর দাঙ্গার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিতও অস্পষ্ট নয়।

পরিভাষা ও শব্দ সংক্ষেপ:

১. পরিভাষা

Critical	বিবাদী
Death Drive (Thanatos)	মরণ প্রণোদনা
Discourse	বয়ান
Enlightenment	আলোকপ্রাপ্তি
Eros	জীবন প্রণোদনা
Problem	সমস্যা-পট
Rationalism	যুক্তিবাদ
Rhetoric	ভাষ্য
Text	পাঠ

২. শব্দ সংক্ষেপ

আনুমানিক	আনু.
তর্জমা	ত.
বঙ্গাব্দ	ব.
শকাব্দ	শক.
সম্পাদক	সম্পা.
সংকলক	সং.
Editor/Edited	Ed.
Translation/Translator	Trans.

প্রথম অধ্যায়

আস্তিক-নাস্তিক পরিচয় ও উনিশ শতকে বাঙালির দর্শনচর্চা

১.১ ‘কে আস্তিক? নাস্তিক কে’

এক ইরানি কবি বিশ্বের পরিচয় দিতে গিয়ে তাকে পুরোনো পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে পাণ্ডুলিপির শুরু ও শেষের পাতাটা হারিয়ে গেছে। ফলে কীভাবেই তার শুরু আর কেমন করে সমাপ্ত হলো সেই পাণ্ডুলিপি কারুর তা জানা নেই, আর জানার সম্ভাবনাও নেই। মানুষ আত্মচেতনার শুরু থেকে সেই হারানো পাতা দুটি খুঁজে চলেছে। মানুষের সেই বিচিত্র অভিযান ও অনুসন্ধানের নামই দর্শন।^১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ভূমিকায় এই কথাগুলি লিখেছেন স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮)। এক অর্থে মানুষের সত্যিকারের ইতিহাস তার চিন্তার ইতিহাস, এখানে বাকি প্রাণী জগতের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ। অন্য একটি উপন্যাসের শরণ নেবো আমরা। সোফি অ্যামুডসন নরওয়েবাসী কিশোরী একদিন সকালে ডাকবাক্সে আবিষ্কার করে আশ্চর্য দুটো চিরকুট। চিরকুট দুটিতে লেখা আছে অবাক করা দুটো প্রশ্ন— ‘কে তুমি?’^২ আর ‘পৃথিবীটা কোথেকে এলো?’^৩ এই ভাবেই শুরু হচ্ছে ইয়ান্টেন গার্ডারের উপন্যাস *সোফি’জ ওয়ার্ল্ড* (১৯৯১)। ১৯৯৫ সালে ইংরেজি তর্জমার সূত্রে যা পৃথিবীব্যাপি পরিচিতি পেয়েছে। বেশ কিছু রহস্যময় চিঠির পর সোফির মোলাকাত হলো প্রেরকের সঙ্গে, মধ্যবয়সী দর্শনবিদ অ্যালবার্টো নব্র। ঐ আশ্চর্য চিরকুট দুটোর সূত্রেই কিশোরী সোফি ধীরে ধীরে পরিচিত হতে শুরু করল পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের সঙ্গে। চিঠির

সহজ প্রশ্নগুলোর আদৌ কোনো গুরুত্ব আছে বলে সোফির মনে হয়নি। কিন্তু চিঠির পর চিঠিতে সহজ, আলোড়নকারী প্রশ্নগুলো চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি করে সোফির মনে। নিজের মনে উঁকি বুঁকি দেয় নানান সব চিন্তার, যেগুলো হয়তো সম্ভাব্য উত্তরও বটে। এই ভাবেই চলতে থাকে তার দর্শন পাঠ। যে দুটি লেখার কথা আমরা উল্লেখ করলাম, তাদের মধ্যে একটা মিল আছে। তা হলো খোঁজ এবং জানার চেষ্টা। এই নিয়েই হয়তো দর্শনের কারবার। কবির কল্পনায় তা পাণ্ডুলিপির হারানো দুটি পাতার খোঁজ আর সোফির চোখে নিজেকে আর চারপাশকে জানার চেষ্টা।

আমরা সাধারণত দর্শন শব্দটি Philosophy-র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করি। কিন্তু ভারতীয় দর্শনচর্চার জগতে দর্শন শব্দটি সর্বদাই Philoshophy অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সংস্কৃতে দর্শন শব্দটির একটি অর্থ দেখা। হরেক রকমের দেখার কৃৎকৌশল। ফিলোসফি শব্দটির একটি অর্থ জ্ঞানের আলো, love of wisdom। পিথাগোরাস সম্ভবত প্রথম ফিলোসফি শব্দটি ব্যবহার করেন। বস্তুত দর্শন এক ধরনের বিবাদী কথোপকথনে ব্যপ্ত থাকে। বহু অর্থের মধ্যে আরেকটি অর্থ হলো— জগতের মূল তত্ত্ব বা সত্য, মানুষের আত্মা, জগৎ, ঈশ্বর, সৃষ্টি-লয় প্রক্রিয়া, আমরা যা জানি তার কতটা সত্যি কতটা মিথ্যা এই বিষয়ক নানান চর্চা, তর্ক, চিন্তাধারা। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—

“খ্রিস্টীয় যষ্ঠ শতকের পূর্বে এই শব্দটি এই জাতীয় অর্থে ব্যবহার দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। হরিভদ্র সূরির ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয় ও মাধবের সর্বদর্শন-সংগ্রহ-এ দর্শন শব্দটি অনেকটা Philosophy শব্দের প্রতি-শব্দরূপে নেওয়া হইয়াছে।”^৪

ভারতবর্ষে দর্শনচর্চার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মোক্ষলাভের পথ নির্ণয় করা। সে কারণে দর্শন ‘অধ্যাত্মবিদ্যা’ ও ‘মোক্ষশাস্ত্র’ হিসেবেও পরিচিত ছিল। সাধারণত চতুর্দশ বিদ্যার মধ্যে

‘মোক্ষশাস্ত্র’ পড়ত না। পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও মানুষ কী উপায়ে সত্যকে জানতে পারবে এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে ত্রাণ পাবে তাই ছিল মোক্ষশাস্ত্রের বিচার্য বিষয়।

Philosophy ও দর্শন শব্দ দুটির মধ্যে তফাৎ ছাড়াও ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস যেভাবে লেখা হয়েছে, যেভাবে তা বিকশিত হয়েছে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর *A History of Indian Philosophy* বইয়ের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন—

“It is hardly possible to attempt a history of Indian philosophy in the manner in which the histories of European philosophy have been written. In Europe from the earliest times, thinkers came one after another and offered their independent speculations on philosophy. The work of a modern historian consists in chronologically arranging these views and in commenting upon the influence of one school upon another or upon the general change from time to time in the tides and currents of philosophy. Here in India, however, the principal systems of philosophy had their beginning in times of which we have but scanty record, and it is hardly possible to say correctly at what time they began, or to compute the influence that led to the foundation of so many divergent systems at so early a period, for in all probability these were formulated just after the earliest Upanisads had been composed or arranged.”^৫

এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণটিকে অনুসরণ করেই ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় প্রবেশ করবো। ভারতীয় দর্শন মূলত সম্প্রদায় বা স্কুল ভিত্তিক। অতীতে কয়েকটি মূল দার্শনিক প্রস্থানের উদ্ভব হওয়ার পর তা পরম্পরায় পরবর্তীকালে প্রবাহিত হয়েছে। আমাদের দেশে নতুন ও স্বাধীন দার্শনিক মতবাদের আবির্ভাব হয়নি। এর বদলে দেখা যায় পাশাপাশি অনেকগুলি

দার্শনিক প্রস্থান ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব। নতুন দার্শনিক যে আসেননি তা নয়, নতুন দার্শনিক এসেছেন। কিন্তু তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজ সম্প্রদায় ও প্রস্থানের প্রতিনিধিত্ব করা। হয়তো সচেতনভাবেই তাঁরা নতুন কোনো প্রস্তাব বা মতামত দেবার চেষ্টা করেননি। পুরোনো অবস্থান ও মতামতগুলিকেই বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। নতুন ব্যাখ্যাকারেরা পূর্বজ আচার্যদের ব্যাখ্যা, টীকা রচনাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ফলত, চিন্তার মূলগত কাঠামো একই থেকেছে। সে কারণে প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস, অভ্যেস, সাধন পদ্ধতি, অনুষ্ঠান এমনকি আদিম সমাজের চিহ্ন সেই প্রস্থানগুলির মধ্যে রয়ে গেছে। পুরোনো অভ্যেস, বিশ্বাসগুলির সঙ্গে পরবর্তীকালের চিন্তা, চর্চার সহাবস্থান ভারতীয় দর্শনে লক্ষ করা যায়। এখানেই ইউরোপীয় দর্শনের বিকাশের সঙ্গে তফাৎ। ইউরোপে প্রাচীন পৌরানিক কাহিনির সঙ্গে তর্ক-ই দর্শনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, সেখানে ভারতীয় দর্শন পৌরানিক কাহিনি, আদিম সমাজের রীতি-নীতি, আচার, অনুষ্ঠানকে মান্যতা দিয়েই দর্শনচর্চায় রত থাকে। অতীতের প্রতি পিছুটান বা আকর্ষণ থেকে মুক্তি পায়নি বলেই ভারতীয় দর্শনচর্চার সঙ্গে ধর্মীয় সাধনা, সম্প্রদায় বহুক্ষেত্রেই জড়িত থেকেছে। ইউরোপীয় দর্শন যেখানে ধর্মের সঙ্গে তার বন্ধনকে মুক্ত করেছে সেখানে ভারতীয় দর্শন চর্চায় ধর্মের যোগ রয়ে গেছে। আজও আমাদের দেশে যোগ, বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন একদিকে যেমন দার্শনিক প্রস্থান তেমনই ধর্মসম্প্রদায়। পরবর্তীকালের দার্শনিকেরা এই বিশ্বাস, অভ্যেসগুলির সঙ্গে তর্ক অপেক্ষা তার কার্যকারিতা উদ্ভাবনেই বেশি সচেতন ছিলেন। তবে এই জাতীয় সহিষ্ণুতা বা সমর্থনের পাশাপাশি নৈয়ায়িকদের অসামান্য অবদান, ধর্মকীর্তি, কুমারিল ভট্টের অসামান্য মেধা অবশ্যই স্বীকার্য।

কিন্তু প্রাচীন দর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যাতারা অসামান্য সুক্ষ সব যুক্তির উদ্ভাবন করেছেন পুরোনো দর্শনের যৌক্তিকতা প্রমাণে। এম. হিরিয়ান্না তাঁর *Outlines of Indian Philosophy* বইয়ে মন্তব্য করেছেন—

“The conception of moksa varies from system to system; but it marks, according to all, the culmination of philosophic culture. In other words, Indian philosophy aims beyond Logic. This peculiarity of the view-point is to be ascribed to the fact that philosophy in India did not take its rise in wonder or curiosity as it seems to have done in the West; rather it originated under the pressure of a practical need arising from the presence of moral and physical evil in life, It is the problem of how to remove this evil that troubled the ancient Indian most, and moksa in all the systems represents a state in which it is, in one sense or another, taken to have been overcome.”^৬

যদিও মোক্ষ বিষয়ে সকল দার্শনিক প্রস্থান একমত নয়। ভারতীয় দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে মোক্ষের উল্লেখ করা হয়। অনেক পণ্ডিতই মনে করেন সকল দার্শনিক প্রস্থানগুলি মোক্ষশাস্ত্র হিসেবে পরিকল্পিত হয়নি। পরবর্তীকালে মোক্ষতত্ত্বের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা হয়েছে।^৭

অতীত সংস্কার, বিশ্বাস, রীতি-নীতির রেশ রয়েছে বলে একথা বলার কোনো কারণ নেই যে, ভারতীয় দর্শনে ঐশ্বর্য নেই। বিভিন্ন প্রস্থানের দার্শনিকরা অতীতকে কেন্দ্র করেই তাঁদের দার্শনিক যুক্তি সাজিয়েছেন বলার অর্থ এই নয় যে, বর্তমান প্রয়োজনীয়তা তাঁদের ভাবনায় আলোড়ন তোলেনি। তাঁদের যুক্তি কৌশল, তীক্ষ্ণতা, অসামান্য কাব্যবোধ, মেধার স্ফূরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলা মূর্থ্যামি। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে বিস্ময়কর মত বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে যেগুলি উন্নত দর্শন প্রস্থানের জন্ম দিয়েছে। সে সমস্ত দর্শন

প্রস্থানগুলি পরস্পরের মধ্যে বিবাদ, তর্ক, বিসংবাদেও লিপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন মতামতের মধ্যে তর্ক, বিবাদই ভারতীয় দর্শনের বিকাশের প্রধান কারণ। প্রকৃত প্রস্তাবে পারস্পরিক তর্কই বিভিন্ন প্রস্থানগুলিকে আরও উন্নত করে গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন প্রস্থানের দার্শনিকরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের মূল সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আরেকদিকে চিন্তা-চেতনার সঙ্গে দেশের/রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সম্পর্ক রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, দার্শনিক চিন্তার বিকাশ সর্বদা আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নির্ভর। চিন্তা, চেতনার বিকাশেরও নিজস্ব স্বকীয় নিয়ম আছে।^৮ চিন্তা সর্বদা বস্তুজগতের দ্বারা প্রভাবিত নয়। সাধারণ লজ্জে ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ দর্শনের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা দস্তুর। তর্ক যে আমাদের দীর্ঘকালে ঐতিহ্য সে কথা প্রায় বিস্মৃত হয়ে যায়। অমর্ত্য সেন তাঁর *তর্কপ্রিয় ভারতীয়* গ্রন্থে সেই তার্কিক ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি *তর্কপ্রিয় ভারতীয়*-তে মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিকে যে ভাবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে তাতে, একটি বিশেষ ধর্মীয় ঐতিহ্যের উপরে গুরুত্ব দেওয়াই দস্তুর। অন্তত সেরকমটা দেখা যায়। কিন্তু ভারতে ধর্মীয় সংশয়বাদের প্রবল উপস্থিতি এই প্রচলিত, প্রায় প্রতিষ্ঠিত রূপারোপের বিপরীত কথাই বলে।^৯ জে এন মহান্তির কথা থেকে একই প্রবণতার কথা জানা যায়। উনি লিখছেন— ভারতীয় সংস্কৃতি কী? ‘আধ্যাত্মিক’। আর পশ্চিমের সংস্কৃতি হল ‘জড়বাদী বা বস্তুবাদী’। যদি ফের প্রশ্ন করা হয় যে আধ্যাত্মিকতা বলতে কী বোঝাচ্ছে? সে উত্তর এলোমেলো। বস্তুত, ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে প্রাক বৈদিক ও বৈদিক উভয় উপাদানই বিদ্যমান। আবার বৈদিক সংস্কৃতির মধ্যে বিপুল বৈচিত্র্য রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে বেদান্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেকে নিশ্চুপ থাকেন যে আরও অনেকানেক মত ছিল যেগুলির সঙ্গে বেদান্তের বিরোধের সম্পর্ক এবং বেদান্তও নিজে অন্তহীন বিবাদে/তর্কে/বিসংবাদে জড়িত ছিল।^{১০} তাঁদের

লেখালেখি, টীকার মধ্যে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিটি প্রস্থানের সমর্থক দার্শনিকরা একদিকে যেমন আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন, তেমনই উলটো দিকে অপরাপর প্রস্থানগুলির আপত্তির জবাব দিয়েছেন, অর্থাৎ বিপক্ষ খণ্ডন। নিজের মতটি ব্যক্ত করার আগে ভারতীয় দার্শনিকরা বিস্তৃতভাবে অপরাপক্ষ বা বিরুদ্ধপক্ষের মতটি উল্লেখ করেন। তা পূর্বপক্ষ, এবং তা খণ্ডন করার পর নিজের অভিমত প্রতিষ্ঠা করেন। যা সিদ্ধান্তপক্ষ নামে স্বীকৃত।

ভারতীয় দর্শনকে ‘আস্তিক’ ও ‘নাস্তিক’ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সাধারণত যে সমস্ত দর্শন প্রস্থান বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে তাদের আস্তিক দর্শন। এবং যে সব দর্শন প্রস্থান বেদকে প্রমাণ হিসেবে মানে না তাদের নাস্তিক দর্শন বলা হয়। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন ছাড়া সকল দর্শন প্রস্থানই বেদকে পারমার্থিক সত্য বলে স্বীকার করেছে। তবে আস্তিক-নাস্তিক শব্দ দুটি সবদা পারিভাষিক অর্থকেই প্রকাশ করেছে তা নয়। ক্ষেত্র বিশেষে তা ভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক কালে আস্তিক ও নাস্তিক এই শব্দ দুটি ঈশ্বর বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রশ্নে ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের মুখ্য অবলম্বন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আস্তিক কে? কে নাস্তিক?’ শীর্ষক প্রবন্ধটি। অধুনা আস্তিক-নাস্তিক শব্দযুগ্মটি অনেকক্ষেত্রেই ঈশ্বরে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস বোঝাতে উল্লেখ করা হয়। কেবলমাত্র এই অর্থে স্থিত থাকলে শব্দ দুটির বহু ব্যঞ্জনা, বিস্তৃত ক্ষেত্রটি অধরা থেকে যাবে। সে কারণেই আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো ভারতীয় দর্শনে এই শব্দ দুটি কী কী অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

কঠোপনিষদ-এ একটি অসাধারণ গল্পের সন্ধান মেলে। পিতা নচিকেতাকে যমের কাছে অর্পণ করেছেন। যমলোকে যমরাজের প্রতিক্ষায় তিন রাত কাটিয়ে ফেলেছে নচিকেতা। কীভাবে সে এলো যমালয়ে? পিতা আরুণি উদ্দালক যজ্ঞের অঙ্গ হিসেবে নিজের সমস্ত কিছু দান করতে চেয়েছিলেন ছিলেন। তখন নাছোড় পুত্র নচিকেতার বারংবার প্রশ্নে^{১১} বিরক্ত আরুণি

জানান তাকে মৃত্যুর কাছে অর্পণ করলেন।^{১২} নিজলোকে ফিরে যম তিন রাত উপবাসী নচিকেতাকে তিন বর দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।^{১৩} নচিকেতার প্রথম দুই ইচ্ছে পূরণে যমের কোনো অসুবিধে হয়নি। কী ছিল নচিকেতার প্রার্থনা? পিতা যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হন।^{১৪} আর মৃত্যুর পর যারা স্বর্গে যান, তারা অমৃতত্ব লাভ করেন। নচিকেতা স্বর্গ লাভের উপায় অগ্নিবিদ্যা দ্বিতীয় বর হিসেবে প্রার্থনা করে।^{১৫} লক্ষণীয় এই দুটি বর-ই কাম্য বিষয়, ফলত যমের বর দানেও কোনো অসুবিধে থাকে না। তৃতীয় বরটি শারীরিক, বৈষয়িক চাহিদা অপেক্ষা চৈতন্যের চাহিদা। তা কোনো পার্থিব ও পারমার্থিক আকাঙ্ক্ষা প্রসূত নয়, নিখাদ জিজ্ঞাসা এবং সংশয় জাত। যা কোনো অর্থে পার্থিব ও পারমার্থিক কামনাকে চরিতার্থ করে না কিংবা পার্থিব ও পারমার্থিক কামনাকেন্দ্রিক নয়। নচিকেতা বলে, মানুষের মৃত্যুর পর তার মনে সংশয় জাগে যে, মৃত্যুর পর আত্মার কোনো অস্তিত্ব আছে কি না? কেউ বলেন আছে আবার কেউ বলে আত্মা নেই। আপনার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই। পরলোক সম্বন্ধে লোকের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অনুগ্রহ করে তা ভঞ্জন করুন। এই আমার তৃতীয় বর।^{১৬} নানা উপায়ে যম নচিকেতাকে নিরস্ত করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু নচিকেতাও অটল। বয়সে নবীন হলেও সে জানে ইন্দ্রিয়ভোগসুখ ক্ষণস্থায়ী। নানাবিধ দুর্লভ সামগ্রী, স্বত্ব-স্বামিত্বের প্রতিশ্রুতি পেয়েও নচিকেতা যমকে বলে, রথাদি, নৃত্যগীত আপনারই থাকুক। শেষ পর্যন্ত যম উত্তর দেন সংশয়ের কোনো কারণ নেই। ইহলোক উত্তর পরলোক কোনো আকাশ কুসুম কল্পনা নয়। পরলোক আছে না নেই এই নিয়ে লোকে তর্ক-বিতর্ক করে, যার বস্তুগত ভিত্তি নিয়ে দেবতাদের মধ্যেও সংশয় ছিল।^{১৭} যম এরপর বলেন আত্মা স্বতঃপ্রমাণিত এবং সত্য। দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে যম বলেন, আত্মা জন্মরহিত, ক্ষয়রহিত, বৃদ্ধিরহিত, শরীরের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না।^{১৮} প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমান দুইয়ের কোনোটির দ্বারাই আস্তিক এবং নাস্তিক প্রমাণ

করা যায় না। তাহলে এই সংশয়ের মীমাংসা কোথায়? নচিকেতা এর উত্তর বা বলা ভালো শব্দ প্রমাণের খোঁজেই যমরাজের শরণ নেয়।^{১৯} সংশয়ের উত্তরে যম জানায়, আত্মা বাক্যের অতীত, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তা পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছু মানুষ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু যাদের ঐ বিশ্বাস নেই তাদের কাছে কিভাবে অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়।^{২০} এই প্রসঙ্গে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—

“প্রশ্ন ঠিক, অথচ উত্তরদাতা ভুল— ছাত্রের পক্ষে শোচনীয় এ দশাকে আরো প্রকট করতে ২/৩/১২-র ভাষ্যে লিখেছিলেন শংকর, নাস্তিকবাদী যে, রব যার, নাস্তি জগতো মূলমাত্মা, জগতের মূলকারণ আত্মা বলে কোনো পদার্থই নেই, তার সান্নিধ্যে, (আর যা-ই সুবিধে হোক), আত্মাজ্ঞানের অ-ভাব মেটে না।”^{২১} যমের সঙ্গে একমত নচিকেতা নাস্তিক বুদ্ধির দ্বারা জাগতিক কোনো কিছুর প্রার্থনা করে না। নচিকেতা, শঙ্কর ভাষ্য অনুযায়ী আত্মজ্ঞানের বিশেষ পথটি বেছে নেয়। কিন্তু মীমাংসা হয় না কে আস্তিক? কে নাস্তিক? ভারতীয় দর্শনে এই বিষয়টি বারেবারেই ফিরে এসেছে। সম্ভবত *কঠ উপনিষদ*-এ আস্তিক্য-নাস্তিক্য সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রাথমিক সূত্রপাত।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের সূত্র ধরে আমরা *চরকসংহিতায়* আস্তিক ও নাস্তিক বিষয়ে কী বলা আছে তা দেখে নেবার চেষ্টা করবো। ‘চরক’ শব্দের অর্থ ভ্রাম্যমান^{২২}। ভ্রাম্যমান চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণের কোষগ্রন্থই *চরকসংহিতা* নামে পরিচিত। বইটি আটটি ‘স্থান’-এ বিভক্ত। তার প্রথম স্থানের শিরোনাম ‘সূত্রস্থান’। সেই ‘সূত্রস্থান’ আবার সাতটি ‘চতুষ্ক’-এ বিভক্ত। তৃতীয় চতুষ্কটির শিরোনাম ‘নির্দেশ-চতুষ্ক’। সেই ‘নির্দেশ-চতুষ্ক’-এর তৃতীয় ভাগের বিষয় বস্তু ‘তিশরৈষণা’ বা ‘তিন এষণা’ বা ‘Three Basic Desires of Life’। কী এই তিন এষণা বা চাহিদা? ‘প্রাণৈষণা’ বা ‘বাঁচার বাসনা’, ‘ধনৈষণা’ বা ‘বিত্তবাসনা’ শেষত ‘পরলোকৈষণা’ বা ‘পরলোকবাসনা’।^{২৩} *চরকসংহিতায়* ‘বাঁচার বাসনা’ ও ‘বিত্তবাসনা’ নিয়ে

আধ্যাত্মিক বিতর্ক বা সমস্যা তৈরি হয়নি। চরকের অভিমত এক্ষেত্রে স্পষ্ট, মানব সমাজে এমন কেউ নেই যাদের মধ্যে বাঁচার ও ধনসম্পদ চায় না। কিন্তু দার্শনিক সংকট তৈরি হয় ‘পরলোকৈষণা’ ঘিরে। পরলোক, মরণোত্তর সত্তা বা তিরোধানের পরের অস্তিত্ব বিষয়ে অনেকেই সংশয়ী। একদল দার্শনিক আছে যারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছুকে প্রমাণ হিসেবে মানেন না। আর পরলোক বিষয়টি যেহেতু অপ্রত্যক্ষ সেকারণে সেটি থাকার সম্ভাবনা তারা বাতিল করে দেন। অন্যদিকে জন্মান্তরের পক্ষে শ্রুতি বা শব্দপ্রমাণ ভিন্ন অন্য কোনো প্রমাণ নেই। প্রত্যক্ষ ও শ্রুতিবাক্যের মধ্যে তর্ক ছাড়াও আছে জন্মের কারণ নিয়ে ভিন্ন মত। কী থেকে মানুষের উৎপত্তি এ প্রশ্নেও প্রস্থানভেদে মতবিরোধ আছে। ফলত ‘পরলোকবাসনা’ নিয়ে নিশ্চিত উত্তর চরকসংহিতায় নেই। ‘সূত্রস্থান’ ১১/৬ শ্লোকে পরোক্ষ প্রমাণে অনুৎসাহী, পরলোক বিষয়ে অবিশ্বাসীরা নাস্তিক নামে অভিহিত হয়। প্রাথমিকভাবে আস্তিকত্ব ও নাস্তিকত্ব নির্ধারিত হয় বেদ-এ বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রশ্নে। কিন্তু চরকসংহিতা আস্তিক্য-নাস্তিক্য নির্ণয়ে আরেকটি শর্ত আরোপ করছে। তা হলো পরলোকে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের শর্ত।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর চতুর্থ পাদ ষাটতম সূত্র ‘অস্তি-নাস্তি-দৃষ্টং মতিঃ’। পাণিনির সূত্র অনুযায়ী ঠক্ প্রত্যয় সহযোগে যা থেকে উৎপন্ন হয় যথাক্রমে আস্তিক, নাস্তিক, দৈষ্টিক। ‘মতিঃ’ শব্দের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে তীক্ষ্ণ মতবিরোধ রয়েছে। দৈষ্টিক বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো, আপাতত আস্তিক ও নাস্তিক শব্দদ্বয়ের উপরেই আমাদের অভিনিবেশ থাকবে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে কেন্দ্র করে কাত্যায়ন লেখেন বার্তিক। সেই বার্তিককে কেন্দ্র করে পতঞ্জলি লেখেন মহাভাষ্য। ব্যাকরণের সাহিত্যের ইতিহাসে অসামান্য সেই গ্রন্থ। আস্তিক সম্পর্কে বলা হয়েছে; আছে, এই যার মতি সে আস্তিক। নেই, এই যার মতি সে নাস্তিক এবং দৃষ্ট, এই যার মতি সে হলো দৈষ্টিক। এখানে বিশেষ করে উল্লেখ্য, কী

সেই মতি যা থাকা ও না থাকার ভিত্তিতে আস্তিক ও নাস্তিক হিসেবে কেউ চিহ্নিত হয়, সে বিষয়ে পাণিনি কিংবা পতঞ্জলি নির্দিষ্ট নির্দেশ বা বিধান দেননি। ফলত *অষ্টাধ্যায়ী* ও *মহাভাষ্যে* আস্তিক নাস্তিক সত্তা ও সংজ্ঞা পরবর্তীকালের ব্যাখ্যাকার ও পণ্ডিতদের বয়ানে নিজ অভিরুচি অনুযায়ী উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্তের দিকে নজর দেবো—

১) *বার্ত্তিক* ভাষ্যের পরে আছে *বৃত্তি*। সবচেয়ে প্রাচীনটি হলো *কাশিকাবৃত্তি*। সেখানে নির্ণীত হয়েছে মতি সত্তার বিশেষতা। কী সেই বিশেষতা? আস্তি ও নাস্তির সঙ্গে জুড়ে আছে পরলোক সংক্রান্ত ভাবনা। পরলোক আছে, এই যার মতি সে আস্তিক এবং পরলোক নেই এই যার মতি সে নাস্তিক। *কাশিকাবৃত্তি* এক টীকাকার হলেন জিনেন্দ্রবুদ্ধি। তাঁর টীকার নাম *ন্যাস* অথবা *কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা*। সূক্ষ্ম বৈয়াকরণ বিচারের মাধ্যমে টীকাকার সিদ্ধান্ত করেছেন, পরলোকের আছত্তে যার মতি, সেই আস্তিক। একই ভাবে বিরুদ্ধ-পদ নাস্তিক। *কাশিকাবৃত্তি* আরেক টীকাকার একাদশ শতাব্দীর হরদত্ত মিশ্র। তাঁর টীকার নাম *পদমঞ্জরী*। পদমঞ্জরীকারও পরলোকের শরণ নিয়েছেন। পূর্বজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কৈয়টের *প্রদীপ*-এর টীকা লেখেন নাগেশভট্ট। তাঁর টীকার নাম *মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত*, যা সংক্ষেপে *উদ্যোত* নামেও পরিচিত। সেখানেও আস্তিক্য ও নাস্তিক্য নির্ণয়ে অন্যতম শর্ত পরলোকে মতি।^{২৪}

২) পতঞ্জলির *মহাভাষ্য*-এর টীকা *মহাভাষ্যাদীপ* বা সংক্ষেপে *প্রদীপ*-এর রচয়িতা দশম শতকের কৈয়ট। তাঁর অভিমতের মধ্যে *কাশিকাবৃত্তি* অনুরণনই শোনা যায়। তবে তিনি পারলৌকিক ভাবনাকে শর্ত হিসেবে খাঁড়া করার যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর অভিমত, লোকপ্রয়োগের দিকে নজর দিলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। লোকজ ভাবনায় আস্তিক ও নাস্তিক বিচার একান্তভাবে পারলৌকিক বিশ্বাস নির্ভর।^{২৫}

৩) ১৮৯১ সালে প্রকাশিত শ্রীশচন্দ্র বসুর পাণিনি অনুবাদে লিখেছেন—

“The affix (ঠক্) does not apply to the sense of belief in general, but to a particular sort of belief. Thus, an Astika is he who believes that the Hereafter *is*. Contrary to him is a Nastik: (he) who does not believe in Hereafter.”^{২৬}

তিনি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করলেন সবরকমের বিশ্বাসের মাধ্যমে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা নির্ণীত হবে না। একটি বিশেষ শর্তই এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪) ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয় দেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্নের প্রভা। সেখানেও পরলোক বিষয়ক বিশ্বাসই নির্ধারণের শর্ত। তবে এর পাশাপাশি তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসকেও স্থান দিয়েছেন।^{২৭}

১৯৮৯ সালে সৌমিত্র এম. কাত্তের তর্জমায় ও ব্যাখ্যায় আস্তিক ও নাস্তিক হয়ে উঠেছে যথাক্রমে theist ও atheist। খেয়াল করার বিষয় বিশ শতকে প্রবেশ করে আস্তিক ও নাস্তিক বিচারে ঈশ্বর গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হয়ে উঠল।^{২৮}

রামায়ণ-এর ‘অযোধ্যাকাণ্ড’-এ রাম-জাবালি কথোপকথন অংশটির দিকে নজর ফেরাবো। পিতৃসত্য পালনের জন্যে রামচন্দ্র তখন চিত্রকূট পাহাড়ে রয়েছেন। এমন সময় সেখানে সপার্ষদ হাজির হন ভরত। রামচন্দ্র জানতে পারেন পুত্রবিরহ সহ্য করতে না পেরে প্রাণ ত্যাগ করেছেন দশরথ। সেখানেই পিতৃ-তর্পণ সারেন। সবার সামনেই ভরত বলেন রাম রাজার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে রাম বলেন আমরা সকলে পিতৃসত্য পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হই। সেই মুহূর্তে ঋষি জাবালি জানান তাঁর অভিমত। কী সেই বক্তব্য? এই সংসারে কে কার? কে আপন পরই বা কে! জীব একবারই জন্মায়, একবারই মারা যায়।

জন্ম বিষয়ে পিতা কেবল নিমিত্তমাত্র। মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে শাস্ত্র তৈরি করেছে কিছু ধূর্ত লোক। মৃতকে অন্ন নিবেদন করে কোন উপকার সাধিত হয়? শাস্ত্রকারদের প্রবোধ যারা মানে তাদের মতো বুদ্ধি যেন তোমার না হয়। প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান করো রাম, সর্বসম্মত যে বুদ্ধি, তার উপরোধে ভরতের অনুরোধ মেনে রাজ্যভার গ্রহণ করো। পরোক্ষের অনুসন্ধান সময় অপচয় করো না।^{২৪} হতবাক রামচন্দ্র রাগত স্বরেই জানান দেন এহেন আচরণ নাস্তিকের মতো। বস্তুত, যে বক্তব্য জাবালি রাখেন, সেটির সঙ্গে চার্বাকদের মতের মিল লক্ষণীয়। এরপরে রোষার্ত রামচন্দ্র বলেন, যেমন চোরেরা, তেমনি তথাগত বুদ্ধ ও নাস্তিকরা। এখানে নাস্তিক শব্দটির সঙ্গে জুড়ে গেছে আরও দুটি বিষয়, চোর ও বৌদ্ধ ধর্ম। *রামায়ণ*-এ রামের মুখ দিয়ে এই নিন্দা বাক্যটিতে নাস্তিকতার সঙ্গে নৈতিকতা ও ধর্মীয় ভিন্নতার সহাবস্থান লক্ষণীয়। রামায়ণকার সচেতনভাবে নাস্তিক মাত্রই অনৈতিক এহেন বয়ানকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। এখান থেকে ‘নাস্তিক’ শব্দটি আরও একটি অর্থ বোঝার সম্ভাবনা তৈরি করে। নাস্তিক পরলোকে অবিশ্বাসী, *বেদ* উপেক্ষা করে। নতুন সংযোজন এরা তর্ক বিদ্যায় পটু এবং নীতিবোধরহিত। সেকারণেই রামের উচ্চারণে চোর, বৌদ্ধ এবং নাস্তিক একগোত্রে স্থান পায়। ‘নাস্তিক’ অবস্থানটি *মৈত্রী উপনিষদ*-এ নিন্দিত। নানান বদগুণের তালিকায় স্থান পেয়েছে নাস্তিক্য। *মৈত্রী উপনিষদ*-এর দুটি তর্জমাকে সাম্প্র্য রূপে হাজির করবো। একটি E.B. Cowell-এর করা, আরেকটি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের। তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের তর্জমা করতে গিয়ে Cowell নাস্তিকতার অর্থ করেছেন atheism^{২০}। রাধাকৃষ্ণন অর্থ করেছেন unorthodoxy^{২১}। টীকায় unorthodoxy সম্পর্কে লিখছেন— “unorthodoxy: non-belief in the unseen world and indifference to sacred scriptures,”^{২২} একজনের কাছে নাস্তিকের অর্থ ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, আরেকজনের কাছে পরলোকে

সম্পর্কে অবিশ্বাসী এবং পুণ্য বা পবিত্র গ্রন্থে অনাস্থাশীল। *রামায়ণ* ও *মৈত্রী উপনিষদ*-এ নাস্তিক কেবল পরলোক ও বেদে অবিশ্বাসী নয়, সে অনৈতিক। নাস্তিক্য খারাপ গুণ হিসেবে চিহ্নিত হলো। পঞ্চম অধ্যায়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *যোগদ্রষ্ট* উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এই বৈশিষ্ট্যটির প্রসঙ্গ আসবে।

মহাভারত-এর ‘শান্তিপর্ব’-এ চার্বাকের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্ত, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় সভাগৃহে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয় চার্বাক। সে বলে ওঠে আপনি জ্ঞাতিঘাতি, ধিক্কারযোগ্য একজন রাজা। কী হবে আপনার বেঁচে? আপনার মরণই ভালো। ভিক্ষুর মুখে এই কথা শুনে বিমনা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে প্রাণ ত্যাগ করা শ্রেয়? ব্রাহ্মণরা টের পান এই ভিক্ষুক আর কেউ নয়, স্বয়ং চার্বাক। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের কোপানলে মাটিতে লুটোয় চার্বাক। কী পরিচয় চার্বাকের? সে দুর্যোধনের বন্ধু এবং রাক্ষস। এখানে চার্বাক অর্থাৎ নাস্তিকের জাতি পরিচয় বিবৃত হলো। *মহাভারত*-এর ‘আরণ্যকপর্ব’-এ ধর্মব্যাধ কৌশিক মুনিকে শিষ্টাচারের পরামর্শ দেন। সেখানে ধর্মব্যাধ জানান প্রত্যেক জ্ঞান পিপাসুর উচিত বৈদিক আচার রপ্ত করা এবং আস্তিকের সঙ্গ করা। আর সে কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নাস্তিকের সঙ্গ।^{৩৩} ‘শান্তিপর্ব’-এ আছে কশ্যপবংশসম্বৃত ঋষি ও শৃগালরূপী ইন্দ্রের কথালোপ। আত্মহত্যা সংকল্পবদ্ধ ঋষিকে বাঁচাতে শৃগালরূপী ইন্দ্র বলেন, পূর্বজন্মে হেতুবাদী, নিরর্থক তর্কিক, বেদ নিন্দুক, নাস্তিক হওয়ার দরুন পণ্ডিতাভিমानी মূর্খের বেশি কিছু ছিলেন না। সেই দোষের ফলেই এ জন্মে শেয়াল হতে হয়েছে তাঁকে।^{৩৪} নাস্তিক শব্দটির অর্থবিস্তার তাকে কেবলই বেদে অবিশ্বাসী অর্থের মধ্যে আটকে রাখে না, আরও অনেকানেক বৈশিষ্ট্য ও ব্যঞ্জন ধারণ করে।

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে আন্তিক-নাস্তিক বিষয়টি কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সেই দিকে নজর ফেরাবো। স্বয়ং মহাবীরের গণনা অনুযায়ী তাঁর সমসাময়িক শ্রমণ সম্প্রদায়ের সংখ্যা ৩৬৩। এই সম্প্রদায়গুলির দর্শন প্রস্থানগুলির দিকে নজর দিলে চারটি প্রস্থান লক্ষ করা যাবে।

১. ত্রিযাবাদী— আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী

২. অত্রিযাবাদী— আত্মার অনস্তিত্বে বিশ্বাসী

৩. অজ্ঞানিকবাদী— যাদের চোখে সকল ‘জ্ঞাতব্য’ বিষয়ই সমস্যাময়। কোনো যুক্তিগ্রাহ্য সমাধানে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা এদের মধ্যে নেই। এঁরা সংশয়ী, অজ্ঞেয়বাদের ঝোঁকও লক্ষ করা যায়।

৪. বৈন্যিকবাদী— এঁরা ‘বিনয়’ বা discipline-এ আস্থাশীল।^{৩৫}

এই প্রস্থানগুলি আবার বহু উপধারায় বিভক্ত।

গৌতম বুদ্ধের মতানুসারে অন্যান্য মতবাদের সংখ্যা ৬২। ঐ ‘দ্বি-ষষ্ঠী প্রণালী’ বহু স্থূল ও সূক্ষ্ম উপবর্গে বিভক্ত। বুদ্ধের বচনানুসারে সেগুলি এগারোটি দার্শনিক প্রস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে। তালিকাটি—

১. শ্বাশতবাদী— আত্মা নিত্য এই যাদের মত

২. আধা-শ্বাশতবাদী— যাঁদের কাছে আত্মা অংশত শ্বাশ্বত, অংশত অশ্বাশ্বত

৩. অন্তানন্তিকবাদী— জগৎ সান্ত না অনন্ত এই নিয়ে যাঁরা ভাবিত

৪. আমরা-বিক্ষেপিক— কোনো প্রশ্নের সরাসরি উত্তর/জবাব দিতে এঁরা অসম্মত

৫. অধীত্য-সমুৎপন্নিক— আত্মা ও জগৎ অকারণ-সম্ভূত এই যাঁদের মত

৬. পূর্বান্ত-কল্পিক ও পরান্তানুদৃষ্টিবাদী— অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত

৭. মরণোত্তর স-চৈতন্য আত্মায় বিশ্বাসী

৮. মরণোত্তর অ-চৈতন্য আত্মায় বিশ্বাসী

৯. মরণোত্তর আত্মার নৈব-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞী সত্তায় বিশ্বাসী

১০. উচ্ছেদবাদী— মৃত্যু-মুহূর্তে আত্মার আনুপূর্বিক বিলয়ে বিশ্বাসী

১১. দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণবাদী— পাঁচ ইন্দ্রিয়ই যথেষ্ট। এর মাধ্যমেই ইহলোকেই চূড়ান্ত সুখলাভ সম্ভব, এই যাদের মত।^{৩৬}

বুদ্ধ ‘ঈশ্বর’ও বিষয়টি উপেক্ষা করে গেছেন। পরে বাংলায় রচিত বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত লেখায় বুদ্ধ নাস্তিক নন এমনটাই প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করার চেষ্টা দেখা গেছে। অঘোরনাথ গুপ্ত *শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব* (১৮৮২)-এ লিখেছেন—

“[বুদ্ধ যে] অপূর্ব নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া সম্বুদ্ধ হইলেন, তাহা কি অবিশ্বাসে নাস্তিকতার ফল?”^{৩৭} দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ‘আর্য্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত’ প্রবন্ধে লিখছেন—
“বুদ্ধদেব নিজে যে নাস্তিক [নিরীশ্বরবাদী] ছিলেন, তাহার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, আর, তাহা বিশ্বাসযোগ্যও নহে।”^{৩৮}

উপনিষদের মধ্যেও অবৈদিক ধারণা ও চিন্তার আভাস পাওয়া যায়। *কৌষীতকী উপনিষদ*-এর বিবরণে যারা কেবল বর্তমান মানে, লোকোত্তরতায় বিশ্বাসী নয় তাদের কাছে ব্রহ্মলোক চিরপর্যাহত থেকে যায়।^{৩৯} *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ*-এর প্রারম্ভিক শ্লোকে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। প্রশ্নগুলি এরকম—

“ব্রহ্মই কি এই জগতের কারণ? আমরা কোথা থেকে এসেছি? সৃষ্ট হবার পর কে আমাদের পালন করেন?
মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাব? হে ব্রহ্মবিদগণ, কার বিধানে আমরা সুখ-দুঃখ ভোগ করি?”^{৪০}

দ্বিতীয় শ্লোকটিতে সেই প্রশ্নের সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে।

“কাল, বস্তুর স্বভাব, কারণ এবং তার কার্য, আকস্মিক ঘটনা, ক্ষিতি, অপ ইত্যাদি মহাভূত অথবা জীবাত্মা, এই সবার কোনও একটি কি জগতের কারণ? এইটিই প্রশ্ন।”^{৪১}

ষড়দর্শনে ‘ঈশ্বর’-এর স্বীকৃতি কি আছে? অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), যাঁকে একসময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘নাস্তিক’ বলে ভৎসনা করেন, তাঁর ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় বইয়ে এই ষড়দর্শনকেই নিরীশ্বরবাদী বলে উল্লেখ করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে আমরা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ‘ঈশ্বর’কে এই জগতের কর্তা বা পুরুষ ধরলে এই ছটি আস্তিক প্রস্থান থেকে যে মন্তব্যগুলি পাই^{৪২}—

সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র-এর ১/৯২ সূত্র ‘ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ’ অর্থাৎ ‘প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ’ অনুযায়ী সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বরবাদী। যোগ-সূত্র-এর ১/২৩ সূত্র ‘ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্’ অর্থাৎ ‘ঈশ্বরও প্রণিধান হতে চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ বা সমাধি সম্ভব’ অনুযায়ী যোগ দর্শন সেশ্বর। বৈশেষিক-সূত্র-এর ১০/২/৯ সূত্র ‘এ বচন তাঁর, তাই এ প্রামাণ্য’ অনুযায়ী বৈশেষিককে নির্দিধায় সেশ্বরবাদী বলা চলে না। ন্যায়সূত্র-এর ৪/১৯ ও ৪/২০ সূত্র অনুযায়ী ন্যায় দর্শনকে সেশ্বরবাদী বলা কিঞ্চিৎ একটেরে। মীমাংসাসূত্র-এ বেদকে অপৌরুষে বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাই জগতের কর্তা কিংবা নিয়ন্ত্রক রূপে ঈশ্বরের কল্পনা করা অর্থহীন। পূর্বমীমাংসা নিশ্চিতভাবেই নিরীশ্বরবাদী দর্শন। বেদান্ত দর্শন বহুধা বিভক্ত। এরমধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মধ্যে ভক্তিবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়, সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলন এঁদের প্রভাবিত করেছে। উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রভাবও এদের মধ্যে লক্ষ করার মতো।^{৪৩} অদ্বৈত বেদান্ত ছাড়াও বাকি চারটি বৈদান্তিক প্রস্থানই সেশ্বরবাদী। শঙ্করের মতে ঈশ্বর কল্পনা বেদ বহির্ভূত। তিনি সিদ্ধান্ত টানেন যে ঈশ্বর কখনই জগতের নিমিত্তকারণ হতে পারেন না। তাঁর বীক্ষায় ব্রহ্ম নির্গুণ, তাই সগুণব্রহ্ম অর্থে ঈশ্বরও পারমার্থিক দৃষ্টিতে অসিদ্ধ। কিন্তু ব্যবহারিকতার প্রক্ষে ‘ঈশ্বর’ ধারণাটি

বাতিল করা বাস্তবচিত নয়। এই যুক্তিটিকে শঙ্করের দার্শনিক কপটতার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়(১৯১৪-২০০৭)।^{৪৪}

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় উপরোক্ত প্রবন্ধে একটি তালিকার মাধ্যমে বিষয়টি দেখিয়েছেন।

সেটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম^{৪৫}—

	বেদের প্রামাণিকতা	আত্মা /আত্মা	জন্মান্তর	কর্মফল	পরলোক	ঈশ্বর
বৌদ্ধ	নাস্তি	নাস্তি	অস্তি	অস্তি	অস্তি	নাস্তি
জৈন	নাস্তি	অস্তি	অস্তি	অস্তি	অস্তি	নাস্তি
অক্রিয়বাদ	নাস্তি	?	?	নাস্তি	?	নাস্তি
নিয়তিবাদ [আজীবিক]	নাস্তি	?	অস্তি	নাস্তি	?	নাস্তি
পরমাণুবাদ	নাস্তি	নাস্তি [অনুমিত]	?	নাস্তি	?	নাস্তি
অন্তঃনিকবাদ	নাস্তি	অস্তি নাস্তি অবজ্ঞ্যঃ	অস্তি নাস্তি অবজ্ঞ্যঃ	অস্তি নাস্তি অবজ্ঞ্যঃ	অস্তি নাস্তি অবজ্ঞ্যঃ	অস্তি নাস্তি অবজ্ঞ্যঃ [অনুমিত]
অদ্বৈত বেদান্ত	অস্তি	অস্তি	অস্তি	অস্তি	অস্তি	অস্তি-নাস্তি
লোকায়ত	নাস্তি	নাস্তি	নাস্তি	নাস্তি	নাস্তি	নাস্তি

ভারতীয় দর্শনে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলি নিরন্তর আলোচিত হয়েছে, সেগুলি হলো— বেদপ্রামাণ্যতা, আত্মা, পরলোক, জন্মান্তর, কর্মফল এবং ঈশ্বরও। কেবলমাত্র চার্বাক/লোকায়ত দর্শনই সব প্রশ্নে নাস্তিক। বাকি প্রস্থানগুলির মধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

ভারতীয় দর্শনে ‘আস্তিক’ ও ‘নাস্তিক’ এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। যে দর্শন প্রস্থানগুলি বেদে বিশ্বাস রাখে কিংবা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে, সেগুলি আস্তিক দর্শন আর যে প্রস্থানগুলি স্বীকার করে না সেগুলি নাস্তিক। চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন ছাড়া বাকি সকল প্রস্থানগুলিই বেদকে পরমার্থ সত্য হিসেবে স্বীকার করেছে। প্রধানত দুটি বেদ মৌলিক, ঋকবেদ ও অথর্ববেদ।^{৪৬} বেদ কবিতায় লেখা, কয়েকটি শ্লোক বা কবিতা নিয়ে তৈরি হয়েছে একটি বৃহৎ কবিতা। প্রতিটি কবিতা বা শ্লোক এবং তার অংশকে বলা হয় মন্ত্র, সেই সমষ্টিকে ‘সূক্ত’ বলা হয়। ঋকবেদ ও অথর্ববেদ কয়েকটি সূক্তের সমষ্টি, সে কারণে তার আরেক নাম ‘সংহিতা’। গুরুমুখ থেকে শুনে ছাত্রেরা মনে রাখত বলে বেদের অপর নাম ‘শ্রুতি’। ঋকবেদ-এর যে সূক্তগুলি সুর সংযোগে গাইতে পারা যেত সেগুলিকে একত্রে বলা হয় সামবেদ বা ‘সামসংহিতা’। যে মন্ত্রগুলি মূলত যজ্ঞের কাজে ব্যবহৃত হতো সেগুলিকে একত্র যজুর্বেদ বা ‘যজুঃসংহিতা’ বলা হতো। যজুর্বেদ মূলত ঋকবেদ থেকে সংগৃহীত হলেও, এর মধ্যের অনেকগুলি মৌলিক সূক্ত আছে। এই ছাড়া আরেক জাতীয় বৈদিক সাহিত্য আছে যা ব্রাহ্মণ নামে অবিহিত হয়। ব্রাহ্মণগুলি মূলত গদ্যে লেখা, যজ্ঞ করার নির্দেশিকা আলোচ্য বিষয়। এছাড়া বেদের আরেকটি বিভাগ আছে যা আরণ্যক নামে পরিচিত। এর মধ্যে কাল্পনিক ধ্যানের উপদেশ দেওয়া আছে। বেদের চতুর্থ ও শেষ ভাগ উপনিষদ বা ‘বেদান্ত’ নামে পরিচিত। উপনিষদগুলির মধ্যে এগারোটি সবচেয়ে প্রাচীন বলে স্বীকৃত। সেগুলি হলো— ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মন্ডুক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও শ্বেতাস্বতর। পরবর্তীকালে আরও অনেক লেখাই উপনিষদ নামে অবিহিত হয়ে থাকে। পণ্ডিতদের মতে এই এগারোটি সবচেয়ে প্রাচীন। উপনিষদের মূলত কবিতা, তর্ক-যুক্তি প্রণালীতে কোনো মতামত বা সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের ভঙ্গিমায় রচিত নয়। কবি যেমন কবিতার মধ্যে তার অনুভূতি ও মত ব্যক্ত করেন

খানিক সেই ভঙ্গিমায় ঋষিরা জীবন, জগৎ, পরমার্থ, সত্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন; যা প্রত্যক্ষত দৃষ্ট নয় এমন বিষয় সেখানে আলোচিত হয়েছে। কবি শব্দের আরেক অর্থ ক্রান্তদর্শী, যাঁরা কিনা অনুভূতির মাধ্যমে অতিরিক্ত কিছু দেখতে পান। হৃদয়ের উপলব্ধি— যুক্তি-তর্ক এই প্রণালীর ব্যতিরেকে— সত্যের সন্ধান দিতে পারে, এই বিশ্বাস প্রাচীনদের মধ্যে ছিল। বেদ এবং উপনিষদের মধ্যে সেই উপলব্ধি ও সত্যের প্রকাশ হয়েছে বলে, আন্তিক দর্শন প্রস্থানগুলি মুখ্যত অথবা গৌণত সেগুলিকে অদ্রান্ত ও প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে। তবে সেগুলির ব্যাখ্যা নিয়ে সম্প্রদায় ও প্রস্থান ভেদে বিপুল মতভেদ রয়েছে।

বেদান্ত দর্শন

বাদরায়ণ একটি গ্রন্থ লেখেন যা ব্রহ্মসূত্র নামে পরিচিত। এটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত হয়। ব্রহ্মসূত্রই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য অবলম্বন। বিভিন্ন বেদান্ত প্রস্থান ব্রহ্মসূত্র নিজ মতানুসারে ব্যাখ্যা করেছেন এবং অপরাপর সম্প্রদায়ের মতকে খণ্ড করেছেন। ব্রহ্মসূত্র-এর চারটি ‘পাদ’ এবং প্রতিটি পাদে চারটি করে অধ্যায় আছে। যোলো অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে। সূত্রাকারের লেখা বলে এর যথার্থ তাৎপর্য নিয়ে সম্প্রদায় ভেদে মতানৈক্য তৈরি করেছে। বিভিন্ন উপনিষদের নানান বাক্যের তাৎপর্য কী তাই ব্রহ্মসূত্র-এর আলোচ্য বিষয়। ব্রহ্মসূত্র-এর যতগুলি ভাষ্য আছে, তারমধ্যে অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যটি সবচেয়ে প্রাচীন। তবে শঙ্করাচার্যের আগেও ব্রহ্মসূত্র-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল, যেগুলিকে তিনি খণ্ডন করেছেন। শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ। সৎ, চিৎ এবং আনন্দ ভিন্ন বস্তু বা গুণ নয়, একই বিষয় বা তত্ত্ব। তাঁর মতে, ব্রহ্ম ও মানুষের আত্মা একই বস্তু। কিন্তু আত্মা এবং ‘আমি’ একই বস্তু নয়। জগতের মূল সত্য আত্মা বা ব্রহ্ম, সেই আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। “যাহা দেখা যায়, যাহা প্রতীত হয় অথচ যাহা পূর্বেও ছিল না এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে

না তাহাকেই বলা যায় মিথ্যা।”^{৪৭} শঙ্করভাষ্য মতে ভ্রম হলো— “যাহা প্রতীত হয় অথচ যাহা সত্যভাবে নাই সেইরূপ জ্ঞানকেই বলা যায় ভ্রম।”^{৪৮} আর যে ভ্রম আমাদের সাংসারিক জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাকে বলে প্রাতিভাসিক জ্ঞান। আর যে জ্ঞান কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান হলেই নিবৃত্ত হয় তাকে বলে ব্যবহারিক জ্ঞান। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান যাকে সত্য বলে মনে হয়, তা ব্যবহারিক সত্য। পারমার্থিক সত্য নয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে কোনো সাংসারিক জ্ঞান থাকবে না। পারমার্থিক সত্য যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার বিষয় নয়, উপনিষদকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। শঙ্করাচার্য যুক্তির দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করেননি, উপনিষদকেই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই মত শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিলেও প্রশ্ন ওঠে যে, জগৎ-সংসারে আমাদের চারদিকে যা প্রতিভাত হচ্ছে তা আসলে কী? শঙ্কর মতে, সমস্তই মায়া— অর্থাৎ মিথ্যা। যা কেবল মাত্র প্রতিভাত হয় কিন্তু তা আগেও ছিল না, এখন নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম এবং ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম প্রায় একই রকমের বিষয়। পার্থক্য একটাই সর্প-ভ্রম ও নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখা অল্পকাল থাকে, সেকারণে তা প্রাতিভাসিক বলে চিহ্নিত। আর জগৎ-ভ্রমকে ব্যবহারিক বলে চিহ্নিত করা হয়। শঙ্কর মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অবিদ্যা অজ্ঞান বা মায়ার দ্বারা ব্রহ্মের সত্যরূপ আবৃত বা ঢাকা থাকে বলে জীবের কাছে পার্থিব বস্তু সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। ‘আমি’ বা জীব বলতে যা বোঝানো হয় তা আসলে মিথ্যা। প্রত্যেক জীবের অন্তরে রয়েছে আত্মা বা ব্রহ্ম। সেই আত্মা বা ব্রহ্মের মূলে যে সত্য আছে তা একটাই বস্তু। অখণ্ড, অদ্বৈত।

রামানুজ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে *বোধায়ন-বৃত্তি* অনুসরণ করে *ব্রহ্মসূত্র* ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যটি *শ্রীভাষ্য* নামে পরিচিত। পঞ্চরাত্র-আগম আড়োয়াড়দের তামিল ভাষায় রচিত নানা ভক্তিমূলক কাব্য ও যামুনাচার্যের *সিদ্ধিভ্রমকে* ভিত্তি করে রামানুজ তাঁর দর্শনকে

গড়ে তোলেন এবং বোধায়ন-বৃত্তি অনুসরণ করে শ্রীভাষ্য রচনা করেন। তাঁর মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। শাক্তর ভাষ্যের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য লক্ষণীয়, রামানুজ মনে করেন ব্রহ্ম নির্গুণ নন, অসংখ্য তাঁর গুণাবলী। এই বস্তু জগৎ ও আমাদের আত্মা উভয়ই ঈশ্বরের অংশ। শরীরের সমস্ত কাজের উপর যেমন জীবের অংশীদারিত্ব আছে তেমনই আমাদের আত্মা ও জগতের সকল ঘটনার উপর ঈশ্বরের প্রভুত্ব রয়েছে। জীব ও জড় জগৎ দুই-ই ঈশ্বরের অংশ। ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ, জ্ঞান, আনন্দ কোনো কিছুই ব্রহ্মের গুণ নয়, শক্তরের এই মতের বিরোধিতা করেন রামানুজ। কিন্তু একটি জায়গায় উভয়েই মিলেছেন, তা হল— ঈশ্বরকে কোনো কিছুর দ্বারাই প্রমাণ করা যায় না। কেবল মাত্র শাস্ত্র বাক্য, অর্থাৎ বেদোক্ত ইত্যাদি বাক্যের মাধ্যমে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয়। বেদোক্ত ক্রিয়া কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধির পর ঈশ্বরের শরণ নিলে ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে ভক্তকে মুক্তি দেন। শক্তর ভাষ্যে ভক্তির স্থান নেই, রামানুজ ভাষ্যে ভক্তি ও কর্ম গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। ভক্তি ও শরণই মুক্তির একমাত্র উপায়। শাক্তর মতে পার্থিব সকল জ্ঞানই আসলে ভ্রম, কিন্তু রামানুজের মতে আমাদের সকল জ্ঞানই সত্য। জগৎ সম্পর্কে রামানুজের অভিমতের সঙ্গে সাংখ্য মতের মিল লক্ষণীয়।

রামানুজ পরবর্তী বৈদান্তিক হলেন মধ্বাচার্য (১১৯৯-১২৭৮)। তিনি দ্বৈতবাদী বেদান্ত দর্শনিক। মধ্বাচার্যের মতে উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র-এর তাৎপর্য হল— ব্রহ্ম জীব থেকে ভিন্ন, প্রত্যেক জীব অপরাপর জীবের থেকে ভিন্ন, জীব ও জগৎ ভিন্ন, জগৎ ও ব্রহ্ম কোনো অভিন্ন বিষয় নয় এবং জগতের সকল বস্তু ভিন্ন। জাগতিক পদার্থগুলি মধ্বাচার্য অনেকটা ন্যায় দার্শনিকদের মতানুসারের বিভাজিত করেছেন। যথা— দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, বিশিষ্ট, অংশী, শক্তি, সাদৃশ্য এবং অভাব। জগৎকে তিনি পরিবর্তনশীল বলে মনে করতেন। জগৎ প্রপঞ্চক বলে তিনি মনে করতেন না। ফলত মধ্বাচার্য ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা শঙ্করাচার্যের

অদ্বৈত মতের বিরোধিতা করে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন যা সংস্কৃত দর্শন সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁদের তিষ্কতা, প্রখর যুক্তি, অসামান্য কাব্যবোধ ও মেধার স্ফূরণ অতি বিরল। মুক্তির পর জীবের জীবন মিলিয়ে গিয়ে ব্রহ্মভাব উদ্ভাসিত হয় একথা মধ্বাচার্য মানতেন না। এছাড়া মুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ভেদ আছে তা তিনি প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জয়তীর্থ এবং ব্যাসতীর্থ। দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মধ্বাচার্য ভক্তিবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছেন, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অদ্বৈতবাদের মধ্যে ভক্তির কোনো স্থান নেই, সেখানে ঈশ্বরও মায়ার সৃষ্টি, একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য। এই অর্থে অদ্বৈত বেদান্ত অনীশ্বরবাদী।

নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য একজন তেলেগু ব্রাহ্মণ ছিলেন, ১২৩৬ খ্রিঃ প্রয়াত হন। নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্র-এর একটি ভাষ্য রচনা করেন, যা বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ নামে পরিচিত। এর উপর শ্রীনিবাস বেদান্ত-কৌস্তভ নামে একটি টীকা রচনা করেন। এর উপর কেশব কাশ্মীরি ভট্ট বেদান্ত-কৌস্তভ-প্রভা নামে টীকা লেখেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অনুগামীরা তাঁর মত সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ ও টীকা রচনা করেন। মাধবমুকুন্দ পরপক্ষ-গিরিবজ্র গ্রন্থে শঙ্করের অভিমত খণ্ডন করা চেষ্টা করেন, এটাই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রধান তর্ক গ্রন্থ। নিম্বার্কের মতে, বেদের কর্মকাণ্ডের নির্দেশ মেনে মানুষ যখন দেখে কর্মের মাধ্যমে স্থায়ী কোনো ফল লাভ করা যায় না, তখন তারা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই সম্প্রদায়ের মতে, ভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ধ্যানের দ্বারাই ব্রহ্ম লাভ সম্ভব। নিম্বার্কের মত ভেদাভেদবাদের অন্তর্গত। ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি কর্তা। তিনি নিজেকে জগত রূপে প্রকাশিত করাচ্ছেন, জগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন আবার অভিন্ন বটে। মাকড়সা যেমন নিজের মধ্যে থেকে উৎপন্ন রস দিয়ে জাল তৈরি করে তার মাঝখানে উদাসীনভাবে বসে থাকে, ব্রহ্মও তেমন জগৎ সৃষ্টি করে উদাসীন কর্তা রূপে বসে থাকে।

পাশ্চাত্য দর্শনের Deism-এর সঙ্গে খানিক মিল লক্ষ করা যেতে পারে, যদিও এই দুই দর্শন প্রস্থানের অমিল অনেক। যেখানে ঈশ্বরকে কল্পনা করা হয়েছে এক উদাসীন সৃষ্টিকর্তা রূপে যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তারপর জগৎ ঈশ্বর সৃষ্টি নিয়মেই চলেছে। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতে একান্ত অদ্বৈতবাদ ও একান্ত দ্বৈতবাদ উভয়ই ভ্রান্ত। তাঁদের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ নন, তিনি সমস্ত কল্যানগুণের আশ্রয়। যদি তিনি জ্ঞান স্বরূপ হন তাহলে অজ্ঞানের আশ্রয় হতে পারেন না। একারণে অজ্ঞানকে জগৎ সৃষ্টির কারণ-রূপে স্বীকার করা সম্ভব নয়, আর জগৎকেও মিথ্যা বলা যায় না। তাঁরা জগৎ ব্রহ্মের বিকাশ বলেই জগতকে সত্য বলে মানেন।

বল্লাভাচার্য (১৪৮১-১৫৩৩) চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মানুষ। তাঁর মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হয়। আরেকদিক থেকে তাঁর মতকে ভেদাভেদবাদও বলা যায়। তাঁর মতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। তিনি সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। তিনি যেমন এক, তেমনি নানা। বল্লাভাচার্য ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে জগৎ মিথ্যা নয়। ব্রহ্ম কর্মফলের বিধাতা, তিনি কৃপা করলেই জাগতিক বন্ধন থেকে জীবের মুক্তি ঘটে। এই কারণে এই সম্প্রদায়ের লেখায় ভক্তিবাদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব মীমাংসা

বেদের উত্তরভাগ অর্থাৎ উপনিষদ বা বেদান্ত সম্বন্ধে যে আলোচনা ব্রহ্মসূত্র-এ পাওয়া যায় তাকে উত্তর মীমাংসা নামেও চিহ্নিত হয়। এর পূর্বভাগ অর্থাৎ যাগযজ্ঞ বিষয়ে যে সমস্ত আলোচনা ও বিচার আছে সেটি পূর্ব-মীমাংসা নামে পরিচিত। সম্ভবত প্রাচীনকাল থেকে ঋষিরা স্তোত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করতেন, সেই উপাসনা, আরাধনার পদ্ধতিই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের আকার নেয়। পূর্ব মীমাংসা দর্শন প্রস্থানের মতে— বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বর বা কোনো ব্যক্তির রচনা নয়। অনাদি অনন্তকাল থেকে তা আছে। বিভিন্ন সময়ে

ঋষিদের মনে বেদের বাণী আবির্ভূত হয়েছে। ফলত বেদে কোনো ভ্রম ও পুনরুক্তি নেই। বেদের প্রধান উদ্দেশ্য কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ণয় করা এবং সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া। সে কারণে বেদবাক্য কাউকে কোনো কাজে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করতে আদেশ দেয়। যা যথাক্রমে বিঠি এবং নিষেধ নামে পরিচিত। বেদের মুখ্য কাজ নির্দেশ দেওয়া, তাহলে এই প্রশ্ন ওঠে এর সঙ্গে দার্শনিকতার সম্পর্ক কী? নির্দেশ দেওয়া হয় ব্যক্তি বিশেষকে সেকারণে জীবতত্ত্ব মীমাংসা দর্শনের বিচার্য বিষয়। মীমাংসকরা জগতকে সত্য বলে স্বীকার করেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁরা মানেন না। জগৎ কখন সৃষ্টি হয়েছিল আর কখন ধ্বংস হবে তা মীমাংসকরা জানেন না, সেকারণে ঈশ্বর বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী নন। তাহলে কী তারা মনে করেন ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস কর্তা? যদিও যাগযজ্ঞ অংশে অনেক দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁরা দেবতার স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বস্তুত, মন্ত্রের মধ্যেই দেবতাদের সত্তা আছে। যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারণই প্রার্থিত ফল দান করে, কোনো দেবতার অনুগ্রহ ব্যক্তি বিশেষের জীবনে সুফল বা কুফল আনতে অক্ষম। কুমারিল মতাবলম্বীরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ছয় প্রকার প্রমাণ বা জ্ঞানোপায়কে স্বীকার করেন। প্রভাকর মতাবলম্বীরা অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেন না। শঙ্করাচার্যের সঙ্গে পূর্বমীমাংসকদের তফাৎ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের লিখছেন—

“কুমারিল ও প্রভাকর উভয়েই আত্মাকে স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া মানেন না এবং সুসুপ্তিতে যে আনন্দের অনুভব হয় এ কথাও মানেন না, তাঁহারা বলেন যে সুসুপ্তিতে আমাদের কোনো জ্ঞান থাকে না। এইখানে শঙ্কর বেদান্তীদের সহিত মীমাংসকদের প্রভেদ। কুমারিল বলেন যে, আত্মা জ্ঞানশক্তিস্বরূপ কিন্তু জ্ঞান হতে হলে মন ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ হওয়া চাই। কিন্তু মোক্ষদশায় এইরূপ সংযোগ থাকে না কাজেই তখন কোনো জ্ঞান হয় না। কাজেই মোক্ষের সময় আত্মার কোনো সুখ ও দুঃখ বোধ থাকে না।”^{৪৯}

ভ্রম ভারতীয় দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। রজ্জুতে সর্প ভ্রম বিষয়ে মীমাংসকরা বলেন দড়ি পূর্বে দেখা সাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং দুইয়ের পার্থক্য যতক্ষণ না বুঝতে পারি ততক্ষণ দড়িকে সাপ বলে মনে করি। এই ভ্রমের নাম অখ্যাতি।^{৫০} অদ্বৈত বেদান্তীদের মতে, দড়িকে যখন আমরা সাপ বলে মনে করি তখন দড়ির উপর একটি অনির্বচনীয় সাপের সৃষ্টি হয়। অদ্বৈত বেদান্তীদের মতে ভ্রমের বিষয়বস্তু অনির্বচনীয়, এবং জগৎ তেমনই একটি সৃষ্টি। অদ্বৈত বেদান্ত মতে ভ্রমকে অনির্বচনীয় খ্যাতি বলে।^{৫১}

সাংখ্য দর্শন

সাংখ্য প্রাচীন দর্শন প্রস্থান, উপনিষদ ও গীতায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনের মৌলিক গ্রন্থ তিনটি^{৫২}; তত্ত্ব-সমাস নামক ২২টি সূত্র, ঈশ্বরকৃষ্ণের ৭০টি কারিকা, আর সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র নামে একটি সূত্র গ্রন্থ। এর মধ্যে সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র রচনাকাল কারুর মতে ৯ম শতাব্দী, কারুর মতে ১৪শ শতাব্দীর। ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর কারিকায় ষষ্টি-তন্ত্র নামে একটি বইয়ের উল্লেখ করেছেন। যেটির সারাংশ তাঁর বইয়ে উল্লেখ করা আছে, কিন্তু ষষ্টি-তন্ত্র আর পাওয়া যায় না। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাও খুব প্রাচীন নয়, পণ্ডিতদের মতে এটি ৪র্থ শতাব্দীর রচনা। কিন্তু প্রাচীনকালে যে এই মত পরিচিত ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যকারিকার টীকা লেখেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালি সন্ন্যাসী বিজ্ঞান-ভিক্ষু সাংখ্যসূত্রের ভাষ্য লেখেন। সাংখ্য সাহিত্যের সম্ভার খুব বিশাল কিছু নয়। সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কপিল। গীতা (১০/২৬) ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-এ (৫/২) তাঁর নাম উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ দর্শনের মতো সাংখ্য দর্শনেও দুঃখ প্রধান স্বীকৃত সত্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

দুঃখ তিন প্রকার- আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আত্মা বা দেহ-সংঘাতকে আশ্রয়

করে যে দুঃখ তা আধ্যাত্মিক, তা দুই প্রকার— শারীরিক ও মানসিক। বন্য জীব ও চোর ডাকাত যে দুঃখ দেয় তা আধিভৌতিক দুঃখ। আর প্রাকৃতিক ভাবে যে দুঃখ মানুষ পায় তা আধিদৈবিক দুঃখ হিসেবে পরিচিত। সাংখ্য দর্শন তিন প্রকার প্রমাণকে স্বীকৃতি দিয়েছে— প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। শব্দ প্রমাণ সম্বন্ধে সাংখ্য দর্শনের মত মীমাংসার বিরোধী, কারণ সাংখ্য মতে শব্দ অনিত্য।^{৫৩} সাংখ্য মতে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় অনুমানের দ্বারা। প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে কেবলমাত্র বাহ্য ও স্থূল বস্তুর জ্ঞান পাওয়াই সম্ভব। শ্রুতিকে প্রমাণ হিসেবে মানলেও, বেদান্ত কিংবা পূর্বমীমাংসার মত প্রতি পদে পদে শ্রুতিকে প্রমাণ হিসেবে সাংখ্য দর্শন উদ্ধৃত করে না। অনুমানই সাংখ্য দর্শনে প্রধান প্রমাণ।

সাংখ্য মতে পুরুষ শুধু ভোক্তা, কর্তা নয়। সে নিষ্ক্রিয় সাক্ষীমাত্র,

“কিন্তু জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্যন্ত জাগতিক ব্যাপার তাহার চিত্তে সুখ-দুঃখ— বেশির ভাগই দুঃখ— উৎপাদন করে। এই ভাবেই তাহার ভোগ হয়। জ্ঞানোদয় হইলে অর্থাৎ কিসে কী হয় জানিলেই তাহার ভোক্তৃত্বও লোপ পায়; তখনই সে মুক্ত হয়।”^{৫৪}

পুরুষ ছাড়া আর যে চব্বিশটি তত্ত্ব আছে তার মধ্যে মূল হলো প্রকৃতি। সাংখ্য মতে,

“ইহাই সমস্ত জগতের উপাদান। ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিনটি গুণের সাম্যাবস্থায়; অর্থাৎ যখন এই তিনটি গুণ সমানভাবে কোনোরূপ বিক্ষোভ সৃষ্টি না করিয়া অবস্থান করে, তখনই উহার নাম হয় প্রকৃতি।”^{৫৫}

প্রকৃতি অচেতন এবং জড়, সাম্যাবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু অবস্থার ফেরে তা সক্রিয় হয়।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উপমার মাধ্যমে এই বিষয়টি বিবৃত করেছেন এই ভাবে—

“প্রকৃতি সক্রিয় হয় পুরুষের সংস্পর্শে; যেন পুরুষকে সে বশ করিতে চায়, এইভাবে। কিন্তু পুরুষ যখন তাহার এই লীলা বা হাবভাব বুঝিয়া ফেলে— অর্থাৎ যখন তাহার তত্ত্ব-জ্ঞান হয়, তখন প্রকৃতি সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া যায় আর সেই পুরুষও মুক্ত হয়। প্রকৃতি যেন লাজুক মেয়ে; লুকাইয়া পুরুষকে অভিভূত করিতে চায়; কিন্তু ধরা পড়িলেই সরিয়া যায়। পুরুষের বন্ধন ও মুক্তির ইহাই ভিতরকার কথা।”^{৫৬}

তবে যেকোনো উপমা একদিকে যেমন জটিল বিষয়কে সহজে বুঝতে সাহায্য করে তেমনই সরলীকরণের সম্ভাবনা তৈরি করে।

ঈশ্বর বিষয়ে সাংখ্য দর্শনের বক্তব্য কী? সাংখ্য দর্শন মুখ্যত নিরীশ্বরবাদী। মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক বলে পরিচিত। তাঁর *সাংখ্য-প্রবচন সূত্র*-এ বলা আছে— “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” (ঈশ্বর অসিদ্ধ)^{৫৭}, “মুক্তবদ্ধয়োৱনয়করাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ” (ঈশ্বর মুক্ত কি বদ্ধ? দুই-ই অসম্ভব। অতএব তাদৃশ ঈশ্বর অসিদ্ধ)^{৫৮}, “প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ” (প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় নিত্যেশ্বর সিদ্ধ নহে)^{৫৯}। সাংখ্য মতে ঈশ্বর নেই, প্রকৃতি ও পুরুষই এই জগৎকে ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট, এই সাংখ্য দর্শনের অভিমত। সাংখ্য দর্শন অনেকগুলি বিষয়কে অস্বীকার ও খারিজ করেছে। বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদ ও ন্যায় দর্শনের ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে খারিজ করেছে। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মতে একমেবদ্বিতীয়ম ব্রহ্মই সৎ এটাও সাংখ্য দর্শন মানেনি। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকৃত হলেই যে বেদ নিত্য তাও সাংখ্য দর্শন মানেনি।

যোগ দর্শন

এই দার্শনিক প্রস্থানের প্রতিষ্ঠাতা পতঞ্জলি (আনুমানিক খ্রি.পূ. ২য় শতক)। সে কারণে যোগ দর্শন ‘পাতঞ্জল দর্শন’ নামেও পরিচিত। পতঞ্জলি নতুন কোনো দর্শন প্রস্থান শুরু করেননি, আগে যা উপদিষ্ট হয়েছে সেইগুলিই সূত্রাকারে পরিবেশন করেছেন। পণ্ডিতেরা প্রশ্ন তুলেছেন যোগ কি দর্শন শাস্ত্র ? উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর *ভারতদর্শনসার*-এ লিখছেন—

“যোগের দার্শনিক মূল্য খুব বেশি নয়। দর্শন হিসাবে ইহা সাংখ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; এই সাংখ্যের তত্ত্বগুলির বিস্তৃত কোনো আলোচনাও যোগ করে নাই। ইহা হইতেই ইহার দার্শনিক প্রতিষ্ঠার পরিমাপ হইয়া যায়। কিন্তু যোগ-দর্শনে চিত্ত-বৃত্তির আলোচনায় যে-সব মনোবিজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, সে-সব বিচারের অযোগ্য নয়।”^{৬০}

এরপরে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন— “কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, হাজার হইলেও ইহা মনোবিজ্ঞান, দর্শন নহে।”^{৬১} কেন উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই সিদ্ধান্ত করছেন তাঁর কারণ শুরুতে উল্লেখ করেছেন। যোগ দর্শন নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করছেন এই ভাবে—

“বেদান্তসূত্রে একাধিক স্থানে এবং নানাভাবে সাংখ্যের মত— বিশেষত তাহার প্রকৃতি-বাদ— খণ্ডনের চেষ্টা হইয়াছে। সাংখ্যের বিরুদ্ধে শেষ কথা বলিয়া বেদান্ত-সূত্রকার বলিতেছেন— ‘এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ’ (২।১।৩); অর্থাৎ যাহা হইল তাহাতে যোগ দর্শনও নিরস্ত হইল, যোগের বিরুদ্ধে পৃথক যুক্তি-প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যোগ ও সাংখ্যের মধ্যে দর্শন হিসাবে পার্থক্য তেমন নাই। জীব ও জগৎ সম্বন্ধে উভয়ের মত এক। পার্থক্য শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধে।”^{৬২}

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন দর্শন ও মনোবিজ্ঞান এক বিষয় নয়। অর্থাৎ দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের চর্চার বিষয় পৃথক। দর্শন ভারতীয় ঐতিহ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা ও মোক্ষশাস্ত্র হিসেবে পরিচিত। মোক্ষ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য দুটি— জগতের নানা তত্ত্ব সম্বন্ধে পরমার্থ সত্য সম্পর্কে জানা এবং কী উপায়ে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে এবং জীবনে সত্য উপলব্ধি করবে, সেই বিষয়ে অবহিত করা। এই বিচারে যোগ দর্শনকে ঠিক দর্শন প্রস্থান হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। পাতঞ্জল-যোগসূত্র-এর প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ বলা হয়েছে— “যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ”^{৬৩}। অর্থাৎ “চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ।”^{৬৪}

শঙ্করাচার্য *সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ* ‘অথঃ সাংখ্যপক্ষ’-এ মহর্ষি কপিলের সাংখ্য দর্শনকে নিরীরাশ্বর সাংখ্য এবং পতঞ্জলি প্রণীত সাংখ্য দর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়েছে। কপিল জ্ঞান মার্গী, জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির পথ দেখেছে। কিন্তু পতঞ্জলি বলেন মুক্তি যোগসাধ্য।^{৬৫} যোগ দর্শনে ঈশ্বরের স্বীকৃতি যুক্তির মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত নয়, বরং প্রসঙ্গত ইঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে। যোগ দর্শনে যখন সমাধির কথা উঠেছে, এর ফল কীভাবে সহজে পাওয়া সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

“ঈশ্বর –প্রণিধানাৎ বা” অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধান হইতেও পারে। প্রণিধান মানে কী। ভক্তি ও উপাসনা ইত্যাদি। ঈশ্বরকে। পুরুষ-বিশেষ, যিনি ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়— যে-সব দ্বারা মানুষের চিত্ত অভিভূত হয়— সে-সব দ্বারা, ‘অপরামৃষ্ট’— অর্থাৎ অনভিভূত এবং অস্পৃষ্ট। তিনি সর্বজ্ঞ, সকলের গুরু এবং ‘প্রণব’ তাঁহারি কথা বলে, ইত্যাদি।”^{৬৬}

যোগ দর্শনে ঈশ্বরের ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা অপেক্ষা ঈশ্বর যোগ দর্শনে একটা বহিরাবরণ মাত্র। যোগসূত্র যে ঈশ্বরের কথা স্বীকার ও উল্লেখ করেছে তার সঙ্গে দার্শনিকতার সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে।

বৈশেষিক দর্শন

উলূকের পুত্র কণাদ বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা বলে প্রসিদ্ধ। সে কারণে এই দর্শন কণাদ বা উলূক্যদর্শন নামেও পরিচিত। প্রাচীন কালে বৈশেষিক দর্শনের উপর দুটি টীকা লেখা হয়েছিল, *রাবণভাষ্য* ও *ভরদ্বাজভাষ্য* নামে। এখন এই গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এছাড়া *ব্যোমবতী*, শ্রীধর লিখিত *ন্যায়কন্দলী*, উদয়ন লিখিত *কিরণাবলী* ও শ্রীবৎসস্বামী লিখিত *লীলাবতী* এগুলিরই টীকা। বৈশেষিক দর্শনের সারমর্ম নিয়ে প্রশস্তপাদ লেখেন *প্রশস্তপাদ-ভাষ্য*। এরই টীকা *ন্যায়কন্দলী*। শঙ্কর মিশ্র পঞ্চদশ শতকে বৈশেষিক সূত্রগুলির একটি টীকা রচনা করেন, যার নাম *উপস্কার*। এই সব গ্রন্থের মধ্যে *ন্যায়কন্দলী* সবচেয়ে বিখ্যাত। বৈশেষিক শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিশেষ বিষয়ক দর্শনশাস্ত্র।^{৬৭} এই দর্শন ছয়টি পদার্থের কথা স্বীকার করেছে, সে কারণে বৈশেষিক দর্শনকার ‘ষট্‌পদার্থবাদী’ নামেও পরিচিত। ষড়্‌ দর্শনের মধ্যে বৈশেষিক দর্শন একটু সহজ ও সূক্ষ্ম বিচার কম বলে অনেকে^{৬৮} একে বালকদের দর্শন বলেও মনে করেন। বৈশেষিক দর্শনে প্রায় সকল বস্তুর বিচার হয়েছে, কিন্তু কোনো বিচারই দীর্ঘ, জটিল পরিপূর্ণ নয় বলে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে অনেকেই একে পূর্ণায়ব দর্শন বলে মনে

করেন না। প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব যা থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত বৈশেষিক দর্শন ক্রমশ ন্যায়ে সঙ্গ মিশে যায়, ধীরে ধীরে পৃথক সত্তা বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে লেখকেরা উভয় দর্শনকে সমানাত্মক বা ‘সমান-তত্ত্ব’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন তর্ক-সংগ্রহ-এ অন্তর্ভুক্ত, ভাষাপরিচ্ছেদ-এ বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চগনন।

স্রষ্টা বা ঈশ্বরের আলোচনা বৈশেষিক দর্শনে নেই। সৃষ্টির কথাও খুব একটা উল্লেখ করা হয়নি। কণাদ লিখিত ৩৭০টি মূল সূত্রের একটিতেও ঈশ্বর শব্দটির উল্লেখ নেই। বৈশেষিক দর্শন ঈশ্বরবাদী হয়ে ওঠে মূলত ব্যাখ্যাকারদের সৌজন্যে। অক্ষয়কুমার দত্ত লিখছেন—

“শঙ্কর মিশ্র বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় সূত্রের অন্তর্গত ‘তৎ’ শব্দের নিম্ন-লিখিতরূপ অর্থ করেন।

...তৎশব্দের অর্থ ঈশ্বর ইহা প্রসিদ্ধই আছে অতএব পূর্বের সূচনা না থাকিলেও, এস্থলে উহা ঈশ্বর-বাচক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।”^{৬৯}

পরে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বলছেন— “টীকাকারেরা যদি নিজে ঐ সূত্রগুলি রচনা করিতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, একবার ভেবে দেখিলেই হয়।”^{৭০} দৃশ্যমান বস্তু জগতের সাধারণ পরিচয় দেওয়াই বৈশেষিকের প্রধান কাজ। ধর্ম ব্যাখ্যা করবো বলে আরম্ভ করেও বৈশেষিক দর্শনকারেরা আধ্যাত্মিকতার আলোচনার মধ্যে আনেননি, বরং পদার্থের ধর্ম বিচারই তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ঠেকেছিল। ঈশ্বর যে আছেন তাও ‘তদ্বচনাৎ আত্মায়স্য প্রমাণ্যং’ এই সূত্রে গোপনভাবে উল্লেখ করেছেন। ‘ঈশ্বর’ শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি, মূলত ব্যাখ্যা ও টীকাকারদের হাত ধরেও ‘তৎ’ শব্দটি ঈশ্বর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ন্যায় দর্শন

ন্যায় দর্শনের সূত্রকার গৌতম(গৌতম) বা অক্ষপাদ। যদিও গৌতম ও অক্ষপাদ অভিন্ন ব্যক্তি কিনা সেই নিয়ে মতভেদ আছে। রামানুজ তাঁর *শ্রীভাষ্য*-এ গৌতম ও অক্ষপাদ আলাদা করে উল্লেখ করেছেন।^{৭১} যদিও শঙ্কর কেবল গৌতম নামটি ব্যবহার করেছেন। ন্যায় দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য যুক্তিতর্কের নিরূপণ। সে কারণে প্রাচীনকাল থেকেই ন্যায় ‘আত্মীক্ষিকী’ নামে পরিচিত। যে দর্শন প্রস্থান ‘অত্মীক্ষা’ বা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ আত্মীক্ষিকীকে সকল শাস্ত্রের প্রদীপ বলে উল্লেখ করা আছে।^{৭২} *ন্যায়সূত্র* সম্ভবত খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে লেখা। চতুর্থ শতকে বাৎসায়ন (ইনি কামসূত্রকার নন, ঐর আসল নাম পক্ষিলস্বামী) লেখেন *ন্যায়ভাষ্য*। এরপর উদ্যোতকর বৌদ্ধদের যুক্তি খণ্ডন করে লেখেন *ন্যায়বার্তিক*। ন্যায় সাহিত্য সুবিশাল। নবম শতাব্দীতে বাচস্পতী মিশ্র *ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্য টীকা* নামে একটি টীকা প্রণয়ন করেন। এছাড়া উদয়নাচার্যের *ন্যায় কুসুমাঞ্জলি*, জয়ন্ত ভট্টের *ন্যায়মঞ্জরী*, কেশব মিশ্রের *তর্ক-ভাষ্য*, গোবর্ধন মিশ্রের *তর্ক-ভাষ্য প্রকাশ* উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ত্রয়োদশ শতকে মিথিলাবাসী গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের *তত্ত্বচিন্তামণি*-র হাত ধরে নব্য-ন্যায়ের সূচনা হয়। বাংলাদেশে নব্য-ন্যায়ের বিচার পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়।

ন্যায়ের মতে পদার্থ ছটি নয়, ষোলটি। এর মধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয় প্রধান। বাকিগুলি হলো— সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল জাতি ও নিগ্রহ স্থান। ন্যায়ের মতে প্রমাণ চারটি— প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এখানেই বৈশেষিক দর্শনের সঙ্গে তার পার্থক্য। ন্যায় সর্বাপেক্ষা আলোচনা করেছে অনুমান নিয়ে। ন্যায়ের মতে অনুমান তিন প্রকার— পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতঃ দৃষ্ট। যদিও বৌদ্ধ মতে প্রমাণ দুই প্রকার— স্বার্থ ও পরার্থ। ন্যায়ের চতুর্থ প্রমাণ ‘শব্দ’। এই সূত্রেই বেদকে ন্যায়

আপ্ত বা শব্দ প্রমাণের শ্রেষ্ঠ হিসেবে উল্লেখ করেছে। শব্দ প্রমাণ দুই প্রকার— দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। ন্যায়ে মোট ৫২৮ মতান্তরে ৫৪৭টি সূত্রের মধ্যে মাত্র তিনটিতে ঈশ্বর প্রসঙ্গ উল্লেখিত। সরাসরি ঈশ্বর নাম ব্যবহার করা হয়েছে একটিতে। ঐ সূত্রটিতে ন্যায় ঈশ্বরকে জগতের কর্তা হিসেবে স্বীকার করেছে। “ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাফল্যদর্শনাৎ।।” (পূর্বপক্ষ) ঈশ্বরই (সর্বকার্যের) কারণ, যেহেতু পুরুষের (জীবের) কর্মের বৈফল্য দেখা যায়।”^{৭৩} বৈশেষিক দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেনি কিন্তু প্রমাণের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতেও চায়নি। ন্যায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে ঈশ্বর আছেন। জগতের একজন কর্তা থাকা যুক্তিযুক্ত, আর সেই উপযুক্ত কর্তাই ঈশ্বর। বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে ন্যায় দর্শন প্রমাণ করতে চেয়েছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, সেই নিয়ে আপত্তি থাকতেই পারে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, নৈয়ায়িকদের তীক্ষ্ণতা, কাব্যবোধ, মেধার অসামান্য স্ফূরণ ভারতীয় দর্শনের অমূল্য সম্পদ।

জৈন দর্শন

জৈন দর্শন ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে নাস্তিক পর্যায়ভুক্ত। জৈন ধর্মে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের কথা উল্লেখ করা আছে। প্রথম তীর্থঙ্করের নাম ঋষভদেব এবং শেষ তীর্থঙ্কর হলেন মহাবীর বা বর্ধমান। মহাবীর (আনু. ৫৯৯-৫২৭ খ্রি. পূ.) ও পার্শ্বনাথ ছাড়া বাকি বাইশজন তীর্থঙ্কর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জৈন ধর্মে নীতির স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। অহিংসাকে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করে জৈন ধর্ম। সংকর্ম ও সংযমের মাধ্যমে চরিত্র গঠন জৈন ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মহাবীরের মৃত্যুর পর ত্যাগের প্রশ্নে জৈন সম্প্রদায় দুটি উপশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একদল সর্বত্যাগী, যারা ‘দ্বিগম্বর’ নামে পরিচিত। অপর দল সাদা বস্ত্র ধারণ করত, যারা ‘শ্বেতাম্বর’ নামে পরিচিত। উভয়ের মধ্যে দার্শনিক পার্থক্য প্রায় নেই, পার্থক্য মূলত ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয়।

জৈন দর্শনের পরিকল্পনায় বিশ্ব নানান দ্রব্যের সমষ্টি। তাদের মতে জগৎ দুভাগে বিভক্ত— জীব ও অজীব। জৈন দর্শনে জীব এবং আত্মা একই। আত্মা আবার চেতন পদার্থ। নিজ কর্মফলে দেহ থেকে দেহান্তরে গমন করে। যখন যে দেহে বাস করে তখন সেই দেহকে নিজের চেতনা দ্বারা ব্যাণ্ড করে। জৈন দর্শনে জ্ঞান লাভের দুটি উপায়— ‘প্রমাণ’ ও ‘নয়’। প্রমাণ দুই প্রকার— প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। এরমধ্যে প্রত্যক্ষকেই জৈন দর্শন মুখ্য হিসেবে স্বীকার করেছে। পরোক্ষ জ্ঞান গৌণ কারণ তা পূর্বলব্ধ জ্ঞানাপেক্ষা অচল। প্রমাণ ব্যতিরেকে আরেকটি জ্ঞান লাভের উপায় ‘নয়’।

“ঈশ্বর সম্বন্ধে জৈনদের স্থিরনিশ্চিত সিদ্ধান্ত— ঈশ্বর নাই। স্যাদ্বাদের সঙ্গে এরূপ একটা নিশ্চিত উক্তি পরম্পরবিরোধী মনে হইবে নিশ্চয়ই। কিন্তু জৈনরা অজ্ঞেয়বাদী নয়।... সোজা সিদ্ধান্ত ঈশ্বর নাই।”^{৭৪}

ঈশ্বর নেই বলতে জৈন দর্শন বুঝিয়েছে; সর্বগ, নিত্য, স্ববশ, বুদ্ধিমান জগতের কর্তা পুরুষ কেউ নেই। সর্বজ্ঞ কেউ নেই একথা জৈন দার্শনিকেরা বলতে চাননি। তীর্থঙ্করেরাই সর্বজ্ঞ, জৈন ধর্মের মানুষ তাঁদেরই ভজনা করে। জৈন দর্শন কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস রাখে।

বৌদ্ধ দর্শন

আনুমানিক খ্রি. পূ. ৫৬০ শতকে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। গৌতমের মনে প্রথম প্রশ্ন ছিল যে দুঃখকে কী উপায়ে নির্মূল করা যায়। দুঃখ এবং দুঃখ নিবারণের আকাঙ্ক্ষাই বৌদ্ধ ধর্মের মুখ্য বিষয়। বুদ্ধ নিজে কোনো গ্রন্থ প্রণয়ন করেননি। এমনকি তাঁর জীবদ্দশায় কোনো উপদেশাবলী সংগৃহীত হওয়ার কথা জানা যায় না। তাঁর মৃত্যু তিন-চার মাস পর মগধরাজ অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেই বুদ্ধদেবের বাণীগুলি সংগ্রহ করার প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ৪র্থ মহাসংগীতির সময় বৌদ্ধরা হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। বুদ্ধদেবের বাণী সমূহকে

একত্রে ত্রিপিটক বলা হয়। এর তিনটি অংশ, অর্থাৎ তিনটি পিটক একত্রে ত্রিপিটক। সেগুলি হলো— *বিনয়পিটক*, *সুত্তপিটক* ও *অভিধম্মপিটক*। তবে ত্রিপিটকগুলি একই সময়ে লিখিত হয়নি। এগুলির মধ্যে বিরোধ ও তর্ক সেই সাক্ষ্য দেয়। বুদ্ধ বচনের যথার্থ অর্থ কী তা নিয়ে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে তীব্র মতভেদ আছে।

সে যাই হোক, বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা ‘চার আর্য সত্য’— দুঃখ, দুঃখ-সমুদয় (দুঃখের কারণ বা হেতু), দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা (দুঃখ নিরোধ বা নিবারণের উপায়)। *মজ্জিম-নিকায়* নিজের প্রচারিত ধর্মকে বুদ্ধদেব ভেলা বা নৌকার (কুল্ল) সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে গল্পটির সারার্থ হলো— ধর্ম আঁকড়ে ধরে বয়ে বেড়ানোর বস্তু নয়। তা এক জীবন থেকে উন্নততর জীবনে উত্তরণের ‘কুল্ল’ (ভেলা/Tool) মাত্র। বলা বাহুল্য, এই উত্তরণ কোনো জাগতিক উত্তরণ নয়, জ্ঞান বা বোধের উত্তরণ। পরিণতির একটি স্তর অবধি ধর্মের প্রয়োজন, তারপর আর দরকার নেই। ধর্ম প্রবক্তাদের কণ্ঠে এমন কথা উচ্চারিত হয়নি, এখানেই বাকি ধর্ম প্রস্থানের সঙ্গে বুদ্ধের তফাৎ। বুদ্ধ অনিত্যবাদী, কিন্তু জন্মান্তর বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃত। কিন্তু বেদের অপৌরুষেয়তা, যজ্ঞ, পশুবলির ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই অর্থে বুদ্ধদেব নাস্তিক এবং বৌদ্ধ দর্শনও নাস্তিক দর্শন প্রস্থান। বুদ্ধদেব দেহ-বিযুক্ত আত্মায় বিশ্বাস করতেন না। আত্মার অবিনশ্বরতার বিরোধিতা করতেন। গৌতম বুদ্ধ কেবলমাত্র অনাত্মবাদের বিরোধী ছিলেন তাই নয়, তাঁর ধর্ম ও দর্শন অনীশ্বরবাদী হিসেবেও পরিচিত ও একাংশের দ্বারা নিন্দিত, ধিকৃত। দীঘ *নিকায়*-এর *পটিক-বগ্গ*-এর *পইক সুত্তে*, কিংবা *সীলক্খন্ধ-বগ্গ*-এর *তেবিজ্জ সুত্তে* ও *কেবট সুত্তে* ঈশ্বরের ‘নশ্বরতা’, ব্রহ্মার বিদ্যমানতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। শেষতক ব্রহ্মা বা ঈশ্বর যে সর্বজ্ঞ নন ব্যঙ্গচ্ছলে জানান দিয়েছেন। বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তি অনিত্যবাদ, ফলত ঈশ্বর-রূপ নিত্য সংজ্ঞাটি কখনই বুদ্ধদেবের কাছে স্বীকৃতি পায়নি।

চার্বাক দর্শন

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-এ উল্লেখিত আছে একদল দার্শনিক ছিলেন যাঁরা পঞ্চভূতকেই পরমতত্ত্ব বলে মনে করতেন। লোকায়াত শব্দটি প্রাচীন, অর্থশাস্ত্র-এ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মেঘাতিথির ভাষ্য-এ এরা তর্কবিদ্যায় পটু ছিলেন বলে উল্লেখিত আছে।^{৭৫} লোকায়াত বা চার্বাক সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত ‘ভূতচৈতন্যবাদ’ নামেও প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে চার্বাক দর্শন আপোষহীন অবিমিশ্র বস্তুবাদী দর্শন। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে ‘বস্তু’ পরিভাষাটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেকারণে ‘বস্তুবৎ’ (অস্তিত্ব আছে) এবং ‘অবস্তুবৎ’ (অস্তিত্ব নেই) দুটি শব্দই ভারতীয় দর্শনে প্রসিদ্ধ। যা অবস্তুবত্ত্ব অথচ শব্দে যার প্রয়োগ আছে তার পারিভাষিক নাম ‘বিকল্প’ বা ‘কল্পনা’। কী আছে এবং কী নেই এই নিয়ে ভারতীয় দর্শনে বিতর্ক আজও চলছে। আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তর ইত্যাদি। চার্বাকদের মতে ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (আলো) ও মরুৎ (বায়ু) এই চারটি প্রধান বস্তু বা বিশ্বজগতের উপাদান। লক্ষণীয়, চার্বাকরা জীবের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য বস্তুগুলিকে বস্তুজগতের উৎস বলে স্বীকার করেছেন। চার্বাকদের ধারণা একান্তভাবে মানবকেন্দ্রিক এবং ইহবাদী। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চার্বাকমত নিয়ে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন—

১. চার্বাক দর্শন কেবল বেদকে প্রমাণ হিসেবে মানে না তাই নয়, এই দর্শন যে কোনো ধর্মমতেরই বিরোধী দর্শন। এঁরা ঈশ্বর, অবিদ্যার আত্মা এবং জন্মান্তরবাদের বিরোধী।
২. জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে চার্বাকদের চার্বাক-বিরোধীরা প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রত্যক্ষ ছাড়া এই দর্শন অন্যকিছুই স্বীকার করে না। কিন্তু অনুমানকেও চার্বাকরা প্রমাণ রূপে মানতেন, যদি সেই অনুমানের ভিত্তি হয় প্রত্যক্ষ (প্রত্যক্ষপূর্বক)। আগুবােক্যে কিংবা আগুবােক্যের দোহাই দিয়ে দিয়ে যে অপ্রত্যক্ষকে হাজির করা হয় সেটিকে প্রমাণ হিসেবে

স্বীকার করতে গররাজি ছিলেন। পুরন্দর নামে এক চার্বাক দার্শনিক সে কথা উল্লেখ করেছেন, *সর্বমতসংগ্রহ*তে সে বিষয়টি উল্লেখ করা আছে। এমনকি নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট পরোক্ষের একথা মেনে নিয়েছেন।

৩. নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে চার্বাকদর্শনকে ইহসুখবাদী বলে নিন্দা করা হয়েছে। জৈন্য রচনায়, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যেও যার নিদর্শন মেলে।

এই তিনটির মধ্যে প্রথমটি সত্য এবং বাকি দুটিকে উপেক্ষা করাই উচিত বলে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন।^{৭৬}

চার্বাকদর্শন যে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছে তাদেরকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজানো যাক^{৭৭}। ১. ভূতচৈতন্যবাদ— মাটি, জল, আগুন এবং বায়ু এই চারটি উপাদানই একমাত্র বাস্তব। সমস্ত জড় ও জীব এগুলিরই এক বা একাধিক উপাদানের সমষ্টি। এই চারটি উপাদানের বিশেষ ক্রিয়া বা সমাবেশই চৈতন্য সৃষ্টির কারণ। দেহ ছাড়া চৈতন্যের ভিত্তি নেই। ২. স্বভাববাদ— ঈশ্বর, নিয়তি, কাল ইত্যাদির বদলে বস্তুর নিজের স্বভাবকেই জগতের বৈচিত্র্যের কারণ বলে ধরা হতো।

৩. প্রত্যক্ষ-প্রধান্যবাদ— চার্বাকরা প্রত্যক্ষকে প্রধানতম প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছেন। সে কারণে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, জন্মান্তর, পরম পুরুষের ধারণাকে খারিজ করেছে, যেহেতু এগুলি ইন্দ্রিয় মাধ্যমে গোচর নয়। তবে অনুমান বা আপ্তবাক্য যদি প্রত্যক্ষনির্ভর হয়, তাতে তাঁরা আপত্তি করেননি। চার্বাকরা দুই ধরনের অনুমানের কথা বলেছেন— লোকপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষনির্ভর আর তন্ত্র(প্র)সিদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্র নির্ভর। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এটিই তাঁদের প্রধান অবদান।^{৭৮}

৪. পুনর্জন্ম ও পরলোক-বিলোপবাদ— দেহ ব্যতিরেকে ক্ষনিক বা অমর আত্মার ধারণা চার্বাক দর্শনে অস্বীকৃত। ফলত জন্মান্তর, কর্মফল, স্বর্গ-নরক, অদৃষ্ট ইত্যাদি ধারণাও সেই সূত্রে বাতিল হয়ে যায়।

৫. বেদপ্রামাণ্য-নিষেধবাদ— কয়েকটি আস্তিক দর্শন প্রস্থান (সাংখ্য, মীমাংসা, *ন্যায়সূত্র*) ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ঈশ্বর মানে না। কিন্তু সাংখ্য ও মীমাংসা আস্তিক কারণ এই দর্শন প্রস্থানগুলি বেদকে অশ্রুত বলে স্বীকার করে। বৌদ্ধ, জৈন দর্শনের মতো চার্বাকরাও বেদকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করে না।

ভারতীয় দর্শন এবং সেই সূত্রে আস্তিক-নাস্তিক প্রসঙ্গে আলোচনার ইতি এখানেই। বাঙালির দর্শনচর্চা নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করবো।

১.২ উনিশ শতক: ঈশ্বর চিন্তা, যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতা

উনিশ শতকে চার্বাকচর্চা

ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনোত্তর কালে বাংলায় চার্বাকচর্চার জন্যে যদি কাউকে সমালোচিত^{১৯} হতে হয়, প্রথম যে নামটি আসবে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। তাঁর সম্পাদিত *সর্বদর্শনসংগ্রহ* দুইভাগে প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ ও ১৮৫৮ সালে। চার্বাক/লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে জানার জন্য সায়ণ-মাধবের *সর্বদর্শনসংগ্রহ* পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যার প্রথম অধ্যায়েই চার্বাক দর্শনের সার কথা সংকলিত হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে এই বইটি প্রকাশের আগে চার্বাক বিষয়ে পণ্ডিতদের সম্মেল ছিল হেনরি টমাস কোলব্রকের কিছু মন্তব্য, যার অবলম্বন *সাংখ্যসূত্র* ও *বেদান্তসূত্র*-এর কয়েকটি ভাষ্য।

বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় *সর্বদর্শনসংগ্রহ* প্রকাশের পর বাংলায় চার্বাক/লোকায়তচর্চা নতুন গতি পায়। যার কৃতিত্ব কিংবা দোষ পরোক্ষভাবে বিদ্যাসাগরে উপর বর্তায়^{৮০}। মোট পাঁচটি পুঁথি দেখে সংস্কৃত কলেজের দুই অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চনন ও তারানাথ তর্কবাচস্পতির সাহায্যে *সর্বদর্শনসংগ্রহ* সম্পাদনা করলেন বিদ্যাসাগর। কেবলমাত্র সংস্কৃত বইটি সম্পাদনা করেই চুপ থাকলেন না তিনি। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চনন সেই বইটি বাংলায় তর্জমাও করলেন। জয়নারায়ণ বিজ্ঞাপনে লিখলেন—

“বিশ্ববিখ্যাত, অসামান্য ধীসম্পন্ন, বিবিধ বিদ্যাসমুদ্র শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যৎকালে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন তৎকালে তিনি আমাকে ঐ পঞ্চদশ দর্শন ও শাক্ত দর্শনের স্থূলমর্ম্ম সকল বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত করিয়া প্রচারিত করিতে কহেন।”^{৮১}

জয়নারায়ণের তর্জমার পড়ে মুগ্ধ হন প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর সম্পাদনা ও জয়নারায়ণের তর্জমা বাংলা চার্বাকচর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে।

সত্যব্রত সামশ্রমীর *সর্বদর্শনসংগ্রহ*-র চার্বাক অধ্যায়টি অনুবাদ করেন। মহেশচন্দ্র পাল পুরো বইটি বাংলা তর্জমা করে প্রকাশ করেন ১৮৯৩ সালে, প্রকাশক ছিলেন নিরপেক্ষ ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা। চার্বাক সম্বন্ধে এঁদের অবস্থান স্পষ্ট হয় তর্জমার শেষে একটি পাদটীকা থেকে— “এই সকল দর্শনশাস্ত্র জনসমাজে অপ্রকাশিত থাকাই কর্তব্য।”^{৮২} বাংলা ভাষায় চার্বাক নিয়ে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ঐ প্রবন্ধটি *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২৮১-র শ্রাবণ সংখ্যায়। পরে তাঁর *নানা প্রবন্ধ* (১৮৮৫) বইতে সংকলিত হয়। এই লেখাটির প্রশংসা করেছিলেন বৌদ্ধশাস্ত্র বিশারদ বেণীমাধব বড়ুয়া। বঙ্কিমচন্দ্র চার্বাক নিয়ে আলাদা করে না লিখলেও, *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় সাংখ্য ও অন্যান্য দর্শন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে চার্বাক দর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। বিশ শতকে, ১৯০৯ সালে পণ্ডিত বিধুশেখর

ভট্টাচার্য শাস্ত্রী নবপর্যায় *বঙ্গদর্শন*-এ ‘ভারতের নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত’ শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। ঐ ধারাবাহিক লেখাটির ষষ্ঠ অধ্যায়ে চার্বাক নিয়ে আলোচনা করেন। বছর দুয়েক পর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত *বঙ্গদর্শন*-এ ‘চার্বাক বা লোকাইত দর্শন’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বিশ শতকে চার্বাক দর্শন নিয়ে বিস্তারিত কাজ করেছেন দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (১৮৬৪-১৯৬১)। তাঁর চার্বাকচর্চা নিছক জ্ঞানচর্চার মধ্যে আটকে ছিল না, লোকাইত মতকে সমর্থন করেছিলেন। এর পরে চার্বাক/লোকাইত দর্শন চর্চার গুরুত্বপূর্ণ মানুষ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৯৩)।

ডিরোজিওর যুক্তিবাদ

ডিরোজিও-র কালে বাংলায় নব্যন্যায়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। নব্যন্যায়ের যুক্তি বাস্তবের কষ্টি পাথরে পরীক্ষিত করার দরকার নেই, তা যেন আপনাতে আপনি পূর্ণ গোছে। ডিরোজিও-র যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নব্যন্যায়ের বিপরীত। সংস্কৃত কলেজের সিলেবাস থেকে নব্যন্যায়ের প্রভাব কমাতে বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ভিন্ন বিষয় হলেও একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, বিদ্যাসাগরের অনেকানেক কীর্তির মতো এই সিলেবাস বদল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি।^{৮০} ডিরোজিও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিরোধী মানবতাবাদী মানুষ। এর পেছনে তাঁর শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ডের প্রভাব অনস্বীকার্য। ইউরোপের দুই বিখ্যাত এম্পিরিসিস্ট দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪) ও ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) ডিরোজিওকে খুব প্রভাবিত করেন। লকের কাণ্ডজ্ঞান ও হিউমের সংশয়বাদী যুক্তিবাদের শিক্ষা ডিরোজিও তাঁর ছাত্র তথা শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন সে কথা অস্বীকার করা যায় না। যাবতীয় আগুবাণ্ডা এবং অপরীক্ষিত সত্যের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। কান্টের (১৭২৪-১৮০৪) ‘বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা’র সমালোচনা করে ডিরোজিও ‘Objection to the Philosophy of

Immanuel Kant' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন হিন্দু কলেজের পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধটির হৃদিস মেলে না, পাওয়া গেলে ডিরোজিও-র দার্শনিক অবস্থানকে ব্যাখ্যা করতে সুবিধে হতো। যতটুকু জানা যায় তা হলো, বেকনীয় [ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) দর্শন] এম্পিরিসিজম ও হিউমের সংশয়বাদী দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি কান্টের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। কান্ট যে দার্শনিক কাঠামো গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন তার পেছনে বিজ্ঞানের সাফল্যকে বিবেকের আলোর সঙ্গে মিলিয়ে একটা অভিন্ন দার্শনিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা। সেই তাত্ত্বিক কাঠামোটি নির্মাণ করতে গিয়ে কান্ট 'পূর্বত সিদ্ধ' (a priori) অর্থাৎ অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ, সংশয়াতীত 'সত্য' নামক একটি ধারণার জন্ম দিলেন^{৮৪}। কিন্তু এই ধারণার জন্ম দিতে গিয়ে কান্ট বেকনের অভিজ্ঞতাবাদ এবং হিউমের 'ইন্ডাকটিভ স্কেপটিসিজম' থেকে সরে এলেন। নিজে বেকন ও হিউমের দ্বারা প্রভাবিত বলেই হয়তো ডিরোজিও কান্টের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন।^{৮৫}

ডিরোজিও আগুবায়ে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। তিনি ছাত্রদের মধ্যে সংশয়কে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সংশয়হীনভাবে ভক্তি ও বিশ্বাসই যখন ঈশ্বরকে মানার মুখ্য ভিত্তি সেখানে ডিরোজিও রোপন করতে চেয়েছিলেন সংশয়ের বীজকে। এই সংশয়বাদ নির্দিধায় ঈশ্বরকে না মানার কথা বলে, যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নিরীশ্বরবাদেরই নামান্তর। তাঁর মূল ভাবনার মধ্যে তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়। প্রথমত, তিনি বেকনের ইন্ড্রিয়ালক অভিজ্ঞতা এবং আরোহী যুক্তিবাদের ধারাকে স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়ত, লকের কাণ্ডজ্ঞান নির্ভর দর্শন যা নিয়ম নির্ভর বা পরিচালিত বিশ্বের ধারণা দেয়, তা তাঁকে প্রভাবিত করে। তৃতীয়ত, হিউমের চিন্তা সূত্র ধরে তিনি মনে করতেন অভিজ্ঞতা নির্ভর জ্ঞানও সবক্ষেত্রে সুনিশ্চিত নয়। সেই জ্ঞান অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে ক্রমাগত সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। আগুবায়ে ও ঈশ্বর বিশ্বাস

সংশয় কিংবা অসম্পূর্ণতা বদলে সর্বদা অভ্রান্ততার দাবি করে। হিউমের প্রভাবের কারণেই তিনি আগুবাণ্য ও ঈশ্বর বিষয়ে অবিশ্বাসী, খানিক নিরীশ্বরবাদীও বটে। ডিরোজিও-র যুক্তিবাদ এই তিনটি ধারার সমন্বয়ে ঘটেছে বলে অনুমান করা যায়।^{৮৬}

অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিসংবাদ

১৮৩৯ সালের ৬ অক্টোবর তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথমে এই সভার নাম ছিল তত্ত্বরঞ্জিনী সভা, পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে নাম বদল করা হয়। দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এই সভা কেবলমাত্র ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ করবে। কেবলমাত্র ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও বেদান্ত আলোচনা করলে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মতো বেদ বা অন্যান্য শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় অবিশ্বাসী মানুষদের স্থান হত না। বেদান্ত ও তত্ত্ববিষয়ে আলোচনা তত্ত্ববোধিনী সভার বিশেষত্ব হলেও সংকীর্ণ ধর্মচর্চায় তা আবদ্ধ ছিল না। ফলে তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্যে দুটি বিপরীত চিন্তাধারার/দর্শন-প্রস্থানের সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়। একদিকে ছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানপন্থী বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তের মতো অন্যদিকে বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ বিরোধী ভাবনাচিন্তা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কী ছাপা হবে তার জন্য একটা কমিটিও তৈরি হয়। যার সদস্য ছিলেন –বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৮৪৩ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে দুই ভিন্ন ভাবধারার মতবিরোধ/মতভেদ উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালির দর্শনচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কেবলমাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেই নয়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অক্ষয় দত্তের মতান্তর হয়। এর সাক্ষ্য আমরা পেয়ে যাব দেবেন্দ্রনাথকে লেখা অক্ষয় দত্তের চিঠিতে।

ইংরেজি ১৮৫৪/৫৫ খ্রিস্টাব্দে (১৭৭৬/৭৭ শকে) সিভেস্টিপল নগরের নিকট ভয়ানক যুদ্ধ হয়। তৎকালে ইংরেজদের জয়-কামনার জন্য ইংলন্ডের অনেক গির্জাতে প্রার্থনা হয়। ওই উপলক্ষে ভারতবর্ষের গির্জা সকলেও তদনুরূপ প্রার্থনা করিবার আদেশ আইসে। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একটি অধিবেশনে হিন্দু পেট্রিয়ট-সম্পাদক বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওই সমাজে অনুরূপ প্রার্থনা করিবার একটি প্রস্তাব করেন। কিন্তু আপনি ওই প্রস্তাব প্রতিবাদ করাতে তাহা রহিত হইয়া যায়।^{৮৭}

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গেও অক্ষয়কুমার দত্তের মতবিরোধের কিছু সাক্ষ্য হাজির করেছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজে এক বক্তৃতায় অক্ষয় দত্ত বলছেন—

ভাস্কর ও আর্কিভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র; গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোন্ট যে-কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। মূল প্রবন্ধে লাপ্লাস ও কঁতের নাম ছিল। এই দুইটি নাম নাস্তিকের নাম বলিয়া পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার সময় ব্রাহ্মসমাজের কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা উঠাইয়া দেন। তাহাতে অক্ষয় বাবুর বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমূলক ডীজম্ করিবার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন।^{৮৮}

রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তদের মতান্তর হয়। সে কারণে মেদিনীপুরে রাজনারায়ণের দেওয়া ভাষণ পত্রিকায় প্রকাশ করেননি সম্পাদক এই প্রসঙ্গে বিরক্ত দেবেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন—

“এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগের এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।”^{৮৯}

অজিতকুমার চক্রবর্তী বলছেন যে, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত আধ্যাত্মিকতার থেকে নৈতিকতাকে বড়ো বলে মনে করতেন। সে জন্যে দেবেন ঠাকুর আক্ষেপ করে বলেছেন যে, আমি খুঁজছি ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী আর তিনি (অক্ষয়কুমার দত্ত) বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে ব্যস্ত। আকাশ-পাতাল প্রভেদ উভয়ের মধ্যে। এমন কী অক্ষয়কুমার দত্ত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও আবশ্যক বলে মনে করতেন না।^{৯০} মহেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা থেকে জানা যায় যে, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আসেন অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার জন্য। এই কথা জানার পর তিনি নিজেই ছাত্রদের কাছে চলে যান ব্রজনাথবাবুকে সঙ্গে নিয়ে। সেখানে ছাত্ররা তাঁর কাছে জানতে চায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার প্রয়োজনীয়তা কী? তিনি বলেন প্রার্থনা করার আবশ্যিকতা/স্বার্থকতা আদৌ নেই। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর বিখ্যাত সমীকরণটি উল্লেখ করেন। মহেন্দ্রনাথ রায় লিখছেন—

“কৃষিজীবী লোক পরিশ্রম করিয়া শস্য লাভ করে; কিন্তু জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনার দ্বারা কোন কৃষাণের কস্মিন্ কালেও শস্য-লাভ হয় নাই।” ইহাতে কেহ কেহ কহিলেন, “ভাল কৃষক পরিশ্রম ও প্রার্থনা উভয়ই করুক না কেন?” তৎপরে ইনি বলিলেন, “বল দেখি, কৃষক যদি প্রার্থনা না করিয়া যথানিয়মে কৃষি-কার্যে নিরত থাকে, তবে তাহার কি ফল-লাভ হইবে?” তাঁহারা উত্তর দিলেন, “কেন শস্যরাশি।” তদনন্তর দত্তজ মহাশয় পুনরায় কহিলেন, “যদি তাহারা প্রার্থনাও করে, কৃষি-কার্যে করে, তাহা হইলে কি ফল-লাভ হয়?” তাঁহারা এই প্রকার জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, “তাহাতেও শস্যরাশি।” তখন ইনি বলিলেন, “যাহা তোমরা বলিলে, বীজগণিতের সমীকরণ-প্রণালীতে তাহা স্থাপন করিয়া বল দেখি, প্রার্থনার শক্তি কত?”

পরিশ্রম=শস্য

পরিশ্রম ও প্রার্থনা= শস্য

অতএব প্রার্থনার শক্তি কত?

এই প্রশ্নের পর সকলেই ক্রিয়াক্ষণ নিস্তব্ধ ও নীরব রহিলেন। পরে অপেক্ষাকৃত কোন বয়োজ্যেষ্ঠ যুবক বলিয়া উঠিলেন, “প্রার্থনার মূল্য শূন্য, অর্থাৎ কিছুই নহে।”^{১১}

এই সমীকরণ/সূত্র ছাত্রমহলে তোলপাড় ফেলে দেয়। তাদের মুখেমুখে এই কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষিত মহলে আলোড়ন তৈরি হয়। অনেকেই অসন্তুষ্ট হন। রাজনারায়ণ বসু প্রতিবাদ করে লেখাও লেখেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বলছেন—

“অনেকে এইরূপ স্থির করিলেন যে...পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার কোন প্রয়োজন বোধ হয় না—

তিনি প্রার্থনা করিবার পূর্বাবধি তাবৎ বস্তু আমারদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেছেন...অকাম হইয়া

সত্য ও তপস্যার দ্বারা এবং তাঁহাতে মনের অভিনিবেশ দ্বারা যে উপাসনা সেই তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনা।”^{১২}

ভিন্ন ধর্মের আক্রমণে নিজ ধর্মকে রক্ষা করার ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। খ্রিস্টান মিশনারিদের আক্রমণের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব দেবেন্দ্রনাথ একপ্রকার নিজ কাঁধে তুলে নেন। অক্ষয় কুমার দত্তও সে কাজে অংশ নিয়েছিলেন। লক্ষ করলে দু’জনের পার্থক্য চোখে পড়বে। বস্তুত দু’টো দার্শনিক অবস্থানের পার্থক্য। অক্ষয়কুমারের অবস্থান সেকুলার মানবতাবাদীর অবস্থান, সেখানে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্বাদেশিকতা, স্বাতন্ত্র, দেশজ ঐতিহ্যকে রক্ষা করার প্রবণতা। অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলার প্রথম যুগের ধর্ম সম্পর্কহীন ব্যক্তি। সম্ভবত প্রথম ধর্ম সম্পর্কহীন মানুষ। বিপরীতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যাপ্ত প্রাচীন হিন্দু ধর্মের মহত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে, বেদান্তের অভ্রান্ততাকে এবং ব্রাহ্ম ধর্মের(এক অর্থে হিন্দু সংস্কৃতির) শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে। অক্ষয় দত্ত আক্রমণ করছেন পাদ্রীদের সাম্প্রদায়িকতা ও ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি আনুগত্যকে। এই সমালোচনা কালে তিনি কখনই বলে উঠতে পারেনি বেদান্ত দর্শন অভ্রান্ত এবং প্রশ্নাতীত। অক্ষয়কুমার কেবল যে পাদ্রীদের সমালোচনাই করতেন তাই নয়, দেবেন্দ্রনাথের অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলতেন, একপ্রকার খারিজ করারও চেষ্টা করতেন। পরে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ তর্কের পর বেদান্তদর্শনের

অভ্রান্ততা সম্পর্কে মত বদল করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* এ বলেছেন—

“রাজনারায়ণবাবু যখন বেদে অভ্রান্তবাদ রক্ষা কপা কঠিন বলিয়া অনুভব করিলেন, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন। তাহার ফলস্বরূপ বেদের অভ্রান্ততাবাদ ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত মত হইতে পরিত্যক্ত হইল; এবং মানবের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি আত্মপ্রত্যয়ের উপরে নিহিত হইল।”^{৯৩}

শিবনাথ শাস্ত্রীর বয়ানে এই কথাই উঠে আসে যে, অক্ষয় দত্তের প্রভাবেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধারণা বদল করেন। এর বিপরীত সাক্ষ্য যে পাওয়া যায় না তা নয়। রাজনারায়ণ বসু *আত্মচরিত* এ লিখেছেন—

“ইংরাজি ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কি না, ইহা সর্বদা আমাদের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বরপ্রত্যাদেশে বিশ্বাস করতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করতাম।”^{৯৪}

এই সমস্ত কথা রাজনারায়ণ তাঁর *Defence of Brahmonism and the Brahmo Samaj* পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন, তিনি একথাও লিখেছেন দেবেন্দ্রনাথের প্রথম সময় থেকে ব্রাহ্মরা বেদকে ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলে মনে করতেন না। দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগেই চারজন যুবককে কাশীতে পাঠানো হয় বেদ বিষয়ে লেখাপড়ার জন্য। পরে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিতর্ক হয়েছে বেদ বিষয়ে। রাজনারায়ণ বসু লিখছেন—

“দেবেন্দ্র বাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি অথচ সংস্কারক; অক্ষয় বাবু যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর। দুই জনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে বেদকে আর ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা কর্তব্য নহে, যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের দুই নায়কের মধ্যে তর্ক বিতর্ক দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হয় তাহার গৌরব কেবল একজনকে দেওয়া কর্তব্য নহে কিন্তু আমি দেখিতেছি অক্ষয় বাবুর বন্ধুরা ইহার গৌরব কেবল তাঁহাকেই চিরকাল দিয়া আসিতেছেন।”^{৯৫}

অজিতকুমার চক্রবর্তী ও দেবেন্দ্র-জীবনীতে প্রায় এই কথাই বলার চেষ্টা করছেন। ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করতে চাইছেন, বেদের অশ্রান্ততা বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের মনে সংশয় আগে থেকেই ছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত কেবল মাত্র সেই সংশয়কে আকার দিয়েছেন। কে আগে বলেছেন বা কে বিষয়টি প্রমাণ করেন কিংবা কার কীর্তি প্রচার করা হচ্ছে আর কার কীর্তি চেপে যাওয়া হচ্ছে এসবের থেকে আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কে কীভাবে দেখছেন এবং কীভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন? শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন দেবেন্দ্রনাথ ধর্মপ্রাণ, ভক্ত অথচ সংস্কার সাধনে উৎসাহী, অক্ষয়কুমার দত্ত যুক্তিবাদী সংস্কারক। দেবেন্দ্রনাথের কথার সূত্রধরেই বলা যায়— তিনি ঈশ্বর ও ধর্ম বিষয়ে আগ্রহী, ধর্মকে সমন্বয়যোগী করতে চান, সংস্কার করতে চান পুরনো রীতি-নীতির। অক্ষয়কুমার দত্ত বিশ্বজগৎ নিয়ে আগ্রহী, তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেমন তা নিয়ে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপিয়ে চলেন। তিনি সমাজের সংস্কার চান তবে যুক্তির পথ বেয়ে। একজন ধার্মিক, অপরজন সেকুলার/ধর্ম সম্পর্কহীন। বস্তুত দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয় দত্ত তর্কে/বিবাদে কেউ জেতেননি। এই ধরনের তর্ক জয়-পরাজয় ব্যক্তিভেদে/ধারণাভেদে বদলেও যেতে পারে। তর্ক নতুন যে রাস্তা খুলে দেয়, তা কারুর একার তৈরি পথ নয়, শেষ পর্যন্ত উভয়ের-ই। প্রশ্ন হল— এই দুই তর্কিক তর্কের মধ্য দিয়ে কোথায় পৌঁছতে চান? অক্ষয়কুমার দত্ত (বিদ্যাসাগরের ভূমিকাকে এক্ষেত্রে স্বীকার করতে হবে) নতুন ভাবে দেখতে চেয়েছেন, ধর্মকে আঁকড়ে না থেকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বুঝতে চেয়েছেন পৃথিবীকে, মানবিক সমস্যাকেও বুঝতে চেয়েছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত জ্ঞানচর্চার জগতে, পাঠক্রমে, জীবনচর্যায় চারিয়ে দিয়েছেন মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রত্যয় সংশয়। বিপরীতে দেবেন ঠাকুর স্থিত থাকতে চেয়েছেন বিশ্বাসে, সংশয় নৈব নৈব চ। ফলে উভয়ে মতান্তর-মনান্তর স্বাভাবিক যা কার্যত, ধর্মবোধ ও বিজ্ঞানচেতনার দ্বন্দ্ব।

১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ এই বারো বছর অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বাঙালির যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কাল। আশীষ লাহিড়ী মন্তব্য করছেন— তিনটি কারণে তাঁর কীর্তি স্মরণীয়— এক, তিনি শিক্ষিত বাঙালির চিন্তাভাবনায় আরোহবাদী যুক্তিশীলতার বাতাবরণ তৈরি করেন। দুই, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত প্রচুর লেখা লেখেন(পাঠ্যবই সমেত) এবং ওই ধরনের লেখার উপযোগী গদ্য-কাঠামো রচনা করে নেন। তিন, স্পষ্ট ভাষায় বেদের অভ্রান্ততাকে প্রশ্ন করেন। খুচরো খুচরো করে এ ধরনের কথা আর কেউ কেউ হয়তো বলেছিলেন। কিন্তু একটা সুসংহত, কেন্দ্রীয় দার্শনিক তত্ত্ব কাঠামোয়, চিন্তাধারার একটা ‘সিস্টেম’ হিসেবে একটা একটা আধুনিক বিজ্ঞানদর্শনকে প্রক্ষেপ করার ব্যাপারে অক্ষয়কুমার পথপ্রদর্শক।^{৯৬} অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তার জগতে স্পিনোজা এবং ফ্রান্সিস বেকনের প্রভাব আছে। ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির, বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম হোতা বেকন, ফলে তাঁর প্রভাব অক্ষয় দত্ত-র চিন্তার জগতকে পৃথিবী সংলগ্ন করবে বলা বাহুল্য। স্পিনোজার মতামতটি অনেকটা এই রকমের— ঈশ্বর প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মগুলির অধীন। ফলে ঈশ্বরের পাঠ তখনই সম্পূর্ণ হবে যদি বিশ্ব প্রকৃতিকে যথার্থভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা যায়। অন্যদিকে দেবেদ্রনাথ ঠাকুর (ভারতীয় বেদান্ত দর্শন) ব্রহ্মাণ্ডের অবাস্তবতার পেছনেই ব্যয় করেছেন অধিকাংশ সময়। কীভাবে মানব জন্ম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তার চিন্তা। এঁদের মিলন কার্যত অসম্ভব। যদিও রামমোহন বেদান্ত ও বেকনের চর্চা একই সঙ্গে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খেয়াল রাখার বিষয়, একটি দর্শন বলছে-- ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যা জানি তা মিথ্যা/ভ্রম, আর বিপরীতে বেকনের দর্শন দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার পরীক্ষিত সত্যতার উপর। এইখানেই বেকনীয় দার্শনিক পদ্ধতিটি (আরোহবাদ/ইন্ডাক্টিভিজম ও অভিজ্ঞতাবাদ) হয়ে উঠল আয়ুধ। বেকনের আরেকটি ভাবনা

অক্ষয় দত্তকে প্রভাবিত করেছিল, তা হল—বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের উন্নতি। অনেক পরে অক্ষকুমার দত্ত বেকন সম্পর্কে মন্তব্য করছেন *ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়* বইতে—

“যদি তত্ত্বানুসন্ধানের প্রকৃত পথাবলম্বন পূর্বক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-মার্গে বিচরণ করিতে পারিতেন, তবে বহুকাল পূর্বে ভারত ভূমিও ইয়ুরোপ-ভূমির ন্যায় এ অংশে ভূ-স্বর্গ-পদে অধিক্রুত হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। ...তাহাদের একটি পথ-প্রদর্শকের অভাব ছিল। একটি বেকন্— একটি বেকন্— একটি বেকন্— তাহাদের আবশ্যক হইয়াছিল। একটি তাদৃশ গুরুর আশ্রয়- বিরহে, তাহারা মেঘাচ্ছন্ন ও তিমিরাবৃত নিশীথ সময়ে দুর্গম বনস্থলে পথ-ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় চিরজীবন পরিভ্রমণ করিয়াছেন।”^{৯৭}

অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তাধারার বিকাশে বেশ কয়েকটি স্তর দেখতে পাওয়া যায়। কার্যত এই স্তরগুলিই বাংলার যুক্তি, সংশয় ও ঈশ্বর চিন্তার দলিল। প্রতিটি স্তরেই অক্ষয় দত্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কের মধ্য দিয়ে বাঙালির দর্শনচর্চার একটি দিক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে গেছেন। ডেইস্ট ভাবনা থেকে সরে এসে প্রায় নাস্তিকের অবস্থান গ্রহণ করেছেন, প্রভাবিত করেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামকমল ভট্টাচার্যদের। প্রস্তুত করেছেন যুক্তিবাদী গদ্য ঘরানার।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়

অক্ষয়কুমার দত্তের সারা জীবনের সাধনার ফসল *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (১৮৭০ ও ১৮৮৩)। বইটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বইটির তথ্যভিত্তিক লেখার অনেকাংশ *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়, কিন্তু বেশির ভাগ অংশ এবং ‘উপক্রমনিকা’ অংশটি উত্তর-তত্ত্ববোধিনী পর্বে লেখা। ফলত ভাববাদী দর্শন প্রস্থানগুলির সমালোচনা, অভিজ্ঞতাবাদী ও পজিটিভিস্ট দর্শনের সমর্থন সেখানে মেলে। বেকন, কোঁত (১৭৯৮-১৮৫৭) ও মিলের (১৮০৬-

১৮৭৩) চিন্তাধারা, ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চার নিদর্শন এই বইয়ের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন চর্চা যে অনেকাংশে ইহবাদী এবং নিরীশ্বরবাদী ভাবনায় পরিপূর্ণ তা *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*-এ তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি ইউরোপীয় বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে প্রভূত প্রশংসা করেছেন, আক্ষেপ করেছেন আধুনিক কালে যুক্তিবাদের প্রতি ভারতীয়দের অনাস্থা নিয়ে। এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত এইচ.এইচ. উইলসনের লেখা থেকে এই বই লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। উইলসন যেখানে পঁয়তাল্লিশটি সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, সেখানে অক্ষয়কুমার দত্ত একশো বিরাশিটি সম্প্রদায়ের কথা বলেন। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ; উপক্রমনিকায় এযাবৎ কাল পর্যন্ত চলে আসা বিশ্লেষণের বিপরীত একটি ভাষ্য হাজির করেন, যা উনিশ শতকে তো বটেই বাঙালির ‘ঈশ্বর’, দর্শন ও যুক্তিবাদ চর্চার ধারায় ব্যতিক্রমী। এবং ওখানে তাঁর মৌলিকত্ব। বেকনীয় পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং যুক্তি প্রয়োগ ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ভিত্তিটাও স্পষ্ট করেন ভূমিকাতেই। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*কে বাঙালির তথা ভারতীয়দের দর্শনচর্চার ধারায় দিকচিহ্ন, বলা বাহুল্য।

উপক্রমনিকাটির সঙ্গে মূল বইয়ের সম্পর্ক প্রাথমিকভাবে স্পষ্ট না হওয়ারই কথা। অনেকক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে দেবেন্দ্রনাথের ভাষা ‘নাস্তিক’ অক্ষয়কুমার দত্ত কেন এই বই লিখতে গেলেন? রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মতে—

“বেদপ্রামাণ্য, ঈশ্বর, উপাসনা— এর কিছুতেই অক্ষয়কুমারের বিশ্বাস ছিল না। তবু এই বিষয়গুলি নিয়ে এমনভাবে অর্থ ও আয়ু ক্ষয় করেছিলেন কেন? একটা সহজ উত্তর হল : তাঁর তথ্যনিষ্ঠা। কোনো বিষয়ে আগা-পাশ-তলা ভালো করে না-জেনে সেটি গ্রহণ বা বর্জন করা তাঁর ধাতে সইত না।”^{৯৮}

আরেকটি অনুমানের কথা জানিয়েছেন অসিতকুমার ভট্টাচার্য, তাঁর মতে— হিন্দু ধর্মের মূল ব্যাপারটা এই যে এর কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্রীড নেই। এই জায়গাতেই তা অন্য সব ধর্মের থেকে আলাদা। ফলে কেউ যদি নতুন কিছু বলতে তাহলে তাঁকে দুটো কাজ করতে হবে। এক, ভক্তরা কীভাবে হিন্দু ধর্ম পালন করছে তা আলোচনা করতে হবে, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্রীডের অন্তর্গত সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সেই সঙ্গে কয়েক শতাব্দী ধরে যে বিরাট চিন্তা সৌধ গড়ে উঠেছে তাও বিশ্লেষণ করতে হবে।^{৯৯} বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, কেবল ষড়্দর্শন সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্যটি উদ্ধৃত করে তাঁর অবস্থান বোঝার চেষ্টা করবো। এই মন্তব্যটি থেকে উনিশ শতকের বাঙালির দর্শনচর্চার প্রেক্ষিতটিও বোঝা যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত লিখছেন—

“এই ষড়্দর্শনের মধ্যে প্রায় কোন দর্শনকারই জগতের স্বতঃ-সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করেন নাই। কপিল-কৃত সাজ্য্য তো সুস্পষ্ট নাস্তিক্যবাদ, পতঞ্জলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশ্ব-স্রষ্টা না বলিয়া বিশ্ব-নির্মাতামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। গৌতম ও কণাদ মতানুসারে জড় পরমাণু নিত্য; কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মীমাংসাপণ্ডিতেরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের মতে জগৎ সৃষ্টই হয় নাই, বিশ্বব্যাপার ভ্রমমাত্র, ইহাতে আর সৃষ্টিকর্তার সম্ভাবনা কি?”^{১০০}

উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে এহেন মন্তব্য নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। তবে ভারতীয় দার্শনিকদের মেধা, যুক্তিবোধের প্রতি অক্ষয়কুমার শ্রদ্ধাশীল। তাঁর আপত্তি বা অনুযোগের কারণ তাঁরা বিজ্ঞানের প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত ছিলেন না। যদি থাকতেন, অক্ষয়কুমারের অনুমান ইউরোপে নয় ভারতেই আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হতো।^{১০১} পরবর্তীকালে আরেক যুক্তিবাদী এবং রসায়নবিদ প্রফুল্লচন্দ্র রায় অক্ষয়কুমারের কাছাকাছি মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, প্রাচীনকালে ভারতে বিজ্ঞানচর্চা যথেষ্ট উন্নত ছিল। কিন্তু জাতপাতের বিভাজন ও অদ্বৈত বেদান্তের চর্চা বিজ্ঞান চিন্তা ও চর্চার প্রসারকে রুদ্ধ করে দেয়। জাতপাতের বিভাজন জ্ঞানচর্চার যে শ্রমের

অঙ্গঙ্গীক ভাবে যুক্ত সেই ধারণাটিকে নস্যাত্ করে এবং বৈদান্তিক দর্শন পার্থিব জগতের ধারণাকেই খারিজ করে দেয়। যার ফলে বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে বক্ষ্যাত্দের জন্ম নেয়। সে যাই হোক, উপরোক্ত উপক্রমনিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত লিখছেন কেন ভারতীয় জ্ঞানচর্চা পথ হারিয়েছিল? তাঁর মতে ইউরোপে যেভাবে বৈজ্ঞানিক দর্শন গড়ে উঠেছিল, আমাদের দেশে তা হয়নি।^{১০২} সময়ের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলায় আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদচর্চার একজন পথিকৃৎ, সে কথা অস্বীকার করার নয়।

বিদ্যাসাগর

সংস্কৃত কলেজের অসামান্য ছাত্র, ভারতীয় দর্শন, কাব্য, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তির কারণেই তিনি ‘বিদ্যাসাগর’। ছাত্রজীবন উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইংরাজি ভাষা শিখতে শুরু করেন, সেই সূত্র ধরেই আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে প্রবেশ। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত গ্রন্থতালিকা দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো, কতো বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আসা-যাওয়া।^{১০৩} কিন্তু শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট ও চিঠিপত্র ছাড়া দর্শন সম্পর্কে মন্তব্য নেই, বিশেষ পাওয়া যায় না। অন্যান্য মনীষীদের মতো দার্শনিক সন্দর্ভ লেখেননি। ফলে রিপোর্ট আর বিভিন্ন লেখাপত্রের মধ্য ছড়িয়ে থাকা সূত্রগুলো আশ্রয় করেই চলতে হবে। আপাতত, সেই টুকরো টুকরো মন্তব্যগুলোকে সাজিয়ে নিয়ে বুঝতে চাইবো তাঁর অবস্থান। টুকরো মন্তব্যগুলো আদতে বিরাট আখ্যানেরই অংশ, যা থেকে বিদ্যাসাগরের দার্শনিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৮৫৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, ব্যালান্টাইনের রিপোর্টের উত্তরে, বিদ্যাসাগর একটা রিপোর্ট জমা দিলেন। বিখ্যাত ও বিতর্কিত সেই রিপোর্ট। কী লিখলেন বিদ্যাসাগর?

“বিশপ বার্কলের *Inquiry* সম্বন্ধে আমার মত এই যে, পাঠ্য পুস্তকের ইহার প্রবর্তনে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক। কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়াইয়া উপায় নাই।

সে-সকল কারণের উল্লেখ এখানে নিম্নয়োজন। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন (ফলস সিস্টেম অব ফিলোসফি), এ-সমন্ধে এখন আর মতদ্বৈত নাই। মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কৃতে যখন এগুলি শিখাইতেই হইবে, ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রতিষেধক রূপে ইংরেজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ান দরকার। বার্কলের Inquiry বেদান্ত বা সাংখ্যের মত একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে; ইউরোপেও এখন আর ইহা খাঁটি দর্শন বলিয়া বিবেচিত হয় না, কাজেই ইহাতে কোনক্রমে সে কাজ চলিবে না।^{১০৪} (আন্ডার লাইন আমার)

১৯২৭ সালে এই চিঠিটা আবিষ্কারের পর অনেকেই অবাক হয়ে যান। ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেও খুব স্বস্তিবোধ করেননি।^{১০৫} বিদ্যাসাগরের শব্দ চয়ন, উপমার প্রয়োগ লক্ষ করলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। বেদান্ত সংস্কৃত কলেজে পড়াতেই হবে। কেন? তা নইলে দেশের ইতিহাস, দর্শন ছাত্ররা শিখবে কীভাবে? কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী এসব মেনে চলেই যত গুণগোল। তাহলে উপায়? ইউরোপের যথার্থ দর্শন। যে কোনো নয়, বার্কলের মায়াবাদী Inquiry নয়, পড়বে লক, হিউমের যুক্তিবাদ। অলীক কল্পলোকের প্রতিষেধক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ। চমৎকার উপমা। রোগ চিহ্নিত, ওষুধও।

১৮৫৯ সালে সংস্কৃত কলেজের সিলেবাস থেকে স্মৃতি ও বেদান্ত তুলে দেবার প্রস্তাব এসেছিল। সরকারের তরফে এই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত জানতে চাওয়া হয়। তিনি বলেন যে, এই দুটো বিষয় তুলে দিলে কলেজের পাঠ্যক্রম খুবই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে। এর আগেও সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি থাকাকালীন বলেন— ভারতে প্রচলিত সমস্ত দর্শনের সাথে কারুর পরিচয় না থাকলে, তার সংস্কৃত জ্ঞান পূর্ণ হবে না। একথা ঠিক হিন্দু দর্শনের সাথে আধুনিক কালের ভাবনা মিলমিশ খায় না, তবুও একথা অনস্বীকার্য একজন ভাল ছাত্রের এ বিষয়ে পূর্ণ বোঝাপড়া থাকা উচিত।^{১০৬} বেদান্ত এবং সাংখ্য নয়, গোটা ষড়্দর্শন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের অবস্থান খুব বিবাদী (Critical)। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ে আরেকটা

দৃষ্টান্ত হাজির করার লোভ সামলানো যাচ্ছে না। ঐ বিখ্যাত চিঠিতে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করছেন—

এক, “আমার মনে হয়না, সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাইতে পারিব। যদি-
বা ধরিয়া লওয়া যায় ইহা সম্ভব, তবুও আমার মনে হয়, উন্নতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানে তথ্য-সকল
ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা দুঃসাধ্য। তাঁহাদের বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব।”^{১০৭}
দুই, আরেকটি জায়গায় তিনি ভারতীয় পণ্ডিতদের আরব খালিফার সঙ্গে তুলনা করছেন।
যারা মনে করে আমাদের শাস্ত্রগুলি অভ্রান্ত।^{১০৮} এই উদ্ধৃতির পর আর কিছু বলার প্রয়োজন
পরে না, কেমন ছিল বিদ্যাসাগরের অবস্থান।

১৮৫৮ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন বিদ্যাসাগর। বিবিধ
কারণে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল, একটা কারণ সিপাহী বিদ্রোহের (কার্ল মার্ক্স যাকে বলবেন
ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ) সময় সিপাহীদের থাকার বন্দোবস্ত হয় সংস্কৃত কলেজে, যা
বিদ্যাসাগরের না-পসন্দ। কারণ লেখাপড়া বন্ধ। এরপরে অধ্যক্ষ হন ই.বি. কাউএল (১৮২৬-
১৯০৩)^{১০৯}, তিনি একটা রিপোর্ট দেন, তাতে জানান যে, বিদ্যাসাগরের সময় দুটো বিষয়ে বড়
উন্নতি হয়েছিল। ১. নিচু ক্লাস ছাড়া সব জায়গায় ইংরাজি আবশ্যক করা, ২. মুঞ্চবোধ-এর
বদলে ব্যাকরণকৌমুদী পড়ানো।^{১১০} রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি
বলছেন— ৩. “নব্যন্যায়-চর্চা খর্ব করা। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে প্রথম দুটির কথা থাকে, কিন্তু
তৃতীয়টির উল্লেখ অবধি দেখা যায় না। তার কারণ বোধহয় যে, বিষয়টির গুরুত্ব ঠিকমতো না
বোঝা।”^{১১১} নব্যন্যায়ের ভাগ কমিয়ে ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য প্রস্থানগুলো (বৌদ্ধ ও জৈন)
এবং আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন (বেকন, মিল) পড়ানো শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের
মন্তব্য— বাংলার দর্শনচর্চার ইতিহাসে এই কীর্তি রেডিয়াম দিয়ে লিখে রাখার মতো।^{১১২}

নব্যন্যায়-চর্চায় আঘাতের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখায়, তিনি ক্ষোভ ও অভিমানের সাথে লেখেন যে, বিদ্যাসাগর নব্যন্যায়ের প্রতি ‘পরাঙ্মুখ’ ছিলেন। এবং বাঙালির শ্রেষ্ঠ কীর্তির প্রতি অনাদর ও বৈরিতার কারণ সাহেবিয়ানা। সে সূত্রেই তাঁরা নব্যন্যায় ‘কঠোর অথচ রসালো’ মন্তব্য করেছেন। কী মন্তব্য করেছেন তাঁরা? নব্যন্যায়-চর্চা মস্তিষ্কের অপব্যবহার, শাস্ত্রের লুতাতন্ত্র (‘a cobweb of learning’), পঙ্কিল পরাবিদ্যা (‘muddy metaphysics’)। প্রথম বিশেষণটা প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের, পরের দুটো বিদ্যাসাগরের।^{১৩}

আক্ষেপের বিষয় যে, বিদ্যাসাগরের ইংরাজি লেখার কোনো সংকলন নেই। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো ছড়িয়ে আছে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শন, সর্বপরি দার্শনিক বা রাজনৈতিক অবস্থান বুঝতে যেগুলো মূল্য অপরিস্রব। এই রিপোর্টগুলো দেখলে বোঝা যাবে, বিদ্যাসাগর ধীরে ধীরে তাঁর দার্শনিক অবস্থান স্পষ্ট করছেন। ষড়দর্শনে তাঁর বিশেষ ভক্তি নেই, তিনি শিখতে ও শেখাতে চাইছেন বেকনের দর্শন। যার মূল কথা, ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার পরীক্ষিত সিদ্ধান্তই একমাত্র সত্য। অর্থাৎ ইনডাক্টিভ লজিক। সে কারণেই, তাঁর প্রস্তাব নব্যন্যায়ের বদলে সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা পড়বে মিলের সিস্টেম অব লজিক। তা বলে ভারতীয় দর্শনকে বাতিল করা যাবে না, সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা দুই শিখবে, জানবে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বিপুল ঐতিহ্য, তীক্ষ্ণযুক্তি, অসামান্য কাব্যবোধ, মেধার স্ফূরণ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর অবহিত ছিলেন। তিনি যুক্তিবাদী, মৌলবাদীর মতো কোনো কিছুকে বাতিল কিংবা নিষিদ্ধ করা তাঁর স্বভাব ধর্ম নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা তর্ক করতে শিখবে, বিচারবোধ তৈরি হবে। এ তো আধুনিকতা ও যুক্তিবাদের গোড়ার কথা, তর্কে রত থাকা।

‘লাজুক যুক্তিবাদ’ এবং ‘ভদ্রলোকি যুক্তিবাদের দক্ষিণাবর্ত’

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) *আনন্দমঠ*-এর শেষে চিকিৎসক জ্ঞান বিষয়ে সত্যানন্দ ঠাকুর তথা পাঠকদের কিছু উপদেশ দেন। জ্ঞান দুই প্রকার ‘বহির্বিষয়ক’ ও ‘অন্তর্বিষয়ক’। তার মধ্যে ‘অন্তর্বিষয়ক’ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এবং সেটি সনাতনধর্মের প্রধান বিষয়। বাইরের অর্থাৎ জড় বা বস্তুজগত বিষয়ক জ্ঞান অর্জন না হলে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানার্জন অধরাই রয়ে যাবে এমনটাই বঙ্কিমী প্রতিপাদ্য।^{১৪৪} অর্থাৎ কিনা বিজ্ঞান এবং তার হাত ধরে আগত যুক্তিবাদ কখনোই প্রকৃত ‘সত্য’-এর নাগাল পাবে না। স্থূল জানা-বোঝার মধ্যেই বিজ্ঞানের চলাচল। বঙ্কিম জ্ঞানের যে বাইনারি/বিভাজন দেখালেন বিবেকানন্দের লেখার মধ্যে তার ছায়া লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞান ও ধর্মকে তিনি মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা বা বলা ভালো সনাতন ধর্মের অভিজ্ঞানকে নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দেন। ‘যুক্তি ও ধর্ম’^{১৪৫} শীর্ষক প্রবন্ধে/বক্তৃতায় বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে—

“জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না। আমরা দেখিব, সমস্ত ধর্ম যে-সত্যের সন্ধানে রত, যে-সত্যের তুলনায় জড়বিজ্ঞানের সব জ্ঞানই গৌণমাত্র, আমরা সেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছি; ইহাই একমাত্র সত্যজ্ঞান, যাহা আমাদেরকে বিশ্বের এই বিশ্বজনীন ঈশ্বরের সঙ্গে এক করিয়া দেয়।”^{১৪৬}

লক্ষণীয় যে ধর্মীয় জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দেবার জন্যে শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয় বিবেকানন্দকেও বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা টানতে হচ্ছে। সনাতন ধর্মীয় অভিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করতে বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রতিতুলনা প্রসঙ্গে শশধর তর্কচূড়ামণির কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। এখানেই উনিশ শতকে পূর্বজ বাঙালিদের ঐশ্বরিকতাবিহীন দর্শন চর্চা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের গুরুত্ব। হিন্দু পুনরুত্থানবাদের পক্ষেও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞানচর্চার হাত ধরে যে সামাজিক যুক্তিবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে ‘বিরুদ্ধপক্ষ’ হিসেবে দাঁড় করিয়ে

ধর্মের পক্ষে লড়াই করা সম্ভবপর নয়, তাই এই আপোস পন্থা। বিজ্ঞানবোধ এবং এই নতুন তর্কিক যুক্তিবোধ যা অনেকাংশে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খারিজ করেছে, সেই যুক্তিবোধের সঙ্গে আপোস-রফার মাধ্যমে নতুন একটি যুক্তিবোধ নির্মাণে সচেষ্ট হবেন বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, শশধর তর্কচূড়ামণি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীরা যাকে অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ চিহ্নিত করছেন ‘লাজুক যুক্তিবাদ’^{১১৭} নামে।

বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যার জন্য আশ্রয় নিচ্ছেন ‘আধুনিক’ ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধের। বলা বাহুল্য, শশধর তর্কচূড়ামণির মতো বাতুল হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাঁর কাছে ‘ধর্ম’ ও ‘বিজ্ঞান’-এর মধ্যে কোনো ফারাক থাকছে না। *ধর্মবিজ্ঞান*-এ ‘সাংখ্য ও অদ্বৈত’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলছেন বাইরে আমরা যা কিছু দেখি তার প্রকৃত স্বরূপ আমরা কখনই জানতে পারি না। কেন তা জানতে পারি না সে বিষয়ে বিশদে কিছু বলেননি। কিন্তু গাণিতিক উপায়ে সেটি প্রমাণ করতে চাইলেন। ‘প্রকৃত স্বরূপ’কে চিহ্নিত করলেন ‘ক’ দিয়ে। আমাদের মনের উপরে তার যে প্রতিক্রিয়া সেটিকে বিবেকানন্দ গাণিতিক ভঙ্গিমায় দেখাচ্ছেন ‘ক+মন’। এরপর এলো ভেতরের কথা। আমার স্বরূপ অর্থাৎ আত্মা তাও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তাকে চিহ্নিত করলেন ‘খ’ দিয়ে। আর আমার নিজের চোখে আমি হলাম ‘খ+মন’। এরপরে বিবেকানন্দ লিখছেন ‘মন’ যেহেতু দেশ-কাল-পাত্রের অধীন তাই সে কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া বিচার করতে পারে না। খানিক গাণিতিক ভঙ্গিমায়, সেই আপেক্ষিক বিষয়টিকে অবলীলায় বাদ দিয়ে বিবেকানন্দ বলবেন—

“কেবল এই মন— এই ছাঁচই উহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল এবং উহাদিগকে অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ— এই দুই রূপে ভিন্ন করিয়াছিল। ‘ক’ ও ‘খ’ উভয়ই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমরা উহাদিগের

উপর কোন গুণের আরোপ করিতে পারি না। ... ‘ক’ ও ‘খ’ উভয়ই নির্গুণ, কারণ উহারা মন হইতে গুণ পাইতেছে। অতএব এই ‘ক’ ও ‘খ’ এক।”^{১১৮}

এর পরেই সিদ্ধান্ত জানাবেন যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তামাত্র। জগতে কেবল এক আত্মা, এক সত্তা আছে।^{১১৯} কেন যে তিনি ‘মন’ বিষয়টিকে যুক্ত করলেন এবং কেন বাদ দিলেন তা স্পষ্ট নয়। কোনো গণিতশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী ‘ক’ ও ‘খ’ একই বিষয় হয়ে গেল সেটির গাণিতিক ব্যাখ্যা মেলা ভার। বিবেকানন্দ অদ্বৈত বৈদান্তিক, অখণ্ড পরম সত্তার সমর্থক। তাঁকেও সাংসারিক বিষয়ের আশ্রয় নিতে হলো, ‘বহির্বিষয়ক জ্ঞান’ বিনা ‘অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান’-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে। বলা ভালো সংসারের মায়াত্ব প্রমাণে। ফলত, এই প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক যে বিবেকানন্দ কি স্ব-বিরোধী? অনেকটা শঙ্করাচার্যের মতন তিনি ও স্ব-বিরোধিতার ফাঁদে পড়লেন না কি?^{১২০}

আত্মা কি অবিনশ্বর? শাস্ত্র থেকে অনেক আগুবােক্যের নিদর্শন হাজির করা যায় এর স্বপক্ষে। কিন্তু বিবেকানন্দ সেই পথ নেবেন না, তিনি সাক্ষ্য করবেন আধুনিক বিজ্ঞানকে। ‘প্রকৃতি ও পুরুষ’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখছেন—

“আপনাদের মধ্যে যাঁহারা রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যদি একটি কাচনলের ভিতর একটি বাতি ও কষ্টিক (Caustic Soda) পেসিল রাখা যায় এবং সমগ্র বাতিটি পুড়াইয়া ফেলা হয় তবে ঐ কষ্টিক পেসিলটি বাহির করিয়া ওজন করিয়ে দেখা যাইবে যে, ঐ পেসিলটির ওজন এখন উহার পূর্ব ওজনের সহিত বাতিটির ওজন যোগ করিলে যাহা হয়, ঠিক তত হইয়াছে।”^{১২১}

বিবেকানন্দ সিদ্ধান্ত টানবেন এই বলে যে প্রাচীন দার্শনিকদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের কী আশ্চর্য মিল। উভয়ের সিদ্ধান্ত একই ধরনের এবং তাঁরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কী প্রকারে কষ্টিক সোডা = অবিনশ্বর আত্মা হয়ে গেল, তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি। আগেই উল্লেখিত স্ব-বিরোধিতার ফাঁদে আবারও, যে তিনি পড়লেন না নির্দিধায় বলা যায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অভিজ্ঞতা লব্ধ, পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে আত্মার (যার সঙ্গে অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের

বৈরিতার সম্পর্ক) মেলবন্ধন আদতে কপট যুক্তি। যাকে ‘লাজুক যুক্তিবাদ’ নামে চিহ্নিত করেছেন অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ^{১২২}।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-১৮৯৯) তেমন পরিচিত ব্যক্তি নন। তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে অলৌকিক যোগশক্তির পরিচয় এখনো টিকে আছে। এসব কিছু মध्ये উনিশ শতকের শুরুতে যে যুক্তিবাদের আবহে যে বাঙালি সমাজ গড়ে উঠছিল, শশধর-বিবেকানন্দ-বিজয়কৃষ্ণদের হাত ধরে তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। এই নতুন ধারাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক হিসেবে না দেখলে তা বাঙালির সমাজের যুক্তিবোধকে প্রায় নিরীশ্বরতা থেকে ঈশ্বরমুখীন করে তোলে তা অস্বীকার করা যায় না। এই ধারায় বিজয়কৃষ্ণ মুখ্য নির্ণায়কের ভূমিকা পালন না করলেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৬৩ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন বিজয়কৃষ্ণ। শান্তিপুর, ময়মনসিংহ, গয়া প্রভৃতি জায়গায় ব্রাহ্ম মন্দির স্থাপনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাঁর কর্মকাণ্ড অনেক যুবককে ব্রাহ্মসমাজের কাজকর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে। এর পাশাপাশি যুবকদের খানিক বিজ্ঞানমুখী ও যুক্তিবাদী করে তোলায় তাঁর ভূমিকা ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) নেতৃত্বে তিনি বিদ্রোহ করেন। পরে যখন কেশব সেন নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে দাবি করলেন, নাবালিকা কন্যার বিবাহ দিলেন, প্রতিবাদে তখন বিজয়কৃষ্ণ তাঁর কাছ থেকে সরে আসেন। শান্তিপুরে প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্যের বংশে বিজয়কৃষ্ণের জন্ম। একদিকে একেশ্বরবাদী যুক্তিবাদ, আরেকদিকে অবচেতনে শৈশবে অভ্যস্ত লালিত বৈষ্ণব ভক্তিরসের ধারা তাঁকে দ্বিধাতুর করে তোলে। কেবল বিজয়কৃষ্ণের ক্ষেত্রেই নয়, উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদের দ্বন্দ্ব একটি পরিচিত দ্বন্দ্ব। চতুরঙ্গ (১৯১৬) উপন্যাস তার সাহিত্যিক নিদর্শন। শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রাহ্মমত ত্যাগ করে

হিন্দুমততেই আশ্রয় নেন। সাধু শ্রীযোগীরাজ গঙ্গীরনাথের কৃপায় তাঁর মত বদল ঘটে এবং নানান মানসিক সংকট থেকে মুক্তি পান। সমাজসেবার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এটাও আরেক পরিচিত উনিশ শতকীয় ধরন, রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) ও বিদ্যাসাগরের হাত ধরে যে আধুনিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল, তাও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় বঙ্কিমী বাহুবলের আখ্যান ও আইডিয়ার কাছে।^{১২৩} অচিরেই নানারকম অলৌকিক ক্ষমতা অধিকারী হয়েছেন বলে খ্যাতি রটে। শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬) সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। যে বিজয়কৃষ্ণ কলকাতায় এসে উপবীত ত্যাগ করেন, ১৮৮৬ সালে আবার নতুন করে উপবীত ধারণ করেন। শুরু হয় বিপরীত যাত্রা। শেষ জীবনে হরিভক্ত বৈষ্ণব হয়ে যান। তাঁর অলৌকিক কীর্তিকলাপ অনেকের মতে আসলে মরফিয়ার-ই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।^{১২৪} এতো গেল তাঁর জীবনের কথা, কোথায় তিনি প্রভাবিত করলেন সমাজ জীবনকে? বাংলার জাতীয় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দুজন মানুষ অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮) বিজয়কৃষ্ণকে তাঁদের গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। অশ্বিনীকুমার যদিও সমাজ জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন। আর সতীশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে প্রায় সরিয়ে নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনাকেই জীবন করলেন। ১৮৯৭ সালে সতীশচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *ডন* পত্রিকা। আর ১৯০৬ সালে গঠন করেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। একদিকে যেমন ইতিহাস, সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কারিগরির মতো বিষয় সেখানে গুরুত্ব পেল, তেমনি হিন্দুধর্ম আশ্রিত স্বাদেশিকতা নতুন যুক্তিবোধও জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হলো। বস্তুত যা রামমোহন-ডিরোজিও-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের প্রবর্তিত সমাজবোধ ও যুক্তিবাদী চিন্তার প্রতিস্পর্শী। বৈজ্ঞানিক

যুক্তিবোধ পর্যবসিত হলো ‘লাজুক যুক্তিবাদ’-এ। হিন্দুধর্ম-যোগশক্তি-জাতীয়তাবাদ-বাহুবলের অক্ষ তৈরি করলো ভদ্রলোকি যুক্তিবাদের নতুন ধারা।^{১২৫}

এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন প্রস্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করলাম, সেই সূত্রে আস্তিক-নাস্তিক শব্দ দুটোর অনেকান্ত অর্থ ও ব্যঞ্জনাগুলিকে বোঝার চেষ্টা করলাম। এই শব্দযুগ্মটি যে, একমাত্রিক বা বাইনারিকে বোঝায় না সে বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে উনিশ শতকে বাঙালির ধর্ম ও দর্শন চর্চার কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছি, বিশ শতকের প্রেক্ষাপট হিসেবে। দর্শনের জগতে শব্দযুগ্মটি যেমন অনেকানেক অর্থ ও সম্ভাবনাকে প্রকাশ করেছে তেমনি, বাংলা উপন্যাসেও আস্তিকতা-নাস্তিকতা বোধ বিচিত্র কিসিমের অর্থ, ব্যঞ্জনা, সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে। সেখানে দর্শন প্রস্থানগুলির সঙ্গে যেমন মিল আমরা লক্ষ্য করি তেমনই, নতুন সামাজিক পরিস্থিতির কারণে নতুন সম্ভাবনাও তৈরি হয়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সে কথাই বলার চেষ্টা করবো আমরা।

তথ্যসূত্র ও টীকা

^১ আবুল কালাম আজাদ, ‘সূচনা’, *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড ১ম ভাগ, কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৬ব, পৃ- ক

^২ Gaarder, Jostein, *Sophie’s World*, Paulette Moller (Trans.), London : weidenfeld & Nicolson, 2015, p. 4

^৩ Ibid, p. 6

^৪ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ২০০৪, পৃ- ৯

^৫ Surendranath Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Vol-1, Delhi : Motilal Banarsidass, 1975, p-62

^৬ M. Hiriyanna, *Outlines of Indian Philosophy*, London : Gorge Allen & Unwin Ltd, 1932, p-18

^৭ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন*, কলকাতা : এন.বি.এ প্রা লি, ২০০৩, পৃ- জ

^৮ Marx & Engels, *Selected Correspondences*, Moscow, 1953, p- 53

- ^৯ অমর্ত্য সেন, *তর্কপ্রিয় ভারতীয়*, সম্পা. কুমার রাণা, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০১২, পৃ- ১৮
- ^{১০} দ্রঃ- আশীষ লাহিড়ী, *অক্ষয়কুমার দত্তঃ আঁধার রাতে একলা পথিক*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭, পৃ-১০৫
- ও J. Mohanty, *Explorations in Philosophy*, New Delhi: OUP, 2001, p. 57
- ^{১১} স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (ত.), *উপনিষদ*, প্রথম ভাগ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ- ৫৪
- ^{১২} ঐ
- ^{১৩} ঐ, পৃ- ৫৮
- ^{১৪} ঐ, পৃ- ৫৯
- ^{১৫} ঐ, পৃ- ৬১
- ^{১৬} ঐ, পৃ- ৬৭-৬৮
- ^{১৭} ঐ, পৃ- ৬৮
- ^{১৮} ঐ, পৃ- ৯১
- ^{১৯} শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আস্তিক কে? কে নাস্তিক?', *অনুষ্টিপ*, কলকাতা, ১ম সংখ্যা ২০০৯, পৃ- ৪৬
- ^{২০} স্বামী লোকেশ্বরানন্দ(ত.), *উপনিষদ*, প্রথম ভাগ, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ- ১৪৩
- ^{২১} শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আস্তিক কে? কে নাস্তিক?', *অনুষ্টিপ*, কলকাতা, ১ম সংখ্যা ২০০৯, পৃ- ৪৭
- ^{২২} ঐ, পৃ- ৪৮
- ^{২৩} ঐ
- ^{২৪} ঐ, পৃ- ৫০-৫১
- ^{২৫} ঐ, পৃ- ৫১
- ^{২৬} Panini, *Ashtadhyayi*, trans. Srisa Chandra Vasu, Delhi : Motilal Banarsidass, 1962, p. 824
- ^{২৭} শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আস্তিক কে? কে নাস্তিক?', *অনুষ্টিপ*, কলকাতা, ১ম সংখ্যা ২০০৯, পৃ- ৫১-৫২
- ^{২৮} ঐ, পৃ- ৫২
- ^{২৯} ঐ, পৃ ৫২-৫২
- ^{৩০} E.B. Cowell (trans.), *The Maitri or Maitrayaniya Upanishad*, London: Asiatic Society of Bengal, 1870, p- 251
- ^{৩১} S. Radhakrishnan, *The Principal Upanisads*, Noida : Harper Collins, 2016, p- 807
- ^{৩২} Ibid, p- 808
- ^{৩৩} শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আস্তিক কে? কে নাস্তিক?', *অনুষ্টিপ*, কলকাতা, ১ম সংখ্যা ২০০৯, পৃ- ৫৬
- ^{৩৪} ঐ, পৃ- ৫৬
- ^{৩৫} ঐ, পৃ- ৬১ এবং টীকা ৬৭, পৃ- ৮৪
- ^{৩৬} ঐ, পৃ- ৬২-৬৩ এবং টীকা ৭১, পৃ- ৮৪
- ^{৩৭} ঐ, পৃ- ৬৬
- ^{৩৮} দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আর্য্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত', *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, বরুণকুমার চক্রবর্তী(সম্পা.), কলকাতা : অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, ২০০২, পৃ- ২০৪-২০৫
- ^{৩৯} ঐ, পৃ- ৬৪
- ^{৪০} স্বামী লোকেশ্বরানন্দ(ত.), *উপনিষদ*, প্রথম ভাগ, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ- ৫৬৬
- ^{৪১} ঐ, পৃ- ৫৬৭
- ^{৪২} শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আস্তিক কে? কে নাস্তিক?', *অনুষ্টিপ*, কলকাতা, ১ম সংখ্যা ২০০৯, পৃ- ৬৮-৭১
- ^{৪৩} উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতদর্শনসার*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২০ব, পৃ- ২৬২-২৬৫

- ^{৪৪} হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, *বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা দর্শন*, কলকাতা : অবভাস, ২০০৮, পৃ- ৮০
- ^{৪৫} শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আন্তিক কে? কে নান্তিক?', *অনুষ্টিপ*, কলকাতা, ১ম সংখ্যা ২০০৯, পৃ- ৭৫
- ^{৪৬} সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, ২০০৪, পৃ- ১০
- ^{৪৭} ঐ, পৃ- ১৩
- ^{৪৮} ঐ
- ^{৪৯} ঐ, পৃ- ২৮-২৯
- ^{৫০} ঐ
- ^{৫১} ঐ
- ^{৫২} উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতদর্শনসার*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২০ব, পৃ- ১৩৮
- ^{৫৩} ঐ, পৃ- ১৪১
- ^{৫৪} ঐ, পৃ- ১৪২
- ^{৫৫} ঐ, পৃ- ১৪৩
- ^{৫৬} ঐ, পৃ- ১৪৩-৪৪
- ^{৫৭} কপিল, *সাজ্জ দর্শন (সাজ্জা প্রবচন-সূত্র)*, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ত.) কলকাতা : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭, পৃ- ৪৮
- ^{৫৮} ঐ
- ^{৫৯} ঐ, পৃ ১৫৩
- ^{৬০} উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতদর্শনসার*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২০ব, পৃ- ১৫৮-৫৯
- ^{৬১} ঐ, পৃ- ১৫৯
- ^{৬২} ঐ, পৃ- ১৫০-৫১
- ^{৬৩} স্বামী প্রেমেশানন্দ, *পাতঞ্জল-যোগসূত্র*, কলকাতা : উদ্বোধন, ১৪১০ব, পৃ- ১
- ^{৬৪} ঐ
- ^{৬৫} শচীন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিভূতিভূষণ ন্যায়াচার্য (ত.), *শঙ্করাচার্য গ্রন্থমালা*, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা : বসুমতি সাহিত্য মন্দির, প্রকাশকাল অনুজ্ঞেখিত, পৃ- ৭৯
- ^{৬৬} উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতদর্শনসার*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২০ব, পৃ- ১৫১
- ^{৬৭} রণজিৎ সরখেল, *ভারতীয় দর্শনে অনীশ্বরবাদ*, কলকাতা : প্রথেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ- ৬৫
- ^{৬৮} বাঙালি সন্ন্যাসী সন্তদাস বাবাজী। দ্রঃ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতদর্শনসার*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২০ব, পৃ- ১৬৯
- ^{৬৯} অক্ষয় কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*, ২য় ভাগ, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৪২০ব, পৃ- ২০
- ^{৭০} ঐ, পৃ- ২১
- ^{৭১} দ্রঃ নলিনীনাথ রায় (ত.), *ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শন*, কলকাতা : বসুমতি সাহিত্য মন্দির, প্রকাশ কাল অনুজ্ঞেখিত, পৃ- ১৪৮
- ^{৭২} সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, ২০০৪, পৃ- ৪০
- ^{৭৩} ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *ন্যায় দর্শন*, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮, পৃ- ৪২
- ^{৭৪} উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতদর্শনসার*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২০ব, পৃ- ১০৫
- ^{৭৫} সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, ২০০৪, পৃ- ৮৩-৮৪
- ^{৭৬} রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *চার্বাকচর্চা*, কলকাতা : সদেশ, ২০১০, পৃ- ১-২
- ^{৭৭} ঐ, পৃ- ৫০-৫২

- ^{৭৮} দ্রঃ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *চার্বাকচর্চা*, কলকাতা : সদেশ, ২০১০, পৃ- ৫৮ এবং পৃ-৭২-৭৩ (টীকা. ৩৪, ৩৫)
- ^{৭৯} এই শব্দটি ব্যবহারের জন্য দ্রঃ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *চার্বাকচর্চা*, কলকাতা : সদেশ, ২০১০, পৃ- ৮
- ^{৮০} ঐ
- ^{৮১} জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চগনন (ত.), *‘বিজ্ঞাপন’, সর্বদর্শন সংগ্রহ*, কলকাতা : মৃজাপুর, অপর সরকারিউলর রোড, ১৯২১ সংবৎ
- ^{৮২} রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *চার্বাকচর্চা*, কলকাতা : সদেশ, ২০১০, পৃ- ১৩
- ^{৮৩} রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *বিদ্যাসাগর নানা প্রসঙ্গ*, কলকাতা : চিরায়ত, ২০১৫
- ^{৮৪} কান্ট তাঁর *ক্রিটিক অব প্র্যাক্টিক্যাল রিজেন*-এর শেষে একটা গল্পের উল্লেখ করেছিলেন। সত্য কী? মিথ্যা কী? এবং Catagarical Imparative-এর প্রসঙ্গে। এক বন্ধু অপর বন্ধুর বাড়িতে এসে জানালো এক হত্যাকারী তাকে তাড়া করেছে। সে এখানে আত্মগোপন করছে প্রাণ বাঁচাতে, বন্ধু যেন কাউকে না জানায় সে লুকিয়ে আছে। কিছু পরে হত্যাকারী বন্ধুটির বাড়িতে এসে জানতে চায় সে কী কাউকে আশ্রয় দিয়েছে? সাধারণ মানুষ বন্ধুর প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয়-ই নেবে, কিন্তু কান্ট বলবেন এখানে সত্য ভাষণই কর্তব্য কারণ ‘সত্য’ অবস্থা অনুযায়ী বদলে বদলে যেতে পারে না। সত্য সর্বদাই সত্য, তা অবস্থার ফেরে বদলে বদলে যেতে পারে না।
- ^{৮৫} আশীষ লাহিড়ী, *ভদ্রলোকি যুক্তিবাদের দক্ষিণাবর্ত*, কলকাতা : ঋতাক্ষত, ২০১৫, পৃ- ২৪-২৫
- ^{৮৬} ঐ, পৃ- ১৮-৩০
- ^{৮৭} মহেন্দ্রনাথ রায়, *বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত*, কলকাতা : শ্রীগোপালচন্দ্র দেব, ১২৯২ব., পৃ- ৩
- ^{৮৮} অজিতকুমার চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, এলাহাবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৬, পৃ- ২৪১
- ^{৮৯} ঐ এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রত্নাবলী*, কলকাতা : শ্রী প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, প্রকাশ সাল অনুজ্ঞেখিত, পৃ- ১০-১১
- ^{৯০} ঐ, পৃ- ২৪০
- ^{৯১} মহেন্দ্রনাথ রায়, *বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত*, কলকাতা : শ্রীগোপালচন্দ্র দেব, ১২৯২ব., পৃ- ৯২-৯৪
- ^{৯২} ঐ, পৃ- ২৪০-৪১
- ^{৯৩} শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, কলকাতা : নিউ এজ, ২০০৯, পৃ- ২১২
- ^{৯৪} রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৩, পৃ-৫৪
- ^{৯৫} ঐ, পৃ-৫৫
- ^{৯৬} আশীষ লাহিড়ী, *অক্ষয়কুমার দত্তঃ আঁধার রাতে একলা পথিক*, কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ২০০৭, পৃ- ৮৭
- ^{৯৭} অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় দ্বিতীয় খণ্ড*, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৪২০ব, পৃ- ৫২-৫৩
- ^{৯৮} রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *কামারের এক ঘা*, কলকাতা : পাভলভ ইনস্টিটিউট, ২০০৩, পৃ- ১৬৭
- ^{৯৯} আশীষ লাহিড়ী, *অক্ষয়কুমার দত্তঃ আঁধার রাতে একলা পথিক*, কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ২০০৭, পৃ- ৯৬ ও টীকা ২, পৃ-১০৪
- ^{১০০} অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় দ্বিতীয় খণ্ড*, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৪২০ব, পৃ- ৫৪
- ^{১০১} ঐ, পৃ- ৫২
- ^{১০২} ঐ, পৃ- ৫২-৫৩
- ^{১০৩} শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, ‘বর্তমান সময়ের প্রত্যেক যুগ-প্রবর্তক ব্যক্তির ন্যায় (বিদ্যাসাগর) পূর্ব ও পশ্চিমকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে সংস্কৃতপণ্ডিত বলিয়া জানে, আমরা জানি তাঁহার ন্যায় প্রতীচ্যজ্ঞানে অভিজ্ঞ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তকালয় তাহার প্রমাণ।’ দ্রঃ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *বিদ্যাসাগরঃ নানা প্রসঙ্গ*, কলকাতা, চিরায়ত, ২০১৫, পৃ- ১২১(টীকা ৪৪)। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুরূপ হয়েছিলেন...তিনি যা কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেন নি।

- তিনি জানতেন বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অথচ তিনিই যুরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর ক্রবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত্ব করেছিলেন। দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিদ্যাসাগরচরিত*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯১ব, পৃ- ৭৩
- ^{১০৪} বাংলা তর্জমা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা। মূল ইংরাজি রিপোর্ট উদ্ধারের কৃতিত্বও তাঁর। তিনি এটা মর্ডান রিভিউতে প্রকাশ করেন। বাংলা তর্জমার জন্যে দ্রঃ- *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা দ্বিতীয় খণ্ড*, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১৬, পৃ-২৭। মূল লেখার জন্যে দ্রঃ— ইন্দ্র মিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, কলকাতা, আনন্দ, ২০১৬, পৃ- ৬৫৮-৬৬১।
- ^{১০৫} বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রঃ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *বিদ্যাসাগরঃ নানা প্রসঙ্গ*, কলকাতা, চিরায়ত, ২০১৫, পৃ-১০৭-০৮ ও ১১৬(টী- ২)
- ^{১০৬} ঐ, পৃ-১০৮-০৯
- ^{১০৭} দ্রঃ- *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা দ্বিতীয় খণ্ড*, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১৬, পৃ-২৭। মূল লেখাটা পাওয়া যাবে— ইন্দ্র মিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, কলকাতা, আনন্দ, ২০১৬, পৃ-৬৫৮-৬৬১।
- ^{১০৮} ঐ। মূল বক্তব্যটি যুক্ত করা হলো— “...আরব-সেনাপতি আমরা আলেকজেন্দ্রিয়া বিজয় করিয়া যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল- আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার ব্যবস্থা কি করা যাইতে পারে, তখন খালিফ উত্তর দিলেন, “গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি হয় কোরাণের মত অনুযায়ী, না-হয় বিরুদ্ধ; যদি অনুরূপ হয় ত এক কোরাণ থাকিলেই যথেষ্ট; আর যদি বিরুদ্ধ হয় ত গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর। অতএব ওগুলি ধ্বংস কর।” আমার বলিতে লজ্জা হয়— ভারতীয় পণ্ডিতগণের গোঁড়ামি ঐ আরব খালিফের গোড়ামির চেয়ে কিছু কম নয়। তাহাদের বিশ্বাস, সর্বজ্ঞ ঋষিদের মস্তিষ্ক হইতে শাস্ত্র নির্গত হইয়াছে, অতএব শাস্ত্র-সমূহ অদ্রাব্য।”
- ^{১০৯} মেয়াদকাল ১৮৫৮-১৮৬৪, সম্ভবত ইনি *সর্বদর্শনসংগ্রহ*-এর ইংরাজি অনুবাদক।
- ^{১১০} রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *বিদ্যাসাগরঃ নানা প্রসঙ্গ*, কলকাতা, চিরায়ত, ২০১৫, পৃ-১০৯। বিস্তারিত পাওয়া যাবে অরবিন্দ গুহর *Unpublished Letters of Vidyasagar* বইয়ে। সম্প্রতি বইটা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে Readers Service থেকে।
- ^{১১১} ঐ
- ^{১১২} ঐ, পৃ- ১০৯
- ^{১১৩} ঐ, পৃ- ১১৪-১৫। হালহকিকত জানা যাবে এই লেখার ৩৮ ও ৩৯নং টীকায়।
- ^{১১৪} বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *আনন্দমঠ*, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৫, পৃ- ১৩১
- ^{১১৫} ১৮৯৬ সালে ইংল্যান্ডে ‘Reason and Religion’ শিরোনামে একটি বক্তৃতা দেন বিবেকানন্দ, সেটির বাংলা তর্জমা স্বামী বিবেকানন্দের *বাণী ও রচনা*র তৃতীয় খণ্ডে ‘যুক্তি ও ধর্ম’ শিরোনামে যুক্ত হয়।
- ^{১১৬} স্বামী বিবেকানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, ৩য় খণ্ড, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৭, পৃ- ১৪৮
- ^{১১৭} জয়দীপ ঘোষ, ‘বাঙালি, বিবেকানন্দ ও যুক্তিবাদের সমস্যা’, *বিবেকানন্দ ও সেকুলার বাঙালির বিবেক*, চার্বাক বক্তৃতামালা ১, কলকাতা : চার্বাক, ২০১২, পৃ-৭-১২
- ^{১১৮} স্বামী বিবেকানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, ৩য় খণ্ড, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৭, পৃ- ৫১
- ^{১১৯} ঐ
- ^{১২০} দ্রঃ হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, *বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা দর্শন*, কলকাতা : অবভাস, ২০০৮, পৃ- ৮০
- ^{১২১} স্বামী বিবেকানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, ৩য় খণ্ড, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৭, পৃ- ২৬
- ^{১২২} জয়দীপ ঘোষ, ‘বাঙালি, বিবেকানন্দ ও যুক্তিবাদের সমস্যা’, *বিবেকানন্দ ও সেকুলার বাঙালির বিবেক*, চার্বাক বক্তৃতামালা ১, কলকাতা : চার্বাক, ২০১২, পৃ-৭-১২
- ^{১২৩} দ্রঃ রণজিৎ গুহ, *দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা* এবং *প্রেম না প্রতারণা* বই দুটিতে এই বিষয়ে অসামান্য আলোচনা করেছেন। একত্রে পাওয়া যাবে *রচনা সংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৯।

^{১২৪} আশীষ লাহিড়ী, *ভদ্রলোকি যুক্তিবাদের দক্ষিণাবর্ত*, কলকাতা: ঋতাস্কত, ২০১৫, পৃ- ৬১-৬৯

^{১২৫} ঋণ ঐ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চতুরঙ্গ, শেষ প্রশ্ন : আন্তিক-নাস্তিক প্রসঙ্গ

২.১ চতুরঙ্গ : বিশ্বাস, সংশয়, আশ্রয়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে ১৯১২ সালের ২৪ মে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ইউরোপে যান। ইউরোপ যাত্রার আগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ‘যাত্রার পূর্বপত্র’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

“মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধটিকে অব্যাহত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি, আমরা সেই বড়ো পৃথিবীর নিমন্ত্রণের পত্র পাইয়াছি।”^১

প্রায় দেড় বছর ভারতের বাইরে থাকেন, ইউরোপকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর চৈতন্যে গভীর প্রভাব ফেলে। ঐ প্রবন্ধ থেকে আরও কিছু কথা জানা যায়—

“আমাকে অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তুমি যুরোপে ভ্রমণ করিতে যাইতেছ কেন?... প্রয়োজন না থাকিলে মানুষ অকস্মাৎ কেন বাহিরে যাইবে এ প্রশ্নটা আমাদের দেশেই সম্ভব। বাহিরে যাইবার ইচ্ছেটাই যে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ একথাটা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কেবলমাত্র ঘর আমাদিগকে এত বাঁধনে এমন করিয়া বাঁধিয়াছে, চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইবার সময় আমাদের এত অযাত্রা এত অবেলা এত হাঁচিকটিকি এত অশ্রুপাত যে বাহির আমাদের পক্ষে অতন্ত্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ঘরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।”^২

আরও লিখেছেন যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে স্বীকৃত, তাহলে ইউরোপ ভ্রমণের কী দরকার দেশে তীর্থ করলে, সাধকসঙ্গ করলেই তো মুক্তি মিলবে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে পাঠকদের খেয়াল করিয়ে দেবেন যে প্রচলিত লজ্জে আধ্যাত্মিকতা বলতে যা বোঝানো হয় তিনি তার সঙ্গে একমত নন। তাঁর আধ্যাত্মিকতার ধারণার সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, নিয়ত পরিবর্তনশীল ভাবনা পদ্ধতি। পরে আরও স্পষ্ট করে লিখেছেন—

“যুরোপের আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব— তখনি এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।”^৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার কারণ ইউরোপ যাত্রী রবীন্দ্রনাথের ব্যকুলতা বোঝার জন্যে। এবং সেই সময়ে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অবস্থানটিও কেমন ছিল তা জানার জন্যে। আধুনিক ভাবনা চিন্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতাকে মিলিয়ে পড়ার চেষ্টাও করছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী বলতে বস্তুত ইউরোপ, আরও স্পষ্ট করে বললে পশ্চিম ইউরোপকে বুঝিয়েছেন। কেন ইউরোপই হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়পর্বে নিয়ে তা প্রশ্ন উঠতে পারে। এই পরিসরে তা আলোচ্য নয়, কেন পশ্চিম ইউরোপ বাঙালির ‘পৃথিবী’ হয়ে উঠল, তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের সম্পর্ক গভীর অভিনিবেশের দাবি রাখে।

যেখান থেকে আমরা যে ‘বড়ো’ ইউরোপ তাঁকে নতুন ভাবে দেখার প্রেরণা দিয়েছিল, পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল নতুন সাহিত্য ঘরানার সঙ্গে, জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে যার ভূমিকা কম নয়, সেই ‘বড়ো’ ইউরোপের ধারণার সঙ্গে তৎকালীন ইউরোপ ঠিক মিলছিল না।

পালটে যাওয়া ইউরোপ, যাকে ‘ছোটো’ ইউরোপ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে, ক্রমশ ধ্বস্ত করে দিতে থাকে রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যকে। ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপ থেকে ফিরে আসেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শুরুর হওয়ার আগের সময়ে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ঝগড়ায় মেতে ওঠা ইউরোপ কি রবীন্দ্রনাথের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল? কবির চৈতন্যে কি কোনো আলোড়ন তোলে নি? আগস্ট মাসে দেশে ফেরার কিছুদিন আগে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ—

“Therefore I must, without delay, go back to that obscurity where all living seeds find their true soil for germination.”^৪

মলিনা রায়ের তর্জমায়— “যত শীঘ্র সম্ভব, এখন তাই আমায় নির্জনতার আশ্রয় নিতে হবে। কেন না ফলবান বীজের অঙ্কুরোদগম, ক্ষেত্রের নিরালা অভ্যন্তরেই সম্ভব।”^৫ নিজের কবিতা/গান/আখ্যান সৃষ্টি নিয়ে কি এই কথা বললেন তিনি? সম্ভবত না। যদি স্রষ্টা/শিল্পী হিসেবে সে কথা বলেন তথ্যের বিচারে তা মান্যতা পায় না, কারণ এই ইউরোপ ও আমেরিকা প্রবাসে অনেককিছুই সৃষ্টি করেছেন কবি। সেপ্টেম্বর মাসে দেশে ফেরার পর আরেকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

“I have gone through a period of difficulty. My life had appeared to me lonely and burdened with responsibilities too heavy for a single man to bear.”^৬

তর্জমায়— “দেশে ফেরার পর যেন অবসাদের অন্তহীন কাল পার হলেম। জীবনটা বড়ো শূন্য এবং আমার একার পক্ষে গুরুতর দায়ভারগ্রস্থ ঠেকছিল।”^৭ রবীন্দ্রনাথে অবসাদ ও জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সমাপতিত করতে চাননি প্রশান্তকুমার পাল। তাঁর অভিমত, এর মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাস খুঁজতে যাওয়া তথ্যসম্মত হবে না।^৮ প্রশান্তকুমার

পাল অ্যান্ডরুজ, অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১-১৯৮৬) অভিমতের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁর যুক্তি অ্যান্ডরুজ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘মৃত্যুযন্ত্রণা’ ব্যক্তি অনুভূতির প্রকাশ। সমকালীন পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। তথ্যের ঘাটতি যদি এই সিদ্ধান্তের বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বিপরীতে এই যুক্তিও ওঠে নাকি যে এই যন্ত্রণা কেবলই ব্যক্তির অনুভূতি সে সম্পর্কেও যথেষ্ট তথ্য প্রমাণের অভাব আছে। আমরা প্রশান্তকুমার পালের অভিমতের সঙ্গে একমত নই। ‘প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উক্ত প্রবন্ধে অধ্যাপক চক্রবর্তী সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে মৃত্যুকীর্ণ যন্ত্রণা বোধ কবির চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে। কবির চৈতন্যে এই মৃত্যু ও বিষাদের বোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া।^৯ দেশে ফেরার পরেও অবসাদ/ডিপ্রেসন কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। ১৯১৪ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ রামগড়ে যান। *বলাকা*-র (১৯১৬) কয়েকটি কবিতাও সেই সময়ে রচিত হয়। *বলাকা* সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিজের মনের অবস্থার কথা রবীন্দ্রনাথ খোলামেলাই বলেছেন যে, চার-পাঁচটি কবিতা রামগড়ে থাকতে লিখেছিলেন। “তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল।”^{১০} (আন্ডারলাইন আমার) রামগড় যে মানসিক যন্ত্রণার ভোগ করেছেন তা প্রায় মৃত্যু তুল্য। এর হাত থেকে কোনো দিন নিষ্কৃতি পাবেন সে আশাও করেননি। অ্যান্ডরুজের জবানিতে জানা যায় যে, জুন মাসে তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খুবই ভালো ছিল। কিন্তু জুলাই মাসে আবারও পুরোনো অবসাদ, অন্ধকার তাঁর জীবনে ফিরে এলো। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ খারাপ ছিল তা নয় এবং স্কুলের কাজও চমৎকার চলছিল। কিন্তু এক মানসিক ক্রেশ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সুরুলে নির্জনে একা রইলেন অবসাদ কাটাতে। অ্যান্ডরুজ চিঠিতে জানিয়েছেন যে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের কোনো খবর

তখনো তাঁরা পাইনি। এমন-কি, শান্তিনিকেতনে এত নির্জনে তাঁরা ছিলেন যে এ বিষয়ে সম্ভাব্য আলোচনা বা কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত কানে আসে নি। অথচ কত আগেই রবীন্দ্রনাথের মন সেই ঘনিয়ে-আসা দুর্যোগের আশঙ্কায় ছেয়ে গেছে।^{১১} কবি তো অন্তর্যামী বা জ্যোতিষ নন। কীভাবে ভাবে বুঝলেন, অনুভব করলেন একথা? এর উত্তর লুকিয়ে আছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর ইউরোপ প্রবাসের মধ্যে। রামগড় থেকে অ্যান্ডরুজকে লেখা চিঠিগুলিতে দেখে নেবো কী লিখছেন রবীন্দ্রনাথ। ২১ মে, ১৯১৪ সালে লিখছেন—

“মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমায় যেতে হবে, সে আমি জানি। যে বেদনা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করেছে, ভগবান জানেন, তা মৃত্যুযন্ত্রণাই। নিজের পুরোনো সত্তাকে ত্যাগ করা খুবই কঠিন।”^{১২}

রবীন্দ্রনাথের শব্দ প্রয়োগ বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিতটি ধরিয়ে দেয় পাঠকদের। এর পরে আরও রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, আমাদের মা কিন্তু স্নেহ-সুকোমল নন। তিনি নির্মমতায় মিথ্যার সমস্ত জাল ছিন্ন করে দেন।^{১৩} এই চিঠি লেখার পরের দিন আরেকটি চিঠিতে লিখছেন অ্যান্ডরুজকে লিখছেন—

“আত্মার অবগাহন জলে নয়, আগুনে। জলে বাইরের মালিন্য ধোওয়া যায় বটে, কিন্তু যে বস্তু-স্তুপ জীবনকে আঁকড়ে ধরে থেকে তার আতিথ্যকে অবমাননা করে, তাকে তো সরানো যায় না। তাই মাঝে মাঝে আমাদের এই আত্মিক অগ্নিমান দরকার। অথচ সেই অগ্নিদাহের চিন্তাতেই আমরা শক্তিত হয়ে উঠি, সংকুচিত হয়ে পড়ি।”^{১৪}

এর পাশাপাশি *শান্তিনিকেতন* ভাষণাবলীর দিকে নজর ফেরালে এই কথার অনুরণন পাওয়া যাবে। এর পাশে আমরা সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের দুটি বক্তৃতার দিকে নজর ফেরাবো। ২০ শ্রাবণ, ১৩২১ব উপাসনা মন্দিরে সাপ্তাহিক বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

“স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে রিপুর আঘাতে আহত হয়ে... মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে। ... বিশ্বপাপের
যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর কর। মা মা হিংসীঃ। বিনাশ থেকে রক্ষা
করো।”^{১৫}

৯ ভাদ্র, ১৩২১ব আরেকটি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

“যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে ওঠে তখনই তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী
জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে তার রুদ্ধ আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক, বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব।”^{১৬}

এই বক্তৃতা/প্রবন্ধ ও চিঠির প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে *নবজাতক* কাব্যগ্রন্থের
কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথে লেখায় প্রায় একই রকমের প্রসঙ্গ উঠে
এসেছে। প্রায় এই বক্তৃতার মতোই রবীন্দ্রনাথ ‘প্রায়শ্চিত্ত’ কবিতায় লিখেছেন—

“ব্যাগু হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমছে লুণ্ঠের ধন।
দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল
ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল।
বিদীর্ণ হল ধনভান্ডারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার
কালনাগিনীর দল।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা।”^{১৭}

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১৭ আশ্বিন, বিজয়া দশমীর দিন এই কবিতাটি লেখা হয়েছে। লক্ষণীয় দুই বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়কাল রবীন্দ্রনাথের কাছে পাপ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। আর সেকারণে প্রয়োজন দহন যজ্ঞের, যা পৃথিবীকে পবিত্র করবে। আমরা *নবজাতক* কাব্যগ্রন্থটির শরণ নিলাম দুই বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময় কালে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের তুলনা করতে, এটা বুঝতে যে এই ঘটনা দুটি কবির চৈতন্যে প্রায় একই রকমের অভিঘাত তৈরি করেছিল। সেই অভিঘাত জন্ম দিয়েছিল প্রায় একই রকমের ইমেজের। অ্যান্ডরুজ ও অমিয় চক্রবর্তীর অভিমত ও অনুমান প্রশান্তকুমার পাল মানতে চাননি। এমনকি রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই অবসাদের কারণ হিসেবে হোমিওপ্যাথির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। পুত্র রবীন্দ্রনাথকে (১৮৮৮-১৯৬১) লেখা চিঠিটির শরণ নেবো। ১৯১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে লিখছেন—

“রথী কিছুদিন থেকে আমার মনের মধ্যে যে উৎপাত দেখা দিয়েছে সেটা একটা শারীরিক ব্যামো। ... প্রথম, কিছুকাল থেকেই আমার একটা nervous breakdown হয়েছে তার সন্দেহ নেই। ... যে কোনো কাজ করতুম অত্যন্ত জোর করে করতে হত। আর মনে মধ্যে একটা গভীর বেদনা ও অশান্তি অकारণে লেগেই ছিল।”^{১৮} (আন্ডার লাইন আমার)

এরপরেই শারীরিক ‘ব্যামো’, যা আদতে মনের বা বলা ভালো এক সংবেদনশীল চৈতন্যের অ-সুখ, সে সম্পর্কে সচেতন রবীন্দ্রনাথ বলবেন কানের ব্যথার জন্যে হোমিওপ্যাথি ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই এই অবসাদের কারণ। তা প্রমাণ করার জন্যে চিঠিতে *মেটেরিয়া মেডিকা* উদ্ধৃত করেছেন। ঐ চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, দিনরাত ‘মরবার ইচ্ছা’ তাঁকে ‘তাড়না’ করেছে।^{১৯} চিঠির শেষে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন—

“আমি deliberately suicide করতেই বসেছিলুম— জীবনে আমার লেশমাত্র তৃপ্তি ছিল না। যা কিছু স্পর্শ করছিলুম সমস্তই যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিলুম। এ রকম একেবারে উল্টোমানুষ যে কি রকম করে

হতে পারে এ আমার একটা নতুন exprience— সমস্তই একেবারে দুঃস্বপ্নের ঘনজাল।”^{২০} (আন্ডার লাইন আমার)

এই দীর্ঘস্থায়ী অবসাদ বা অ-সুখ, যা গুরুত্ব ইঙ্গিত মিলেছিল বিলেত থেকে ফেরার ঠিক আগে বন্ধু অ্যান্ডরুজকে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে। দেশে ফেরার কিছুদিন পরে সম্মানিত হন নোবেল পুরস্কারে। বিশ্ব জুড়ে স্বীকৃতির মাঝেও এই অবসাদ কেন? তথাকথিত সাফল্য ও স্বীকৃতির মাঝে কেন লিখছেন— “মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবেনা, আমার জীবনটাই যেন আগাগোড়া ব্যর্থ;— অন্যদের সকলের সম্বন্ধেই নৈরাশ্য এবং অনাস্থা।”^{২১} এই নৈরাশ্য, অবসাদ, আত্মহত্যার ইচ্ছা কেবলই ওষুধের প্রতিক্রিয়া? নাকি এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব ইউরোপ তথা বিশ্বের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, পরিস্থিতি? বস্তুত, আমাদের প্রস্তাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী পৃথিবী কবির চৈতন্যকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। কার্যত এই প্রশ্ন তার মনে তৈরি করে, যে মানবিক উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছেন ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির হাত ধরে, যা মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে, সেই ধারণা যখন ধ্বস্ত হতে থাকে তখন সংবেদনশীল শিল্পীর মনে এই সংকট তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে তাঁর দ্বারা কিছুই হয়নি। তিনি আদতে ব্যর্থ। চিঠির একেবারে শেষে রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন—

“সুরুলের ছাতে শান্ত হয়ে বসে আবার আমার চিরন্তন স্বভাবকে ফিরে পাবো সন্দেহ নেই— মৃত্যুর যে

গুহার দিকে নেবে যাচ্ছিলুম তার থেকে আবার আলোকে উঠে আসব কোনো সন্দেহ নেই।”^{২২}

সতত আশাবাদী রথীন্দ্রনাথ অবসাদের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে পারেন? মৃত্যু চিন্তাকে অতিক্রম করে ফেরত তাঁকে আসতেই হবে। কীভাবে মুক্তি পাবেন তিনি? কোথায় সেই ওষুধ? কবি, একজন বাবা, পারিবারিক মানুষ অভয় দিচ্ছেন প্রিয়জনকে “তোদের ভয় নেই এ আমি ছিন্ন করব”^{২৩}। সেই অভয়বাণীর মধ্যে বলে দিলেন “এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।”^{২৪}

রবীন্দ্রনাথ যতই বলার চেষ্টা করুন না কেন যে হোমিওপ্যাথির জন্যেই তাঁর এই সমস্যা, তিনি স্পষ্টত জানেন যে অ-সুখ, অবসাদের অন্যতম কারণ আদতে আপন ‘অন্তর’। বস্তুত, তা সংবেদনশীল শিল্পীর চৈতন্যের সংকট। সেকারণেই ওষুধও আছে নিজের কাছে। ফলত, রবীন্দ্রনাথ শরণ নেবেন শিল্পীসত্তারই, সৃষ্টি হবে *চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, বলাকা*। *চতুরঙ্গ*-ই তাঁর অ-সুখ, অবসাদ মুক্তির অন্যতম প্রতিষেধক। কেবল ‘আমি’-র মুক্তির থেকে বড়ো হয়ে উঠল ‘প্রচুরতম মানুষের প্রভুততম সুখসাধন’-এর মন্ত্র।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের বড়ো পালাবদল সূত্রপাত, যা কিনা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি বদলে দেয়। বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গে আসার আগে অন্য প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার। উনিশ শতক মানবসভ্যতার বিপুল অগ্রগতির সময়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ‘গণতন্ত্র’-এরও উন্মেষের কাল। মানুষ একে একে সন্ধান পেল বাষ্প শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি এবং পারমানবিক শক্তির যা মানুষের দেখার জগৎকে নিমেষে বদলে দিল। কী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কী মানব অধিকারের প্রশ্নে সভ্যতার বিরাট উল্ফনের কাল। তা স্থায়ী হয় নি, অচিরেই ১৯১৪-র বিশ্বযুদ্ধ মানুষের বিশ্বাস, আস্থা, ভরসা ভেঙ্গে ফেলে। পৃথিবীকে দেখতে শুরু করে নতুন করে। ঈশ্বরের কল্যাণময় সত্তা নিয়ে সংশয়ী হয়ে পড়ে মানুষ। এ কথার অর্থ এই নয় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অবধি ঈশ্বর বিশ্বাস অটুট ছিল, দর্শনচর্চা-জ্ঞানচর্চার পরিধিতে সংশয়ের জন্ম অনেককাল আগেই, আখ্যানের রাজ্যে এই তার প্রথম পদার্পণ, অন্তত বাংলা সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম নাস্তিক (ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রশ্নে) সৃষ্টি ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে কী কোনো সম্পর্ক আছে? জ্যাঠামশাইয়ের চরিত্র হয়ে ওঠা কী নিছক সমাপতন? এই বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা

নজর দেবো সবুজ পত্র-এর পাতায়। আমরা দেখে নেবো কী কী লেখা প্রকাশিত হয়েছিল সবুজ পত্র-এ। ১৩২১ ভাদ্র সংখ্যায় ‘ইউরোপে কুরুক্ষেত্র’ শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন প্রমথ চৌধুরী। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ‘বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ’ শিরোনামে আরেকটি প্রবন্ধ লিখছেন প্রমথ চৌধুরী। ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে ‘জ্যাঠামশাই’। এরপরে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের তিনটি লেখা ‘লড়াইয়ের মূল’, ‘খৃষ্টধর্ম’, এবং ‘শচীশ’। মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় যথাক্রমে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ‘দামিনী’ ও ‘শ্রীবিলাস’ অংশটি। আমরা ‘খৃষ্টধর্ম’ প্রবন্ধটির দিকে যদি নজর রাখি তাহলে দেখতে পাবো মানুষের ব্যথা, জাগতিক দুঃখ, পাপ, যুদ্ধ নিয়ে কিছু কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে বলছেন— অন্নবস্ত্রের ক্লেশ সহ্য করা সহজ। কিন্তু নিজের ভিতরে আপন বড় ‘আমি’ কষ্ট পাচ্ছেন প্রকাশের অভাবে, তা কি মানুষ সহ্য করতে পারে? তারপরে বলবেন— মানুষের ইতিহাসে এত যুদ্ধ কেন?^{২৫} কীভাবে ব্যথা মুক্ত হবে মানব? রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

“এই ব্যথা যখন মানুষের মধ্যে এত সত্য তখন নিশ্চয়ই তার ঔষধ আছে। সে ঔষধ কোনো স্নানে পানে বাহ্যিক কোনো আচারে অনুষ্ঠানে নয়। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কেমন কোরে বাধাহীন হতে পারে, যাঁরা মহামানুষ তাঁরা আপন জীবনের মধ্যে দিয়ে তাই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।”^{২৬}

কিংবা ঐ প্রবন্ধের অন্যত্র লিখছেন— “মানুষ আপনার চেয়ে আপনি বড়; সেই জন্যে মানুষ মৃত্যুকে দুঃখকে ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করতে পারে।”^{২৭} প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য হাজির করেছেন। তাঁর বক্তব্য তুলে দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথ শেষ করছেন এই বলে—

“মানুষের মধ্যে মানুষের এই যে বড় আবির্ভাব, যিনি মানুষের হাতের সমস্ত আঘাত সহ্য করছেন, এবং যাঁর সেই বেদনা মানুষের পাপের একেবারে মূলে গিয়ে বাজছে, এই আবির্ভাব ত ইতিহাসের বিশেষ কোনো একটি প্রান্তে নয়। সেই মানুষের দেবতা মানুষের অন্তরেই—তাঁরই সঙ্গে বিরোধেই

মানুষের পাপ, তাঁরই সঙ্গে যোগেই মানুষের পাপের নিবৃত্তি। মানুষের সেই বড়, নিয়ত আপনার প্রাণ উৎসর্গ কোরে, মানুষের ছোটোকে প্রাণদান করছেন।”^{২৮}

চতুরঙ্গ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেন আমরা রবীন্দ্রনাথের ‘খৃষ্টধর্ম’ প্রবন্ধটি থেকে উদ্ধৃতি দিলাম? তার একটি কারণ এই যে প্রবন্ধটি ‘জ্যাঠামশাই’, ‘শচীশ’ লেখার সমকালীন বলে। অন্য কারণ এই লেখার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধ, দুঃখ, ব্যথা বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হাজির করেছেন, যার সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত অ-সুখ, অবসাদ উত্তোরণের স্পষ্ট যোগ লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ব্যথার ওষুধ খুঁজে পাচ্ছেন মানুষের চৈতন্যের মধ্যে। কারণ এ ব্যথার উৎস শরীর নয়, চৈতন্য। সেকারণেই চৈতন্যের শুশ্রূষা প্রয়োজন। হয়তো অবসাদের একটা কারণ হোমিওপ্যাথি, কিন্তু তা একমাত্র কারণ নয়। আমাদের বিনীত প্রস্তাব ঐ মুহূর্তের বিশ্ব পরিস্থিতি, মানবতার লাঞ্ছনা তাঁকে ব্যথিত করে। শিল্পীর সংবেদনশীল চৈতন্য শারীরিক ক্লেশ সহ্য করতে পারে, কিন্তু অন্তরে কষ্ট তাঁর পক্ষে অসহনীয়। পৃথিবী ব্যাপী অ-সুখের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ কল্যাণময় ঈশ্বরের কাছে ফিরতে পারবেন না। বিমূর্ত ঈশ্বর আছেন না নেই? সেই নিয়ে তর্ক করবেন না। বরং সেই ঈশ্বরের আশ্রয় নেবেন যিনি আছেন মানুষের মধ্যে, মানবিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। বস্তুত, মানুষই (Man) তাঁর ঈশ্বর, সেই তার প্রাণ উৎসর্গ করে পৃথিবীকে করে তুলবে মানবিক। আমরা বিশেষ ভাবে স্মরণ করবো ‘খৃষ্টধর্ম’ প্রবন্ধটির শেষ বাক্য। “রূপকের আকারে এই সত্য খৃষ্টধর্মে প্রকাশ হচ্ছে।”^{২৯} রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম কী রূপকের আকারে জাগতিক পৃথিবীর কথাই বলে? রূপকের মোড়ক সরিয়ে নিলে হয়তো পরে থাকে আঁকাড়া বাস্তব জগত। সেই বাস্তব জগতের কথাই লিখতে চেয়েছেন চতুরঙ্গ-এর পাতায়। অবসাদ, অ-সুখ যা তাঁকে প্রায় আত্মহত্যার মুখোমুখি হাজির করে তা কী হোমিওপ্যাথি ওষুধের জন্যে? সমকালীন সময়, রাজনীতি, মানবিক যুক্তির পরাজয় চালিত করে বিষাদের অভিমুখে। সুরুলের

ছাতে শান্ত হয়ে চিন্তা করতে করতে সেই বিষাদ, ব্যথা, অবসাদ, অ-সুখ মুক্তির ওষুধও খুঁজে পান মানুষতার মধ্যে। সে জন্যে চতুরঙ্গ বারেবারে ফেরত আসে ‘বড়’ মানুষের কথা নিয়ে, যে আপনার মধ্যে দিয়ে অপর মানুষের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে। যে মানুষ প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম দুঃখ, ‘ব্যথা’ নিয়ে ভাবিত।

লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১) তাঁর *The Theory of The Novel* (১৯১৬) বইয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন,

“The novel is the epic of a world that has been abandoned by God. The novel hero's psychology is demonic; the objectivity of the novel is the mature man's knowledge that meaning can never quite penetrate reality, but that, without meaning, reality would disintegrate into the nothingness of inessentiality.”^{৩০}

উপন্যাস সেই পৃথিবীর মহাকাব্য, যে পৃথিবী ঈশ্বরহীন কিংবা ঈশ্বর পরিত্যক্ত পৃথিবীর মহাকাব্য হলো উপন্যাস। চতুরঙ্গ (১৯১৬) প্রসঙ্গে এই কথাগুলো কেন আমরা বলছি? লুকাচ হয়তো মহাকাব্য শব্দটি আক্ষরিক/টেকনিক্যাল অর্থে ব্যবহার করেন নি। কিন্তু উপন্যাসকে লুকাচ গ্রহণ করেছেন আধুনিক পৃথিবীর মহাকাব্য হিসেবে। মানুসিক যন্ত্রণা, সংকট এবং তা উত্তোরণের আকাজক্ষা লিপিবদ্ধ হয় উপন্যাসে। আমাদের মহাকাব্য *রামায়ণ* রচনার প্রেরণা শোক। সেই বেদনাই প্রণোদনা জুগিয়েছে শোককে অতিক্রম করতে। আর সেখানে রয়েছে পাপপুণ্যের ধারণা। যার ফলে জুটবে নরকবাস কিংবা স্বর্গীয় সুখ। সেখানে আধুনিক রাষ্ট্রীয় বিচারে পাপের ধারণা নেই। রাষ্ট্র জন্ম দিয়েছে নতুন ধারণার, অপরাধ ও শাস্তি, কে করবে তার বিচার? ঈশ্বর? বিচার করবে রাষ্ট্র, ইহকালেই মিলবে কৃতকর্মের ফল। ফলে আধুনিক শিল্পীর সৃষ্টির কেন্দ্রে আছে বিষাদ, ঐশ্বরিক আশাবাদের বদলে মানবিক সংকট ও সংকট উত্তোরণেই তার

আগ্রহ। যে বিষাদ আধুনিকতার ফসল। বলা ভালো আধুনিকের অর্জন। ঐশ্বরিক মহত্ত্ব অপেক্ষা মানবিক ব্যথাই হয়ে ওঠে আখ্যানের বিষয়। লুকাচের এই মন্তব্যটিকে মাথায় রাখবো রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ উপন্যাসটি পড়ার সময়।

দীর্ঘকাল এই উপন্যাসটি পাঠক, সমালোচকদের ও পণ্ডিত ভাবিয়েছে, আলোড়িত করেছে। তাদের মধ্যে মতের মিল যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমন অমিলও কম নয়। আমরা থিম্যাটিক দিক থেকে উপন্যাসটিকে সমালোচকেরা কীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তা বোঝার চেষ্টা করবো। সেই সূত্র ধরে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিয়ে সমালোচকদের বিভিন্ন মত পর্যালোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* নামে অসামান্য বই লেখেন। সেখানে চতুরঙ্গ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা শুরু করেছেন এই বলে—

“রবীন্দ্রনাথের শেষ-যুগের উপন্যাসসমূহের মধ্যে চতুরঙ্গ (১৯১৬) সর্বাপেক্ষা আংশিকত্বের (fragmentary) লক্ষণাক্রান্ত, ইহার অন্তর্নিহিত সমস্যাটি ভাবগভীরতার পরিবর্তে লঘু ও দ্রুতসঞ্চারী চটুলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে।”^{৩১}

তাঁর অভিমত এই উপন্যাসটির গতি, উত্থান-পতন, অকারণ বাঁক বদল ‘খেয়ালী শিশুর লীলাচাপল্যের’ মতন। এই উপন্যাসে গভীরতর নিয়মের লক্ষণ খুঁজে পাননি তিনি। উপন্যাসিকের দায়িত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ অপেক্ষা কবি কল্পনার চাপল্য অনুভব করেছেন। অথচ, তাঁর কাছে কবিত্বের অতর্কিত বিকাশের মুহূর্তগুলিই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ! শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই বইটি উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। সে কথাই হয়তো ঘুরিয়ে বলতে

চেয়েছেন। উপন্যাসের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন দামিনীর ভাব পরিবর্তনকে। শচীশের সম্পর্কে আলোচনা করলেও, তার আচরণ ও ভাব পরিবর্তন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। একথায় স্পর্ধা প্রকাশিত হতে পারে তবুও বলা দরকার যে, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চতুরঙ্গ-এর প্রতি সুবিচার করেননি।

২) সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*-এর চতুর্থ খণ্ডে *চতুরঙ্গ* নিয়ে আলোচনার শুরুতে লিখেছেন—

“রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে চতুরঙ্গের রচনা সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ ও শিল্পনিপুণ। ইহাতে অধ্যাত্মসাধনার গভীর কথা যেমন সহজভাবে ও অনায়াসে বলা হয়েছে তেমন আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না (বোষ্টমী গল্পটি ছাড়া)।”^{৩২}

সুকুমার সেন লিখেছেন, রসসাধনার রসাল দিকটির বিপদ সম্পর্কে সচেতন করেছেন রবীন্দ্রনাথ; পাশাপাশি দেশের লোক দেখানো স্বার্থপর হৃদয়হীন জনসেবার হীনতাও চিত্রিত হয়েছে। সুকুমার সেনের জনসেবা প্রসঙ্গে করা মন্তব্যটির সঙ্গে একমত হওয়া কিঞ্চিৎ কঠিন। ‘স্বার্থপর’ ‘হৃদয়হীন’ জনসেবার নমুনা *চতুরঙ্গ*-এ কীভাবে সুকুমার সেন পেলেন তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মেলে না। এরপর ‘জ্যাঠামশায়’ অংশটি ও জগমোহন সম্পর্কে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—

“চতুরঙ্গের প্রথম অঙ্গ ‘জ্যাঠামশায়’ সবচেয়ে স্বসম্পূর্ণ। শচীশের জ্যাঠামশায় জগমোহনের ভূমিকা এইখানেই সমাপ্ত। কেবল শচীশের অন্তরে তাঁহার শিক্ষা এবং প্রভাব শেষ অবধি কাজ করিয়া গিয়াছে।”^{৩৩}

প্রথমত, এই বাক্য দুটি থেকে উঠে আসা সিদ্ধান্ত বাস্তবিকভাবেই পরস্পর বিরোধী। জ্যাঠামশায়ের ভূমিকা প্রথম অঙ্গে সমাপ্ত হলে তা শচীশকে কীভাবে প্রভাবিত করবে? দ্বিতীয়

সিদ্ধান্ত বাক্যটি প্রথম সিদ্ধান্ত বাক্যটিকে নাকচ করে দেয় না কি? দ্বিতীয়ত, জ্যাঠামশাইয়ের শিক্ষা ও প্রভাব শেষাঙ্গি যার মধ্যে বহমান ছিল সে শ্রীবিলাস। আমাদের বিচারে প্রথম অংশেই জ্যাঠামশাইয়ের ভূমিকা সমাপ্ত হয়নি বরং গোটা উপন্যাসেই ফল্গুধারার মতো বহমান ছিল। বস্তুত, জ্যাঠামশাই উপন্যাসের ভিত্তি। পরে এই প্রসঙ্গে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো। চতুরঙ্গ নিয়ে আলোচনা সমাপ্ত করতে গিয়ে সুকুমার সেন আরেকটি মন্তব্য করেছেন যা তাঁর পূর্ব বক্তব্যকে কার্যত নস্যাৎ করে। তাঁর মতে, চতুরঙ্গ অনেকটা দাবাখেলার মতো— চারজনের মধ্যে; শচীশ, দামিনী, লীলানন্দ-স্বামী ও শ্রীবিলাস। আর জগমোহনকে তিনি চিহ্নিত করেছেন সেই খেলার ‘বাজী বা ঠাকুর (অর্থাৎ stake)’, বাকিরা ‘দাবার ঘুটি’ মাত্র।”^{৩৪} তিনিও শচীশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উপন্যাসটিকে পড়তে চেয়েছেন।

৩) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অসামান্য বই *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*-এ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ খারিজ করেছেন। তাঁর বয়ানেই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করবো। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

“বরঞ্চ নায়ক-নায়িকার জীবনের দিকে তাকালে ‘চতুরঙ্গ’ আখ্যার তাৎপর্য বোঝা যায়। এবং সেদিক দিয়ে জগমোহন অংশটি অনাবশ্যক দীর্ঘ— তার উত্তর মেলে। বইখানির প্রধান পাত্র-পাত্রী শচীশ ও দামিনী। শচীশের জীবনের সুস্পষ্ট চারটি পর্যায়। জ্যাঠামশাই, লীলানন্দ, দামিনী, সর্বোত্তীর্ণ অবস্থা। দামিনীর জীবনেও অনুরূপ চারটি ভাগ বা পর্যায়— গুরু লীলানন্দ, গুরু বিদ্রোহ, শচীশ এবং শ্রীবিলাস। ‘চতুরঙ্গ’ নাম এই দিক দিয়ে সার্থক।”^{৩৫}

তিনিও উপন্যাসটিকে পূর্বজন্মের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণের সুক্ষতা ও ব্যাপ্তি আমাদের মুগ্ধ করে। তবে, তাঁর মতের সঙ্গে আমাদের সবিনয় পার্থক্য থাকবে।

৪) সৈয়দ আকরম হোসেন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেতনালোক ও শিল্পরূপ-এ আলোচনা শুরু করেছেন সমকালীন পরিস্থিতির উল্লেখ করে। মূলত তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন— এক, রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য ভ্রমণ। দুই, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। তিন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই তিনটি ঘটনার উল্লেখ করে যে সিদ্ধান্তের উপনীত হচ্ছেন তার সঙ্গে আমাদের অমিলই বেশি। সৈয়দ আকরম হোসেন লিখছেন—

“প্রাক-যুদ্ধকালীন ইউরোপীয় বেগবান জীবনমূল থেকে আহৃত এবং চেতনায় লালিত নবতর বীজশক্তির শিল্পিত বিকাশে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি, নিঃসন্দেহে অনুকূল মানসিক আবহাওয়া সৃজন করেছিল।”^{৩৬}

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত বক্তৃতার দিকে নজর দিলে দেখতে পাবো অনুকূল তো নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী অ-সুখ, অবসাদ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সাথী। এই যুক্তি উঠতে পারে যে বেদনা, অ-সুখ কিংবা অবসাদই হয়তো প্রণোদনা জুগিয়েছে নতুন সৃষ্টিতে। যা কিনা অ-সুখ, অবসাদ মুক্তির উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছেন কবি। তবে সৈয়দ আকরম হোসেনের অভিমত দেখে সে কথা বোঝার উপায় নেই। উনি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করলেও এড়িয়ে গেছেন সেই পরিবেশ, প্রেক্ষিত যা রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যে প্রভাব ফেলেছিল। কী ভাবে ধ্বস্ত করে কবিকে? সৈয়দ আকরম হোসেনের ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে মুখ্যত শচীশ, সেই সূত্রে দামিনীকেও গুরুত্ব দিয়েছেন।^{৩৭} তাঁর মতে শচীশ ও দামিনীর দ্বন্দ্ব মুখর পথ চলা উপন্যাসটিকে শিল্পিত করে তুলেছে। আরও মন্তব্য করেছেন— এ উপন্যাস শ্রীবিলাসের ট্রাজেডি।^{৩৮} পূর্বে উক্ত সমালোচকদের তুলনায় শ্রীবিলাসের জন্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কাহিনি সমাপ্তিতে তার অবস্থাও বিশ্লেষণ করেছেন। দামিনী কলকাতায় চলে আসে শ্রীবিলাসের সঙ্গে। সেখানেই তাদের পরিণয়। সেই স্বল্প স্থায়ী দাম্পত্য জীবনের শেষে শ্রীবিলাসের জুটল নৈঃসঙ্গ আর শূন্যতা। আকরম হোসেন বলছেন—

“শ্রীবিলাসের অধ্যাত্মলোক নেই, ঈশ্বর নেই; তার দামিনীও রইল না। এমন সীমাহীন শূন্যতায়, বহুস্তরীভূত বেদনায় রবীন্দ্রনাথ আর কোনো চরিত্রকে নিক্ষেপ করেননি। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জীবনের দ্বিমুখী বঞ্চনার ট্রাজেডিকেই ‘চতুরঙ্গে’- প্রথম শিল্পময় করেন।”^{৩৯}

নিশ্চিতভাবেই এই বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের সামনে হাজির করে। শ্রীবিলাসের জীবনে আকরম হোসেন কেবল শূন্যতাই লক্ষ করেছেন, কিন্তু শচীশ কী পেল? ‘দামিনী’ অংশের ‘পরিশিষ্ট’ সাক্ষ্য দেয়— শচীশের ধ্রুব সত্য খুঁজে পাওয়াকে নিয়ে কথক খানিক বাঁকা মন্তব্যই করেছেন। সে কী পেল আর কী পেল না ঠিক বোঝা গেল না। শ্রীবিলাস কি সত্যি নিঃসঙ্গ? দামিনী তার জীবনে সত্য, কিন্তু একমাত্র সত্য কি? দামিনী ‘পদ্মপাতায় জলকণা নয় কেবল’, সত্য। এই উপলব্ধি বস্তুত পক্ষে পার্থিব জগতের সত্যতাকে প্রকাশ করে। কী রইল বিষণ্ণ, ব্যথাতুর শ্রীবিলাসের? মানুষ।

৫) বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭৪) *রবিতীর্থে* বইয়ের দুটি লেখার কথা উল্লেখ করবো। পূর্বে উল্লেখিত সমালোচকদের লেখাগুলি প্রধানত জ্ঞানচর্চার জগতের বিষয়। কিন্তু বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দুটির মুখ্য উদ্দেশ্য তা নয়, এর পেছনে সামাজিক, রাজনৈতিক ভাবনাও কাজ করেছে। তবু কেন সেদুটির শরণ নিচ্ছি? কারণ এই যে, এর সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি লেখেন। যার বিশেষ গুরুত্ব আছে। ‘জ্যাঠামশায়’ প্রবন্ধে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় নাস্তিকতার সূত্র ধরে সমালোচনা করছেন হরিমোহনদের মতো ধার্মিকদের ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের।^{৪০} ‘চতুরঙ্গের রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক প্রবন্ধে রামকৃষ্ণ পরমহংসের উদার ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করছেন। যদিও উভয়ের দেখার মধ্যে তুলনা চলে না। কিন্তু তাঁর দেখাও মূলত শচীশ কেন্দ্রিক। যে ‘পরম সত্যকে’ রবীন্দ্রনাথ খুঁজছিলেন শচীশের মাধ্যমে তাকেই পাঠকের দরবারে হাজির করেছেন।^{৪১} কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে বিজয়লাল

চট্টোপাধ্যায়ই সম্ভবত প্রথম জ্যাঠামশাই চরিত্রটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চান। তাঁর শচীশ কেন্দ্রিক বয়ানের মধ্যেও জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে রয়েছে পরম মমতা। ক্ষেত্র বিশেষে একথা বলেছেন— “জ্যাঠামহাশয়ের কণ্ঠে এ বাণী কি রবীন্দ্রনাথেরই বাণী নয়?”^{৪২} রবীন্দ্রনাথের পরম মমতা মাখা চরিত্র যে জ্যাঠামশাই সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর দুটি লেখা মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ভালোলাগার কথা জানিয়েছেন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে। দেশ পত্রিকায় বিজয়লালের প্রবন্ধ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখছেন— “দেশ-এ চতুরঙ্গ জ্যাঠামশাইয়ের যে চরিত্র আলোচনা করেছ পড়ে ভালো লাগল।”^{৪৩} রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ও দার্শনিক প্রত্যয়ের কথা খেয়াল রেখেও বলেছেন, জ্যাঠামশাইয়ের নাস্তিক্য ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্র দর্শনের একটা যোগসূত্র ছিল।

৬) অশ্রুকুমার শিকদার *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস-এ চতুরঙ্গ* ও রবীন্দ্র উপন্যাস প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য করে করেছেন। সে দিকেই নজর ফেরাবো। তাঁর বিচারে—

“রবীন্দ্রনাথ তো বাস্তবপন্থী উপন্যাস লিখতে চাননি— তা চাইলে তিনি চরিত্রগুলোর চারপাশে ‘framework of a stable society’ গড়ে তুলতেন। তাঁর বিষয় ‘আইডিয়া জিনিসটা’। যে উপন্যাসের বিষয় চরিত্রের বিবর্তন বিকাশ বা ত্রিভুজসমস্যার জটিলতা দেখানো নয়, রেনেসাঁসের যুক্তিবাদের সারবত্তাহীনতা দেখানো— সেই উপন্যাসে, বিষয়ের অনুরোধেই বাস্তব পরিবর্তনের ন্যায়যুক্তিসংগত সোপানগুলো যে স্বেচ্ছায় গোপন করা হয়েছে এ কথা বুঝলে ‘চতুরঙ্গ’ের বিরুদ্ধে আংশিকতার অভিযোগ উঠত না, উঠত না পাগলা হাওয়া বা পাতলা হাওয়ার কথা।”^{৪৪}

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অশ্রুবাবু। কিন্তু তাঁরও পড়ার কেন্দ্রে রয়েছে শচীশ। তাঁর মতে,হ্যাঁ ও না-এর দ্বন্দের মধ্যে দিয়ে এই উপন্যাস এগিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই দ্বন্দ্ব সিনথেসিসে রূপান্তরিত হয়েছে এই তাঁর সিদ্ধান্ত। প্রাক্তন

নাস্তিক খুঁজে ফিরছে কাকে বলে আস্তিকতা। ইতি-নেতির ডায়ালেকটিকের মধ্য দিয়ে এই বোধির সিন্থেসিসে উত্তীর্ণ হওয়াটাই ‘চতুরঙ্গ’র থিম।^{৪৫} গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, নিশ্চিত ভাবেই তা চতুরঙ্গ পড়ার অনেকগুলি দিক ধরিয়ে দেয়। কিন্তু উপন্যাসের প্রধান থিম কী এই প্রশ্নে পূর্বজন্দের সঙ্গে তাঁর খুব একটা মতপার্থক্য নেই। তিনি ভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন মাত্র। থিসিস, অ্যান্টিথিসিস এবং সিন্থেসিস এই পদ্ধতির প্রসঙ্গ আছে অশ্রবাবুর লেখায়। দর্শনের এই বিশেষ পদ্ধতিটি হেগেলিয় ধারণা হিসেবে পরিচিত। যদিও হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) ব্যবহৃত শব্দগুলি ছিল কনক্রিট, এবস্ট্রাক্ট, এবসিলিউট। পরবর্তী কালে কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডরিখ এঙ্গলসের (১৮২০-১৮৯৫) লেখায় এই প্রসঙ্গ এসেছে। মুখ্য বক্তব্য হলো দুটি বিপরীত ধর্মী ভাবনার সংঘাতে তৃতীয় একটি ভাবনার জন্ম। অশ্রবাবু সিন্থেসিস বলে যেখানে থেমেছেন ঘটনার গতি কিন্তু সেখানে থেমে থাকেনি। বরং চতুরঙ্গ-এর শেষে শচীশের বাহ্যিক ও আদর্শগত অনুপস্থিতি বেশ স্পষ্ট। শ্রীবিলাসই প্রধান হয়ে উঠছে। আর উপন্যাসের ‘পরিশিষ্ট’ অংশটির দিকে নজর দিলে দেখতে পাবো ‘হাঁ’ ও ‘না’-এর দ্বন্দ্ব শচীশ কোথায় পৌঁছালো। উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। “সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল— কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না।”^{৪৬} থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের দ্বন্দ্ব যে নতুন ধারণাটি তৈরি হয়, শচীশের শেষ অবস্থান থেকে খুব স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। বোধির উত্তরণ বিষয়েও পাঠক স্পষ্ট আন্দাজ পায় না। দর্শনের লজ্জে খানিক অজ্ঞেয়বাদী অবস্থান। এক সময়ে সে ঈশ্বর মানে নি, লীলানন্দ স্বামী শিষ্যত্ব তাকে আস্তিক করে তোলে। তৃতীয় পর্বে সে অরূপের সন্ধান রত। প্রথম দুই পর্বে থেকে তৃতীয় পর্বে একটা বদল লক্ষ করা যায়। এখন সে গুরু বা পথপ্রদর্শকের সান্নিধ্য বিনা একাই সাধনা রত। কিন্তু তার মৌল অবস্থান কী? তা খুব স্পষ্ট নয়।

৭) এবার আমরা নজর দেবো উদয়কুমার চক্রবর্তীর লেখা *চতুরঙ্গঃ সাধক কবির আলোচনা* নামক বইটির দিকে। উক্ত বইয়ের মুখ্যত দুটি প্রবন্ধই আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। ‘চতুরঙ্গঃ এতো বেদন হয় কি ফাঁকি!’ এই প্রবন্ধে চতুরঙ্গ-র শচীশ ও দামিনীর সঙ্গে রক্তকরবী-র রঞ্জন ও নন্দিনীর তুলনা করেছেন। তাঁর ভাবনায় আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বিক অবস্থানের কথা আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন— “বিশু পাগল এবং শ্রীবিলাস অন্ধকারে উপেক্ষিত থেকে গেছে।”^{৪৭} তাঁর ভাবনা কেন্দ্রে শচীশ। ‘বিধবা প্রেতিনীর কান্নাঃ চতুরঙ্গে নাস্তিকতা এবং নিষ্ঠুরতা’ শীর্ষক লেখায় এই উপন্যাসের নায়ক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

“শ্রীবিলাসের চরিত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। অথচ শচীশ নিজেকে ভাঙচুর করে একটা পরিণতির পথে যেতে ব্যস্ত। এছাড়া, শ্রীবিলাস শচীশের মতো কোনো মহৎ উপলব্ধি লাভ করেনি। সুতরাং উপন্যাসে নায়কচিত্র যোগ্যতা শচীশেরই বেশি; এটা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হব।”^{৪৮}

প্রায় একই রকম মন্তব্য করেছেন ‘চতুরঙ্গঃ এত বেদন হয় কি ফাঁকি!’ প্রবন্ধে। মন্তব্য করেছেন, চতুরঙ্গ উপন্যাসে শ্রীবিলাস শেষ পর্যন্ত কোনো পরিণতি পায় না। দামিনীর স্মৃতিটুকু সম্বল করে শ্রীবিলাসের এই বসে থাকা— যেন নেশার মতো; যা শ্রীবিলাসকে জড়বৎ করে দেয়।^{৪৯} এই অভিমতটি অভিনিবেশের দাবি রাখে, পরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমাদের প্রস্তাবের সঙ্গে অমিলগুলি উল্লেখ করার চেষ্টা করবো।

৮) এবার আমাদের আশ্রয় *দেবদাস জোয়ারদার রচনাসমগ্র* ১ বইটি। ঐ বইয়ে ‘রবীন্দ্রভুবনে বিশ্বাস ও নাস্তিক্য মেরু’ শীর্ষক প্রবন্ধটি আমাদের আলোচ্য। প্রবন্ধটি লেখায় হয় *বসুমতী* পত্রিকায় প্রকাশিত রমাপ্রসাদ চন্দ্রের ‘মানবধর্মের মর্মকথা’ প্রবন্ধটির সমালোচনার সূত্রে। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক ঈশ্বর ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে চতুরঙ্গ উপন্যাসটির কথা উঠে এসেছে। মুখ্যত জ্যাঠামশাইকে নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন। জ্যাঠামশাইয়ের আদর্শ

গড়ে বেহুামের হিতবাদ ও কোঁতের ধ্রুববাদের উপকরণে। তিনি বলেছেন জ্যাঠামশাই রবীন্দ্রনাথের হাতে পরম শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলে ঔপন্যাসিক ভুলে যাননি “যে জগমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ মনে গুঢ় অনুভবের দিকটি উপেক্ষিত ছিল”^{৫০}। ননিবালার বিবাহ বা আত্মহত্যার আগে যখন জ্যাঠামশাইয়ের আশীর্বাদ চায়, তখন জগমোহন বলেন— মা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বুড়ো বয়সে তুমি এই ‘নাস্তিক’কে ‘আস্তিক’ করে তুলবে। জ্যাঠামশাই আশীর্বাদে সিকি-পয়সা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ননিবালার ওই মুখখানি দেখলে তাঁরও আশীর্বাদ করতে ইচ্ছা করে।^{৫১} এই বাক্যগুলি থেকে দেবদাস জোয়ারদার সিদ্ধান্ত টানলেন যে, মানবধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাসের কোনো বিরোধ নেই বলেই তাঁর ধারণা ছিল। ‘বরং জগৎ ও জীবনের প্রতি অপার ভালোবাসাই তাঁকে ঈশ্বরবিশ্বাসী করে তুলেছে’। কেননা ভালোবাসার মধ্যে তিনি ‘চিরকাল এক রহস্য’ অনুভব করেছেন।^{৫২} এই সিদ্ধান্ত বাক্যগুলিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো— এক, জ্যাঠামশাইয়ের যুক্তিনিষ্ঠ মনে অনুভূতির অভাব লক্ষ্য করেছেন। দুই, মানবধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাসের কোনো বিরোধ তাঁর বিচারে নেই। তিন, জগৎ ও জীবনের প্রতি ভালোবাসাই তাঁকে ঈশ্বর বিশ্বাসী করে তুলেছে। চার, ভালোবাসার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অপার রহস্য অনুভব করেছেন। যুক্তিবাদ ও অনুভূতির মধ্যে বিরোধের সম্পর্ক দেখছেন দেবদাস জোয়ারদার। চলতি ভাষ্যে এমনটাই বলা দস্তুর যে, যুক্তিবাদী কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সেখানে অনুভূতির স্থান নেই বললেই চলে। যেন একটির আশ্রয় মানুষের বুদ্ধির কাছে অপরটির আশ্রয় মন নামক অপার কুহক ঘেরা রাজ্য। অনুভূতিও একটি যুক্তিগ্রাহ্য বুদ্ধি নির্ভর বিষয়। তা নির্ভর করে একজনের অপর সম্পর্কে অভিজ্ঞতার উপর। কেন এই অনুভূতি অপর সম্পর্কে তৈরি হচ্ছে তার পেছনে নিদিষ্ট কার্যকারণ সম্বন্ধ রয়েছে। জগৎ জীবনের প্রতি ভালোবাসা যদি ঈশ্বর বিশ্বাসের কারণ হয়, তবে ঈশ্বর

‘পরম’, ‘অরূপ’ কোনো সত্তা নন। নিতান্তই জাগতিক মানবিক বিষয়, অর্থাৎ জ্যাঠামশাইয়ের ভাষায় যাকে ছোঁয়া যায়, ধরা যায়, অনুভব করা যায়। অথচ উপন্যাসে দেখা যায় শচীশ অরূপের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজছে। সে ঈশ্বর কল্পনার অতীত, এমনকি শচীশও যে তার সন্ধান পেয়েছে তা স্পষ্ট নয়। ননিবালার প্রতি স্নেহ, ভালোবাসাকে যুক্তিবাদী নাস্তিকের পরাভব হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তা আদতে যুক্তির পরাভব নয়, বরং স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসার প্রকাশ। বস্তুত, এখানে প্রকাশিত হয়েছে জ্যাঠামশাইয়ের অনুভূতিপ্রবণ সত্তা। জ্যাঠামশাইয়ের জাগতিক কর্মকাণ্ডের পেছনে মানবিক অনুভূতির প্রণোদনা ছিল সে বিষয়ে সমালোচকেরা নীরবই থেকেছেন। কর্তব্যবোধের পেছনে সতত ক্রিয়াশীল মানবিক সত্তা দেখতে না পাওয়া সমালোচকদের অনুভূতির পরাভব। আমাদের বিনীত প্রস্তাব, চতুরঙ্গ পাঠের ইতিহাসে এই যুক্তি ও অনুভূতির দ্বৈততা বা বাইনারি প্রতিষ্ঠার অভ্যেস ও রীতি জ্যাঠামশাই চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করেনি।

৯) এবার আমরা নজর দেবো তপোব্রত ঘোষের *শ্রীবিলাসের ডায়ারির* দিকে। তপোব্রত ঘোষের মতে এই উপন্যাসটি শ্রীবিলাসের স্বধর্মলাভের ইতিহাস। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীবিলাসই এই উপন্যাসের নায়ক।^{৩০} শ্রীবিলাসের স্বধর্ম প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, দামিনীকে ভালোবেসে শ্রীবিলাস জ্যাঠামশাইয়ের ধর্ম ও লীলানন্দের ধর্মকে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নিয়েছে। লীলানন্দের সাধনা অবরোহীপন্থী। আর শ্রীবিলাসের মন আরোহীপন্থী। এর পেছনে বেকনীয় দর্শনের প্রভাব লক্ষণীয়। উনিশ শতকে অক্ষয়কুমার দত্তের হাত ধরে বেকনীয় পদ্ধতির কথা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। তাঁর সিদ্ধান্ত জ্যাঠামশাইয়ের কাজে রসের মাধুর্য ছিল না আর লীলানন্দের কাজের মধ্যে ছিল না পৌরুষ। শ্রীবিলাসের দাম্পত্যে কাজ ও রসের

সম্মিলন ঘটেছে বলেই কলকাতা বৃন্দাবন হয়ে উঠেছে। এই সিদ্ধান্তটির সঙ্গে আমরা বিবাদী আলাপে রত থাকার চেষ্টা করবো।

১০) ১৯৭৮ সালে *পরিচয়* পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় ‘চতুরঙ্গ’-এর করণ কৌশল’ শিরোনামে কার্তিক লাহিড়ী একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কার্তিক লাহিড়ীর বিচারে এই উপন্যাসটি আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ, কিন্তু শিল্পিত আবেগের নৈর্ব্যক্তিকতায় উপন্যাস হিসেবে সার্থক হয়ে উঠেছে।^{৫৪} আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ হয়েও ধর্মীয় আখ্যান নয়। উত্তর ভারতীয় রাগ সংগীতের সঙ্গে উপন্যাসটিকে পড়ার প্রস্তাব রেখেছেন। *ঈশোপনিষদ* ও *চতুরঙ্গ*কে পাশাপাশি রেখে পড়ার প্রস্তাব করেছেন। তার কারণ *চতুরঙ্গ*-এর মতো *ঈশোপনিষদ*-এও পরস্পর বিরোধী প্রত্যয়গুলির সহাবস্থান তিনি লক্ষ্য করেছেন।^{৫৫}

আমরা *চতুরঙ্গ* বিষয়ে পণ্ডিত ও সমালোচকদের মতগুলি ফিরে দেখার চেষ্টা করলাম। বোঝার চেষ্টা করলাম কীভাবে তাঁরা এই উপন্যাসটিকে পড়তে চেয়েছেন। রবীন্দ্র উপন্যাস সমালোচনার ইতিহাসে এই মতগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। এবং পাঠকদের কাছে তা মান্যতাও পেয়েছে। এই সমস্ত মতগুলিকে খারিজ করা ধৃষ্টতার সামিল, আমরা কেবল ভিন্ন ভাবে দেখার প্রস্তাব রাখবো।

গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হওয়ার আগে ১৯১৪ সালে *সবুজপত্র* পত্রিকায় ধারাবাহিক চারকিস্তিতে চারটি গল্পো লেখেন রবীন্দ্রনাথ। আপাতত ভাবে গল্পের আকারে প্রকাশিত হলেও তার মধ্যে সংযোগ ছিল। পরে ‘চারিটি অংশ’ একত্রে *চতুরঙ্গ* নামে প্রকাশিত হয়। এই বইটিকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করতে কিছু দ্বিধাস্থিত ছিলেন বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না, কারণ তথাকথিত উপন্যাসের অভ্যাসের সঙ্গে এর কিছুটা অমিল। সেকারণেই উপন্যাস শুরু

আগে একটা মন্তব্য জুড়ে দেন— “এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ। ‘জ্যাঠামশাই’ ‘শচীশ’ ‘দামিনী’ ও ‘শ্রীবিলাস’ ইহার চারি অংশ।”^{৫৬} রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটির সঙ্গে আমরা একমত নই। বস্তুত, এই উপন্যাস কিংবা ‘বইখানি’-র দুটি অংশ— এক, জ্যাঠামশাই। দুই, না-জ্যাঠামশাই। রবীন্দ্রনাথের ঐ মন্তব্যটির সঙ্গে তর্ক করতে করতেই আমরা দেখতে চাইবো এই আখ্যানটিকে। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অনুসারে ‘চারিটি অংশ’কে যদি বিভাজিত করা যায় তাহলে লক্ষ করা যাবে তিনটি অংশের শিরোনাম নামবাচক বিশেষ্য এবং একটি অংশের শিরোনাম সম্পর্কবাচক বিশেষ্য। আরও লক্ষণীয় সম্পর্কবাচক শিরোনামটি শেষাঙ্গি কেবলই আত্মিক সম্পর্কের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, বরং তা একটি বিশেষ দর্শনের প্রকাশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। আখ্যানের মধ্যে শ্রীবিলাসের বারংবার ‘জ্যাঠামশাইয়ের চালা, তর্ক করাই আমাদের স্বভাব’ রূপে নিজেকে সম্বোধিত করার উদ্দেশ্য পরিচয় সূত্রে পাওয়া সম্পর্ক নয়, বরং তা জ্যাঠামশাইয়ের জীবনচর্যা ও দার্শনিক অবস্থানকেই আত্মীকরণের ফলশ্রুতি। ‘জ্যাঠামশাই’ এই সম্পর্কবাচক শিরোনাম ও শব্দবন্ধটি উপন্যাসে একটা আইডিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করবে।

আখ্যানে প্রথম অংশের শেষে জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর ঘটে। ফলে বাকি অংশ জুড়ে তার শারীরিক উপস্থিতি^{৫৭} পাঠকের চোখে পরে না। কিন্তু গোটা উপন্যাসেই ভূত দেখার মতো জ্যাঠামশাইয়ের উপস্থিতি লক্ষণীয়। না-জ্যাঠামশাই (শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাস) অংশটি বস্তুত পক্ষে অনুপস্থিত জগমোহনের কাহিনি নয়, তা না-উপস্থিত জ্যাঠামশাইয়ের কাহিনি। না-উপস্থিত জ্যাঠামশাই কার্যত উপস্থিত জ্যাঠামশাইয়ের থেকে আরও বাজ্রয় হয়ে উঠেছেন তর্কে বিতর্কে বিবাদের মধ্য দিতে। না-উপস্থিত থেকেও স্পষ্ট থেকেছেন কেবল পৌরুষ বা চারিত্রগুণের কারণে নয়, দর্শনের জোরে। মানুষ কেবলমাত্র একটা ভাব নয়, তার স্পষ্ট

উপস্থিতি আছে, তাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। চতুরঙ্গ-এ জ্যাঠামশাইয়ের অবস্থানটি বোঝা যায় আর অস্তিত্বের ভিত্তিতে। কেমন সেই অস্তিত্ব? যার একটি সমসাময়িক অবস্থা আছে। যাকে কিনা ছোঁয়া যায়, ধরা যায়। যা একটি বিশেষ সময়ের রৈখিক গতিকেও চিহ্নিত করে। যা মানুষিক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। এবং নিজের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করে আখ্যানের মধ্যে। এই অবস্থাগুলির মধ্যে দিয়ে যাচাই করা হয় তার উপস্থিতিকে। চতুরঙ্গ-এ এই উপস্থিতির এই ধরনটির বাইরেও আরেক किसিমের বৈশিষ্ট্য আছে, কী সেই ধরন? নিজের (জ্যাঠামশাইয়ের) চিন্তা ও অস্তিত্ব বিষয়ে বোঝাপড়া। যার প্রকাশ ঘটেছে ‘প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন’ ও নাস্তিকতার স্পষ্ট উচ্চারণের মাধ্যমে। এইগুলির মধ্য দিয়েই পালিত হয়, বেঁচে থাকে বা বড়ো অর্থে নির্মিত হয় জ্যাঠামশাইয়ের আরেক ধরনের অস্তিত্ব বা উপস্থিতি। খেয়াল করা বিষয়, এই প্রতিনিধিত্বমূলক উপস্থিতির ধরনগুলি কেবল শারীরিক উপস্থিতিকেই জানান দিচ্ছে না, সাথে সাথে তার চিন্তা বা দার্শনিক অবস্থানকেও চারিয়ে দিচ্ছে পাঠকের মধ্যে। শেষোক্ত ধরনটি প্রতিনিধিত্বমূলক না-উপস্থিতি অংশের মধ্যেও ক্রিয়াশীল রয়ে যায়। বস্তুত, চতুরঙ্গ-এ কথক ভিন্ন ভিন্ন সংকটের পরিস্থিতিতে বারবার জানান দিয়ে যায় তর্ক করাই জ্যাঠামশাইয়ের শিক্ষা। এই না-উপস্থিতিকে আমরা প্রতিনিধিত্বমূলক উপস্থিতির আরেকটি ধরন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই দিক থেকে পড়লে চতুরঙ্গ শচীশের পরিণত হওয়ার বা শ্রীবিলাসের স্বধর্ম লাভের ইতিবৃত্ত নয়, তা জ্যাঠামশাইয়ে প্রত্যাবর্তনের আখ্যান। বলা ভালো, জ্যাঠামশাইয়ের রিকগনিশনের (Recognition) আখ্যান।

বাংলা সাহিত্য সমালোচকেরা চতুরঙ্গকে বিভিন্ন ভাবে পড়তে চেয়েছেন। সে পাঠের মান্যতাও আছে, সমালোচক ও পাঠকদের কাছে সে পাঠ স্বীকৃতিও পেয়েছে। আমরা বিনীত স্বরে ভিন্ন

পাঠের প্রস্তাব রাখছি। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর বছর কয়েকপর শ্রীবিলাসকে কাছে পেয়ে শচীশ জড়িয়ে ধরে। শ্রীবিলাস বুঝতে পারে

“মিলনমাত্র যে আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে-আমি শ্রীবিলাস নয়, সে-আমি ‘সর্বভূতে’; সে আমি একটা আইডিয়া। এই ধরনের আইডিয়া জিনিসটা মদের মতো; *নেশার বিহ্বলতায় মাতাল* যাকে-তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে, তখন *আমিই কী আর অন্যই কী*।”^{৫৮} (বাঁকা হরফ আমার)

শচীশের কাছে, স্পষ্টত লীলানন্দের দর্শনে ‘আমি’ এই সত্তার অস্তিত্বই নেই। সকলই আদতে সর্বভূতে লীন; ঈশ্বরের অংশ, ব্যক্তি ‘আমি’র অংশীদারিত্ব লীলানন্দ স্বামীর দর্শন স্বীকার করে না। ফলত, প্রাথমিক ভাবে শ্রীবিলাস সে পথের পথিক হতে চাইবে না। স্পষ্টই দ্বিমত রেখে যাবে, “*আমি তো ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত* একাকার-বন্যার একটা ঢেউমাত্র হইতে চাই না— *আমি যে আমি*।”^{৫৯} (বাঁকা হরফ আমার) বন্ধুত্বের খাতিরে কিংবা ‘সমপ্রাণতা’ জন্যে শচীশকে ছেড়ে যাওয়াও সম্ভব হয় না, ফলে সে ‘নেশা’ সঞ্চারিত হলো শ্রীবিলাসের মধ্যে। লক্ষণীয় চতুরঙ্গ-এর কথক শ্রীবিলাসের বয়ানে স্পষ্ট যে, লীলানন্দের দর্শন বহুর অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, ভক্তিবাদী দর্শন এক এবং একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ববিলীনতাকে মান্যতা দেয়। আখ্যানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক এও জেনে যান যে, ভক্তির বা নেশার ‘চটক ভাঙিয়া গেল’ কলকাতায় এসে। সেই শহর কলকাতায়, যেখানে শ্রীবিলাস পাড়াগাঁ থেকে কলেজে পড়তে এসেছিল। এবং আজন্মলালিত সংস্কারের চটক ভেঙ্গেছিল জ্যাঠামশাইয়ের সাহচর্যে। শ্রীবিলাস আপন যুক্তির নিরিখে নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। সচেতনভাবেই কোনো আইডিয়া/দর্শনকে গ্রহণ করেছে কতগুলিকে খারিজ করেছে। চতুরঙ্গ-এর শ্রীবিলাস অংশে শঙ্করাচার্যের *মোহমুদগার*-এর কথা উল্লেখিত হয়েছে। শঙ্করের মায়াবাদকে কার্যত খারিজ করে

শ্রীবিলাস। কেন? কারণ শঙ্করাচার্যের মায়াবাদও ‘আমি’র অস্তিত্বকে নিকেশ করতে চায়, দার্শনিক ভিন্নতা থাকলেও লীলানন্দের ভক্তিবাদও তাই করে। শ্রীবিলাসের বয়ানে উঠে আসে—

“আমি জানি, আমার কথা কেহ মানিবে না। শঙ্করাচার্যের মোহমুদার কাহাকেও রেহাই করে না। মায়াময়মিদমখিলং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শঙ্করাচার্য ছিলেন সন্ন্যাসী— কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ— এ-সব কথা তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি সন্ন্যাসী নই, তাই আমি বেশ করিয়া জানি, দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।”^{৬০}

শঙ্করাচার্য অদ্বৈত বৈদান্তিক, জগতের অস্তিত্বকে তিনি স্বীকার করেন না, বস্তু পৃথিবী তাঁর দর্শনে মায়া। তিনি ভক্তিবাদীও নন, নির্গুণ ব্রহ্মের প্রচারক। তাঁর সত্য একমাত্র ব্রহ্ম, কিন্তু শ্রীবিলাস ব্রহ্মের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তিত নয়, তার চিন্তার কেন্দ্র ‘মায়াপ্রপঞ্চক’ পৃথিবীর কলকাকলি, রূপ-রস-গন্ধ এবং দামিনী। ঈশ্বরের খাতিরে সে মায়াপ্রপঞ্চক পৃথিবী, দামিনী সর্বোপরি আপন অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চায় না। *চপটিপঞ্জারিকায় মোহমুদার*-এর অন্তে জ্ঞানমার্গী শঙ্করাচার্যের মতো ভক্তি বিহ্বল কণ্ঠে শ্রীবিলাস বলতে পারবে না ‘ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং ননু মূঢ়মতে’^{৬১} কারণ সে মানব অস্তিত্বের স্বীকৃতিতে আস্থাশীল, সে জ্যোতামশাইয়ের মতো সজীবকে মানে যাকে ছোঁয়া, ধরা যায়। শ্রীবিলাস মন্তব্য করে— “সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে?”^{৬২} খেয়াল করার বিষয় শ্রীবিলাস লীলানন্দের ভক্তিমার্গ ও শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ উভয়ে দর্শন প্রস্থানকেই খারিজ করেছে ‘আমি’ নামক সজীব, সচেতন, অস্তিত্বময় চৈতন্যটির কারণে। সে যে কেবল আপন অস্তিত্ব ও চৈতন্য সম্পর্কে সচেতন তাই নয়, অপরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও আগ্রহী। ব্রহ্মময় বা ঈশ্বরময় (লীলানন্দের ভক্তিমার্গ) জগত অস্তিত্বকে ভ্রান্ত বলেও মানে।

অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ চতুরঙ্গকে শ্রীবিলাসের স্বধর্মলাভের ইতিবৃত্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য—

“কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই।”^{৬৩}

তাঁর যুক্তিক্রমটি এইরকমের— শ্রীবিলাসের আরোহীপন্থী মন ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির মধ্য দিয়ে কলকাতাতেই বৃন্দাবনকে উপলব্ধি করেছে। অর্থাৎ কিনা কলকাতার অস্তিত্বে বৃন্দাবনত্ব আরোপ, কলকাতা তার পূর্ণ অস্তিত্বকে বর্জন না করেই বৃন্দাবনকে ধারণ করেছে। ধরে নেওয়া যাক, এই যুক্তিক্রমটির মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। তা কী লীলানন্দের দর্শনানুগামী? ভক্তি তো দেশকালের সীমাকে অতিক্রম করে সর্বভূতে বৃন্দাবনত্ব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। সীমা বা ব্যক্তি অস্তিত্বকে স্বীকার করে কি তা অসীমত্ব ও ঈশ্বরত্বকে স্বীকার করতে পারে? যেখানে শ্রীবিলাসের বয়ানে স্পষ্ট হয়ে আছে লীলানন্দের ভক্তি মার্গ আদতে ভাব বিহীন জগৎ, সেখানে কে আছে আর কে নেই তা নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। যে মার্গ শ্রীবিলাসের কাছে ‘নেশার’ দর্শন! লীলানন্দের রসের মাধুর্য রস-জগৎ ভিন্ন আর কিছুকেই গ্রহণে অনাগ্রহী সেখানে কলকাতার বৃন্দাবনত্ব কি সম্ভব? রবীন্দ্রনাথ আজন্ম কখনই বৈষ্ণব দর্শন কিংবা কাব্যকে বৈষ্ণব দর্শনানুগ পথে পড়েন নি। তাঁর বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ্য আদ্যন্ত আধুনিকের জবানে বন্দী। প্রসঙ্গত, আমরা রবীন্দ্রনাথেরই তিনটি লেখার কাছে ফেরত যাবো, দেখার চেষ্টা করবো কীভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যকে পড়ছেন তিনি। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে *সাধনায়* ছাপা হয় ‘বৈষ্ণব কবিতা’, পরে তা *সোনার তরী* (১৮৯৪) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

“সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,

কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,

কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান

বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,

রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।”^{৬৪}

রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চাইবেন কার চোখের জল দেখে তোমার রাধার কথা মনে পড়েছিল? ব্যক্তিগত অনুভূতির নিরিখেই বৈষ্ণব কবিতাকে পড়তে চাইবেন। এ চাওয়াতে কোনো অন্যায় নেই কিংবা এভাবে ‘পড়া’ যে ভুল তাও নয়। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে আধুনিকের বয়ান এমনতর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আধুনিক সাহিত্যের একজন পাঠক, গীতিকবিতা সংরূপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ যে তাঁর ‘পড়া’র মধ্যে পড়বে না এ অস্বাভাবিক। আধুনিক তো আত্ম বা ‘আমি’কে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব সাহিত্যের কাছে পৌঁছাবেন। বৈষ্ণব ভক্ত কিংবা শাস্ত্রজ্ঞ সে পথে যাবেন না। তিনি বলবেন, আধুনিকের এই পাঠ বৈষ্ণবতত্ত্ব ও দর্শন অনুযায়ী ভুল। বৈষ্ণব দর্শন ও সম্প্রদায় তাকে অনুমোদন দেয় না। ১৩৩১ব ভাদ্রে *বঙ্গবাণী*তে প্রকাশিত হয় ‘তথ্য ও সত্য’-এর প্রায় দশবছর (১৩৪১ব) পর *প্রবাসীর* বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ‘সাহিত্যতত্ত্ব’ পরে এই লেখাগুলো *সাহিত্যের পথে* (১৩৪৩ব) অন্তর্ভুক্ত হয়। সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের উদাহরণ মাঝেমাঝে ফিরে আসে তাঁর লেখায়। ‘তথ্য ও সত্য’-এ সাহিত্য বা কলা-রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির পদের আশ্রয় নিলেন। লিখছেন—

“কবিতার বিষয়টি যাই হোক-না কেন, এমন-কি, সে যদি দৈনিক একটা তুচ্ছ ব্যাপারই হয়, তবু সেই বিষয়টিকে শব্দচিত্রে নকল করে ব্যক্ত করা তার উদ্দেশ্য বিদ্যাপতি লিখছেন—

যব গোধূলিসময় বেলি

ধনি মন্দিরবাহির ভেলি,

নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

গোধূলি-বেলায় পূজা শেষ করে বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে ঘরে ফেরে— আমাদের দেশে সংসার-

ব্যাপারে এ ঘটনা প্রত্যহই ঘটে।”^{৬৫}

‘সাহিত্যতত্ত্ব’ প্রবন্ধে লিখছেন—

“কিন্তু, যাকে ভালোবাসি অর্থাৎ যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিপুরুষের পরম সম্বন্ধ তার সম্বন্ধে পরিমাণ থাকে

না। তার সম্বন্ধে অনায়াসেই বলতে পারি—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

তথ্যের দিক থেকে এতবড়ো অদ্ভুত অত্যাক্তি আর-কিছু হতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তিপুরুষের অনুভূতির মধ্যে

ক্ষণকালের সীমায় সংহত হতে পারে চিরকাল।”^{৬৬}

১২৯২ব বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের (১৮৬০-১৯০৮) যৌথ সম্পাদনায়

প্রকাশিত হয় *পদরত্নাবলী*। বিমানবিহারী মজুমদার (১৮৯৯-১৯৬৯) তাঁর *রবীন্দ্র-সাহিত্যে*

পদাবলীর স্থান বইয়ে অনুমান করছেন নতুন বৌঠানের মৃত্যু শোক ভুলতেই হয়তো এই

সংকলন। তা অনুমানই, নির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ দাখিল করেননি। তবে এই সংকলন নিয়ে বেশকিছু

গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বিমানবিহারী মজুমদার যা রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কাব্য পাঠের

দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্ট করে। তাঁর মতে *পদরত্নাবলী*-ই প্রথম বৈষ্ণব পদের সংকলন যা বৈষ্ণব

সাধনভজনের অঙ্গ হিসেবে রচিত হয়নি। ফলে, গৌরাঙ্গলীলার পদ যা আধ্যাত্মিকতার চাবিকাঠি

তাদের সংকলনে শুরুতে তা নেই। লীলা অপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে আধুনিক গীতি কবির মনোভঙ্গি। বৈষ্ণব পদ সংকলকরা শ্রীরূপ গোস্বামীর *উজ্জ্বলনীলমণি*-র বেঁধে দেওয়া পথেই পদ সাজিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথরা সেই তাত্ত্বিক পথে হাঁটেনি। তাঁর কাছে মুখ্য হয়েছে তাঁর সময়ের পাঠ রুচি। পদগুলির শুরুতে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ থাকলেও বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের উল্লেখ সেখানে নেই। বিমানবিহারী মজুমদার এই প্রশ্ন তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ কি ছোটোগল্পের কৌশলে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন? ১৯৪০ সালে মৃত্যুর একবছর আগে *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*-র ভূমিকা লেখেন। সেখানে স্পষ্টই লিখছেন—

“পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয় তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না।”^{৬৭}

খেয়াল করার বিষয় কাব্যে এবং প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সাহিত্যকে পড়ছেন ব্যক্তিগত অনুভূতির অবস্থান থেকে। বৈষ্ণব পদাবলী তাঁর কাছে ভক্তির কাব্য নয়, ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির ঈশ্বরপ্রায়ী প্রকাশ। ঈশ্বর (কৃষ্ণ অথবা রাধা) ব্যক্তি অনুভূতি প্রকাশের অবলম্বন মাত্র। সেকারণেই তিনি লিখবেন কার অশ্রু আঁখি দেখে শ্রীরাধার কথা কবির মনে আসে? যাকে ভালোবাসেন তার উদ্দেশে অনায়াসে বলতে পারেন—

‘জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।’

কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞের ভাষায় এ কাজ অবৈষ্ণবচিত। কারণ মধুর রসের অবলম্বন একমাত্র শ্রীরাধিকার জন্যেই নির্দিষ্ট, সে স্থান দামিনীর হতে পারে না, অন্তত বৈষ্ণব দর্শনানুসারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে শ্রীবিলাসের কলকাতায় বৃন্দাবন যাপন লীলানন্দের তত্ত্বানুসারী নয়, আর নিজ প্রেমের অভিজ্ঞতা দিয়ে বৃন্দাবন অর্থাৎ বৈষ্ণব মাধুর্যের জগতের উপলব্ধিও

রবীন্দ্রনাথের মতো ‘হেরি কাহার নয়ান, রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে’ মতো অবৈষম্যবচিত উচ্চারণ। বস্তুত, শ্রীবিলাসের ‘স্বধর্মলাভ’-এর ইতিবৃত্তে লীলানন্দের (বৈষম্যব দর্শন) মাধুর্যের সন্নিবেশ অযৌক্তিক। বরং বলা যায়, আধুনিক মানুষ শ্রীবিলাসের কাছে কলকাতার বৃন্দাবন হয়ে ওঠা ‘মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়’^{৬৮}। এই মানবিক অভিজ্ঞানের স্বীকৃতি আছে জ্যাঠামশাইয়ের চর্যায়। যাঁর বিখ্যাত লজ্জ ‘প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন’। লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত শব্দটি ‘সুখসাধন’। জ্যাঠামশাই মানুষের শুধু উন্নতি-সাধন করেন না, ‘সুখসাধন’-এ ব্রতী। উন্নতির সঙ্গে কেবল জাগতিক বিষয়কে চিহ্নিত করে, সুখের কেবল জাগতিক বিষয় নয়, চৈতন্যেরও। জ্যাঠামশাইয়ের জীবনচর্যা ও বাণীর মধ্যে মাধুর্য, মানবিক অনুভূতির অভাব ছিল না। তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ, শচীশের বিদায় নেওয়ার সময়টি। যা প্রমাণ করে, জ্যাঠামশাইয়ের দর্শনে মানবিক মাধুর্যের কোন অভাব ছিল না, মানবিক মাধুর্যের অভাব ছিল লীলানন্দের ভক্তিবাদের মধ্যে।

জ্যাঠামশাইয়ের কাজের মধ্যে কোনো রসের মাধুর্য ছিল না, আর লীলানন্দের রসের মধ্যে ছিল না কাজের পৌরুষ।^{৬৯} লীলানন্দ স্বামী যার দর্শনটি নেশার মতো। চতুরঙ্গ-এ লীলানন্দের দর্শন সম্পর্কের যে যে বিশেষণ ও মন্তব্য করা হয়েছে সেগুলিকে খেয়াল রাখলে লীলানন্দের ভক্তিবাদ সম্পর্কে শ্রীবিলাসের অবস্থান পরিষ্কার হবে। এক, “এই ধরনের আইডিয়া জিনিসটা মদের মতো; নেশার বিহ্বলতায় মাতাল যাকে-তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কী আর অন্যই কী।”^{৭০} দুই, “ভক্তির দস্যুবৃত্তি শুরু হইল”^{৭১}। প্রথম ক্ষেত্রে শ্রীবিলাসের বয়ান থেকে স্পষ্ট লীলানন্দের ভক্তিতে মাধুর্য আছে বটে তবে তা অপরের অস্তিত্ব ও চৈতন্য সম্পর্কে অচেতন। অচেতনতাই এই মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য, কেবল আত্মপীতি ও আপন-মাধুর্য লাভ এ দর্শনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মাধুর্যের

চিহ্নমাত্র নেই, বরং অধিকারহরণের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য লক্ষণীয়। বস্তু জগত এবং অপর ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকারে অপারগ একটি দর্শন (আইডিওলজি) থেকে ব্যক্তি প্রেমের অনুভূতি (প্রেম উদ্দেশ্য কেবলই আত্মপ্ৰীতি নয়, অপরের প্ৰীতি আকাঙ্ক্ষাও বটে) শেখা অবাস্তব ও অযৌক্তিক নয় কি? আধুনিকের প্রেমানুভূতির কেন্দ্রে আছে আত্ম ও অপরের চৈতন্য বিষয়ে সচেতনতা এবং পারস্পরিক মমত্ব। বস্তুজগৎ তার কাছে ভাব নয়, বাস্তব এবং সত্য; আর প্রেমাস্পদ চৈতন্যময় একটি সজীব সত্তা, একজন ইনডিভিডুয়াল। চতুরঙ্গ-এ শচীশের কাছে দামিনী এবং তার অনুভূতি প্রত্যাখ্যাতই হয়েছে। প্রত্যাখ্যানের কারণ যৌনজীবন সম্পর্কে জ্যাঠামশাইয়ের শিক্ষার^{৭২} প্রভাব নয়, বরং ভক্তিবাদী দর্শন। যাঁরা গুহার ঘটনাটিকে অনাসক্তি ও যৌনতা বিষয়ে ভয় বলে চিহ্নিত করতে চান তাদের সঙ্গে আমরা একমত নই। দামিনী চেয়েছিল ভক্ত শচীশের সঙ্গ, নাস্তিক শচীশ তার অজানা; হয়তো শুনে থাকতে পারে তার পূর্ব জীবনের কাহিনি। কিন্তু কামনা করেছিল ভক্তিবাদী-আস্তিক শচীশকেই। সে শচীশের কাছে এসেছিল ‘দামিনী’ হয়ে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, পলকে তার তীব্র উপস্থিতি জানান দিতে। কিন্তু এই অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে ভক্তিবাদী শচীশ স্থান দেবে কীভাবে? শচীশ জগতকে দেখেছে এবং পেতে চেয়েছে বিশেষত্বহীন এক এবং অদ্বিতীয় ভাবের জগতে। দামিনীর উপস্থিতি তার আত্মজিজ্ঞাসা ও দর্শনকে সংকটে ফেলে দেবে। সংকট মুক্তির সহজ ও পরিচিত প্রত্যাখ্যানের রাস্তাই সে গ্রহণ করে। যৌনতা বিষয়ক ভয় নয়, এ দর্শনের প্রত্যাখ্যান। দামিনী নভেল পড়তে ভালোবাসতো, উনিশ শতকের শেষার্ধের কলকাতার উচ্চ-মধ্যবিত্ত মানুষের পরিচিত অভ্যেস।

“একদিন আমার প্রতি দামিনীর হুকুম হইল, তার জন্য ভালো বাংলা বই কিছু আনাইয়া দিতে। বলা বাহুল্য, ভালো বই বলিতে দামিনী *ভক্তিরত্নাকর* বুঝিত না, ... আমি যে-লেখকের বই আনাইয়া দিলাম সে-লোকটা একেবারে *নির্জলা আধুনিক*। তার লেখায় *মনুর চেয়ে মানবের* প্রভাব অনেক বেশি প্রবল। বইয়ের

প্যাকেটটা গুরুজির হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি ভুরু তুলিয়া বলিলেন, কী হে শ্রীবিলাস, এ-সব বই কিসের জন্য?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি দুইচারিটি পাতা উলটাইয়া বলিলেন, এর মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ তো বড়ো পাই না। লেখকটিকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

আমি ফস করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, একটু যদি মনোযোগ করিয়া দেখেন তো সত্যের গন্ধ পাইবেন। আসল কথা, ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ জমিতেছিল। ভাবের নেশার অবসাদে আমি একেবারে জর্জরিত। মানুষকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শুদ্ধমাত্র মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলোকে লইয়া দিনরাত্রি এমন করিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে আমার যতদূর অরুচি হইবার তা।”^{৭৩}

লক্ষণীয় বইটি আধুনিক সাহিত্যিকের লেখা, তার মধ্যে ‘মানবের প্রভাব’ বেশি; এতে সাত্ত্বিকতা নেই বটে কিন্তু সত্য আছে। ফলে সন্ন্যাসীর কাছে এ বই পরিত্যাজ্য, কিন্তু সংসারীর কাছে আদৃত। মানবহীন মানবিক অনুভূতির চর্চায় বিরক্ত ও দ্বিধাস্থিত শ্রীবিলাসের কাছে আধুনিক নভেলের মানবিক আবেদন বেশি আগ্রহ তৈরি করবে, সেটাই স্বাভাবিক। লীলানন্দের রসের জগতে মাধুর্য ছিল একথা ঠিক, কিন্তু অংশত ঠিক। এ মাধুর্য অ-মানবিক^{৭৪} মাধুর্য, যা দিয়ে বস্তুজগৎ ও বিশেষ ও সাধারণ কোনো মানবিক অনুভূতিকে অনুভব করা যায় না। লীলানন্দের না ছিল কাজের পৌরুষ না ছিল মানবিক মাধুর্য। জ্যাঠামশাইয়ের কাজে পৌরুষ ছিল কিন্তু মাধুর্য কি ছিল না? মাধুর্য ও মধুর এই ধারণাটি দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে বিশেষ অর্থ আমাদের মধ্যে তৈরি করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভক্তিবাদের জনপ্রিয়তা হয়তো এর কারণ। জ্যাঠামশাইয়ের দর্শনের মোদ্দা কথাটি ছিল ‘প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন’। এই লজ্জাটি যে সাধারণ বা নির্বিশেষকে উদ্দেশ্য করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খেয়াল করার

বিষয়, এই দর্শন যতোই সাধারণের উদ্দেশ্যে ধ্বনিত হোক না কেন এর অন্তর্নিহিতে স্পষ্ট হয়ে আছে অপরের প্রতি সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষা। রণজিৎ গুহ তাঁর *দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা* শীর্ষক বইয়ে ‘দয়া’ বিষয়ে অসামান্য আলোচনা করেছেন। দেখাতে চেয়েছেন দয়া, দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্কের বাইরে দার্শনিক অবস্থান। শুদ্ধ জ্ঞানের প্রতিভূ সক্রটিস আবেগ ও অনুভূতিকে সর্বদাই বুদ্ধিতে পরিণত করেছেন। *ক্রিটো* ও *ফিডো* গ্রন্থে কোনো কোনো চরিত্রে যখনই দয়া বা শোকের লেশমাত্র দেখা যাচ্ছে, তখনই তা অপরিণতবুদ্ধি বলে ধিক্কৃত। এমনকি, সক্রটিসের নাটকীয় আত্মঘাতেও সক্রিয়তার দোলা লাগেনি এতটুকুও, তা কেবল আত্মজিজ্ঞাসা।^{৭৫} আরও লিখছেন— যেসব অনুভূতি কর্তব্যবোধকে সজাগ করে তোলে, ‘দয়া’ তার অন্যতম।^{৭৬} মার্থা নাস্বমের সন্দর্ভের সূত্র ধরে রণজিৎ গুহ পৌঁছাবেন, যে কোনো মানবিক কর্তব্যবোধের পেছনে সক্রিয় থাকে দয়া নামক বোধ। সে বোধ সক্রটিয় জ্ঞানের জড়তায় পঙ্গু নয়। অনুভূতির প্রেরণায় সচল, চলিষুঃ। এই অনুভূতি কিসের জন্যে? বা কার জন্যে? এই প্রশ্ন ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। নিশ্চিত ভাবে তা ‘আমি’-র অনুভূতি। যা, সেই অনুভাবক ‘আমি’র মধ্যে চারিয়ে দেয় নিজেকে শ্রদ্ধা ও আত্মসমীহাবোধ। যা ‘আমি’কে আত্মমর্যাদায় স্থিত করে, চিনতে পারে নিজেকে, হয় আত্মস্থ।^{৭৭} নিজেকে অশ্রদ্ধা করা সম্ভব হয় না তারপক্ষে। এই আত্মস্থতা সংসার বিমুখ সাধকচিত আত্মস্থতা নয়। যার মধ্যে লগ্ন আছে পথ চলা, মানুষের মতো করে বেঁচে থাকার আনন্দ কিংবা আকাঙ্ক্ষা। যে আত্ম উপলব্ধি শেখায় অপরাপর ‘আমি’-র প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে। যে আত্মমর্যাদার স্বীকৃতি ‘অপর’-এর মর্যাদায়। যা মানুষকে মানুষতা স্থিত করে, করে মানবিক। ব্যক্তি, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সে ‘আমি’ হয়ে ওঠে বিশ্বনাগরিক। নাস্তিক জ্যাঠামশাই ‘প্রচুরতম’ (নির্বিশেষ বা সাধারণ) মানুষের সমস্যাকে দেখতে ও বুঝতে চান এর মধ্যে শুধুই ‘কর্তব্যপরায়ণতা’ খোঁজা একটেরে। জগমোহনের

নির্বিশেষ লজ্জাটি বিশেষ নির্ভর। বিশেষের উপকার ছাড়া নির্বিশেষ অর্থহীন একটি উপাদান। এখানে তর্ক উঠতে পারে এই জ্যাঠামশাইয়ের পরের উপকার করার প্রবৃত্তির আত্ম-অনুভূতির নিরিখে পরের সমস্যা বোঝার চেষ্টা। একথায় ভুল নেই, অপরকে অনুভব করা কি আত্মানুভূতি ব্যতিরেকে সম্ভব? আত্ম-অনুভূতিই কার্যত মাধুর্যের অবলম্বন। ভক্তের মাধুর্য আর আধুনিক অনীশ্বরবাদীর মাধুর্য এক নয়। ভক্ত ‘আমি’কে লীন করে দিতে চায় ঈশ্বরের সমীপে। আধুনিক, অনীশ্বরবাদীর সজীব, সচেতন চৈতন্য সম্পর্ক তৈরি করতে চায় আরেকটি চৈতন্যের সঙ্গে। ননিবালার মৃত্যুর দায় ঠেলে দেওয়া হয় জ্যাঠামশাইয়ের দিকে, বলা হয় এই ঘটনা ‘যুক্তির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অযুক্তির জয়’^{৭৮}। নাকি ঘটনাটিকে এইভাবে পড়বো— সমাজ, স্মৃতি শাসিত অমানবিক রীতির স্বৈরাচারের কাছে যুক্তির, মানবিক অনুভূতির পরাভব? ননিবালার মৃত্যুর ঘটনাটিকে এভাবে পড়াও অমূলক নয়! বিশেষের প্রতি মাধুর্য না থাকলে ননিবালা নিয়ে কি জ্যাঠামশাই চিন্তিত হতেন? কিংবা শচীশ যখন বলে সে সিভিল বিবাহ মতে ননিবালাকে বিবাহ করবে তখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

“জগমোহন শচীশকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন অশ্রুপাত তাঁর বয়সে আর কখন করেন নাই।”^{৭৯}

এই প্রশ্ন যদি ওঠে যে, আদর্শের উত্তরাধিকার জ্যাঠামশাইকে বিহ্বল করে। সে কথা ঠিক, কিন্তু অংশত। কারণ ননিবালা বিপদ, অসহায়তার প্রসঙ্গকে সরিয়ে রেখে এই বিহ্বলতার বিচার ও বিশ্লেষণ অর্থহীন।

চতুরঙ্গ-এ জ্যাঠামশাই ও লীলানন্দ স্বামী দুজন যে দুটি দার্শনিক প্রশ্নানকে প্রতিনিধিত্ব করছে সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই। দুই দর্শন প্রশ্নানের মূলগত বিরোধ উপন্যাসে স্পষ্ট।

প্রশ্ন হোল, এই দুই দর্শন কি মিলতে পারে? বা দুইয়ের সহাবস্থানে পৃথক অবস্থান (আইডিওলজি) গড়ে উঠতে পারে? যাদের সম্পর্কই মৌলিক বিরোধের! লীলানন্দের দর্শনে ছিল পৌরুষের অভাব (যদিও পৌরুষের আফালন লীলানন্দের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল), আর জ্যাঠামশাই মাধুর্যহীন। ফলত, লীলানন্দ থেকে শ্রীবিলাস গ্রহণ করল মাধুর্য আর জ্যাঠামশাইয়ের শিক্ষা কাজের পৌরুষ। দুয়ে মিলে শ্রীবিলাসের স্বধর্মলাভ। প্রসঙ্গত খেয়াল রাখা দরকার, শচীশ ও শ্রীবিলাসের ‘সমপ্রাণতা’য় ছেদ আসে দামিনীর সূত্রে। এই মন্তব্যটি অর্ধ সত্য/Fact। চতুরঙ্গ এ শ্রীবিলাসের মোহমুক্তি ও ‘সমপ্রাণ সখাত্বে’ ছেদ পড়ার প্রাথমিক কারণ কলকাতা, কলকাতা শহরের হাত ধরেই আসে দামিনী। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, কলকাতায় এসে ‘নেশা’ জমিয়ে রাখা কঠিন হলো। কঠিন কলকাতায় ‘মাথা’ ঠুকে গেলো, মানুষের ধাক্কায় ‘চটক’ ভেঙ্গে গেল। লক্ষণীয় লীলানন্দের দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তীর্থক মন্তব্য ও বিশেষণ প্রয়োগগুলি। ‘নেশা’ ছুটে গেলো, ‘মাথা’ ঠুকে গেলো, ‘চটক’ ভেঙ্গে গেলো। এরপরে লিখছেন— ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখদুঃখ, ভালোমন্দের বিচিত্র সমস্যায়-পাক-খাওয়া মানুষের ভিড়ের কলকাতায় অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন রসের বিহ্বলতা টিকিয়ে রাখতে প্রাণপন চেষ্টা করতে লাগলো শ্রীবিলাস। শহরের কর্কষতা, মানুষ, কলরবের সংস্পর্শ ভাবের জগতের মায়া ও শচীশের সঙ্গে বিচ্ছেদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। চতুরঙ্গ এ কলকাতা শহর নিজেই একটা চরিত্র, উপন্যাসের প্রথম বাক্য মনে রাখলে তা আরও স্পষ্ট হবে। শ্রীবিলাসের জীবনদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ মোচড়গুলি কলকাতা শহরকে কেন্দ্রে রেখেই। ফলত, দামিনী-ই যে বিচ্ছেদের মূল উপাদান এ কথাটি বলে দেওয়া একটেরে, অন্তত টেক্সটে তার সমর্থন মেলে না। যদি ধরেও নিই, দামিনীর নুপুরের নিক্রণ শ্রীবিলাসকে নতুন পথ দেখালো। রসে বিহ্বলতা ছিন্ন করলো, সেই আবার দুই দর্শনের মিতালি পাতাতে বৃন্দাবনের মাধুর্য উপলব্ধি করালো? সৃষ্টির কারণ নিয়ে অদ্বৈত বৈদান্তিকদের সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত

বলে চিহ্নিত করে সাংখ্য দর্শন। অদ্বৈত বৈদান্তের মতে ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ (Material Cause) ও নিমিত্ত কারণ (First efficient Cause)। সাংখ্যের আপত্তি উপাদান কারণ ও উপাদেয় কার্যের মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্য থাকে। যেমন- মাটি থেকে ঘট কিংবা সোনার তাল থেকে গয়না। এখানে বস্তুগত ঐক্য আছে, কিন্তু শঙ্কর ভাষ্যে সেই ঐক্য নেই। ফলত, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হতে পারেন না। এর উত্তরে শঙ্করাচার্যকে চার্বাকীয় যুক্তির সাহায্য নিতে হয়। পারমার্থিক ও ব্যবহারিক দুটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে এই আপত্তির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন শঙ্করাচার্য। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় যে জগৎ আদতে মায়া সেই জগৎ নিয়ে ব্যবহারিক তত্ত্ব কি অবাস্তব নয়? দুটি পরস্পর বিরোধী দর্শন, যাদের সম্পর্কই মৌলিক বিরোধের তাদের মিলনে স্বধর্মলাভ লাভ কি সম্ভব? কলকাতা বৃন্দাবন হতেই পারে, কলকাতায় বৃন্দাবন তৈরি সম্ভব, তবে তা লীলানন্দের বৃন্দাবন নয় আধুনিক মানুষের বৃন্দাবন, যারা নভেল ভালোবাসে, সাত্ত্বিক অলীক রসের রাজ্যে ভ্রমণ যাদের না-পসন্দ, তার জন্যে লীলানন্দের দর্শনের সহায়তা শ্রীবিলাস ও দামিনীর অপ্রয়োজনীয়। বরং জ্যাঠামশাইয়ের চ্যালাত্ব সেই পথের হুঁশি দিতে পারে। তা হলো— “মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়”^{৮০}। যে ভাবনার সঙ্গে প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধনের ঐক্যের সম্পর্ক। একদিকে আছে অস্তিত্বের বিলয়, অপর দিকে শ্রীবিলাসের ‘বৃন্দাবনে’ আছে স্বীকৃতি।

শচীশ নয়, জ্যাঠামশাইয়ের আইডিয়াটি শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাসের মাধ্যমে উপন্যাসের প্রতিষ্ঠিত হলো। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীবিলাস হলেও, সেই চরিত্র যে ধারণা বা আইডিয়াটিকে কেন্দ্র করে তর্ক করেছে, বিশ্বাস করেছে কখন নিশ্চুপ থেকেছে তিনি হলেন জ্যাঠামশাই। সেই অর্থে চতুরঙ্গ জ্যাঠামশাইয়ের রিকগনিশনের আখ্যান। সে কথা বলার পূর্বে আমরা রবীন্দ্রনাথের অন্য কয়েকটি লেখাপত্রের দিকে নজর দেবো। সেই সূত্র রবীন্দ্রনাথের

ধর্ম, ঈশ্বর, বিশ্বাস সংক্রান্ত অভিমতের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করবো। উপনিষদ রবীন্দ্রনাথকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। এ কথা সত্য, জীবনের শেষ দিনগুলিতেও সেই উপনিষদের শরণ নিয়েছেন। এই কথার অর্থ কী এই যে উপনিষদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা আজীবন একই রকম ছিল? ছোটবেলায় বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) কাছে প্রথম উপনিষদ পাঠ। সেই পাঠ কি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক পর্বে বা জীবনের অন্তিম সময়ে অপরিবর্তনীয় ছিল? দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনা ও ধর্মচিন্তার মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের চিন্ময় জীবন বিকশিত হয়েছে।^{৮১} এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত ও চর্চিত। কিন্তু বাবার অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ রূপে সরে এসে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর, ধর্ম, বিশ্বাস বিষয়ক ভাবনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সেই ভাবনা বদলের সন্ধিকাল। এই কথার অর্থ এই নয় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে তাঁর চিন্তার জগতে সংশয়, জিজ্ঞাসা তৈরি হয়নি। ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক থাকার সময়েই নিজের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে ঈষৎ সংশয়ী হয়ে পড়ছিলেন। প্রশান্তকুমার পাল ও অমিয় পি সেনের অভিমত আদি ব্রাহ্মসমাজের অংশ হয়েও আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারে রবীন্দ্রনাথের রুচি ছিল না। যেটুকু কাজ কর্ম করতেন বা বাহ্যিক সংস্কারের প্রতি যেটুকু আনুগত্য ছিল তা দেবেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবশত। বাবার মৃত্যুর পর সেটাও লোপ পায়।^{৮২} প্রশান্তকুমার পাল আরও মন্তব্য করছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বেদ, উপনিষদ-এর ব্যাখ্যার মধ্যে সায়ন ভাষ্যের সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজে না পেয়ে তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানের গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা ভেবে দেখেন না পরিপ্রেক্ষিতটিকে।^{৮৩} রবীন্দ্রনাথের লেখাপত্রের দিকে নজর দিলেই দেখা যাবে কেন এই বদল। কেন বেদ উপনিষদের রবীন্দ্র ব্যাখ্যা ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে না? কেন তা স্বতন্ত্র ‘দেখা’? আলাদা ভাবে দেখতে ও ব্যাখ্যা করতে চাওয়ার কারণ কোথায় লুকিয়ে আছে? নব্যহিন্দু সমাজের মুখপাত্র শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮১৫-১৯২৮), চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০), অক্ষয়চন্দ্র

সরকারের (১৮৪৪-১৯১৭) সাকার উপাসনার বিরোধিতা করেন রবীন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মদের নিরাকার উপাসনার পক্ষেই সওয়াল করেন। ১২৯২ব. শ্রাবণ মাসে ‘সাকার ও নিরাকার উপাসনা’ শীর্ষক বক্তৃতা দেন রবীন্দ্রনাথ। সেই বছরেই ভারতীর শ্রাবণ সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয় এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের টীকা সহ পুনরায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেখানে পৌত্তলিকতার বিরোধিতা তো করেনই পাশাপাশি ব্রাহ্মদের উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। খেয়াল রাখা দরকার তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিত। সেই অবস্থাতে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের ঈশ্বর সাধনার পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

“পৌত্তলিকতার এক মহদোষ আছে। চিহ্ন^{৮৪} যথার্থ বলিয়া মনে করিয়া লইলে অনেক সময়ে বিস্তর ঝগড়াট বাঁচিয়া যায় এই জন্য মনুষ্য স্বভাবতই সেইদিকে উন্মুখ হইয়া পড়ে। ...ব্রাহ্মদের কি এ আশঙ্কা নাই! কেবল মূর্তিই কি চিহ্ন, ভাষা কি চিহ্ন^{৮৫} নয়! আমি এমন কথা বলি না। মনুষ্যমাত্রেরই এই আশঙ্কা আছে। এবং সেই জন্যই ইহার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করা আবশ্যিক। সকল চিহ্ন অপেক্ষা ভাষা-চিহ্নে এই আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অল্প থাকে। তথাপি ভাষাকে সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। ভাষার দ্বারা পূজা করিতে গিয়া ভাষা পূজা করা না হয়। দেবতার নিকটে ভাষাকে প্রেরণ না করিয়া ভাষার জড়ত্বের মধ্যে দেবতাকে রুদ্ধ করা না হয়।”^{৮৬}

সাকার উপাসনাকে সমালোচনা করার পাশাপাশি ব্রাহ্মদের উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে সংশয় যে তাঁর মধ্যে তৈরি হয়েছিল, এই লেখাটি সে কথা বুঝিয়ে দেয়। কার্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, কিন্তু সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মতের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। ভাষার মাধ্যমে পূজোও যে আসলে সত্যের থেকে চিহ্নকে বেশি মর্যাদা দিতে পারে সেই বিষয় তিনি সচেতন হচ্ছিলেন। এই প্রশ্ন কী তাঁর

মধ্যে তৈরি হচ্ছিল, সাকার-নিরাকার নির্বিশেষে ধর্মের কাছে ঈশ্বর অথবা সত্য অপেক্ষা চিহ্ন অধিক গুরুত্বপূর্ণ? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিবার, ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রথাগত ধারায় রবীন্দ্রনাথ খানিক বেমানান। এবং এটিকে তিনি প্রথাগত ধর্মাচরণ ও আস্তিক্য ত্রুটি হিসেবে বুঝতে ও পড়তে চাইছিলেন। সম্ভবত সেকারণে শাস্ত্রের মান্য ব্যাখ্যার সঙ্গে রবীন্দ্র ভাষ্যের দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান পরিচয় ছিল ধর্মপ্রচারক। হিন্দু ধর্মের সংস্কার আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা অসংগত হবে না অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর বিরোধের কথা। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* সম্পাদক বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন, উলটো দিকে পত্রিকার প্রকাশক ও কর্ণধার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে বাহ্য প্রকৃতি অপেক্ষা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বিচারেই আগ্রহী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের পার্থক্য প্রচুর। যেখানে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মের ভাব আনতে নিষেধ করবেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ সকল ধর্মকে ধারণ করতে চাইবেন তাঁর ভাবনায়। আনুষ্ঠানিকতাকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চিন্তা গড়ে ওঠেনি, সেকথার ইঙ্গিত রয়েছে স্মৃতিকথায়। তাঁর জবানিতে পড়া যাক সে কথা—

“আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না— আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।”^{৮৭}

ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ পরিবারের প্রথাগত পথে অগ্রসর হননি। ‘সাকার ও নিরাকার উপাসনা’ শীর্ষক লেখাটি পড়লে মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর ভক্ত ও ধার্মিক মানুষ ছিলেন। কিন্তু কথাগুলোর দার্শনিক, ধার্মিক ব্যাখ্যা করতে গেলে সংকট উপস্থিত হতে পারে। *আত্মপরিচয়*-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“সকল মানুষেরই ‘আমার ধর্ম’ বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটিকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খ্রিস্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্তে আছে সে হয়তো সত্য তা নয়। নাম গ্রহণের এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।”^{৮৮}

রবীন্দ্রনাথের বাহ্যিক, সামাজিক, পারিবারিক অভ্যেসে পাওয়া ধর্মগত পরিচয়কে মানুষের নিজ ধর্ম বলতে চান না। এখানে পুরোনো তর্ক উঠে আসবে ধর্ম শব্দের অর্থ কী? রবীন্দ্রনাথ ধর্ম বলতে কী রিলিজিওন বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বোঝাচ্ছেন নাকি যা ‘আমি’কে ধারণ করে রাখে তা বুঝতে চাইছেন? বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক বা রিলিজিওন অর্থে নয় বৈশিষ্ট্য অর্থে ধরা দেয়। এই জন্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের লেখার শরণ নেবো। *আত্মপরিচয়*-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা।”^{৮৯}

নির্দিষ্ট নিয়মের ছকে রবীন্দ্রনাথকে বাঁধা চলে না। তাঁর ধর্মের খোঁজ আছে তাঁর চৈতন্যের মধ্যে, ভাবনার মধ্যে। ফলত, বাবার কিংবা ব্রাহ্মসমাজের অবস্থান থেকে সরে এসে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর, ধর্ম, বিশ্বাস বিষয়ক ভাবনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। এক মানবিক অভিজ্ঞানের সন্ধান রবীন্দ্র চৈতন্যে ফুটে উঠতে থাকে, *গোরা* (১৯১০), *গীতাঞ্জলি* (১৯১০) সময় থেকে। ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয় *নৈবেদ্য* কাব্যগ্রন্থ। যা আদতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কবির অর্ঘ্য। বইটি উৎসর্গ করা হয় ‘পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে’। উৎসর্গ পত্রের বাক্যটির সঙ্গে কাব্যগ্রন্থের বিষয় সংগতিপূর্ণ। ঈশ্বরের আরাধনা রবীন্দ্রনাথ বাবার থেকেই

শেখেন, আর দেবেন্দ্রনাথ আমৃত্যু খুঁজেছেন ‘ঈশ্বরের সহিত’ তাঁর সম্বন্ধ। অথচ তেরো বছর পর *সবুজপত্র*-এর পাতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

“মাইডিয়ার নরেন, চরণকে শ্রী বলিলে যে কি বলা হয় তা আমিও জানি না তুমিও জান না অতএব ওটা বাজে কথা,...আমার চরণসম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করিলে ভক্তিপ্রকাশ করা হইতে পারে কারণ কোনো কোনো চতুষ্পদ তোমাদের ভক্তিভাজন”^{৯০}।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মানবিক অভিজ্ঞানের খোঁজ নবতর মাত্র পায়, যার ইঙ্গিত আছে *চতুরঙ্গ* এ। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অ-সুখের সঙ্গে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অ-সুখ ও অবসাদের নিবিড় সম্পর্ক থাকা সম্ভব। ঈশ্বর ভাবনা, ধর্মাচরণ নিয়ে সংশয় সঙ্গে ‘পরম’ বিশ্বাসের দ্বন্দ্বিক সহাবস্থান ছিল। কিন্তু যুদ্ধ তাঁর প্রত্যয়, ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির যুক্তিবাদ ও বাংলায় পরিগ্রহণের অভ্যেসকে নাড়িয়ে দেয়; ধ্বস্ত করে। সম্ভবত সেটাই অবসাদের অন্যতম কারণ। মানুষের বিশ্বাসের কেন্দ্র আর কোনো ঐশ্বরিক দর্শন নেই, আছে পৃথিবী, বস্তুজগৎ। নতুন খোঁজে রত হলো মানুষ। সেই মানবিক খোঁজ ও অভিজ্ঞানের ইঙ্গিত, চিহ্ন রয়েছে *চতুরঙ্গ*-এর জ্যাঠামশাইয়ের জীবন দর্শনে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের জীবনে, চিন্তায় সন্ধিকাল। *চতুরঙ্গ*-এ যে ভাবনার শুরুয়াৎ, ভবিষ্যতে তা ধীরে ধীরে অন্যতর রূপ নেবে। জ্যাঠামশাইয়ের ভাবনার সঙ্গে যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সাদৃশ্য আছে তা বোঝা যায় হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠিতে। আমাদের বিচারে হেমন্তবালা দেবীকে (১৮৯৪-১৯৭৬) লেখা চিঠিগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর, ধর্ম, বিশ্বাস সংক্রান্ত বক্তব্য সবচেয়ে স্পষ্ট, নির্ভীক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কেন বলছি একথা? এখানে গুরুত্ব সহকারে বিচার করতে হবে কোনো একজনের লেখা কিংবা ভাবনা প্রকাশের বিষয়টি। কী প্রকাশ করছেন? এবং কার বা কাদের কাছে তা প্রকাশিত

হচ্ছে? বলাই বাহুল্য যে, চিঠির পাঠক নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি। আর বইয়ের পাঠক অনির্দিষ্ট সাধারণ পাঠক, যাদের সকলের চৈতন্য বিষয়ে লেখকের অবহিত থাকা কার্যত অসম্ভব। এক্ষেত্রে লেখক যৌথ বা সামাজিক চৈতন্যকে লক্ষ করে তাঁর ভাবনা প্রকাশ করেন। চিঠির ক্ষেত্রে সে বাধা থাকে না, কারণ পত্র লেখক যাকে লিখছেন তাঁর চৈতন্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সেখানে পত্র লেখক অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষ জানা বোঝার উপরেই অধিক নির্ভরশীল। বস্তুত, এখানে তিনি অনেক নির্ভীক, স্পষ্টবাদী। এবং অভিঘাত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বিপরীতে বইয়ের ক্ষেত্রে লেখককে কিঞ্চিৎ দ্বিধাতুর। এ কারণেই আমরা হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠির উপর অধিক গুরুত্ব দেবো। রবীন্দ্রনাথের লেখা বক্তব্যগুলিকে কালানুক্রমে সাজিয়ে দেখার চেষ্টা করবো চতুরঙ্গ-এর সময়কালে যে ভাবনার সলতে পাকানো শুরু বলে আমরা মনে করছি, তার সঙ্গে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠির মিল ও অমিল। ২৯ চৈত্র, ১৩৩৭-এ লিখেছেন—

“কত মানুষকেই বঞ্চিত করে তবে আমরা এই দেবতার খেলা খেলি। ... আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। ... মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বলেই আমার নালিশ। ... আমি মানুষকে ভালোবাসি বলেই এই খেলার দেবতার সঙ্গে আমার ঝগড়া।”^{১১}

৮ বৈশাখ ১৩৩৮-এ লিখেছেন—

“অন্তত আজ এটুকু বুঝেছি কর্মের মধ্যে যে উপলব্ধি তাতে মনুষ্যত্বকে সম্মানিত করা হয়— তাতে বাইরের ব্যর্থতা ঘটলেও অন্তরে গৌরবহানি ঘটে না।”^{১২}

১৪ জুন, ১৯৩১-এ লেখা এই লম্বা চিঠিতে কার্যত জ্যাঠামশাইয়ের প্রতিধ্বনি উঠে আসে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়,— আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে— সেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা সত্য, পিণ্ডিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে— যে দেবতা স্বর্গের তাঁর মধ্যে এসব কিছুই সত্য নয়। ... তোমার লেখায় তোমাদের পূজার বর্ণনা শুনে আমার মনে হয় এ সমস্তই অবরুদ্ধ অতৃপ্ত জীবনের আত্মবিড়ম্বনা।”^{৯৩}

এই অংশগুলি পড়লে রবীন্দ্রনাথকে নাস্তিক বলেই মনে হয়।

৪ অক্টোবর, ১৯৩৩-এ লিখেছেন—

“এই মর্ত্য পৃথিবীর উপর আমার যদি তেমন বিতৃষ্ণা হতো আমিও তাহলে বৈকুণ্ঠের প্রতি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতুম। দরকার হয়নি বলে কল্পনাও করি নে। আনন্দরূপস্মৃত যদ্বিভাতি— আমার কাছে এই মর্ত্যের রূপই আনন্দরূপ অমৃতরূপ— একে অবজ্ঞা করিও এত বড়ো ধৃষ্টতা আমার নেই।”^{৯৪}

আরো গুরুত্বপূর্ণ এই চিঠিটি শেষ করছেন ‘ভজনপূজনহীন দাদা’ বলে। ১১ অক্টোবর, ১৯৩৩-এ লিখেছেন—

“বৈকুণ্ঠপুরী যদি সত্যি কোথাও থাকে তাহলে সেখানে মর্ত্যের মানুষ টিকতে পারে না। এই পৃথিবীর মাটি নিয়েই আমাদের নিজের বৈকুণ্ঠ নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে। সেই জন্যেই মানবসংসারে দ্বৈত আছে— যেমন আছে অপূর্ণতা তেমনই আছে পূর্ণতার আদর্শ।”^{৯৫}

ঠিক এই সময়েই প্রকাশিত হচ্ছে *মানুষের ধর্ম* (১৯৩৩)। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ‘মানব’-এর ধারণা দিয়েছেন। কী সেই ধারণা?

“সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয় নি। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না।”^{৯৬}

আরও বলছেন, সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজো করেছে, তাঁকেই বলেছে ‘এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা’।^{৯৭} মানুষই দেবতা হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র ভাবনায়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগতে, বিশ্বাসের জগতে বিরাট বাঁক বদল এই বিষয়ে সন্দেহ থাকা অমূলক। জীবনের শেষ দিকে এসে উপনিষদ বাণীর সম্পূর্ণতা বিষয়ে প্রশ্ন জেগেছিল মনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক-মুহূর্তে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় নিকোল ম্যাকনিকোলের সম্পাদিত *Hindu Scriptures*। তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“A transcendental spirit of enquiry challenges the old gods, and their mechanical propitiation prescribed by the sacred texts. Says Narada: ‘I know the Rigveda, the Yajur, the Sama-veda, with all these I know only the Mantras and the sacred books, I do not know the Self.’ ... And if this Supreme Self is unknowable and incomprehensible, it is yet realizable through self-discipline and knowledge by the Self in man, for the two are ultimately one. ... But the Upanishads, though they measured the highest reaches of the philosophic imagination of our people, were yet incomplete in their answer to the complex longing of the human soul. Their emphasis was too intellectual, and did not sufficiently explore the approach to Reality through love and devotion.”^{৯৮}

বস্তুত পক্ষে, এই ভূমিকাটি উপনিষদের সঙ্গে সংশয়ী রবীন্দ্রনাথের বিবাদী আলাপ। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেয় ও প্রেয়বোধের ধারণা অনেকটাই বদলে দেয়। যার সূচক বিন্দু ছিল *চতুরঙ্গ*, *ঘরে-বাইরে*, *বলাকা* প্রভৃতি লেখাগুলি। যা পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগতকে নির্মাণ করতে সাহায্য করে। শচীশ চরিত্রটি কি *চতুরঙ্গ*-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র? শচীশের বিকশিত হয়ে ওঠাই কী উপন্যাসের মুখ্য বিষয় বস্তু? বস্তুত, *চতুরঙ্গ*-এ প্রতিটি চরিত্র

গুরুত্বপূর্ণ, আদতে দুটি ধারণার সংঘাত এবং সেই সংঘাতে প্রতিক্রিয়া। শচীশ বিষয়ে আমরা উপন্যাসের একটি অংশ দেখে নেবো, ‘দামিনী’ অংশের শেষে ‘পরিশিষ্ট’-এ বলা হচ্ছে—

“আর-একদিন এই-সমস্তই মানিয়া-লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরব শান্ত হইয়া বসিয়া—
কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়াবিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।”^{৯৯}

নাস্তিক্য ও ভক্তিবাদী আস্তিক্য ধারা ছেড়ে কী সে অজ্ঞেয়বাদে প্রবেশ করলো? কথকের বয়ানে কি সেই ইঙ্গিত-ই মেলে? আমাদের প্রস্তাব চতুরঙ্গ ‘জ্যাঠামশায়’-এর রিকগনিশনের আখ্যান। শচীশ এবং শ্রীবীলাস দুজনেই এক অর্থে জানতে চেয়েছে, তাদের ফেলে আসা অভিজ্ঞতা এবং নবলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মুক্তির পথ খুঁজেছে। শচীশ শেষাব্দী মুক্তির পথ পেল কিনা স্পষ্ট নয়। জ্যাঠামশাই-লীলানন্দ স্বামী-দামিনী-ননিবালা এবং শ্রীবীলাসের স্মৃতিকে অতিক্রম করতে পেরেছে কিনা বোঝা যায় না। শ্রীবীলাস শেষ পর্যন্ত খুঁজে পায় তার পথ, যে পথে রয়েছেন ‘জ্যাঠামশায়’, মানবিক অভিজ্ঞান ও প্রেমের হাত ধরে মুক্তির রাস্তা খুঁজে নেয় সে। শ্রীবীলাসের এই যাত্রার মাধ্যমে ‘জ্যাঠামশায়’ আবারও উপস্থিত হন উপন্যাসে। একটি বিষয়ে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে শ্রীবীলাসের তফাৎ রয়েছে, কিংবা বলা যায় একটি পয়েন্টে সে জ্যাঠামশাইয়ের অবস্থানকে ছেড়ে আসে। তা হলো ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক বক্তব্য। জ্যাঠামশাইয়ের সকল কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল সোচ্চারে জানান দেওয়া যে, ঈশ্বর একটি মিথ্যা জ্ঞান। প্রস্তাবিত ‘না-জ্যাঠামশায়’ অংশে শ্রীবীলাস ঈশ্বর বিষয়ে নিরুচ্চার, এর অর্থ এই নয় যে, সে অবস্থান বদলেছে। আস্তিক্য বিষয়ে অবস্থান প্রায় একই, কিন্তু সে শান্ত, স্থিতধী। চিত্তকৃত ঘোষণা অপেক্ষা কাজ ও প্রেম অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে শেষ পর্যন্ত গর্ব করেছে এই বলে, জ্যাঠামশাইয়ের চ্যালার, তর্ক করাই স্বভাব। ‘জ্যাঠামশায়’-এর দর্শনকে সে ছেড়ে আসেনি,

বরং আরেকবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীবিলাসের মাধ্যমে। যে দর্শনের সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে ঐহিক, মানবিক অভিজ্ঞান। সে অর্থে চতুরঙ্গ ‘জ্যাঠামশায়’ রিকগনিশনের আখ্যান।

২.২ শেষ প্রশ্ন : তর্ক, প্রশ্ন, সংস্কার

আমরা এই অংশে মুখ্যত আলোচনা করবো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) শেষ প্রশ্ন (১৩৩৮-ব) উপন্যাস নিয়ে, দেখার চেষ্টা করবো আন্তিক-নাস্তিক দার্শনিক প্রশ্ন দুটি কেমন করে তাঁকে প্রণোদিত করেছে এই উপন্যাস সৃষ্টিতে। সে সম্পর্কে কথা বলার আগে আমরা তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের একটি বিতর্কের দিকে ফিরে তাকাবো। এটা বোঝার চেষ্টা করবো ঐ বিতর্কের সাথে শেষ প্রশ্ন-এর সম্পর্ক কেমন? এবং কীভাবে আন্তিক-নাস্তিক দার্শনিক অবস্থান প্রচ্ছন্ন অথচ মূলগতভাবে প্রভাবিত করেছে উপন্যাসটির ‘হয়ে ওঠা’কে। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা ‘অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য’ সংক্রান্ত বিতর্কের দিকে নজর দেবো।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে ভারতবর্ষ পত্রিকায় অমলচন্দ্র হোমের (১৮৭৫-১৯৭৫) একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ‘অতি আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য’ শীর্ষক লেখায় অমলচন্দ্র হোম আধুনিক সাহিত্য রচনার বিষয় নিয়ে কিছু মন্তব্য করেন। তরুণ লেখকদের নাম বা রচনার নাম উল্লেখ না করলেও অনুমান করে নেওয়া যায় যে তাঁর প্রধান লক্ষ ছিল কল্লোল, কালি-কলম, বরণা ইত্যাদি পত্রিকার লেখককুল। এই লেখাটি প্রকাশের আগে ১৯২৬ সালের বড়োদিনে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে এই লিখিত

প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)।

এই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—

“... গল্পের পর গল্প পড়িয়া যাই— মন বিরূপ হইয়া উঠে, তিক্ততায় চিত্ত বিকৃত হয়। একি কৃত্রিম ভাববিলাস, প্রেমের অসহনীয় ন্যাকামি, ভাষা ও ভাবের বিকৃত অসংযম, বাস্তবতার নামে কলাকৌশলশূন্য অভিনয়, আন্তরিকতাবিহীন অনুভূতির মায়া কান্না বাংলা কথা-সাহিত্যকে পাইয়া বসিল।

ইহাই কি বাংলার নবযুগের সাহিত্য?”

পশ্চিমের বাস্তব সাহিত্যে যৌন সম্বন্ধের যে রূপ চিত্রণ অতি ঔৎসুক্যে আমাদের কথা-সাহিত্যে আমরা অনুকরণ করিয়া চলিয়াছি, তাহা কি শুধু আমরা সৃষ্টির আনন্দেই করিতেছি? তাহার অন্তরালে কি ইন্দ্রিয়-লালসার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন হইয়া নাই এবং তাহার কলুষ কি আমাদের সাহিত্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়িতেছে না?”^{১০০}

প্রাবন্ধিকের শব্দচয়ন খেয়াল করলে একথা স্পষ্ট হবে, তিনি ‘অতি-আধুনিক সাহিত্য’-কে নৈতিক ভাবে গ্রহণীয় বলে মনে করেন না। *কল্লোল*, *কালি-কলম*, *ঝরণা* পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলির সম্পর্কে তাঁর প্রয়োগ করা বিশেষণ লক্ষণীয়— ‘ভাষা ও ভাবের বিকৃত অসংযম’, ‘ইন্দ্রিয়-লালসার’ ইঙ্গিত ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, এই সমস্ত শব্দ বা বিশেষণ প্রয়োগ সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকেই চিহ্নিত করে দেয়। যে ভঙ্গি গড়ে ওঠার পেছনে বিশেষ নৈতিক ও দার্শনিক ভাবনাই ক্রিয়াশীল। ঐ প্রবন্ধের অন্য একটি অংশে নজর দিলে আমাদের অনুমান স্পষ্ট হবে। তিনি এটাও মনে করেন যে, এই সাহিত্য আন্দোলন আমাদের সমাজ ও সাহিত্যকে কলুষিত করছে এবং এর প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজনীয়। এরপরে ঐ লেখাতে ভবিষ্যতের তরুণ লেখকদের প্রতি আহ্বান রাখেন, যারা আজকের লেখকদের মতো সহজ জনপ্রিয়তার লোভে ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ করবেন না, সেই সব

ভবিষ্যতের তরুণ লেখকদের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন। “যাঁহারা মানুষের জীবনকে আর্টের পূজাবেদীতে নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করিবেন— আমরা তাঁহাদের আগমন-আশায় অপেক্ষা করিতেছি।”^{১০১} আশা করছেন বাংলা সাহিত্য দেবতার বন্দনা গানে মুখরিত হয়ে উঠবে চারপাশ, ধ্বনিত হবে “সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্।”^{১০২} অমল হোমের আস্থানের মধ্যে একথা স্পষ্ট যে, আর যাই হোক আধুনিক সাহিত্য আর্টের দেবতার কাছে নৈবেদ্যের যোগ্য নয়। তা কলুষিত, অপবিত্র, ধুলো মলিন। তা কখনই পূজোর সামগ্রী হতে পারে না। অমলচন্দ্র হোমের শব্দ প্রয়োগের ঝোঁক লক্ষ্য করলে কিংবা যে উপমার সাহায্যে তিনি শিল্প-সাহিত্যকে সংজ্ঞায়িত করতে চাইলেন, সে দিকে নজর দিলে স্পষ্ট হয়ে যাবে তাঁর নৈতিক ও দার্শনিক অবস্থান ঠিক কী? আর কোন কোন বিষয়কে তিনিও সাহিত্য পদবাচ্য বলে মনে করেন?

এই সময়েই শনিবারের চিঠি-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) ও মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যান, উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের ‘নোংরামি’^{১০৩} বিষয়ে তাঁর মতামত। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সেই সাক্ষাতের কথা সজনীকান্ত তাঁর স্মৃতিকথাতে উল্লেখও করেছেন। শরৎচন্দ্র সেখানে নাকি বলেন কলঙ্কিত সাহিত্য রচনা অপেক্ষা সাহিত্য লুপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথকেও বাংলা সাহিত্যের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যে অনুরোধ করেন সজনীকান্ত। অমল হোমের পথে ধরেই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে *কল্লোল*, *কালি-কলম* পত্রিকা। সেই চিঠিতে নাম করে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), যুবনাথ (১৯০২-১৯৭৯), নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখের সাহিত্য চর্চার সমালোচনাও করেন। কবিকে খেয়াল করিয়ে দেন নরেশ সেনগুপ্ত সম্পর্কে তাঁর প্রশংসার কথা। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানান, আধুনিক সাহিত্য তাঁর চোখে পড়ে না। যেটুকু দৈবাৎ

নজরে আসে, সেখানে লক্ষ্য করেন কলমের আঁক ঘুচে গেছে। তাকে তিনি সুশ্রী বলতে পারেন না। সতর্ক রবীন্দ্রনাথ খেয়াল করিয়ে দেন এর পেছনে কোনও নৈতিক অবস্থান নেই, শুদ্ধ সাহিত্যিক বিচারেই তা তিনি গ্রহণে অপারগ। পরে কখন এই নিয়ে তিনি লিখবেন বলে আশ্বাস দেন।^{১০৪} পরে ‘সাহিত্য ধর্ম’ নামে একটা প্রবন্ধ *বিচিত্রায়* প্রকাশিত হয়। সেখানে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সাহিত্যে যে আঁক ও আভিজাত্য আছে তাই নিত্য বা চিরকালীন। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বে-আঁকতাকে কেউ কেউ নিত্য বলে মনে করেছেন, তাঁরা ভুলে যান যে নিত্য/চিরকালীন/শাস্ত্র অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। লেঙ্গট পরা, ধুলোমাখা আধুনিকতা বাংলা সাহিত্যে এসে পড়েছে, তাকে অসত্য না বলে, অসঙ্গত বলেই মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং সেটিকে সাহিত্যের বিষয় করে তোলায় তাঁর ঘোর আপত্তি। নৈতিক আপত্তির পাশাপাশি, অমল হোমের আধুনিক সাহিত্য সংক্রান্ত আপত্তির কেন্দ্র ছিল বিষয় (content) ভিত্তিক। কী হবে সাহিত্যের বিষয়? কী স্থান পাবে? আর কোন বিষয়কে সযত্নে এড়িয়ে যাবেন সাহিত্যিক? রবীন্দ্রনাথের অবস্থান কিঞ্চিৎ সে রকমের। তবে সতর্ক, বিচক্ষণ রবীন্দ্রনাথ নৈতিক অবস্থানকে বাতিল করে, তাঁর আপত্তিকে কেন্দ্রীভূত করলেন দুটি প্রশ্নে— এক, বিষয়গত এবং দুই, সাহিত্যের চিরন্তনত্ব। কিন্তু উভয়ের বিষয়গত আপত্তিকে নৈতিক কিংবা দার্শনিক অবস্থান থেকে দেখা যেতে পারে।

এর প্রতিবাদে *বিচিত্রা*-র ভাদ্র সংখ্যায় ‘সাহিত্যধর্মের সীমানা’ নামে একটা প্রবন্ধ লেখেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখছেন—

“বাস্তবিক বর্তমান বাংলাসাহিত্যে যেসব অসাধারণ চরিত্রের অসাধারণ কার্যকলাপ লইয়া কথা লেখা হইয়াছে, তাদের কোনো এক-আধটা সম্বন্ধে হয়তো এ কথাগুলো বলা চলিলেও, সাধারণভাবে তাদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না যে, সেগুলি কোনো বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি সত্যের উপাদান লইয়া

লেখা। যেসব লেখা সাহিত্যপদবাচ্য, তার সম্বন্ধে সাধারণভাবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, সেগুলি বিজ্ঞানের বই হইতে উপাদান কুড়াইয়া লেখা নয়, জীবনের প্রত্যক্ষ দর্শন ও আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত।”^{১০৫}

এ বিতর্ক এখানেই থেমে থাকেনি, রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতিবাদ করে *বঙ্গবাণী*-র ভাদ্র সংখ্যায় কলম ধরেন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। “সাহিত্য-ধর্ম” নামের লেখাটির শেষের দিকে গিরিজাশঙ্কর বলেন যে, সাহিত্যকে বুঝতে হবে সমকালের প্রেক্ষিতে। সাহিত্যের রচনা-ভঙ্গি, বিষয়-আশয় সংগত না অসংগত তা সেই যুগের মানব মন বা চৈতন্যের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে এবং বিচার করতে হবে। তবেই বোঝা সম্ভব আঠারো শতকের বাংলা সাহিত্যের রচনা ভঙ্গিকে এবং রবীন্দ্রনাথের রচনা ভঙ্গিকে। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের নিত্যকালের ধারণার বিরোধিতা করলেন বটে, কিন্তু এই প্রশ্ন তৈরি করে গেলেন যে, সাহিত্য পড়া কিংবা বিচার করা কী কাল সাপেক্ষ? তা অন্য তর্ক। আমরা ফিরে আসি গিরিজাশঙ্করের লেখায়। প্রবন্ধটির শেষে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীব্র আক্রমণ শাণিত হয়। গিরিজাশঙ্কর লিখছেন—

“সধবাই হউক আর বিধবাই হউক, বিমলা ও বিনোদিনীর মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকে আমরা বর্কবর মানব-মনের অসঙ্গত সাহিত্যিক প্রকাশ বলিয়া উপেক্ষা করিব না,... ভারত সমুদ্রের ওপারে উলঙ্গ মানব-মন হাটে আসিয়া যে কলরব করিতেছে তাহা বাঙ্গালার অন্তঃপুরের মানব-মনকে অতি সাংঘাতিক রকমে আক্রমণ করিয়াছে এবং বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবির লেখনী সে আক্রমণের কথা এমন করিয়া প্রকাশ করিয়াছে যে রঘুনন্দনের স্মৃতির বৈঠকের ভগ্নাংশ যেখানে যেখানে আছে সেখানে এই সধবা ও বিধবা নারীর মনস্তত্ত্বের অতি নিপুণ বিশ্লেষণ, সাহিত্যিক রচনাভঙ্গীর ধারাতেও নির্লজ্জ এবং বর্কবরোচিত বলিয়া অবজ্ঞাত ও নিন্দিত হইবে।”^{১০৬}

বঙ্গবাণী-র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কিছুটা সখ্য ছিল, সেই সূত্রে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁকে এই প্রসঙ্গে লিখতে অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে সজনীকান্ত দাস *শনিবারের চিঠি*-তে

রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আবেদন এবং তার উত্তরে লেখা কবির চিঠিটি প্রকাশ করে দেন। আর জুড়ে দেন তাঁর ও মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কথোপকথনের প্রসঙ্গ। যদিও শরৎচন্দ্র সজনীকান্তের সব কথার সঙ্গে একমত নন। সজনীকান্ত তাঁর এবং শরৎচন্দ্রের অভিমত জড়িয়ে যে কথা লিখেছেন, তার সঙ্গে শরৎচন্দ্র দ্বিমত পোষণ করেন। ফলে ‘সাহিত্যের রীতি ও নীতি’ নামে একটা লেখা শরৎচন্দ্র *বঙ্গবাণী*-র দপ্তরে পাঠিয়ে দেন এবং তা আশ্বিন সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সে লেখার শুরুতেই উল্লেখ করেন নরেশ সেনগুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে আক্রান্ত ও বে-আক্রান্ত বিষয়ে মতদ্বৈতের কথা। এবং স্ববিনয়ে জানান, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একমত নন। বিজ্ঞানের ধর্ম-ই হল সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতুহল। এই কৌতুহল সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছে, যা রবীন্দ্রনাথের না-পসন্দ। বিজ্ঞান বলতে কেবল নর-নারীর শরীর, যৌনতা বোঝায় তাহলে সাহিত্যে তার ‘অবারিত’ প্রবেশে অনিচ্ছুক, শরৎচন্দ্র। একে তিনি ‘অহেতুক’, ‘অবাস্তব’, ‘অসংগত’ বলেও চিহ্নিত করছেন। রবীন্দ্রনাথের অতি-আধুনিক সাহিত্য নিয়ে অনীহার কেন্দ্রে ছিল সাহিত্যিক কারণ, নৈতিকতা নয়। শরৎচন্দ্রের অভিমত থেকে এ অনুমান করে নেওয়া কঠিন নয় যে, তাঁর অনীহা নৈতিক কারণে। যদিও তিনি বৈজ্ঞানিক মনোভাবকে কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলেই মনে করেন। কিন্তু ‘নোঙরামি’ সাহিত্যের বিষয় নয়। তা যত-ই সত্য হোক আর বিজ্ঞান হোক না কেন! এরপরে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—

“নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহার সীমা নির্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমা-রেখা কি ইহার আছে না কি যে, ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ভর অপরের হাতে তাহাই কদর্য্যতায় কালো হইয়া উঠে। ... নর-নারীর যৌন-মিলন যে সকল রস-সাহিত্যের ভিত্তি এ সত্য কবি অস্বীকার করেন নাই। তথাপি

মোট কথাটি বোধহয় তাঁহার এই যে, ভিত্তির মত ও-বস্তুটি সাহিত্যের গভীর ও গোপন অংশেই থাক।

বনিয়াদ যতই নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়।”^{১০৭}

এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় কেন শরৎচন্দ্রের অভিমতের কেন্দ্রে আছে বিশেষ দার্শনিক নৈতিকতার বোধ। কেন বা তিনি মনে করেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে তা বিজ্ঞানের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সাহিত্যের মন্দিরে নয়। প্রসঙ্গত, দুটি কথা বলা প্রয়োজনীয়— এক, সমাজ যদি পৃথিবী ও সূর্যের ঘোরা বিষয়ে চিন্তিত হয় তবে তা সাহিত্যের ‘মন্দিরে’ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবন্ধেই আরেক জায়গায় শরৎচন্দ্র লিখেছেন— “সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা।... বড়ো কথা ইহা ভাষা ও জাতির কল্যাণকর কি না।”^{১০৮} যদিও সাহিত্যের ‘মন্দির’ না বলে দরবার কিংবা আসর বলেই শ্রেয়। কারণ ‘মন্দির’ শব্দটি বিশেষ অনুসঙ্গকে চিহ্নিত করে। তা আধুনিক সাহিত্যের সেক্যুলার সংরূপে খানিক বেমানন। আধুনিক আখ্যানের জগতকে লুকাচ বলবেন, ‘ঈশ্বর’ পরিত্যক্ত জগৎ। তাঁর অভিমতের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মিল নেই। বস্তুত, এই উপমা প্রয়োগ বুঝিয়ে দেয় শরৎচন্দ্রের দ্বিধা, দোদুল্যমানতাকে। আধুনিকতাকে গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়েই তাঁর অগ্রগতি। দুই, ব্রেখটের (১৮৯৮-১৯৫৬) *গ্যালিলিও* নাটকের সঙ্গে আমরা পরিচিত, শরৎচন্দ্র এই নাটকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা জানা নেই। যে নাটকের কেন্দ্রীয় সমস্যা পট যুক্তি ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। যা তৈরি হয়েছে এই প্রশ্নকে সামনে রেখে— পৃথিবী না সূর্য কে কার চারদিকে ঘোরে? শরৎচন্দ্র বিজ্ঞান/সত্যকে নির্বিচারে গ্রহণের পক্ষপাতী নন, যতই তিনি বলুন না কেন বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ন্ত্রিত কল্পনা ছাড়া কথা সাহিত্য অর্থহীন। আন্তিক্যবোধ তাঁর শিক্ষা, সংস্কার, রুচির নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের আধ্যাত্মিক (আক্ষরিক অর্থে), অলীক সাহিত্যের সূত্রে শরৎচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান যে কবিতা ও কথাসাহিত্য এক নয়, এক নয় তাদের ধর্ম ও ধর্মের সীমানা। মানুষের বোধ ও আত্মার ক্ষুধার মধ্যে পার্থক্য এতোটা গভীর যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ন্ত্রিত কল্পনাকে বাদ দিলে সাহিত্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক মনোভাব অর্থে শরৎচন্দ্র ‘বাস্তববোধ’কেই বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন।^{১০৯} এক অর্থে, ‘বাস্তবতা’ স্বীকার করে নিলেন শরৎচন্দ্র। প্রায় একথা বলতে চাইলেন, বাস্তবতা বোধ কথাসাহিত্যের অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতটা বাস্তবিক হওয়া যাবে সেই নিয়ে তাঁর বক্তব্য সুনির্দিষ্ট। এই লেখাতে নরেশচন্দ্রকে কিছু মন্তব্য করেন, যে তাঁর নরেশবাবুর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় না থাকলেও, পাণ্ডিত্যে, ভাষার উপর দখল, চিন্তার বিস্তারে এবং স্বাধীন মত প্রকাশের বাংলা সাহিত্যে তাঁর সমতুল্য কেউ আছে বলে জানা নেই। এবং শরৎচন্দ্র এও মনে করেন, তাঁর সমস্ত বই রবীন্দ্রনাথের পড়া উচিত। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘সাহিত্য-ধর্ম’ প্রবন্ধের মতামত সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। রবীন্দ্রনাথ এরপরেও কয়েকটি লেখা লেখেন। ১৩৩৪ব *প্রবাসী*তে প্রকাশিত হয় ‘সাহিত্যে নবত্ব’ নামে একটি প্রবন্ধ, যেটি জাভা থেকে বালি যাওয়ার পথে জাহাজে ‘যাত্রীর ডায়েরি’ শিরনামে লেখা। এই লেখাটিকে ‘সাহিত্য ধর্ম’ প্রবন্ধের পরিপূরক হিসেবেও পড়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র উভয়ের লেখা নিয়েই সে সময় বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল। *আত্মশক্তি*তে মুশাফির ‘সাহিত্যের মামলা’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন আর *প্রবাসী*তে কলম ধরেন ব্রজদুলাল হাজারী, তাঁর লেখার শিরোনাম ছিল ‘রস ও রুচি’। উভয় লেখার প্রতিবাদে শরৎচন্দ্রও *আত্মশক্তি*তে প্রবন্ধ পাঠান। আবার এই লেখার প্রতিবাদে ব্রজদুলাল হাজারী *আত্মশক্তি*তে প্রবন্ধ লেখেন, যার সংক্ষিপ্ত উত্তরও দেন শরৎচন্দ্র ঐ পত্রিকাতেই। এই আলোড়নের মধ্যে ‘বিশ্বভারতী সম্মিলনী’ নবীন ও প্রবীন সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা সভার

আস্থান করে। ১৩৩৪ সালের ৪ ও ৭ চৈত্র জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ‘সাহিত্যে রূপ’ ও সাহিত্য সমালোচনা’ শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সে বিতর্কের ইতিহাস কিছুটা ধরা আছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *কল্লোলের যুগ* বইয়ে। এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

কিন্তু একবছর পরে শরৎচন্দ্র তাঁর বক্তব্য কিছুটা বদল করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ‘বঙ্কিম-শরৎ সমিতি’ পক্ষ থেকে তাঁর ৫৪তম জন্মদিবস পালনের অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে শরৎচন্দ্র জানান যে, রবীন্দ্রনাথের ‘সাহিত্য ধর্ম’ বিষয়ে *বঙ্গবাণী*তে যে প্রবন্ধ তিনি লেখেন সেই বক্তব্যের সঙ্গে এখন একমত নন। সেই কথাগুলো তখন তাঁর বলা ঠিক হয়নি বলেও মনে করেন। ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্য গত একবছরে যত্ন করে পড়ে তাঁর মনে হয়েছে নিজের অভিমত বদল করা প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র জানাচ্ছেন—

“এক বন্ধুর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকগুলি তরুণী, বোধ হয় ২০।২৫ জন হবে, উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে বলেন—‘দুঃখের ব্যাপার এই, আমরা লিখতে জানি না, সেই জন্য আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি না। আজকাল যা হচ্ছে, আমরা লজ্জায় মরে যাই। কম বয়সের ছেলেরা হয়তো মনে করে, এসব জিনিস আমরা খুব ভালোবাসি।... আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কঠোর কথাটাই আমার বারম্বার মনে পড়ে। সেদিন তাঁর কথা আমার না বললেও হ’ত। মনে হয়েছিল সত্য ছিল না, কিন্তু এক বৎসর পরে এ আর আমি বলতে পারিনে!’”^{১১০}

শরৎচন্দ্রের অভিমত বদলের আরেকটা কারণ তাঁর পাঠকরা। নতুনদের লেখা পড়তে পড়তে তাঁর যেমন তাঁর দ্বিধা তৈরি হচ্ছিল, তেমন একদল অনুরাগী পাঠকের অভিমতও তাঁর অবস্থান বদলে অনুঘটকের ভূমিকা নেয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঐ বক্তৃতাটি *মাসিক বসুমতি*তে প্রকাশিত হয়, সে লেখা খেয়াল করলে দেখা যাবে, কার্যত পাঠকের রুচি, শিক্ষা-দীক্ষা,

নৈতিকতাবোধ (ম্যরালিটি) সর্বোপরি দার্শনিকবোধ (সচেতন না হলেও) কীভাবে লেখকের অভিমত কিংবা অবস্থান বদলে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করছে। লেখক যেমন পাঠক তৈরি করেন তেমনই পাঠকের চৈতন্য, সামাজিক চৈতন্য লেখকের খানিক অভিমতকে প্রভাবিত করে, নির্মাণও করে। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র ও তাঁর পাঠকদের যৌথ চৈতন্য-ই নির্মাণ করেছে তাঁর পরবর্তী অবস্থান। এক অর্থে যার ফসল *শেষ প্রশ্ন* উপন্যাসটি।

এবার আমরা *শেষ প্রশ্ন* (১৩৩৮-ব) দিকে নজর দেবো। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে এই উপন্যাসটি অনিয়মিত ভাবে *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। *ভারতবর্ষ*-এ প্রকাশের তারিখগুলো এই— ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-কার্তিক, মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন, ১৩৩৬ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩৭ সালের চৈত্র এবং শেষ কিস্তি ১৩৩৮ সালের বৈশাখ। অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত বিতর্কের সঙ্গে সঙ্গে এই উপন্যাসটিও *ভারতবর্ষ*-এ প্রকাশিত হয়। এই তথ্য বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এ উপন্যাসটি এক অর্থে সেই বিতর্কেরই ফসল এবং কেমন হবে ‘অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য’ তার-ই শরৎচন্দ্রীয় নমুনা বলা যেতে পারে। *শেষ প্রশ্ন* যখন *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই দুরকমের পাঠ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছিল। গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুরা যেমন ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তেমনি প্রগতিশীল পাঠকরা শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেন। রক্ষণশীল অংশ হয়তো মনে করেছিল শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিমত ও সহানুভূতি কমলের দিকেই ঢলে ছিল। এমনকি প্রকাশকের উপরেও তারা ক্ষুব্ধ হন, বাধ্য হয়ে শরৎচন্দ্র প্রকাশককে চিঠি লিখে আশ্বস্ত করেন।^{১১১} সংঘের লোকেরা *শেষ প্রশ্ন* লেখার জন্যে যে খুব খুশি হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় দিলীপকুমার রায়কে (১৮৯৭-১৯৮০) লেখা একটি চিঠি থেকে। শরৎচন্দ্র লিখছেন—

“শেষ প্রশ্ন প’ড়ে খুসি হয়েছে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। কারণ, খুসি হবার তো তোমাদের নিয়ম নয়।

প্রবর্তক সজ্জ এ বছর অক্ষয় তৃতীয়ায় আমাকে আর ডাকলে না। তারা অনুরোধ করেছিল বইয়ের মধ্যে

শেষের দিকে যেন আশ্রমের জয়গান করতে পারি। অথচ স্পষ্টই দেখা গেল পেরে উঠি নি।”^{১১২}

ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে নিকটজনদের কাছে শেষ প্রশ্ন প্রসঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন শরৎচন্দ্র। সে সব চিঠিপত্রের মধ্যে তিনটি চিঠিকে আমরা এখানে উল্লেখ করবো। ১৩৩৮-এর ৩০ বৈশাখ রাধারাণী দেবী (১৯০৩-১৯৮৯) ও দিলীপকুমার রায়কে এবং ৪ জৈষ্ঠ্য ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতকে (১৯০২-১৯৭২) লেখা চিঠি। লক্ষ্য করার বিষয়— এই চিঠিগুলিতে শেষ প্রশ্ন এবং ‘অতি আধুনিক সাহিত্য’ বিতর্কের কথাই উচ্চারিত হয়েছে। ফলত, এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, শেষ প্রশ্ন এবং ‘অতি আধুনিক সাহিত্য’ বিতর্ক কেবল কালগত ভাবেই একসঙ্গে চলেনি, বরং উপন্যাসটি ঐ বিবাদ বা বিতর্কেরই ফসল। সেই চিঠিগুলিতে কী মন্তব্য করেছেন শরৎচন্দ্র—

১। রাধারাণী দেবীকে লেখা চিঠির অংশ—

“...‘শেষ প্রশ্ন’ তোমার ভাল লেগেছে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। ভেবেছিলাম এ বই ভালো লাগবার মানুষ বাঙ্গলা দেশে হয়ত পাবো না; শুধু গালি-গালাজই অদৃষ্টে জুটব,...

অতি-আধুনিক-সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত, বুড়ো হয়ে এসেছি, শক্তি-সামর্থ্য পশ্চিমের আরালে ডুব দেবার আভাস অহরহ নিজের মধ্যে অনুভব করি, এখন যাঁরা শক্তিমান নবীন সাহিত্যিক, তাঁদের কাছে হেঁট হয়ে এইটুকু মাত্র বলে গেলাম।...”^{১১৩}

২। দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠির অংশ—

“শেষপ্রশ্নে অতি-আধুনিক-সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেছি। “খুব কোরবো, গর্জন কোরে নোঙরা কথাই লিখবো” এই মনোভাবটাই অতি-আধুনিক-সাহিত্যের সেন্ট্রাল পিভট নয়— এরই একটু নমুনা দেওয়া।...”^{১১৪}

৩। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতকে লেখা চিঠির অংশ—

“আরও একটা কথা মনে ছিল সে অতি-আধুনিক-সাহিত্য। ভেবেছিলাম এই দিকে একটা ইসারা রেখে যাবো। বুড়ো হয়েছি, লেখার শক্তি অস্তুগতপ্রায়, তবু, ভাবী-কালের তোমরা এই আভাসটুকু হয়ত পাবে যে নোঙরা না করেও অতি-আধুনিক সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল, পেলব রসানুভূতিই নয়, ইন্টেলেক্টে-এর বলকারক আহাৰ্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রস-সাহিত্যের একটা বড়ো কাজ। এরপরে তোমরাও যখন লিখবে তোমাদেরও অনেক পড়তে হবে, অনেক চিন্তা করতে হবে। শুধু চিত্তবিনোদনের হাঙ্কা ভারটুকু বয়ে দিয়েই অব্যাহতি পাবে না।”^{১১৫}

এই চিঠিগুলোর মধ্যে শরৎচন্দ্র আধুনিক সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত এবং তাতে তাঁর বিচারে কী থাকবে ও কী থাকবে না, তার প্রস্তাব রাখছেন। সেই প্রস্তাবগুলিকে পরপর সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করবো। কী প্রস্তাব রাখছেন শরৎচন্দ্র? এক, খুব গর্জন করে ‘নোঙরা’ কথা লিখলেই অতি-আধুনিক সাহিত্য হবে তা তিনি মনে করেন না। দুই, পাঠকের কোমল রসানুভূতির জারিয়ে তোলা অতি-আধুনিক সাহিত্যের কাজ নয়, বরং ইন্টেলেক্টের খিদে মেটানোও সাহিত্যিকের দায় এবং দায়িত্ব। ফলে চিত্তবিনোদনের উপযোগী গল্পের বদলে চিন্তার খিদে, চিন্তার প্রতর্কই তাঁর কাছে কাজিষ্কৃত। এই চিঠিপত্র ও শেষ প্রশ্ন-র মধ্য দিয়েই সাহিত্যে বাস্তবতা সংক্রান্ত বিতর্কে শরৎচন্দ্রের অভিমতটি স্পষ্ট হয়ে যায়। এই সময়পর্ব জুড়ে লেখা প্রবন্ধ, সাময়িক পত্রে প্রতিবাদী চিঠি ইত্যাদি পেরিয়ে শরৎচন্দ্র নিজের যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে স্পষ্ট অবস্থান নিলেন শেষ প্রশ্ন-র হাত ধরে। আধুনিক সাহিত্য নিয়ে চলা তর্কে

অংশগ্রহণের পাশাপাশি শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক নমুনা হাজির করার চেষ্টা করলেন, বোঝাতে চাইলেন এমন করেই অতি-আধুনিক সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত। যেখানে জীবনচিত্র বে-আব্রুও নয়, সেকারণেই তা সংগত। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোথায় সাহিত্যধর্মের সীমানা? তারই একটা নমুনা পেশ করলেন। এক অর্থে, শেষ প্রশ্ন কল্লোল বা কালি-কলম-এর লেখকদের সঙ্গে বিবাদী আলাপ (Critical Engagement)। যে কথাগুলো প্রবন্ধে বলা সম্ভব হয়নি বা সম্ভব নয়, সেটাই ‘রস’ সাহিত্যের মাধ্যমে উপস্থিত করতে চাইলেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে আন্তিক-নাস্তিক প্রতর্ক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এতো কথা বলার কী কোনো অর্থ আছে? ঈশ্বর সংক্রান্ত বিতর্ক কী শেষ প্রশ্ন-এ আছে? এসব প্রশ্ন ওঠা অযৌক্তিক নয়। আমরা এবার উপন্যাসের দিকে নজর দেবো। শেষ প্রশ্ন-এ আন্তিক ও নাস্তিক, এই দুই বিবাদী প্রস্থানের তর্ক হয়তো স্পষ্ট ভাবে নেই। কিন্তু ঐতিহ্য, পরম্পরা, স্বদেশী সংস্কৃতি-র সূত্রে এই তর্কটাকেই আখ্যানের মধ্যে চারিয়ে দিয়েছেন লেখক। আমরা দেখে নেবো বিবদমান দার্শনিক প্রস্থান দুটির সঙ্গে নৈতিকতা এবং আধুনিকতার সম্পর্ক কেমন? আর কেন শরৎচন্দ্র ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে এই তর্কটিকেই आधार করলেন? আশা শহরে কয়েকটি প্রবাসী বাঙালি পরিবারকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের চলন। তাদের মধ্যেই পরম্পরা, ঐতিহ্য, পশ্চিমী আধুনিকতা নিয়ে যে বিবাদ, বিসংবাদ, তর্ক তাই এই উপন্যাসের কাহিনি। শরৎচন্দ্র নিজেও স্বীকার করেছেন সে অর্থে ‘গল্প’ বস্তু এই উপন্যাসে নেই। আর সেকারণেই এই উপন্যাস অনেকের অপছন্দ এবং নিন্দিত^{১৬}। সে যাই হোক আমরা উপন্যাসের দিকে নজর ফেরাই।

আশুতোষ গুপ্ত, ‘বাঙালী সাহেব’ তাঁর শিক্ষিতা কন্যাকে নিয়ে আশ্রয় আসেন স্বাস্থ্য উদ্ধারের অজুহাতে। শিক্ষিত, অভিজাত, রুচিশীল আশুতোষবাবুর অর্থেরও অভাব নেই। আশ্রয় এসেই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে, প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় সারেন। সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে সেই আলাপ হৃদয়তায় পরিণত হয়। কথক সে বর্ণনা দেওয়ার মাঝে সংকোচবসত প্রবাসীদের না-জিজ্ঞাসিত বিষয় জুড়ে দেন গল্পের কাঠামোর মধ্যে। কী সে অনুক্ত প্রশ্ন— এরা হিন্দু অথবা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত।^{১৭} কথকের বর্ণনা থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি যে সমাজের বা ধর্মের লোক হন না কেন সামাজিক বন্ধন, সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। কথক পাঠককে জানাচ্ছেন—

“বাড়িতে মুসলমান বাবুর্চি থাকার ব্যাপারটা সকলে না জানিলেও এ কথাটা সবাই জানিত যে, এতখানি বয়স পর্যন্ত মেয়েকে অবিবাহিত রাখিয়া যিনি কলেজে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন তিনি মূলতঃ, যে সমাজেরই অন্তর্গত হউন, বহুবিধ সংকীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।”^{১৮}

অর্থাৎ কিনা আশুবাবু আধুনিক মনের অধিকারী। মূল কাহিনি (Storyline) শুরু করার আগেই, কথক জানান দিলেন এই উপন্যাসের একজন কেন্দ্রীয় চরিত্রের (Agent), ধর্মীয় (Religion), সামাজিক অবস্থান কেমন। এই বর্ণনা থেকে এটিও পরিষ্কার হয়ে গেল ‘আধুনিক’-এর মানদণ্ড হিসেবে কোন কোন শর্ত কথক পাঠকের সামনে রাখছেন। ধর্ম (Religion) ও সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে আশুবাবুর উদার অবস্থান তাঁর ‘আধুনিক’ হয়ে ওঠার শর্ত।

উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক পরিচিত হয়ে যায় বাকি চরিত্রগুলির সঙ্গে। আশুবাবুর প্রায় বিপরীত চরিত্র (Agent) হিসেবে অক্ষয় আসে উপন্যাসে, সে ইতিহাসের অধ্যাপক, নিষ্কলঙ্ক সাধু ব্যক্তি যে অপরের চারিত্রিক পবিত্রতা বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ। আরেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র (Agent) কমল, যে প্রায় র‍্যাডিক্যাল ‘আধুনিক’। সাক্ষাৎ উপস্থিতির পূর্বে কমল সম্পর্কে একটা ধারণা পাঠকের সামনে হাজির করে হরেন্দ্র, অক্ষয়। শিবনাথ আগে

কলেজে অধ্যাপনা করতো, তার চাকরি যায় মদ খাওয়া ও মাতলামো করা অপরাধে। শিবনাথ পূর্বের রুগ্ন, প্রায় পঙ্গু স্ত্রীকে ত্যাগ করে বিবাহ করে। সে নিয়ে তর্কাতর্কিতে জানা যায় কমল কেমন।

“অক্ষয় বহুক্ষণ কথা কহে নাই, এখন জিজ্ঞাসা করিল, এটির অক্ষর-পরিচয়টুকুও নেই বোধ হয়? শিবনাথ কহিল, অক্ষর-পরিচয়ের লোভে ত বিবাহ করিনি, করেছি রূপের জন্যে। এ বস্তুটির বোধ হয় তাতে অভাব নেই।”^{১১৯}

যে পরিচয় শিবনাথ সূত্রে আমাদের সামনে আসে, আর পাঠকের সঙ্গে কমলের প্রথম পরিচয় যখন ঘটে তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় কমল শিক্ষা, রুচি, মুক্তবুদ্ধির প্রশ্নে সকলের থেকে আলাদা। রূপের বাইরে তার স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে।

শেষ প্রশ্ন-এ স্পষ্ট করে নাস্তিকতা ও ঈশ্বর অবিশ্বাসের প্রসঙ্গ মাত্র দুবার আছে। কিন্তু আখ্যানের চলনে নীতি, নৈতিকতা, ত্যাগ ও ভোগ, সংস্কার, আচার, অতীত প্রেম ইত্যাদি প্রসঙ্গে আস্তিক ও নাস্তিক দার্শনিক প্রস্থানের তর্ক বারংবার পাঠকের সামনে হাজির করেছেন লেখক। আশুবারুর ‘আধুনিকতা’ সংকীর্ণতাবিহীন মুক্তবুদ্ধি, হরেন্দ্রর ‘নৈতিক পবিত্রতা’, প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে ‘আশ্রম’ প্রতিষ্ঠার প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়িয়েছে কমলের ‘আধুনিক’বোধ। প্রথাগত, প্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রত, চলে আসা ধারণাগুলির বিরোধিতা করেছে কমল। জাতির বা দেশের আদর্শের বিপরীতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে বিশ্বজনীন আদর্শের। সংসারের, সমাজে নারীত্বের অবমাননার বিষয়টিও এড়িয়ে যায়নি কমলের দৃষ্টি থেকে। যদিও তা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়, আমাদের আলোচনায় সে প্রসঙ্গ আসবে না। সেই দিক থেকেও শেষ প্রশ্ন উপন্যাসটি ‘পড়া’ জরুরি। এই সব প্রসঙ্গগুলিকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আমরা বুঝতে চাইবো কেন ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র পুরনো দার্শনিক তর্কটিকেই আধার করলেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো এই বিশেষ প্রতীকটি বাংলা সাহিত্য আন্দোলনের বিভিন্ন তর্কের মধ্যে কীভাবে ফল্গুধারার মতো ত্রিাশীল থেকেছে।

রুগ্ম স্ত্রীকে ছেড়ে শিবনাথের পুনরায় বিবাহ করায় বিরক্ত হরেন্দ্র বলে ওঠে— “বিবেক বলে কি আপনার কোথাও কিছু নেই শিবনাথবাবু?”^{১২০} উত্তরে শিবনাথ জানায়, বিবেক অর্থহীন বিষয়। মিথ্যে বিবেকের শিকলে বাঁধা পড়ে নিজেকে পঙ্গু করা তার দর্শন নয়। দুঃখকে সাথী করে বেঁচে থাকা তার উদ্দেশ্য নয়। কেনই বা সে অন্যের দুঃখের জন্যে নিজের জীবনকে দুঃখময় করে তুলবে। প্রসঙ্গত, চার্বাকদের সেই বহুল প্রচলিত শ্লোক আমাদের মনে আসবে। মাধবাচার্য *সর্বদর্শনসংগ্রহ*-এ চার্বাকদের পুরুষার্থ বিষয়ে লিখছেন—

“অঙ্গনাঢ্যালিঙ্গনাদি-জন্য-সুখমেব পুরুষার্থ। অর্থাৎ অঙ্গনার আলিঙ্গন, চুম্বন, মর্দন, প্রভৃতি জন্য এবং কাম্য বিষয়ের প্রাপ্তিজন্য সুখই পুরুষার্থ। এই সুখ দুঃখ-সম্মিলিত অর্থাৎ দুঃখ মিশ্রিত বলিয়া পুরুষার্থ-ই নহে; ইহা মনে করিবেন না। কারণ অবর্জনীয়রূপে প্রাপ্ত দুঃখের পরিহারের দ্বারা সুখমাত্রই সকলের ভোক্তব্য হইয়া থাকে।”^{১২১}

কামকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলে বলে স্বীকার করা ক্ষেত্রে প্রধান আপত্তি, কামজ সুখ সব সময়েই দুঃখ সম্পৃক্ত সে কারণে তা কখনই মুখ্য পুরুষার্থ হতে পারে না। এ আপত্তি প্রধানত আস্তিক দর্শন প্রস্থানগুলির, কারণ ভারতীয় আস্তিক দর্শন প্রস্থানগুলি প্রধানত যে প্রশ্ন নিয়ে চর্চা করেছেন তা হলো জীবন দুঃখময়, তা থেকে মুক্তির উপায় সন্ধানই তাদের লক্ষ্য। অর্থাৎ কিনা মোক্ষ। ফলত যে ধরনের সুখ আদতে দুঃখ সংলিঙ্গ তা কখনই চূড়ান্ত প্রাপ্তি বলে তারা স্বীকার করবেন না। সে কারণেই ধর্ম, অর্থ, কামকে পুরুষার্থ না বলে মোক্ষকেই পুরুষার্থ বলে স্বীকার করা হয়েছে। এমনকি ধর্মজনিত সুখকেও তারা চিরস্থায়ী বলে মনে করেন না। কামজ সুখ দুঃখ সংলিঙ্গ হতে পারে, সে কথা চার্বাকরাও মনে করেন। তার অর্থ এই নয় যে সুখকে

পরিহার করা। দুঃখের আশঙ্কায় সুখকে ত্যাগ করাও অমনুষ্যচিত। সেকারণে চার্বাক্যষ্টিতে বলা হয়েছে—

“বিষয় প্রাপ্তিজন্য সুখ দুঃখের দ্বারা সংসৃষ্ট বলে তা পুরুষগণের ত্যাজ্য হবে— এ ধরনের বিচার মূর্থতা পরিচায়ক। এই জগতে এমন কোন সুখার্থী আছে কি যে তুষযুক্ত ও কণাযুক্ত বলে সিতবর্ণের উত্তম তণ্ডুল যুক্ত ধান পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করবে?”^{১২২}

শিবনাথের স্বরে কী আমরা এই কথার প্রতিধ্বনি পাই? কেন সে বলে বিবেক অর্থহীন? বলাবাহুল্য, এ উপন্যাসে ‘বিবেক’ নামক ধারণাটির সংলগ্ন হয়ে থাকে সামাজিক ধর্মবোধ। কেবলমাত্র আত্মসুখের জন্য কেন আমি পীড়িতকে ছেড়ে আসবো। কিন্তু ভারতীয় দর্শন ধর্মকেও পুরুষার্থ বলে স্বীকার করে না। ধর্মবোধের জন্যে রুগ্ন স্ত্রীর সাহচর্য আদতে শিবনাথের দুঃখের কারণ হয়ে উঠবে। শিবনাথ সে পথের পথিক নয়। ‘সুখ’-ই তার পুরুষার্থ, যদিও সুখকে পুরুষার্থ বলে স্বীকার করার কারণেই চার্বাকরা একমাত্র নিন্দিত নয়। সকল দার্শনিক প্রশ্নান ‘সুখ’-এর খোঁজে রত, বিবাদের কারণ কোন সুখ শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে। বিবেকের প্রশ্নই যদি ওঠে তাহলে সংস্কার মুক্ত আশুবাবু শিবনাথের স্ত্রী সম্পর্কে এ মন্তব্য করতে পারতেন না যে—

“শিবনাথ যাই হোক, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্রলোক,—তঁর কথা আলাদা। কিন্তু সেই সূত্র ধরে কি এই মেয়েটির সঙ্গেও পরিচয় করা চলে? জাতের উঁচু-নীচু আমরা হয়ত তেমন মানিনে, কিন্তু বিভেদ ত একটা কিছু আছেই। বি-চাকরের সঙ্গে ত বন্ধুত্ব করা যায় না মা।”^{১২৩}

‘বিবেক’ নামক ধারণাটি সামাজিক ধর্মবোধ, প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় নৈতিকতার ঊর্ধ্বে স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ কোনো স্বয়ম্ভূ কোনো বিষয় নয়। ‘বিবেক’ গড়ে ওঠার নির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রেক্ষিত আছে। এখানে জাতপাতের ভেদাভেদের পাশাপাশি আশুবাবুর মনে স্থান পেয়েছে বৈদিক ও আর্থিক ভেদাভেদের ধারণা। সে কারণেই তঁর কুষ্ঠা। শেষাদি

‘আধুনিক’ আশুবাবু হয়তো মনে করেন এই বন্ধুত্ব ‘তাঁর’ সামাজিক অবস্থানে সংকটের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

তাজমহল দেখতে গিয়ে কমলের সঙ্গে পাঠকের প্রথম আলাপ। সেই প্রথম আলাপেই কমল যে অসহ্য হয়ে ওঠে একাংশের কাছে। তাজমহলের মধ্যে আশুবাবু উপলব্ধি করেন সম্রাট শাহজাহানকে, কেমন করে তাঁর অপরিসীম ব্যথা পাথরে মূর্ত হয়ে আছে। কীভাবে একনিষ্ঠ পত্নী প্রেম অমর হয়ে আছে এই সৃষ্টির মাধ্যমে। কমল শাহজাহানের সৃষ্টিকে দেখে শিল্পীর কল্পনার প্রকাশ হিসেব। সেখানে মমতাজ বা পত্নী প্রেম আকস্মিক সমাপতন মাত্র কিংবা প্রকাশের একটা উপলক্ষ্য। কমল মনে করে— “একদিন যাকে ভালবেসেছি কোনদিন কোন কারণেই তার পরিবর্তন হবার জো নেই, মনের এই অচল, অনড় জড়ধর্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।”^{১২৪} *বলাকা*-র সাত নম্বর কবিতাটির সঙ্গে কমলের কথার আশ্চর্য মিল লক্ষ করা। কমলের কথায় সেই স্বরই খুঁজে পাই যেন। মৃত্যু পত্নীর প্রতি ভালোবাসায় পুনর-বিবাহের উৎসাহ আশুবাবু আর পাননি। কমল কি তাকে মহৎ, দৃষ্টান্তযোগ্য আদর্শ বলে মনে করে? কিংবা আশুবাবুর ‘সংযম’কে কি সে আদর্শ বলে মানে? এর উত্তরে কমল যা বলে, সে কথায় চার্বাকপন্থীদের উপস্থিতি টের পাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

“কমল তাহার প্রতি চাহিল, কিন্তু তাহাকেই যে উত্তর দিল তাহা নয়। বলিল, একদিন স্ত্রীকে আশুবাবু ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই। তাঁকে দেবারও কিছু নেই, তাঁর কাছে পাবারও কিছু নেই। তাঁকে সুখী করাও যায় না, দুঃখ দেওয়াও যায় না। তিনি নেই। ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে, আছে কেবল একদিন যে তাঁকে ভালবেসেছিলেন সেই ঘটনাটা মনে। মানুষ নেই, আছে স্মৃতি। তাকেই মনের মধ্যে অহরহ পালন করে, বর্তমানের চেয়ে অতীতটাকে ধ্রুব জ্ঞানে জীবন-যাপন করার মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি ত ভেবে পাইনে।”^{১২৫}

চার্বাকরা পার্থিব পৃথিবীর অস্তিত্বে আস্থা রাখে, অপার্থিব, অতীন্দ্রিয় কোনো কিছুর প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই। তারা আত্মা, পূর্বজন্ম বা পরজন্ম মানে না। দেহাত্মবাদীরা মনে করে ইহলোকে দেহাবসানের সঙ্গে আত্মার অস্তিত্বও লুপ্ত হয়। বৃহস্পতি সূত্রে বলা হয়েছে— “পরলোকিনোহভাবাৎ পরলোকাভাবঃ (১৭), নাস্তি পরলোকঃ (২৯)”^{১২৬} একথা উল্লেখ্য যে কমলের কথার মধ্যে আত্মা, পরলোক প্রসঙ্গ নেই। তার মুখ্য আপত্তি বর্তমানের বদলে অতীতকে গুরুত্ব দেওয়ায়। যে নেই, কেবল স্মৃতিটুকুই আছে তাকে স্মরণ করে বাস্তবকে অস্বীকারের প্রবণতার মধ্যে কোনো প্রাণ নেই, আদর্শ নেই। আছে কেবল বাস্তবের দিকে বা বর্তমানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে জীবনকে অস্বীকার ও অতীতকে মহৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা। অতীতচারিতা ও নৈতিকতাকে সে বারংবার আক্রমণ করবে ভারতীয় অধ্যাত্ম আদর্শের প্রসঙ্গে। কমল মনে করে বৈধব্যের জীবন আসলে মিথ্যাকে সত্যের গৌরব দান। যেমন করে চার্বাকরা মনে ঈশ্বরের কল্পনা আসলে অলীক বা অবাস্তবকে লৌকিক বা বাস্তব করার উদ্যোগ। আমাদের দেশে মৃত স্বামীর প্রতি ভালোবাসা বৈধব্যে বা পুনরায় বিবাহ না করার মধ্যে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ কোনো বিধবা যদি পুনরায় বিবাহ করেন তাহলে পূর্ব স্বামীর প্রতি ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়। কমলের আপত্তি চার্বাকীয় লজ্জে বললে, অনেকটা এরকম দাঁড়ায় যার অস্তিত্ব নেই তার প্রতি ভালোবাসা আসলে মিথ্যা। যার অস্তিত্ব নেই (যাকে প্রমাণ করা যায় না, ঈশ্বর) তাতে বিশ্বাসের কোনো কারণ থাকতে পারে না। চার্বাকপন্থীরা বস্তু জগৎকে, পরিদৃশ্যমান জগৎকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেছেন। তাদের সমস্ত চিন্তা মানবকেন্দ্রিক, ঐহিক। এই বিচারের কমলের অবস্থানও দেহাত্মবাদী, ভূতচৈতন্যবাদীদের মতো। আধুনিক লজ্জে কমলের দর্শনকে আমরা মানবকেন্দ্রিক বলতে পারি। চার্বাকদের মতো সেও মনে করে মৃত স্বামীর প্রতি ভালোবাসার অঙ্গীকারে পুনরায় বিবাহ না করা কার্যত মিথ্যার

গৌরব, কারণ মৃতের কোনো অস্তিত্ব নেই। পুনর বিবাহ পূর্ব ভালোবাসাকে অস্বীকার করে না। নিজে শিবনাথের সঙ্গী (প্রথা মেনে তাদের বিবাহ হয়নি), ভালোবাসা চলে যাবার পর কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতাকে সম্বল করে শিবনাথকে বেঁধে রাখতে সে চায় না। তা বোঝানোর জন্য যে যুক্তির অবতারণা কমল করে সেটির সঙ্গে চার্বাকদের যুক্তির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কমল বলছে— “এই যেমন প্রাণও সত্য, দেহও সত্য, কিন্তু প্রাণ যখন যায়?”^{১২৭} প্রাণহীন দেহ যেমন অচেতন তেমনই ভালোবাসা ছাড়া দাম্পত্যও মৃত। তাকে অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়ে বেঁধে রাখা অমানবিক। এই কথোপকথনে অবিনাশ বলে— “কিন্তু তার আমরণ সংযত জীবনযাত্রাকে কি বিরাট পবিত্রতার মর্যাদাটাও দেব না?”^{১২৮} এর উত্তরে কমল ‘সংযম’ ও ‘পবিত্রতা’ এই শব্দ এবং ধারণার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ‘সংযম’ কিংবা ‘সংযত’ জীবনচরণ শব্দগুলো প্রেক্ষিত বিহীন ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যে, এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রই সম্মম, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। কমল প্রশ্ন তোলে বৈদ্যবের ‘সংযম’ কেন পবিত্র তার কারণ বুঝিয়ে না দিলে সে অপারগ। আশুবাবুকে বলে, যে মন সামনের দিকে চলতে পারে না। অবসাদ, জরাগ্রস্ত মন বর্তমান ও ভবিষ্যতকে অস্বীকার করে অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। বর্তমান যার কাছে অনাবশ্যক, অনাগত ভবিষ্যত অর্থহীন, সেই অতীত সর্বস্বতাকে কমল বিদ্রুপ করে। লক্ষণীয়, কমলের বক্তব্যের মধ্যে *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এর রোহিত রাজার উপাখ্যানের অনুরণন পাওয়া যেতে পারে। অসুস্থতার সংবাদ শুনে যখন রোহিত ঘরে ফিরে আসলেন তখন ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তাকে বললেন—

“অহে রোহিত, যে ব্যক্তি (পর্যটনদ্বারা) শান্ত হয়, তাহার নানা সম্পদ ঘটে, আর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও মনুষ্যসমাজে বসিয়া থাকিলে ক্লেশ পায়; যে চলিয়া বেড়ায়, ইন্দ্র তাহার সখা; অতএব তুমি বিচরণ কর।”^{১২৯}

ঐ উপাখ্যানে দেখা যায় ঘরে ফিরতে উদ্যত, স্থিত হতে চাওয়া রোহিতকে বারংবার ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র ‘চরৈবেতি চরৈবেতি’ প্রণোদনা জুগিয়েছে। একথা শিখিয়েছে চলার ক্লেশই অমৃতময়, সম্মুখপানে না চাওয়ার ‘সুখ’ আদতে মিথ্যা। চলাই ধর্ম, পথেই (চলিষুতাই) আনন্দ, বস্তুত ‘চরৈবেতি’-ই ব্রহ্ম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এর উপাখ্যানটির কেন্দ্রে হয়তো স্থিতি ও চলনের দ্বন্দ্ব কাজ করছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণকার/কারদের এই ভাবনার কেন্দ্রে ছিল জীবনের সমৃদ্ধির প্রশ্নটি, জীবনে সুখ অপেক্ষা শ্রমজনিত ক্লেশই জরুরি, শ্রমই শেষাঙ্গি সুখের উপায়। কমলের সঙ্গে এদের ভাবনার কিঞ্চিৎট অমিল রয়েছে। কমলের চলার প্রণোদনার কেন্দ্রে ক্রিয়াশীল জীবনের যাত্রার আকাঙ্ক্ষা, সুখ-সমৃদ্ধি সেখানে গৌণ। তার ভাবনা মূলত নৈতিকতা কেন্দ্রিক, প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত যান্ত্রিক স্থবিরতাপেক্ষা অপরীক্ষিত রাস্তা চলতে ইচ্ছুক। বিপরীতে ব্রাহ্মণকারদের ভাবনার কেন্দ্রে, মানব সভ্যতার প্রাথমিক চাহিদাই মুখ্য। প্রতিষ্ঠিত, বলা ভালো ধর্মাচারকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠিত নৈতিক স্থিতিবস্থাকে প্রশ্ন করছে কমল। চলার, অর্থাৎ নতুনকে গ্রহণ করা, অতীতচারিতা ইত্যাদি প্রশ্নে বৈদিক ভাবনার সঙ্গে কিছু প্রশ্নে অমিল থাকলেও মূলগতভাবে ঐক্যের সম্বন্ধ লক্ষ করা যায়। কেন অমূলক নয়? কেনই বা কমলের ভাবনার সঙ্গে ‘চরৈবেতি চরৈবেতি’ মিলিয়ে দেখতে চাই সে কথা কিছু পরে আমরা আলোচনা করবো।

এই তর্ক চলতে চলতে উঠে আসে কমলের সঙ্গে শিবনাথের বিবাহের প্রশ্নটিও। কথায়-কথায় জানা যায়, শিবনাথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় শৈব মতে। কিন্তু অবিনাশ জানায় আমাদের সমাজে শৈব মতে বিবাহ স্বীকৃত নয়। ফলে কমল ‘বিবাহিত’ কিনা তা একান্তভাবেই শিবনাথের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল। শিবনাথ অস্বীকার করলে তার কিছুই করার থাকবে না। স্বাধীন, নিজ অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন কমলের কাছে এ প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কমল সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক বন্ধনকে (প্রথাগত আনুষ্ঠানিক বিবাহবন্ধন) মানে না, সম্পর্কের বাঁধন তার কাছে

‘ভালোবাসা’য়। ফলে শিবনাথ তাকে অস্বীকার করলে সে ‘শৈবমতে’ বিবাহের আনুষ্ঠানিকতার বাঁধন দিয়ে তাকেই বাঁধতে যাবে? কমল বলে— “সত্য যাবে ডুবে”^{১৩০} আশুবারু মানেন যে, সত্য এই বিশ্ব সংসারে সবথেকে বড়ো কিংবা মহৎ বিষয়। কিন্তু অনুষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিকতা মিথ্যে নয়। আনুষ্ঠানিকতার আদি নিদর্শন আমরা বেদ ও পূর্ব মীমাংসা দর্শনের মধ্যে পাই। এই প্রসঙ্গে পূর্ব মীমাংসকদের সঙ্গে চার্বাকদের তর্কের দিকে ফিরে তাকাবো। বেদকে অস্বীকার করতে গিয়ে চার্বাকরা একপ্রকারের যুক্তি হাজির করে যে, বেদ কথিত কর্ম বা মন্ত্র অনেক সময়ে প্রার্থিত ফল আদায়ে ব্যর্থ হয়। সে কারণেই বৈদিক মন্ত্রটি চার্বাকদের কাছে মিথ্যা বাক্য। এই যুক্তির উত্তরে পূর্ব মীমাংসকরা বলেন, এতে মন্ত্রের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হয় না কারণ, প্রার্থিত ফল লাভ শুধুই মন্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। আরও কিছু জাগতিক শর্তপালনও আবশ্যিক, তবেই মন্ত্র ফলদায়ী। কী আসলে গুরুত্বপূর্ণ বৈদিক মন্ত্র না জাগতিক বস্তু জগত সে অন্য তর্কের বিষয় এবং জটিলও বটে। বলা বাহুল্য, ঐহিক প্রচেষ্টা ছাড়া মন্ত্র অসহায়। তেমনই মন্ত্র ও আনুষ্ঠানিকতা কমলের কাছে অপ্রয়োজনীয় ‘ভালোবাসা’ ছাড়া। আশুবারু মানেন, সত্য সবচেয়ে বড়ো কিন্তু তা বলে অনুষ্ঠানকে মিথ্যা বলা চলে না। বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বৈবাহিক অনুষ্ঠানকে মিথ্যা বলতে পারে না। কারণ সম্পর্ক তো মন্ত্রের বাঁধনে বাঁধা থাকে না, সম্পর্কের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় জাগতিক কয়েকটি শর্তের উপর দাঁড়িয়ে, সেই শর্ত পালন না হলে মন্ত্র ক্ষমতাহীন, কিন্তু মিথ্যা নয়। অর্থাৎ অনুষ্ঠান সত্য কিন্তু তা চিরকালই পরজীবী সত্য। অনুষ্ঠানকে পরজীবী সত্য বলার কারণ পরেই কমলের একটি মন্তব্য। খানিক চার্বাকীয় ঢঙে “কমল বলিল, মিথ্যে ত বলিলে। এই যেমন প্রাণও সত্য, দেহও সত্য, কিন্তু প্রাণ যখন যায়?”^{১৩১} দেহ সত্য আত্মাও সত্য, কিন্তু দেহাতীত আত্মা চার্বাকদের কাছে অলীক, অস্তিত্বহীন।

অজিত কমলের বাড়িতে উপস্থিত হয় নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে। কথা সূত্রে কমল দেখায় সারাদিন ধরে সে অজিতের জন্যে কী কী রেঁধেছে? এবং সে না এলে খাবারগুলো কমল মুচিদের ডেকে দিয়ে দিতো। অজিত জানায় তাতে খাবারগুলোর সদগতি হতো। শরৎচন্দ্র লিখছেন—

“অর্থাৎ আপনার অভাব নেই, হয়ত অধিকাংশই ফেলা যাবে,— কিন্তু তাদের অত্যন্ত অভাব। তারা খেয়ে বাঁচবে। সুতরাং তাদের খাওয়ানোই খাবারের যথার্থ সদব্যবহার, এই না?

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ ছাড়া আর কি!

কমল বলিল, এ হলো সাধু লোকদের ভালো-মন্দ বিচার, পুণ্যাত্মাদের ধর্মবুদ্ধির যুক্তি। পরলোকের খাতায় তারা একেই সার্থক ব্যয় বলে লিখিয়ে রাখতে চায়, বোঝে না আসলে ঐটেই হলো ভুয়ো। আনন্দের সুধাপাত্র যে অপব্যয়ে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ কথা তারা জানবে কোথা থেকে?”^{১৩২}

কমলের এই আরগুমেন্ট আমাদের কৌতূহলী করে। অজিতের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সে পাপ-পুণ্যে, ভালো-মন্দ বিচারবোধের বিপ্রতীপে হাজির করে আনন্দের অনুভূতিকে। আনন্দের অনুভূতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রশ্ন তোলে দীর্ঘদিন লালিত পরলোকের ধারণা সম্পর্কে। পরজন্মে কিঞ্চিৎ সুবিধে পাওয়ার লোভ দেখিয়ে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মে পুণ্যের জয়গাথাকে ও পাপ কর্মের নিন্দাকে ভুয়ো বলে দেগে দেয়। বলে দেয় কর্তব্যবোধের মধ্যে যে আনন্দ আছে বলে অজিত মনে করে তা আদতে আনন্দের ছলনা, তা দুঃখের অপর নাম। লক্ষণীয়, কমল যে প্রায় চার্বাকদের মতো পরলোক, পরজন্মের লাভ ক্ষতির খতিয়ানকে ভুয়ো বলে চিহ্নিত করছে; বেঁচে থাকার অর্থ হিসেবে মানুষের ‘আনন্দানুভূতি’-কে এক মাত্র শর্ত রূপে হাজির করছে; সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে এই প্রশ্ন তৈরি করছে না যে নাস্তিকের কাছে তাহলে ভালো-মন্দ অমূলক কিংবা অহেতুক একটা ধারণা? যা আমার মনে আনন্দ অনুভূতি জাগাবে তাই

শ্রেয় এবং প্রেয়? এই প্রশ্ন কি তোলা যায় যে, নাস্তিক মাত্র অনৈতিক বা নৈতিকতাবোধ রহিত একটা দার্শনিক অবস্থান? যেটি যৌথতার বদলে আত্ম সুখকেই একমাত্র আশ্রয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। কমলের অবস্থান এই প্রশ্ন তুলবে নাকি? যে পাপ-পুণ্য, পরজন্মের ধারণা যদি নাও বা মানি, সামাজিক ভালো-মন্দের বিচারকে অস্বীকার তো করা চলে না। প্রতিটি ‘আমি’ যদি কেবল মাত্র আত্ম-অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। কমলের দার্শনিক অবস্থান কি শেষ পর্যন্ত নৈতিকতার অবস্থানের বিরোধিতা করছে? সামাজিক নৈরাজ্যই কি তার আকাঙ্ক্ষা বা সমাধান? এককথায় এর উত্তর মেলা ভার। আপাতত উত্তরের অপেক্ষা না করে কমলের আরেক চারিত্র বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর ফেরাই।

কথোপকথন সূত্রেই পাঠক জেনে যান যে কমল কিন্তু ব্যক্তি জীবনে কৃচ্ছ্রসাধিকা। আদর্শ হিন্দু বিধবার অনেকগুলি কুল লক্ষণ তার যাপনের সঙ্গে যুক্ত। অজিত যখন তাকে জিজ্ঞেস করে—

“কিন্তু কি খাবেন আপনি?

ঐ যে। ঐই বলিয়া সে দূরে এনামেলের বাটিতে ঢাকা একটা বস্তু হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওর মধ্যে

আমার চাল-ডাল আর আলু সেদ্ধ আছে। ঐ আমার রাজভোগ।”^{১৩৩}

কিংবা যখন দেখে শুকিয়ে প্রায় বিবর্ণ হয়ে যাওয়া চাল-ডাল আর আলু সিদ্ধ কমলের আহাৰ্য, কমলের এই স্বেচ্ছা আত্মপীড়ন অজিতকে ব্যথিত করে। তार्কিক, যুক্তিবাদী ‘বাইরে’র কমলের সঙ্গে এই কমলকে মেলাতে পারে না অজিত। শরৎচন্দ্র লিখছেন—

“তাহার এই কঠোর আত্মসংযম অজিতের অভিভূত মুগ্ধ চক্ষুে মাধুর্য ও শ্রদ্ধায় অপরূপ হইয়া উঠিল, এবং বঞ্চনায়, অসম্মানে ও অনাদরে যে কেহ ইহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি ঘৃণার অবধি রহিল না।”^{১৩৪}

আশুবাবুদের কাছে তর্কিক, যুক্তিবাদী কমল ‘সংযম’ নামক ধারণাটিকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল, বলতে চেয়েছিল ‘সংযম’ বা ‘সংযত’ থাকা; বস্তুত মিথ্যাকে আসলে সত্যের গৌরব দেওয়ার চেষ্টা, সে কমলের মধ্যে অজিত খুঁজে পায় শ্রদ্ধার এহেন কুল লক্ষণকে। উপন্যাসে অন্তত একজনের কাছে হলেও কমল শ্রদ্ধা যোগ্য হয়ে ওঠে সেই কারণে যাকে কিনা সে মিথ্যার আরেক রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অথচ উপন্যাস জুড়েই অক্ষয়দের কাছে কমল নিন্দিত হয় প্রাতিষ্ঠানিক রুচি, নৈতিকতা, যৌনতার ধারণার বিরোধিতা করার জন্যে। শাস্ত্রের বিরোধিতার অর্থই হয়ে দাঁড়ায় কমল আদতে ‘ভোগ’-এর প্রচারক। কমলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাসের বিরুদ্ধে স্টোইকদের অভিযোগকে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস সম্পর্কে রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) তাঁর *History of Western Philosophy*-তে বলছেন সকলেই এপিকিউরাসের ছাত্র হতে পারতো, এমনি কী ক্রীতদাস রক্ষিতারা। সম্ভবত শেযোক্তদের কারণেই তিনি সামাজিক ভাবে এতো নিন্দিত। তাঁর এবং তাঁর সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রাও ছিল সাদাসিধে, কিছুটা দার্শনিক অবস্থানের কারণে কিছুটা আর্থিক কারণে। তাদের খাদ্য ও পানীয় ছিল রুটি আর জল। উৎসবের দিনে কিছুটা চাঁজ। এহেন মানুষ স্টোইকদের কাছে হয়ে ওঠেন ভোগবিলাসী।^{১৩৫}

“This is the life of which you pronounce yourself worthy: eating, drinking, copulation, evacuation and snoring.’ Book II, chap. xx, *Discourses of Epictetus*”^{১৩৬}

লক্ষণীয়, ঠিক হুবহু স্টোইকদের মত না হলেও কমলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি সঙ্গে কিছুটা মিল আমরা পেতে পারি। অভিযোগের প্রবণতাগুলো খানিক একই রকমের। এপিকিউরাস ক্রীতদাস ও রক্ষিতাদের তাঁর ছাত্রত্বের সম্মান দিতেন। প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতি, রুচি ও নৈতিকতার বিরোধিতা তাঁকে সমাজে প্রাস্তীয় করে তোলে। তাঁর লেখা প্রায় তিনশ’ বইয়ের হারিয়ে যায়, কয়েকটি টুকরো লেখা, কিছু চিঠি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। শেষ প্রশ্ন— এ কমলও আক্ষরিক ভাবেই আশ্রয় প্রাপ্তবাসী, সমাজের অভিজাত পল্লী থেকে কিছুটা দূরে তার বাসস্থান, মুচিদের পাড়ার কাছাকাছি। উপন্যাসে কমলও প্রতিষ্ঠিত রীতি, রুচি ও নৈতিকতার বিরোধিতা করার জন্যে নিন্দিত ও প্রাস্তিক।

অজিত কমলকে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। যদিও কিছু পরেই সে শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রতি অনীহা বিতৃষ্ণা জন্মেছে সন্দেহ নেই। কারণ কমলের নির্ভীক, নিলাজ উচ্চারণ। অজিত দর্শনগত ভাবে কমলের প্রতিপক্ষই, তার প্রশ্নের ধরনেও সেই বিশেষ দার্শনিক প্রস্থানের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। সে প্রশ্ন করে— “পাপিষ্ঠ শিবনাথের কাছে এই অপমান ও বঞ্চনা পাবার পরেই কি এই কৃচ্ছ অবলম্বন করছেন?”^{১৩৭} অর্থাৎ কিনা নারীর কৃচ্ছ সাধনের একমাত্র কারণ স্বামীর অবহেলা। যেমন করে আশুবাবু সংযত জীবনাচরণ করে গেছেন একমাত্র স্ত্রীর মৃত্যুর পর আরেকবার বিবাহ না করে। উত্তরে কমল জানায়, না, প্রথম স্বামীর মৃত্যুই ‘কৃচ্ছ’ ব্রত পালনের কারণ। এরপরের বাক্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, “অজিতের মুখের উপরে যেন কে কালি ঢালিয়া দিল।”^{১৩৮} যে কারণে আমরা বলেছিলাম কমল ও অজিত আদতে দুটি বিবদমান দার্শনিক অবস্থানের প্রতিনিধি। কমলের স্পষ্ট উচ্চারণ অজিতকে হতচকিত করে, মুখ কালো হয়ে যায়, কারণ তাকে সে দেবীর আসনে বসিয়ে ছিল সে কিনা আগেই বিধবা হয়। লক্ষণীয়, এরপরে কমলের দুর্দশাময় জীবন কাহিনি অজিতকে ব্যথিত করে না, বরং

কমল সম্পর্কে তার শ্রদ্ধা কিছুটা কমে যায়! যার দায় কিন্তু কমলের নয়। কমল জানায় তার পূর্ব স্বামী অসমিয়া খ্রিস্টান, বাবা মৃত্যুর পর আশ্রয় পায় শিবনাথের কাকার কাছে। সেই থেকে দুঃখ-কষ্টে একবেলা খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে। কৃচ্ছসাধনা বৈধব্যের কারণে নয়, আর্থিক দুর্দশার জন্যে। কথা সূত্রে অজিত জানতে পারে কমল তার বাবার মৃত্যুর তিন বছর পর আসামের চা-বাগানের বড় সাহেবের ঘরে জন্মায়। মুহূর্তের মধ্যে “পূর্বের স্নেহ ও শ্রদ্ধা-বিস্ফারিত হৃদয় বিতৃষ্ণা ও সঙ্কোচে বিন্দুবৎ হইয়া গেল।”^{১৩৯} লক্ষণীয় দ্বিতীয়বার অজিতের শ্রদ্ধাবোধে বাধার কারণ কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক রীতি, রুচি, নৈতিকতাবোধের বিপ্রতীপ আচরণ। কমল প্রতিষ্ঠিত, প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সবসময়েই তর্কে লিপ্ত থেকেছে। সেকারণে সে বলতে পেরেছে তার প্রকৃত বাবা (সম্ভবত বাগানের বড়ো সাহেব) ছিলেন ‘সাধু লোক’। চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, সততায় এমন মানুষ কমল কমই দেখেছে। জীবন, যৌনতা, নৈতিকতা নিয়ে কমলের ধারণা অক্ষয়দের না-পসন্দ হওয়াই তো স্বাভাবিক। সেকারণেই এপিকিউরীয়ান কিংবা চার্বাকদের মতো তার পরিচয় হয়ে উঠবে ‘ভোগবাদী’ এবং ‘উন্মাদযৌবনের’ স্তবগানে মুখর একজন মানুষ। বস্তুত, যে তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে শেষ প্রশ্ন-এর চরিত্রগুলি তর্কে বিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে— ক) কোন পথ শ্রেয় চিরন্তন ভারতীয় আদর্শ নাকি পশ্চিমী অনুকরণ? খ) চারিত্রিক নৈতিকতা গ) মুক্তির পথ কী? ত্যাগ না ভোগ অর্থাৎ পুরুষার্থ সংক্রান্ত সমস্যা, অজিত-কমলের কথোপকথনের মধ্যে তার সুর কিছুটা ধরা যায়। প্রত্যক্ষভাবে, আন্তিক-নাস্তিক বা ঈশ্বর বিশ্বাস, অবিশ্বাস প্রসঙ্গ না এলেও; আখ্যানের গড়ে ওঠায় পুরোনো প্রতর্কটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

গোটা উপন্যাসে মাত্র বার তিনেক ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার প্রসঙ্গ আছে। প্রথম দৃষ্টান্ত- আশুবাবু ও অক্ষয়ের সঙ্গে কমলের তর্ক হয়েছে, পরের অনুকরণে কল্যাণ নেই। ভারতীয় নারীর যা বিশিষ্টতা অপরের লোভে তা থেকে ভ্রষ্ট হলে সব দিক থেকেই আমরা ব্যর্থ হব।^{১৪০} এই প্রসঙ্গে তর্ক চলতে চলতে কমল এ প্রশ্ন রাখে কোনো দেশের বৈশিষ্ট্যের জন্যে মানুষের নয়, বরং উল্টো মানুষের জন্যেই বৈশিষ্ট্যের কদর। চিরকাল একই ছাঁচে মানুষ গড়ার অর্থ কি মানুষতাকেই অপমান করা নয়? এতে একটা বিপত্তি হতে পারে বলে আশুবাবুরা মনে করেন আমি যে ভারতীয় তা চেনার উপায় থাকবে কী করে? কমল জানায় ভারতীয় বলে চেনা না গেলেও মানুষ বলে বোঝা যাবে, আর এটাই জাতির সার্থকতা। কমল বলছে—

“তখন মুনি-ঋষিদের বংশধর বলে চেনা যাবে না, কিন্তু মানুষ বলে চেনা যাবে। আর আপনারা যাকে ভগবান বলেন তিনিও চিনিতে পারবেন, তাঁর ভুল হবে না।

অক্ষয় উপহাসে মুখ কঠিন করিয়া বলিল, ভগবান শুধু আমাদের? আপনার নয়?

কমল উত্তর দিল, না।”^{১৪১}

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত— আশুবাবু, হরেন্দ্র, নীলিমা, বেলা আড্ডার মধ্যে কমলের প্রসঙ্গ উঠে আসে। শুধু আশ্রমই নয়, সবারকমের ধর্ম প্রতিষ্ঠানের উপরেই তার ভারি রাগ। উপন্যাসে সে কথা বারংবার উঠে এসেছে। হরেন্দ্র আশ্রম প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে একটি আশ্রমের পরিচালক। সে বলছে—

“শুধু আমাদের উপরেই নয়, সর্ববিধ ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিই তাঁর অতন্ত্য অনুরাগ! ব্রহ্মচর্য বলুন, বৈরাগ্যের কথাই বলুন, আর ঈশ্বর সম্বন্ধেই আলোচনা হোক, শোনা মাত্রি অহেতুক ভক্তি ও প্রীতির প্রাবল্যে অগ্নিবৎ হয়ে ওঠেন। মেজাজ ভাল থাকলে মূঢ়-বুড়ো-খোকাদের ছেলেখেলায় আবার কৌতুকবোধ করতেও অপারক হন না। চমৎকার!

বেলা চুপ করিয়া শুনিতেছিল, কহিল, ঈশ্বরও ওঁর কাছে ছেলেখেলা?”^{১৪২}

তৃতীয় দৃষ্টান্ত— প্রাচীন ভারতের আদর্শ ও পরম্পরার অনুসরণ এবং অনুকরণ প্রসঙ্গে হরেন্দ্র বলে (যা আসলে কমলেরই যুক্তি) আমাদের পূর্বপুরুষদের বর্বরতাকে প্রাচীন অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়ে তো মেনে চলা যায় না। স্বভাবতই সতীশ ক্রুদ্ধ হয়। বলে—

“প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বর্বরের তুলনা হয় না হরেন্দ্র!

হরেন্দ্র বলিল, ... কিন্তু ওটা যুক্তি নয় সতীশ, ওটা গলার জোরের ব্যাপার।

সতীশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল, আপনাকেও যে একদিন নাস্তিকতার ফাঁদে পড়তে হবে এ আমরা ভাবিনি হরেন্দ্র।

হরেন্দ্র কহিল তুমি জান আমি নাস্তিক নই।”^{১৪৩}

এই তিনটি দৃষ্টান্ত খেয়াল করলে দেখা যাবে, বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে বৈরীতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ছে। এই মন্তব্য একটা প্রশ্ন তুলে দেয় ‘বিশ্বাস’ কি অ-যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত? বা ‘বিশ্বাসীর’ কোনো যুক্তি থাকতে পারে না? এবং কমল কি ‘অবিশ্বাসী’, যার মধ্যে কোনো কিছুকেই বিশ্বাস করার শক্তি নেই? বা ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে ‘বিশ্বাস’ নামক ধারণাটিকে কি সে অস্বীকার করে? এককথায় এর উত্তর মেলা ভার। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পরিসর এটা নয় এবং ঐ আলোচনা গভীর অভিনিবেশের দাবি রাখে। যে কথা না বললেই নয় যে, বিশ্বাসীরও নির্দিষ্ট যুক্তি বিন্যাস থাকে যেমন আস্তিক দার্শনিক প্রস্থানগুলির যুক্তি বিন্যাস একান্ত ভাবে বেদ আশ্রিত; তাদের মধ্যে বিতর্ক আছে বেদের ব্যাখ্যা নিয়ে কিন্তু, শেষ অব্দি তারা বেদকেই প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে। এই একটি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ নেই। অক্ষয়, আশুবাবুদেরও যুক্তি বিন্যাস প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরা নির্ভর, বিপরীতে

কমলের যুক্তি বিন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে প্রশ্ন করার রীতি, বিনাবাক্যে, প্রমাণ বিনা কোনো কিছুকে স্বতঃসিদ্ধ বলে না মানার রীতি। প্রসঙ্গত একথা বলা অমূলক হবে না যে, ইউরোপীয় চিন্তা-দর্শন এবং কিছুটা ভারতীয় নাস্তিক দর্শন প্রস্থানের চিন্তাধারা কমলকে প্রভাবিত করেছে। তার মুক্তমনা বাবা হয়তো তাকে এভাবে গড়ে তুলেছে। এই আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে বিবদমান দার্শনিক অবস্থানের দিকে ঠেলে দিয়েছে। চার্বাক সম্প্রদায় সম্পর্কে অপরাপর দার্শনিক প্রস্থানগুলোর অভিযোগ এরা তর্কিক, প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করে না। বেদকেও অশ্রান্ত বলে মানে না। সে কারণেই এরা নাস্তিক, পাষণ্ড। শেষ প্রশ্ন-এ কি সেই রীতির অনুবর্তন দেখা যায় না? হরেন্দ্র কেন নাস্তিক হিসেবে নিন্দিত হয়? হরেন্দ্র যে আশ্রম গড়ে তোলার উদ্যোক্তা সেখানেও তৈরি হয়েছে আশ্রমের আদর্শ নিয়ে দ্বিধা। এতে কমলের অবদান কম নয়। হরেন্দ্র, সতীশের আশ্রম ছাড়া কমল আর কিছুই দেখেনি। সে বলে, “চোখে কি সমস্তই দেখা যায়? আপনাদের আশ্রমে শ্রম করাটাই চোখে দেখে এলাম, কিন্তু বৃহৎ বস্তু লাভের ব্যাপারটা যে আড়ালেই রয়ে গেল।”^{১৪৪} আশ্রমের নিদারুণ কৃচ্ছ সাধন কী ফল দিলো সে বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত সতীশ কিংবা হরেন্দ্র দিতে পারে না। অতীতের যা কিছু নিত্য পূজনীয় তাকে তো আর উপেক্ষা করা চলে না। এই কথার উত্তরে কমলের অভিমতই জানায় হরেন্দ্র, বলে প্রাচীনতাই পূজনীয় হওয়ার একমাত্র কারণ হলে প্রাক-সভ্য যুগে পিতা-মাতাকে জ্যাক্ত মাটির তলায় পুঁতে ফেলার রিচুয়াল পালনীয় হওয়া উচিত। তখন সতীশ বলে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বর্বরের তুলনা হয় না। খেয়াল করার বিষয় তর্কের মূল পয়েন্ট ছিল প্রাচীনতা অর্থাৎ অতীতের রীতি-নীতি, আচার-বিচার তাকে অবমাননা করা উচিত নয়। সেই সূত্রেই বিশেষ প্রাচীন রিচুয়ালের প্রসঙ্গটি তোলে হরেন্দ্র (যা আদতে কমলের যুক্তি)। উত্তেজিত সতীশ তাকে নাস্তিক বলে তিরস্কার করে। আমরা যদি এককথায় বলার চেষ্টা করি, যুক্তি ও বিশ্বাসের

দ্বন্দ্ব বা বৈরীতামূলক সম্পর্ক-ই এ উপন্যাসের মুখ্য দ্বন্দ্ব। কাহিনি ও চরিত্রগুলির (Agent/Actant) চলনে সেই দ্বন্দ্ব-ই ক্রিয়াশীল থেকে। তাহলে কি এই উপন্যাস কিংবা কমলের অভিমত আমাদের এই সংকটের মধ্যে ঠেলে দেয় তार्কিক বা যুক্তিবাদী^{১৪৫} মানেই অ-বিশ্বাসী? তাহলে কি একথা বলা যায় কমল ‘না’-এ বিশ্বাসী? কমল আশুবাবুদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু মানবিক অভিজ্ঞানে বিশ্বাসী। বিশ্বাসী না বলে, আরও সুনির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করা যায়, আস্থা। কমল তার অবস্থানে আস্থাশীল, প্রচলিত প্রাচীন ভারতীয় ধারণার সঙ্গে যার বিরোধের সম্পর্ক।

শেষ প্রশ্ন প্রসঙ্গে তিনটি চিঠির কথা আমরা উল্লেখ করেছিলাম। দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিটি আরেকবার উল্লেখ করবো। শরৎচন্দ্র লিখছেন—

“শেষ প্রশ্ন প’ড়ে খুসি হয়েছে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। কারণ খুসি হবার তো তোমাদের নিয়ম নয়। প্রবর্তক সঙ্ঘ এ বছর অক্ষয় তৃতীয়ায় আমাকে আর ডাকলে না। তারা অনুরোধ করেছিল বইয়ের মধ্যে শেষের দিকে যেন আশ্রমের জয়গান করতে পারি। অথচ স্পষ্টই দেখা গেল পেরে উঠি নি।”^{১৪৬}

শরৎচন্দ্র যে আশ্রমের জয়গান গাইতে পারেননি এই চিঠিই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। এবং আশ্রমিকদের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ বিদ্রূপও প্রকাশ পেয়েছে উদ্ধৃত দ্বিতীয় বাক্যটির মধ্যে। আমরা চিঠিটি ফিরে পড়তে চাইছি এই কারণে যে, শেষ প্রশ্ন-এ আশ্রমের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কমল তর্কে জড়িয়ে যায়, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমের আদর্শের অনুকরণ। হরেন্দ্র, সতীশরা মনে করতো শাস্ত্রবচনের মাধ্যমে একদিন ভারত জগতের শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, এর জোর ও প্রেরণা এসেছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এতেই দেশের-দেশের মঙ্গল, দেশোদ্ধার যদি কখনো সম্ভব হয় তবে এই পথেই হবে। বলা বাহুল্য, কমল প্রাচীন ভারতের অনুকরণে বিরোধিতা করে। আশ্রমের ভাবাদর্শও আক্রমণের মুখে পরে।

আমরা আগেই বলেছিলাম, আন্তিক-নাস্তিক প্রতর্ক প্রকাশ্যে এই উপন্যাসে নেই কিন্তু আশ্রমের আদর্শকে কেন্দ্রে রেখে সেই প্রতর্ক উঠে এসেছে শেষ প্রশ্ন-এ। কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

এক, “শিশুদের নিয়ে প্রচণ্ড আড়ম্বরে এই নিষ্ফল দারিদ্র্যচর্চার নাম কি মানুষ গড়া হরেনবাবু? এরাই বুঝি সব ব্রহ্মচারী? এদের মানুষ করতে চান ত সহজ পথ দিয়ে করুন,— মিথ্যে দুঃখের বোঝা চাপিয়ে অসময়ে কুঁজো করে দেবেন না।”^{১৪৭}

দুই, “কার থেকে মুক্তি, হরেনবাবু? ক্রিবিধ দুঃখ থেকে, না ভাববন্ধন থেকে? কোনটাকে দেশের একমাত্র কল্যান স্থির করে আশ্রম-প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত বলুন ত? ... বলুন সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্যের-সাধনা আমাদের নয়, আমাদের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা। কিন্তু তার শিক্ষা কি ছেলেদের এই? গায়ে মোটা জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, পরনে জীর্ণবস্ত্র, মাথায় রুম্বকেশ, একবেলা অর্ধাশনে যারা কেবল অস্বীকারের মধ্যে দিয়েই বড় হয়ে উঠছে, পাওয়ার আনন্দ যার নিজের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল,”^{১৪৮}

কমল সাধারণ জীবন ধারণ করলেও, মনে করে সখ করে দারিদ্র্যাপনের মধ্যে মুক্তি নেই। এই ভাবনার সঙ্গে ‘ত্যাগ’-এর মহিমা যুক্ত করলেই আশ্রমের আদর্শ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে না, বরং আদর্শের দারিদ্র, চিন্তার দারিদ্র ও আশ্রমের দারিদ্রকে প্রতিষ্ঠা করে। এক ঐতিহাসিক কাল পর্বে গড়ে ওঠা দর্শনকে যে কোনো সময়ে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব আছে। সে মনে করে ‘ত্যাগ’-এ মহিমা থাকতে পারে, কিন্তু সত্য নেই। সত্যকে আপন করতে তারা অক্ষম। এখানেই ফিরে আসে নৈতিকতার প্রশ্ন। ভারতীয় দর্শন মুখ্যত যে প্রশ্নটি নিয়ে চর্চা করেছে তা হলো দুঃখের নিবৃত্তি কীভাবে হবে? অর্থাৎ মুক্তির উপায় কী? মুক্তির উপায় বাতলাতে গিয়ে আন্তিক দর্শন প্রশ্নানগুলি ইহজাগতিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিকে সামনে আনে। মূলত ইউরোপে বিস্ময় বা জিজ্ঞাসা থেকেই দর্শনের (Philosophy) জন্ম, কিন্তু ভারতে

তা নয়। জীবনে নৈতিক ও ঐহিক গ্লানির কারণেই, এক অর্থে বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরেই দর্শনের জন্ম। ফলত, নৈতিক সংকট-ই প্রাচীন ভারতীয় দর্শন প্রণেতাদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল। তাঁরা খুঁজে ছিলেন কী উপায়ে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মুক্তির সঙ্গে মোক্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, প্রায় সমস্ত দর্শন প্রস্থানগুলি মোক্ষ বলতে এমন এক কাল্পনিক অবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন, যেখানে পৌঁছালে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় দর্শন নীতিবিদ্যা নিয়ে সচেতন এক অর্থে, নৈতিক ও ঐহিক গ্লানিই দর্শন প্রস্থানগুলির গড়ে ওঠার কারণ, অথচ স্বতন্ত্র নীতিবিদ্যার প্রস্থান গড়ে ওঠেনি। আশ্রমের আদর্শের মাধ্যমে যে বিশেষ নৈতিক আদর্শকে চারিয়ে দেওয়া হচ্ছিল সমাজের মধ্যে কমল তার বিরোধিতা করে। কমলের বয়ানে আমরা জানতে পারি—

“আপনার আশ্রমের ফিলসফি আমি বুঝিনে, কিন্তু এটা বুঝি, দৈন্য-ভোগের বিড়ম্বনা দিয়ে কখনো বৃহৎকে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু খানিকটা দম্ব আর অহমিকা। সংস্কারের অঙ্ক না হয়ে একটুখানি চেয়ে থাকলেই এ বস্তু দেখতে পাবেন,— দৃষ্টান্তের জন্যে ভারত পর্যটন করে বেড়াতে হবে না।”^{১৪৯}

যে তপোবনের আদর্শে হরেন্দ্ররা আশ্রম তৈরি করতে চায়, যা প্রাচীন সভ্যতার দান; আশুবাবুর মতে যাকে নতশিরে গ্রহণ করার মধ্যেই দেশের চরম সার্থকতা, যা কিনা দেশের কল্যাণের পথ। এই প্রসঙ্গে আমরা যদি *ঈশ উপনিষদ*-এর প্রথম মন্ত্রটি দিকে নজর ফেরাই, তাহলে কমলের দার্শনিক অবস্থানটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। *ঈশ উপনিষদ*-এ উচ্চারণ করা হচ্ছে—
“তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা / মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।” অর্থাৎ ত্যাগের অনুশীলন করো এবং সর্বভূতের চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও। অপরের ধনে লোভ করো না।^{১৫০} এই মন্ত্রের শাক্তরভাষ্য হলো—

“কিন্তু কিভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব? ত্যাগের অনুশীলন দ্বারা। সর্বদা মনে রাখতে হবে এই জগৎ এবং তার নানা প্রলোভন সত্য নয়; সত্য নয় এই অর্থে যে তা অনিত্য। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, কারণ ব্রহ্ম

অবিনশ্বর। অনিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা চিরতরে ত্যাগ করে ব্রহ্মে মনকে একাগ্র করতে হবে। আমরা সোনা দেখে মুগ্ধ হই, কিন্তু তা নশ্বর। যা ক্ষণস্থায়ী তার পেছনে ছোটা, অপরের ধনে লোভ করা বা নিজের ধনেও আসক্ত হওয়া উচিত নয়। যিনি জানেন এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী, তাঁর কাছজে ধনসম্পদ ও ইন্দ্রিয়সুখ নিতান্তই তুচ্ছ। ব্রহ্মকেই একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলে জানতে হবে।”^{১৫১}

কমল যে কেবল আশ্রমের বিরোধিতা করল তাই নয়, ভারতীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ঈশ উপনিষদ-এর প্রথম মন্ত্রটির শাক্তরভাষ্যকে খারিজ করার স্পর্ধা দেখালো। যে উপনিষদের মন্ত্রে বিশ্বাস রাখে না, ‘নাস্তিক’ ভিন্ন অন্য কোনো শব্দ তার জন্যে ভারতীয় শব্দ কোষ বরাদ্দ করেনি। চার্বাকীয় পদ্ধতিতে কমল বলে দৈন্য ভোগের বিড়ম্বনা কখনো বৃহৎকে পাওয়ার উপায় হতে পারে না। খেয়াল করার বিষয়, ‘ত্যাগ’ ও এক অর্থে ‘ভোগ’। পার্থিব জগতকে অস্বীকার করে যে ‘সুখ’ (যার সঙ্গে মোক্ষ সম্পর্ক) পাওয়া যায়, তার মধ্যে স্ফূর্তি নেই, কমলের মতে তা অকারণ ক্লেশ ‘ভোগ’-এর নামান্তর। যাকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় আত্ম ক্লেশ ‘ভোগ’ সুখ, যাকে ‘ত্যাগ’ নামে চিহ্নিত করা হয়। মুক্তি অনাস্বাদিত থেকে যায়, কেবল জোটে মিথ্যা মুক্তির অহমিকা। সে পথে দেশের মুক্তি সুদূরপর্যন্ত, এমনটাই কমলের মত।

শেষ প্রশ্ন-এ সত্য ও মিথ্যা নিয়ে কিছু দার্শনিক কথা ঘনিষ্ঠে তুলেছে কমল, অজিতরা। দুটি প্রসঙ্গের কথা আমরা উল্লেখ করবো, ঘটনাচক্রে দুটি প্রসঙ্গই কমলের প্রেম, ব্যক্তিগত জীবন এবং অজিতের সঙ্গে না-হয়ে ওঠা সম্পর্ক কেন্দ্রিক। অজিত মনে করে, সে মোহের বশে কমলকে প্রার্থনা করেছিল, চেয়েছিল মিথ্যে দিয়ে ভোলাতে। অথচ কমল তাকে উপেক্ষা করেনি। কমল উত্তরে জানায়— “মিথ্যের কথা ত হয়নি অজিতবাবু, মোহের কথাই হচ্ছিল। ও দুটো এক বস্তু নয়।”^{১৫২} প্রায় দার্শনিকসুলভ বাচনে কমল স্পষ্ট জানায় ‘মিথ্যা’ এবং ‘মোহ’

দুটি আলাদা বিষয়। আর সত্যি যদি মোহের বশে কাউকে ভোলাতে চান, সে নিজেকেই। এই সূত্র ধরেই আমরা পৌঁছে যাবো ঐ তর্কটিতে। নারীর ভালোবাসাকে অর্জিত সত্য বলে জানে আর নারীর রূপের প্রতি অচেতন বুদ্ধির মোহকে ততবড়ো মিথ্যা বলে চিহ্নিত করে। উপমার আশ্রয়ে বলে— “কমল, কুহেলিকা যত বড়ো ঘটা করেই সূর্যালোক ঢেকে দিক তবু সে-ই মিথ্যে। সূর্যই ধ্রুব।”^{১৫৩} এর উত্তরে কমল ‘সত্য’ সম্পর্কে আমাদের চিরায়ত ধারণাটির মূলগত ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন রাখে। সরাট, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিমায় জানায়—

“কোন্ আদিম কালে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সে তেমনি বিদ্যমান। সূর্যকে সে বার বার আবৃত করেছে এবং বার বার আবৃত করবে। সূর্য ধ্রুব কিনা জানিনে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়নি। ও দুটোই নশ্বর, হয়ত ও দুটোই নিত্যকালের। তেমনি, হোক মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণ ত মিথ্যে নয়!”^{১৫৪}

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে, বলা ভালো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানব সভ্যতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই মানুষ, দীর্ঘকালের অর্জিত জ্ঞানকে আরেকবার করে প্রশ্ন করতে শুরু করলো। দর্শনে ব্রহ্ম কিংবা অসীমের একটা মেটাফিজিক্যাল তাৎপর্য আছে। ভারতীয় আন্তিক দর্শন প্রস্থানগুলি তার সাক্ষ্য দেয়। এই মহাবিশ্ব, মহাকাল, চিরন্তন অবিনশ্বরতার মেটাফিজিক্যাল তাৎপর্যের বাইরে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করলো মানুষ। যা মানুষের সামনে এই সিদ্ধান্ত হাজির করলো যে, শুধু প্রাণীদের, পৃথিবী, সূর্যর নয়, এই মহাবিশ্বের এমনকি মহাকালেরও একটা জন্ম মৃত্যু আছে। সম্ভবত মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন ‘সংশয়’-এর ধারণা এক অর্থে প্রতিষ্ঠা পেল বিশ্বব্যাপি যুদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলির হাত ধরে। সেই চিন্তার প্রতিফলন কি আমরা শেষ প্রশ্ন-এ কমলের জবানিতে পাই না? লক্ষণীয়, কমল ‘সত্য’ বলে যাকে চিহ্নিত করেছে তা কি ‘Truth’? না কি

‘সত্য’ বলতে সে ‘Fact’-কে বোঝাচ্ছে? কমলের জবানে ‘সত্য’ (Truth)-ই সংশয়ের মুখে পড়ছে। অজিত ‘সত্য’ বলতে বুঝিয়েছে মঙ্গলময় ধারণাকে। আর সেকারণেই সেখানে আলোর উপমা স্থান পেয়েছে, সেই উপমার মধ্যে ঐশ্বরিক মঙ্গলময়তার ছাপ রয়ে গেছে। ‘মিথ্যা’-র সঙ্গে যার বিরোধের সম্পর্ক। সে কারণে ‘মিথ্যা’-র রূপক কুহেলিকা। কমল বরং আধুনিকের মতো সত্য ও মিথ্যার দ্বৈততার (Binary) উর্দ্ধে গিয়ে এই ঘটনাক্রমকে দেখতে চেয়েছে। সেকারণে তার কাছে সূর্যালোক সত্য এবং কুহেলিকার কুহকও সত্য। সেকারণে সূর্য ও কুহেলিকা তার কাছে অবিনশ্বর নয়। হয়তো দুই-ই নিত্যকালের কারণ নিত্যতারও লয় আছে। দুটিই প্রাকৃতিক ঘটনা। আমরা নিশ্চিত করে জানি না তৎকালীন বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে শরৎচন্দ্র কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন, অনুমান করা যেতে পারে এসব তাঁর অগোচর ছিল না। কমলের সত্য-মিথ্যা মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরিচালিত নয়। মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েই সত্য, সেকারণে কমল বলে— “ক্ষণও ত মিথ্যে নয়!”^{১৫৫} উভয়ের সংযোগেই আনন্দময় নশ্বর পৃথিবী। ক্ষণিকের আনন্দ নিয়ে সে বারবার প্রকাশিত হবে। সেকারণে কমলের বস্তুবাদী বীক্ষণ সমালোচিত ও ধিকৃত হয় ‘নির্বিকার’ বলে। আমরা দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির দিকে নজর দেবো। উভয়ের থিতু না হওয়া সম্পর্ক প্রসঙ্গে অনুযোগের স্বরে অজিত কমলকে বলেছে— “কিন্তু অধিকারের দাবী তুমি করলে না, চাইলে শুধু তাই যা বুদবুদের মত স্বপ্নায়ু এবং তারই মতো মিথ্যে।”^{১৫৬} আগের দৃষ্টান্তটির ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম অজিতের সত্য আসলে মঙ্গলময়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে অজিত ‘সত্য’-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্যকে পাঠকের সামনে হাজির করছে তা হলো দীর্ঘস্থায়ীত্ব। সত্য চিরন্তন, শাস্ত্রত; ‘মিথ্যা’-ই ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণিকের চাহিদা কিংবা ক্ষণস্থায়ী ঘটনা ‘সত্য’ হতে পারে না, ‘সত্যি’ তা ঘটেছিল কিন্তু সে বুদবুদের মতো মিথ্যা। অজিতের ‘সত্য’(Truth)-এর ধারণার সঙ্গে লগ্ন থাকে মঙ্গলময়তা ও দীর্ঘস্থায়ীত্বের বোধ। বস্তুত, অজিতের এই ধারণার

পেছনে রয়েছে আস্তিক বিশ্ববীক্ষা। পাশ্চাত্য শিক্ষা, বস্তুবাদী ভাবনা এবং ইতিহাসের সূত্রে কমল জানে শুধু পৃথিবীই নয়, এই ব্রহ্মাণ্ড-ও চিরজীবী নয়, ফলত স্বপ্নায়ু, ক্ষণিক বুদ্ধবুদ্ধ কিংবা কুহেলিকা তার কাছে মিথ্যা হয়ে যায় না। তা ‘সত্য’রূপেই তার চেতনাকে ভরিয়ে তোলে। সে কারণে— কমল তার অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য গাছের ফুল ও সোনার ফুলের তুলনা হাজির করে, আরও বলে হৃদয় বস্তুটা লোহার নয়, ফলে নির্ভয়ে তার উপরে ভার দেওয়া চলে না। খেয়াল করা বিষয় তার ‘সত্য’-এর সঙ্গে সজীবতার সম্পর্ক, তা যতই ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন! বস্তুবাদী বা নাস্তিকদের মতো তার কাছে স্বপ্নায়ু আনন্দই মানব জীবনের চূড়ান্ত সঞ্চয়। দীর্ঘ লালিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতায় আঘাত পেয়ে অজিত মনেমনে বলে ওঠে— “পৃথিবী জুড়িয়া সমস্ত মানব-জাতির এই প্রাচীন ও পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি এতবড় অবজ্ঞায় অজিতের মন ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল।”^{১৫৭} এই তর্কে অজিত রেগে গিয়ে বলে উঠবে— আসলে তুমি আমাদের আপনার নও। কোন আমাদের? যারা প্রাচীন ভারতের আদর্শ মেনে চলে, যারা প্রাচীন আশ্রম জীবনে ফিরতে চায়। কেন কমলের অবস্থান বেমানান? কারণ তার শিক্ষার মধ্যে ইউরোপ আছে, বেদবাক্যে বিশ্বাস তার নেই। এই দুই বিবদমান পক্ষের মিল হওয়া অসম্ভব। একপক্ষের কাছে ‘সত্য’ চিরন্তন সূর্যের মতো এবং তা মঙ্গলময়। তাদের কাছে ‘সত্য’ অপরিবর্তনীয়। কমলের ‘সত্য’ শাস্ত্রতের কাছে দাসখণ্ড লিখে রাখেনি। ক্ষণজীবন তার কাছে সত্য রূপে প্রতিভাত হয়। তা পরিবর্তিতও হতে পারে, সর্বদা মঙ্গলময় নাও হতে পারে, বস্তুত সজীবতাই তার কাছে সত্য। অনেকটা *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এর চরৈবেতি মন্ত্রের মতন। আস্তিক দর্শন গ্রন্থানগুলির Truth (সত্য)-এর ধারণাটিকে এক নিমেষে ধুলিসাৎ করে দিয়ে ‘সত্য’-এর নতুন সংজ্ঞা তৈরি করতে চায়। ‘সত্য’ মানে তার কাছে Fact।

আমরা আগেই বলেছি ভারতীয় দর্শনে চার্বাকদের নীতিচিন্তায় বিতর্কিত বক্তব্য হলো পুরুষার্থ সংক্রান্ত। এই প্রসঙ্গে নজর দেবো আশুবাবুর সঙ্গে কমলের ‘ত্যাগ’ ও ‘ভোগ’ বিষয়ে আলোচনাটির দিকে। উপন্যাসে এই আলোচনা যখন চলছিল সেখানে কমল নিজে অনুপস্থিত, আশুবাবুই আগে কমলের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের স্মৃতিচারণ করছিলেন। সেই সূত্রেই আমরা এই বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত হই। বৈধব্যের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আশুবাবু কমলকে জানান— “হিন্দু-সভ্যতার মর্মবস্তুটির সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকলে আজ হয়ত বুঝিয়ে দিতে পারলাম যে, ত্যাগ ও বিসর্জনের দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করাই আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা...”^{১৫৮} আশুবাবু মনে করেন ভোগ নয় ত্যাগ ও বিসর্জনের দীক্ষাই হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ দীক্ষা। কমল উত্তরে জানায়—

“আত্মোৎসর্গ কথাটায় একটু বহুব্যাপ্ত ও বহুপ্রাচীন পারমার্থিক মোহ আছে, তাতে নেশা লাগে, পরলোকের অসামান্য-অবস্থা ইহলোকের সঙ্কীর্ণ সামান্য বস্তুকে সমাচ্ছন্ন করে দেয়, ভাবতেই দেয় না ওর মাঝে নরনারী কারও জীবনের শ্রেয়ঃ আছে কিনা।”^{১৫৯}

কমল তখন বলে বাবা বলতেন,

“মানুষকে নিঃশেষে শুষে নেবার দুরভিসন্ধি যাদের তারাই অপরকে নিঃশেষে দান করার দুর্বুদ্ধি যোগায়।

দুঃখের উপলব্ধি যাদের নেই, তারাই দুঃখ বরণের মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

বললাম, কমল, তোমার বাবা কি তোমাকে কেবল নিছক ভোগের মন্ত্রই দিয়ে গেছেন?...

ভোগের ক্ষুধা ত মেটে না,— অতৃপ্তি নিরন্তর বেড়েই চলে। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন ও

পথে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, মুক্তির আশা বৃথা।”^{১৬০}

ভারতীয় নৈতিকতার মূল স্রোতের নিরিখে চার্বাকদের সবচেয়ে বিতর্কিত বক্তব্য হল পুরুষার্থ সংক্রান্ত। তাদের কাছে কামই পুরুষার্থ। অন্যান্য দার্শনিক প্রস্থান দীর্ঘদিন ধরে একে সংকীর্ণ

অর্থেই ব্যাখ্যা করেছেন। সুখ লাভ করাকে চার্বাকরা পুরুষার্থের সাধন বলে মনে করেনি। যে ধরনের সুখে মানুষতার চিহ্ন আছে সে সুখ-সাধনাই তাদের অভিপ্রেত। কাম/সুখকে পুরুষার্থ বলে স্বীকৃতি দেবার অর্থ একথা বলা যে তা সকলের প্রাপ্য। বলাই বাহুল্য, তা কখনই স্থূল আত্মকেন্দ্রিক সুখ নয়। আশুবাবু এরপর মহাভারত থেকে উদ্ধৃত করে বলেন— “ন জাতুকামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষংবর্জ্যেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।।”^{১৬১} এই শাস্ত্র বাক্য শুনে কমল পাঁচটা যুক্তি দেয় যে জ্ঞান চর্চায় জ্ঞান লাভের ইচ্ছে বেড়ে যায় তেমনই পুণ্যানুশীলনে পুণ্যের উদগ্র বাসনা বৃদ্ধি পায়। শাম্যতি নেই বলে তাঁরা আক্ষেপ করেননি, তাঁদের বিবেচনা ছিল বলতে হবে।

এই কথাবার্তা বা তর্ক চলতে চলতে আশুবাবু ফিরে গেলেন কমলের জীবনে। তার আগে বললেন তাঁরা (ঋষিরা) এই কথা বলতে চাননি, বোঝাতে চেয়েছেন ভোগের তৃপ্তি হয় না। কামনার নিবৃত্তি নেই ফলে ভোগের অনুশীলন থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করাই আসল। তাঁরা বলতে চেয়েছেন রিপুকে জয় করাই আসল বিষয়। এই তর্কে কমল দুটি প্রশ্ন রাখে— এক, তৃপ্তি কি কেবলই ‘ভোগ’-এর সঙ্গে যুক্ত? আর দুই, তৃপ্তি বাহ্যিক স্থূল বিষয়, কেবলমাত্র শরীরের সঙ্গেই কি তার সম্পর্ক? চৈতন্যের (Consciousness) সঙ্গে কি কোনো সম্পর্ক নেই? ভারতীয় দর্শনচর্চায় বিশেষত পুরুষার্থ সংক্রান্ত আলোচনায় ‘ভোগ’ নামক ধারণাটিকে বাহ্যিক শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। কমল সেই প্রকল্পটিকে নিয়ে প্রশ্ন করে। বলতে চায় ভোগে শারীরিক তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মা বা চৈতন্য তৃপ্ত হয়। সাধারণ বয়ানে যে কথাটি বলা হয় যে, ‘ত্যাগ’এর মাধ্যমে শারীরিক তৃপ্তি না হলেও আত্মা তৃপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে যা স্বর্গীয় সুখের সন্ধান দেয়। যে তৃপ্তি আদতে মোক্ষ ও মুক্তির সমার্থক হয়ে ওঠে ধর্মীয় বয়ানে। কথক উপন্যাসে কমলের বয়ানে সেই তর্কটিকে ঘুরিয়ে দিতে চান। ঈশ উপনিষদ-এর প্রথম

শ্লোকে ত্যাগের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। ঐ শ্লোকটি আরেকবার ফিরে পড়তে চাইছি এই প্রসঙ্গে। কী আছে ঈশ উপনিষদ-এর শ্লোকে? ‘মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম’ অর্থাৎ অপরের ধনে লোভ করো না। খেয়াল করা বিষয় উপনিষদকারেরা স্পষ্টতই ‘আত্ম’ ও ‘অপর’ এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে গেছেন। অর্থাৎ আপন বস্তুকে ভোগের বিরোধিতা তাঁরা করেননি। আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা একথা বলতেই পারি মানবিক ভোগে অন্যায় নেই। আত্মা সংক্রান্ত বিষয়েও চার্বাকপন্থীদের সঙ্গে আন্তিক তর্ক সুবিদিত। চার্বাকরা চৈতন্যকে বস্তু জগতের সংলগ্ন হিসেবে দেখেন। তাঁরা বলতেন চৈতন্য দেহের উপরেই নির্ভরশীল। মৃত্যু হলে দেহ বিকল হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে চৈতন্যও বিলুপ্ত হবে। দেহই হলো আত্মা। ছান্দগ্য উপনিষদ-এ সে কথার অনুরণন পাওয়া যাবে— ‘য এষোহক্ষিণি পুরুষো এষ আত্মেতি’ অর্থাৎ কিনা ‘চক্ষুতে এই যে পুরুষকে দেখা যায়, ইনি আত্মা। ইনি অবিনাশী ও অভয়। ইনিই ব্রহ্ম।’^{১৬২} প্রত্যক্ষগম্য দেহই আত্মা কিংবা আত্মার অবস্থান প্রত্যক্ষগম্য দেহে। আমরা ‘ভোগ’ প্রসঙ্গে কমল ও আশুবাবুর মধ্যে কেন দেহ-আত্মার তর্ককে নিয়ে এলাম? এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। কমলের বাচনে পাঠক জানতে পারে— তৃপ্তির

“আসল সত্তা ত বাইরের ‘ভোগের’ মধ্যে নেই— উৎস ওর জীবনের মূলে, এখান থেকে ও নিত্যকালের জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের যোগান দেয়। শাস্ত্রের ধিক্কার ব্যর্থ হয়ে দরজায় পড়ে থাকে তাকে স্পর্শ করতেও পারে না।”^{১৬৩}

কমলের কাছে ভোগের আনন্দ শারীরিক, ভোগ কেবলমাত্র দেহজ বা শারীরিক আনন্দ দেয় না চৈতন্যকেও তৃপ্ত করে। চৈতন্যময় দেহকে কেন্দ্র করে তা আনন্দের সামগ্রী হয়ে ওঠে। আশুবাবুদের বয়ানে ত্যাগ বা বিসর্জনের মন্ত্রের মাধ্যমে যে মহিমার কথা প্রচারিত হয় তাকে ধূলিসাৎ করে দিতে চায় কমল। কারণ ‘ত্যাগ’ বা ‘বিসর্জন’-এর মাধ্যমে অর্জিত কষ্ট কেবল

শারীরক নয়, চৈতন্যের কষ্ট বটে। কমল যে হেতু দেহাতিরিক্ত আত্মার ধারণায় অবিশ্বাসী তাই আশুবাবুদের বয়ানকে বাতিল করে দেয়। সে বলতে চায় ক্লেশ কখনও আত্মা বা চৈতন্যকে সুখী করতে পারে না। কিছু আগেই উত্থাপিত প্রথম প্রশ্নটিতে এবার আমরা ফেরত যাবো। তৃপ্তি কী কেবল ভোগের সঙ্গেই যুক্ত? ত্যাগও এক ধরনের ‘ভোগ’-ই। অ-পার্থিব সুখ ‘ভোগ’-এর স্বপ্নে যে মানুষ ত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ করে তা কি সত্যি ‘ত্যাগ’? রিপু প্রসঙ্গে কমল বলে রিপুকে গাল দিলেই তো সে আর ছোটো হয়ে যাবে না, প্রকৃতির পাকা দলিলে সে দখলদার, শুধু বিদ্রোহ করে কেই বা তাকে অস্বীকার করতে পেরেছে? বস্তুত, একথা মনে হয় কমল স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী। মানবিক চাহিদাগুলিকে বাতিল করতে সে নিমরাজি। কমল উপন্যাসে এই প্রস্তাব রাখে যে আত্মদান কেবল শারীরক অনুভূতি তৈরি করে না। প্রকৃত প্রস্তাবে চৈতন্যকেও আলোড়িত করে তোলে। মানবিক ‘ভোগ’ তার কাছে পরিত্যাজ্য নয়, গ্রহণীয় কাক্ষিত। বরং অ-পার্থিব, অ-লৌকিকের (লোকজ অর্থাৎ বস্তুগত ভিত্তি নেই এমন) আত্মদান অনাকাক্ষিত। প্রাতিষ্ঠানিক শাস্ত্রীয় চিন্তার বিরোধিতা করে কমল ‘ভোগ’কে জীবনের, সভ্যতার অন্তরের সামগ্রী হিসেবে দেখতে চায়। চার্বাকদের মতন তার অন্তরের অস্তিত্ব একান্ত ভাবে দেহজ। বলতে চায় ঐ শাস্ত্রকারদের বাণীগুলি নিতান্তই একপেশে কিংবা সোচ্চারে বলে ওঠে “মানুষকে নিঃশেষে শুষে নেবার দূরভিসন্ধি যাদের তারাই অপরকে নিঃশেষে দান করার দুর্বুদ্ধি যোগায়। দুঃখের উপলব্ধি যাদের নেই, তারাই দুঃখ-বরণের মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।”^{১৬৪} শেষ প্রশ্ন-এ কমল কার্যত বিদ্রোহিণী, প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য পাঠককে অনেকগুলি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সপ্রশ্ন, তর্কিক ভারতীয় উত্তরাধিকারকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গগুলির সূত্রে দেখতে পাওয়া যাবে যে, শেষ প্রশ্ন-র গোটা তর্ক, বাদ-প্রতিবাদ চলেছে মুখ্যত দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে— এক, কোন পথ শ্রেয় চিরন্তন ভারতীয় আদর্শ নাকি পশ্চিমী অনুকরণ? দুই, চারিত্রিক নৈতিকতা, সে প্রসঙ্গে এসেছে শিবনাথ এবং কমলের কথা। লেখার শুরুতে অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে যে বিবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলাম আরেকবার সেদিকে নজর দেবো। অতি-আধুনিক সাহিত্যচর্চা নিয়ে একপক্ষের (যেখানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের অভিমত) অভিযোগ ছিল ‘ভারতসাগরের ওপারে’ (ইউরোপে) যে হাট বসেছে তারই অনুকরণ চলছে আমাদের সাহিত্যে। আধুনিকদের সাহিত্য ‘বিদেশের আমদানি’ করা সাহিত্য। আরেকটা অভিযোগ নর-নারীর যৌন জীবন ‘অবারিত’ ভাবে উঠে আসছে এদের লেখার মধ্যে। এই বাদ-প্রতিবাদের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় শেষ প্রশ্ন-র মধ্যে। আমাদের প্রস্তাব শেষ প্রশ্ন এই তর্ক, বাদ-প্রতিবাদেরই অংশ; সেই বিতর্কটিকে একরকম করে গ্রহণ ও বর্জন করতে করতে আখ্যান এগিয়েছে।

এবার আমরা দুটি বিষয়ে অভিনিবেশ দেবো— এক, কেন শরৎচন্দ্র ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে আস্তিক-নাস্তিক তর্কটিকেই আধার করলেন? দুই, ভাবনায় চিন্তায় কমলের মতো বিদ্রোহিণী, র‍্যাডিক্যাল চরিত্র কেন জীবনচর্যায় হিন্দু বিধবার মতো কৃচ্ছ সাধন করে? আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, অতি-আধুনিক সাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি মূলত সাহিত্যিক। সতর্ক রবীন্দ্রনাথ নৈতিকতাকে তাঁর আপত্তির কেন্দ্রবিন্দু করেননি। শরৎচন্দ্র স্পষ্টত তাঁর কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর প্রধান আপত্তির জায়গাটা ছিল নর-নারীর যৌন জীবন, তা সত্য হোক বা বিজ্ঞান; সাহিত্যে সেটির ‘অবারিত’ প্রবেশাধিকারে তিনি নারাজ, কারণ তাঁর মতে এটা ‘অসংগত’। শরৎচন্দ্রের ঝোঁকটা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে তাঁর মূল আপত্তির কেন্দ্রে আছে নৈতিকতা বোধ। সে কথা স্পষ্ট লিখেছেন তাঁর প্রবন্ধে। বলা বাহুল্য,

আস্তিক-নাস্তিক তর্ক সেই প্রশ্নটিকে সহজে পাঠকের সম্মুখে হাজির করতে পারে। বস্তুত এই তর্কের হাত ধরেই আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যের তর্কটিকে বুঝতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র। ভারতীয় দর্শন প্রস্থানে নীতি বিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ হলেও পাশ্চাত্যের মতো পৃথক নীতিবিদ্যার প্রস্থান গড়ে ওঠেনি। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করবো অমল হোমের সাহিত্য রচনার দৃষ্টিকোণটি। তিনি লিখেছিলেন বাংলা সাহিত্য দেবতার ‘মন্দিরে’ একদিন ধ্বনিত হবে ‘সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্’। এই তর্কের একপক্ষে ছিলেন অমল হোমরা যাঁদের সাহিত্য ভাবনার মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছিল ভারতীয় আস্তিক দর্শন প্রস্থানের দৃষ্টিভঙ্গি। আরেকদিকে ছিলেন *কল্লোল কালিকলম* গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা যাঁরা অসুন্দরকে, আকাঁড়া জীবনকেই তুলে আনতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের ‘মন্দিরে’। শরৎচন্দ্র এই বিবাদ, বিসংবাদে প্রাথমিকভাবে ‘অতি-আধুনিক’দের পক্ষে থাকলেও, পরে তাঁর অবস্থান কিছুটা বদল করেন। আমাদের প্রস্তাবে এই তর্ক কেবল দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তা শরৎচন্দ্রের চৈতন্যকে এক প্রকার আলোড়িত করে, সেই প্রণোদনায় তৈরি হয় *শেষ প্রশ্ন*। নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করতে নির্মিত হয় *শেষ প্রশ্ন*। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার তর্ককে বুঝতে ও বিকল্প সাহিত্যিক নমুনা পেশ করতে পুরোনো আস্তিক-নাস্তিক প্রতর্কটিকেই বেছে নিলেন শরৎচন্দ্র। এই প্রতর্কটি সহজেই অমল হোমদের আপত্তি ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও *কল্লোল কালিকলম* গোষ্ঠীর অবস্থানের সঙ্গে তাঁর তফাৎ চিহ্নিত করতে পারে বলে তিনি মনে করেছিলেন। এই প্রতর্কটি ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যিক নমুনার সবচেয়ে সহজ প্রেক্ষাপট হয়ে উঠার সম্ভাবনা রাখে। সে কারণে আস্তিক-নাস্তিক প্রতর্কটিকেই কেন্দ্রীয় সমস্যা-পট (problem) করে তোলেন।

এবার আমরা দ্বিতীয় বিষয়টির দিকে নজর ফেরাবো। *শেষ প্রশ্ন*-এ কেন প্রয়োজন পড়ল এমন একটি কৃচ্ছ্রসাধিকা অতি-আধুনিক চরিত্রের? এই প্রশ্নে কথা বলার আগে আখ্যান

লেখার কৌশল সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মতামত উল্লেখ করবো। পরিচালক ও অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বৈঠকী আলাপের কথা লিখেছেন গোপালচন্দ্র রায়। নিজের আখ্যান রচনার কৃৎকৌশল সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছেন—

“আমি (চরিত্রগুলির মধ্যে) ‘ইউনিফর্মিটি’ চেষ্টা করে রাখি না— রাখবার প্রয়োজনও হয় না; কারণ আমার

চরিত্রগুলিকে আগে চরিত্র হিসাবে কল্পনা করি, তারপর তাদের ‘সিচুয়েশন’এ ফেলে ‘রিঅ্যাক্ট’ করাই।”^{১৬৫}

ফলত একথা অনুমান করে নেওয়াই যায় যে শেষ প্রশ্ন লেখার সময়েও শরৎচন্দ্র এই রীতিই অনুসরণ করেন। উনি প্রাথমিক ভাবে কমলকে কল্পনা করেছিলেন যাকে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে রিঅ্যাক্ট করান। উপন্যাসে দেখা যায় কমল প্রায় হিন্দু বিধবার মতো করে কৃচ্ছ সাধন করছে। এমন কি কমলের কথার ঘোর বিরোধিতা যারা করে তারাও সেকথা উল্লেখ করেছে।

“যুক্তি ও তর্কের ছলনায় কমল মুখে যাই বলুক, বাস্তব ভোগের ক্ষেত্রে তাহার এই কঠোর আত্মসংযম অজিতের অভিভূত মুগ্ধ চক্ষে মাধুর্য ও শ্রদ্ধায় অপরূপ হইয়া উঠিল,”^{১৬৬} অন্যত্র

হরেন্দ্র বলেছে, “ অথচ নিজের মধ্যে এমনি একটি নির্দ্বন্দ্ব সংযম, নীরব মিতাচার ও নির্বিশঙ্ক তিতিক্ষা আছে যে, দেখে বিস্ময় লাগে।”^{১৬৭} কেন প্রয়োজন পড়ল এমন একটা কৃচ্ছসাধিকা

অতি-আধুনিক চরিত্রের? যেহেতু শরৎচন্দ্রের মুখ্য আপত্তির কেন্দ্রে নৈতিকতা বোধ, সেকারণে

তাঁর শিক্ষা ও রুচি মোতাবেক চরিত্রের আকৃতি নিয়ে এই সতর্কতা। সেকারণেই ভারতীয়

নারীর আদলেই তৈরি করে নিলেন কমলকে। যে ঐতিহ্য ও পরম্পরা নিয়ে তর্ক করবে অথচ

স্বভাবে, চর্যায় ভারতীয় নারীত্বকেই বরণ করে নেবে। বস্তুত, এই আখ্যানে শরৎচন্দ্র বিবদমান

দুই পক্ষের মেলবন্ধনের প্রস্তাব রেখেছেন। চেয়েছেন এই তর্কের নিরসন। সেকারণেই হয়তো

কমলের মধ্যে এই বৈপরীত্য (Dichotomy)। উপন্যাসে শরৎচন্দ্র যতই পশ্চিমী রীতিতে তর্ক

চালান না কেন; যতই খারিজ করুন আশ্রমের আদর্শকে, প্রাচীন ভারত সম্পর্কে নির্মোহ হয়ে

ভাবতে বলুন না কেন, শেষ অবধি নৈতিকতার (মর্যালিটি, এথিক্স) প্রশ্নে তিনি আস্তিক্যবাদী
ভারতীয় আদর্শকে ছেড়ে যেতে পারেননি বা চাননি।

তথ্যসূত্র ও টীকা

^১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যাত্রার পূর্বপত্র', *তত্ত্ববোধিনী*, কলকাতা, আষাঢ় ১৮৩৪ শক, পৃ-৫৩।

^২ ঐ, পৃ- ৫৩

^৩ ঐ, পৃ- ৫৪

^৪ Rabindranath Tagore, *Letters to a Friend*, London, Gorge Allen & Unwin Ltd, 1926, p-

^৫ Rabindranath Tagore, *Letters to a Friend*, London, Gorge Allen & Unwin Ltd, 1926, p- 38,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্রনাথ-এগুরুজ পত্রাবলী*, অনু. মলিনা রায়, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭৪, পৃ- ৩

^৬ Rabindranath Tagore, *Letters to a Friend*, London, Gorge Allen & Unwin Ltd, 1926, p-

^৭ ঐ

^৮ প্রশান্ত কুমার পাল, *রবিজীবনী*, সপ্তম খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪২০, পৃ- ১১

^৯ দ্র. উদয়কুমার চক্রবর্তী, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথ', *প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শতবর্ষে ফিরে দেখা*, দেবব্রত ঘোষ ও সনৎকুমার নস্কর (সম্পা.), কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৫, পৃ- ১৭৩-১৮৩

^{১০} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্রনাথ-এগুরুজ পত্রাবলী*, অনু. মলিনা রায়, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭৪, পৃ- ১৫১

^{১১} ঐ, পৃ- ২

^{১২} ঐ, পৃ- ৭

^{১৩} ঐ, পৃ- ৮

^{১৪} ঐ, পৃ-৮

^{১৫} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শান্তিনিকেতন*, ২য় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬, পৃ- ৪০৪

^{১৬} ঐ, পৃ- ৪০৫

^{১৭} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৩, পৃ- ৬৮৭-৮৮

^{১৮} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র ২*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪১৯, পৃ- ৩১-৩২

^{১৯} ঐ, পৃ- ৩২

^{২০} ঐ, পৃ- ৩৪

^{২১} ঐ, পৃ-৩২

^{২২} ঐ

^{২৩} ঐ, পৃ- ৩৪

^{২৪} ঐ

^{২৫} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঋতুধর্ম', *সবুজপত্র*, পৌষ ১৩২১, কলকাতা, পৃ- ৫৯২

^{২৬} ঐ, পৃ- ৫৯২-৯৩

^{২৭} ঐ,

^{২৮} ঐ, পৃ- ৫৯৫

২৯ এ

^{৩০} Lukacs Georg, *The Theory of the Novel*, Delhi, Aakar, 2016, p-88

^{৩১} শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ২০০৬-০৭, পৃ- ১৬০

^{৩২} সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০১২, পৃ- ৩৪৫

৩৩ এ

^{৩৪} এ, পৃ- ৩৫২

^{৩৫} সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮, পৃ-১৯০

^{৩৬} সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৮, পৃ- ২৪৪

^{৩৭} এ, পৃ- ২৬৫

৩৮ এ

৩৯ এ

^{৪০} দ্র. বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১, পৃ-২৫৮-৫৯

^{৪১} দ্র. এ, পৃ- ২৬৮

^{৪২} এ, পৃ- ২৬৬

^{৪৩} এ, পৃ- ৪১৪ (৯ নং চিঠি)

^{৪৪} অশোকুমার সিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ-৬

^{৪৫} এ, পৃ- ৮

^{৪৬} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ- ১৬৫

^{৪৭} উদয়কুমার চক্রবর্তী, *চতুরঙ্গ সাধক কবির আলোচনা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ- ১৮

^{৪৮} এ, পৃ- ৮৫

^{৪৯} এ, পৃ- ২৪

^{৫০} দেবদাস জোয়ারদার, *দেবদাস জোয়ারদার রচনাসমগ্র ১*, কলকাতা, টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ১৯৯৯, পৃ- ২১৬

^{৫১} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ- ১৪৪

^{৫২} দেবদাস জোয়ারদার, *দেবদাস জোয়ারদার রচনাসমগ্র ১*, কলকাতা, টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ১৯৯৯, পৃ- ২১৭

^{৫৩} তপোব্রত ঘোষ, *শ্রীবিলাসের ডায়ারি*, কলকাতা, ভারবি, ২০১৪, পৃ- ১৬৫

^{৫৪} কার্তিক লাহিড়ী, “চতুরঙ্গ-এর করণ কৌশল”, *পরিচয়*, কলকাতা, মে-জুন, ১৯৭৮, পৃ- ৪৮

^{৫৫} এ, পৃ- ৩৯

^{৫৬} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ- ১৩১

^{৫৭} এখানে অন্য একটি তর্ক দেখা দিতে পারে যে শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া জ্যাঠামশাইয়ের যে উপস্থিতির কথা আমরা বলছি তা কী আসলে জ্যাঠামশাইয়ের ভাবনাকে খারিজ করেছে না। যিনি বলেছিলেন আমরা সজীবকে মানি। যাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষতাকে অনুভব করা যায়। অথচ আমাদের প্রস্তাবে না-জ্যাঠামশাই অংশে তাকে সজীব হিসেবে অনুভব করা যায় না। এই প্রস্তাব কি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাবাদী জগমোহনের দর্শনের বিরোধিতা করেছে? না। বাস্তবে জগমোহনের মৃত্যু হলেও, তার আত্মার অবলুপ্তি হলেও, জ্যাঠামশাইয়ের ভাবনা বা দর্শন কিন্তু না-জ্যাঠামশাই অংশে বাধ্য ছিল।

^{৫৮} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ- ১৪৮

৫৯ এ

৬০ এ, পৃ- ১৬৬

৬১ *শাক্তগ্রন্থরত্নাবলী*, পৃ- ১৬৯

৬২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্রচন্দাবলী*, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ- ১৬৬

৬৩ ঐ, পৃ- ১৭৭

৬৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সোনার তরী*, কলকাতা, কালিদাস চক্রবর্তী, ১৩০০, পৃ- ৪৯

৬৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্যের পথে*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৫, পৃ- ৪৭

৬৬ ঐ, পৃ- ১৩০

৬৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কবির ভণিতা*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭৫-ব, পৃ- ১৯

৬৮ জীবনানন্দ দাশ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা: ভারবি, ১৯৮৮, পৃ- ৫৬

৬৯ তপোব্রত ঘোষ, *শ্রীবিলাসের ডায়ারি*, কলকাতা, ভারবি, ২০১৪, পৃ- ১৫২

৭০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্রচন্দাবলী*, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ- ১৪৮

৭১ ঐ, পৃ- ১৫১

৭২ তপোব্রত ঘোষ গুহার ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছেন জ্যাঠামশাইয়ের যৌনতা বিষয়ে খোলামেলা শিক্ষা ও ননিবালার আত্মহত্যা শচীশকে যৌনতা বিষয়ে ভীত করে তোলে তারই ফলশ্রুতি গুহাতে দামিনীকে লাথি মেরে বের করে দেওয়া।

ঐ, পৃ- ৯৯-১০০

৭৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্রচন্দাবলী*, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ- ১৬১-৬২

তারপর দামিনীর সঙ্গে লীলানন্দ স্বামীর কিছু কথাবার্তা হয়। সেই অংশটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

“হইয়াছে। গুরুজি আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, আচ্ছা তবে একবার মনোযোগ করিয়া দেখা যাক। বলিয়া বইগুলা তাঁর বালিশের নিচে রাখিলেন। বুঝিলাম, এ তিনি ফিরাইয়া দিতে চান না। নিশ্চয় দামিনী আড়াল হইতে ব্যাপারখানার আভাস পাইয়াছিল। দরজার কাছে আসিয়া সে আমাকে বলিল, আপনাকে যে-বইগুলা আনাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম সে কি এখনো আসে নাই?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি বলিলেন, মা, সে-বইগুলি তো তোমার পড়িবার যোগ্য নয়।

দামিনী কহিল, আপনি বুঝিবেন কী করিয়া?

গুরুজি ঈর্ষাভর করিয়া বলিলেন, তুমিই বা বুঝিবে কী করিয়া?

আমি পূর্বেই পড়িয়াছি, আপনি বোধ হয় পড়েন নাই।

তবে আর প্রয়োজন কী?

আপনার কোনো প্রয়োজনে তো কোথাও বাধে না, আমারই কিছুতে বুঝি প্রয়োজন নাই।

আমি সন্ন্যাসী, তা তুমি জান।

আমি সন্ন্যাসিনী নই তা আপনি জানেন, আমার ও বইগুলি পড়িতে ভালো লাগে।

আপনি দিন।

গুরুজি বালিশের নিচে হইতে বইগুলি বাহির করিয়া আমার হাতের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, আমি দামিনীকে দিলাম।”

৭৪ এখানে মানবিক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, আধুনিকের ‘মানব’ অস্তিত্ব বিষয়ক ভাবনাকে সামনে রেখে।

৭৫ রণজিৎ গুহ, *দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা*, কলকাতা, তালপাতা, ২০১১, পৃ- ৫০

৭৬ ঐ, পৃ-৫১

৭৭ ঐ, পৃ-৫৫-৫৬

৭৮ তপোব্রত ঘোষ, *শ্রীবিলাসের ডায়ারি*, কলকাতা, ভারবি, ২০১৪, পৃ- ৭২

৭৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্রচন্দাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ- ১৪৩

৮০ জীবনানন্দ দাশ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা: ভারবি, ১৯৮৮, পৃ- ৫৬

- ^{৮১} ক্ষিতিমোহন সেন, *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন*, কলকাতা, পুনশ্চ, ২০০৯, পৃ- ৬৭
- ^{৮২} দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, *রবীন্দ্রজীবনী*, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২১, পৃ- ২০ এবং Amiya P Sen, *Religion and Rabindranath Tagore*, New Delhi, OUP, 2014, p- xvii
- ^{৮৩} ঐ
- ^{৮৪} বানান পরিবর্তিত
- ^{৮৫} বানান পরিবর্তিত
- ^{৮৬} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা', *ভারতী*, কলকাতা, শ্রাবণ, ১২৯২, পৃ- ১৯২-৯৩
- ^{৮৭} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯, পৃ- ৬৩
- ^{৮৮} ঐ, পৃ- ১৩৯
- ^{৮৯} ঐ, পৃ- ১৪৬
- ^{৯০} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জ্যোতামশায়', *সবুজপত্র*, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃ- ৫৩১
- ^{৯১} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র ৯*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪১৮, পৃ- ৪-৫
- ^{৯২} ঐ, পৃ- ১২
- ^{৯৩} ঐ, পৃ- ৪২-৪৩
- ^{৯৪} ঐ, পৃ- ২১২
- ^{৯৫} ঐ, পৃ- ২১৫
- ^{৯৬} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃ- ১০০৯
- ^{৯৭} ঐ
- ^{৯৮} Rabindranath Tagore, 'Foreword', *Hindu Scriptures*, Ed. Nicol Macnicol, London, Everyman's Library, 1963, p-vi
- ^{৯৯} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ- ১৬৫
- ^{১০০} গোপালচন্দ্র রায়(সম্পা.), *শরৎ-পত্রাবলি*, কলকাতা, পারুল, ২০০০, পৃ- ৪৫৫।
- ^{১০১} অমলচন্দ্র হোম, 'অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য', *ভারতবর্ষ*, কলকাতা, মাঘ ১৩৩৩, পৃ- ২৯৬
- ^{১০২} ঐ, পৃ- ২৯৬
- ^{১০৩} 'নোংরামি' এই ধারণাটি আসলে শিক্ষা, রুচি, নৈতিকতা সর্বোপরি দার্শনিক অবস্থান সাপেক্ষ। সর্বজন মান্য ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়।
- ^{১০৪} গোপালচন্দ্র রায়(সম্পা.), *শরৎ-পত্রাবলি*, কলকাতা, পারুল, ২০০০, পৃ- ৪৫৮
- ^{১০৫} নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'সাহিত্যধর্মের সীমানা', *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, কলকাতা, পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০০২, পৃ-১৯৫-১৯৬।
- ^{১০৬} গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, "সাহিত্য-ধর্ম", *বঙ্গবানী*, ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ-৮৭-৮৮।
- ^{১০৭} শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি', *বঙ্গবানী*, আশ্বিন ১৩৩৪, পৃ- ২৪৩।
- ^{১০৮} ঐ
- ^{১০৯} "এই ধরনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সাহিত্য রচনায়। পরলোকগত সাহিত্যিকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য ইহার উল্লেখ করিতেছি না, করিতেছি হাতের কাছে একটা অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অসম্ভব কল্পনার উদাহরণ পাইতেছি বলিয়া, বাঙ্গালা দেশে তাঁহার পাঠকসংখ্যা বিরল নয়। আমি নিজে দেখিয়াছি মুদির দোকানে একজন গ্রন্থ পাঠ করিতেছে এবং বহুলোকে গলদশ্রলোচনে সেই সাহিত্যসুধা পান করিতেছে। নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র দরিদ্র নায়ক মা কালীর কাছে স্বপ্নে আদেশ পাইয়া সাত ঘড়া সোনার মোহর গাছতলা হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিয়া বড়লোক হইল। ছেলে মরিল কিন্তু ভয় নাই। শ্মশানে জটাজুটধারী তেজঃপুঞ্জ-কলেবর এক সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাবে ছেলে

চিতার উপরে ‘বাবা’ বলিয়া উঠিয়া বসিল। রসজ্ঞ শ্রোতার দল কাঁদিয়া আকুল। তাহাদের আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। সেখানে কেহই ঠেলা দিয়া প্রশ্ন করে না, কেন? কিসের জন্য? তাহারা বলে, দরিদ্র নায়ক বড়লোক হইয়াছে ঢের। মরা-ছেলে প্রাণ পাইয়াছে ইহাই আমাদের যথেষ্ট,—ইহাতেই আমাদের বোধের ক্ষুধা, আত্মার ক্ষুধা মেটে। ইহা অনির্বচনীয়,—এইপ্রকার সাহিত্য-রসেই আমাদের হৃদয়ের বসন্তলোকে কল্ললতায় ফুল ফুটে। কলহ করিবার কি আছে? কিন্তু, আমি যদি এ কাজ না পারি, নিজের গ্রন্থের দরিদ্র নায়ককে মা কালীর অনুগ্রহ জোগাড় করিয়া দিতে সক্ষম না হই, জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে খুঁজিয়া না পাইয়া মরা-ছেলেকে দাহ করিতে বাধ্য হই, ত নিশ্চয় জানি আমার বই তাহারা পুড়াইয়া ছাই করিয়া ছাড়িবে। কিন্তু উপায় কি? বরঞ্চ, হাতজোড় করিয়া চতুরাননের কাছে গিয়া বলিব, তাহারা আরও খান-কয়েক বই আমার পুড়াক, সে আমার সহিবে, কিন্তু এই রসজ্ঞ ব্যক্তিদের আত্মার ক্ষুধা, বোধের ক্ষুধা মিটাইবার সৌভাগ্য “শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ”। কিন্তু কেন? কেন, এই জন্য যে কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। ইহাদের ধর্মও এক নয়, ধর্মের সীমানাও এক নয়। এবং মানুষের বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধার জাতিভেদ এতই গভীর ও বিস্তৃত যে, বৈজ্ঞানিক মনোভাব-নিয়ন্ত্রিত কল্পনাকে বিসর্জন দিলে ইহাদের অর্থ-ই প্রায় থাকে না।” দ্র:- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘সাহিত্যের রীতি ও নীতি’, *বঙ্গবানী*, আশ্বিন ১৩৩৪, পৃ- ২৪২-৪৩।

^{১১০} গোপালচন্দ্র রায়(সম্পা.), *শরৎ-পত্রাবলি*, কলকাতা, পারুল, ২০০০, পৃ- ৪৬১-৪৬২। দ্র. *মাসিক বসুমতি*, ফাল্গুন, ১৩৩৬।

^{১১১} শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব, পৃ-৬০৩

^{১১২} গোপালচন্দ্র রায়(সম্পা.), *শরৎ-পত্রাবলি*, কলকাতা, পারুল, ২০০০, পৃ- ২৩১

^{১১৩} গোপালচন্দ্র রায়(সম্পা.), *শরৎ-পত্রাবলি*, কলকাতা, পারুল, ২০০০, পৃ-২৬৩

^{১১৪} গোপালচন্দ্র রায়(সম্পা.), *শরৎ-পত্রাবলি*, কলকাতা, পারুল, ২০০০, পৃ-২৩১-৩২

^{১১৫} গোপালচন্দ্র রায়(সম্পা.), *শরৎ-পত্রাবলি*, কলকাতা, পারুল, ২০০০, পৃ-৩০৪

^{১১৬} প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *শেষ প্রশ্ন*-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন, বলেন তিনি যদি এই উপন্যাসটি লিখতেন তবে সকলে তাঁর জয়গান করতো। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যধারার মধ্যে *শেষ প্রশ্ন* ব্যতিক্রমী। অভ্যস্ত পথে না হেঁটে অন্য ভাবে জীবনকে দেখতে চাওয়া শরৎচন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠিত, জনপ্রিয় আখ্যানকারের কাছে কঠিন। দ্রঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমগ্র প্রবন্ধ এবং* শুভময় মণ্ডল ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৫, পৃ- ১১-১৩

^{১১৭} শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব, পৃ-৪০১

^{১১৮} ঐ, পৃ- ৪০১-০২

^{১১৯} ঐ, পৃ- ৪০৭

^{১২০} ঐ, পৃ- ৪০৭

^{১২১} পঞ্চগনন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রীণা, *চার্বাক-দর্শনম্*, ২৪ পরগনা, শ্রীসাম্যব্রত চক্রবর্তী, ১৩৯৪ব, পৃ- ১৪

^{১২২} সৌমিত্র বসু, ‘নৈতিকতাঃ চার্বাকের দৃষ্টিতে’, *ভারতীয় ধর্মনীতি*, অমিতা চ্যাটার্জি(সম্পা), কলকাতা, যা বি প্রকাশনা, পৃ- ২৪৮

^{১২৩} শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব, পৃ-৪১০

^{১২৪} ঐ, পৃ- ৪২১

^{১২৫} ঐ, পৃ- ৪২৩

^{১২৬} দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩, পৃ- ১৮৭

^{১২৭} শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব, পৃ-৪২৫

^{১২৮} শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব, পৃ-৪২৩

- ১২৯ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (অনু.), *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*, কলকাতা, শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৮ব, পৃ- ৫৮৮।
- দ্র. ফ্লাগুন ১৩২৩ সালে *প্রবাসী* প্রকাশিত ক্ষিতিমোহন সেনের “চরৈবেত চরৈবেতি” প্রবন্ধ।
- ১৩০ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব, পৃ-৪২৫
- ১৩১ ঐ
- ১৩২ ঐ, পৃ- ৪৪১
- ১৩৩ ঐ
- ১৩৪ ঐ, পৃ- ৪৪২
- ১৩৫ Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, London, Routledge, 2004, p- 279
- ১৩৬ ঐ, দ্বিতীয় টীকা- THE EPICUREANS, পৃ- ১০৭৯
- ১৩৭ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব, পৃ-৪৪২
- ১৩৮ ঐ, পৃ- ৪৪৩
- ১৩৯ ঐ
- ১৪০ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব, পৃ- ৪৪৮
- ১৪১ ঐ
- ১৪২ ঐ, পৃ- ৫২৬
- ১৪৩ ঐ, পৃ- ৫৪৮
- ১৪৪ ঐ
- ১৪৫ যুক্তিবাদী এই শব্দটি আমাদের কাছে বিভিন্ন অর্থে গৃহীত হয়। আমরা আপাতত শব্দটি ব্যবহার করতে চাইছি যিনি কার্যকারণ সম্পর্ক রেখে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান, সেই অর্থে। যুক্তিবাদ ও যুক্তিবাদী শব্দটি আধুনিক সময়ে, বহুক্ষেত্রে ধর্ম ও ধার্মিক, মৌলবাদ ও মৌলবাদীর বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমরা সেই অর্থে ব্যবহার করছি না। আমরা মনে করি ধর্মেরও একটা যুক্তি আছে, যে কোনো মৌলবাদী ধারণা বা আচরণও বিশেষ যুক্তিক্রম মেনে চলে। যুক্তিবাদীর সঙ্গে তার তফাৎ উভয়ের যুক্তির কার্যকারণ সম্পর্ক ও পদ্ধতি। যুক্তি প্রতিষ্ঠার প্রি-কনডিশন ভিন্ন। সেই ভিন্নতা জনিত কারণেই উভয়ের বিবাদ এবং বিসংবাদ।
- ১৪৬ গোপালচন্দ্র রায়(সম্পা.), *শরৎ-পত্রাবলি*, কলকাতা, পারুল, ২০০০, পৃ- ২৩১
- ১৪৭ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব, পৃ- ৪৬৭
- ১৪৮ ঐ, পৃ- ৪৬৯
- ১৪৯ ঐ, পৃ- ৫০৩
- ১৫০ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ(অনু.), *উপনিষদ প্রথম ভাগ*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ- ৪-৫
- ১৫১ ঐ
- ১৫২ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব, পৃ- ৪৭৩
- ১৫৩ ঐ
- ১৫৪ ঐ পৃ-৪৭৩-৭৪
- ১৫৫ ঐ
- ১৫৬ ঐ, পৃ- ৫১৭
- ১৫৭ ঐ
- ১৫৮ ঐ, পৃ- ৫৩২
- ১৫৯ ঐ
- ১৬০ ঐ, পৃ-৫৩৩

১৬১ ঐ

১৬২ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *উপনিষদ দ্বিতীয় ভাগ*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ- ১৮৯

১৬৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব, পৃ- ৫৩৪

১৬৪ ঐ, পৃ- ৫৩৩

১৬৫ গোপালচন্দ্র রায়, *শরৎচন্দ্র দ্বিতীয় খণ্ড*, কলকাতা, সাহিত্য সদন, ১৯৬১, পৃ- ১৩

১৬৬ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব, পৃ- ৪৪২

১৬৭ ঐ

তৃতীয় অধ্যায়

‘অসংলগ্ন ভবিষ্যত’: জগদীশ গুপ্তের কখন বিশ্ব

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) একেবারেই জনপ্রিয় বা বহুল পঠিত লেখক নন। সমকালের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য রুচির সঙ্গে খুব একটা মিল খুঁজেও পাওয়া যাবে না। একথা স্বীকার্য, *কল্লোল* ও *কালি-কলম* পত্রিকা প্রচলিত সাহিত্য রুচিকে বদলাতে চেয়েছিল। *কল্লোল* ও *কালি-কলম* পত্রিকার লেখক হলেও তিনি ঠিক ‘কল্লোল গোষ্ঠী’-র লোক নন। এই গোষ্ঠীর সাধারণ লক্ষণ তাঁর লেখায় বিশেষ মেলে না। তাঁর সমকালে সাহিত্যচর্চার জগৎ আচ্ছন্ন ছিল কল্লোলীয় ঔজ্জ্বল্যে, কোমল ছায়াচ্ছন্ন শরৎচন্দ্রে এবং রবীন্দ্রনাথের দ্বারা। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় সংস্করণের সুযোগ পায়নি জগদীশ গুপ্তের বইগুলি। তাঁর সমকালে অধিকাংশ বাংলা আখ্যানে যে বস্তুটির প্রাধান্য ছিল তা হলো হৃদয়। মন ও মস্তিষ্কের দেখা যে মেলেনি এমন নয়। জগদীশ গুপ্ত সেকালের সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে; মূলত আখ্যানচর্চায়, যুক্ত করলেন নতুন আরেকটি চিহ্ন, প্রবৃত্তি। একথা বলার অর্থ এই নয় যে জগদীশ গুপ্তের আখ্যান কেবলমাত্র প্রবৃত্তি তাড়িত, হৃদয় ও মনের জটিল খাতেও ছিল তাঁর নিয়ত আসা যাওয়া। আরেকটি প্রশ্ন/তর্ক উঠতে পারে ‘প্রবৃত্তি’ নামক বৈশিষ্ট্য দিয়ে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানকে বিশেষিত করার ক্ষেত্রে। যে প্রাণী মাত্রই প্রবৃত্তি তাড়িত এবং মানুষও যেহেতু প্রাণী তার প্রবৃত্তি তাড়িত হওয়া অহেতুক নয়। মানুষ অর্থাৎ আধুনিক মানুষ, হোমো সেপিয়েন্স তার প্রবৃত্তির পেছনে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ তৈরি করে এবং বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পণ্ডিতেরা জগদীশ

গুপ্তের আখ্যানকে দেখেছেন একান্তভাবে দেহাত্মবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তাঁর চরিত্রদের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত রূপে জীব হিসেবে।^১ এই বিশ্লেষণ জগদীশ গুপ্তের আখ্যানকে পড়ার দুটি প্রবণতা তৈরি করেছে— এক, জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের গতি ও পরিণতি আপাততভাবে প্রচলিত যুক্তিবোধের অতীত, সেকারণে সিদ্ধান্তের নিয়েছেন যে, তাঁর আখ্যান নিয়তি বা অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত। দুই, যেহেতু বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির চিহ্ন, লক্ষণ ও অনুরণন চরিত্রগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না, তাই তারা একান্তভাবে প্রবৃত্তি ক্রীড়নক। নিয়তি চরিত্রগুলিকে সৃষ্টি করেছে, শেষ পর্যন্ত তা নিয়তির আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি লাভ করেছে। আমরা দেখার চেষ্টা করবো এই দুটি প্রবণতা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য এবং এর বাইরে আর কোনো ভাবে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানকে পড়া যায় কিনা।

জগদীশ গুপ্তের আখ্যান মূলত গ্রাম্যজীবনকে কেন্দ্র করে রচিত। গ্রামকে দেখা ও উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রেও সমকালীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর অমিলই বেশি। গ্রাম তাঁর আখ্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এবং তা উপস্থিত হয় কল্লোলীয় ভাবালুতাকে বর্জন করেই। এখানেই লুকিয়ে আধুনিকতার আরেক চিহ্ন, এই দিক দিয়ে তাঁর অবস্থান সমকালের সাহিত্য রুচির বিপ্রতীপে। এখানেই সমকালীন *কল্লোল* ও *কালি-কলম* পত্রিকার লেখকদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছিন্নতা। কেন বলতে চাইছি জগদীশ গুপ্ত সমকালের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন? এই সময় পর্বে যাঁরা বাংলা সাহিত্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা প্রত্যেকেই সচেতনভাবে রাবীন্দ্রিক ও প্রতিষ্ঠিত ঘরানার সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের তফাৎ এবং বিচ্ছিন্নতাও লক্ষণীয়, যা তাঁকে অনন্য করে রেখেছে। আগেই বলেছি যে, তাঁর আখ্যানের গ্রাম্যজীবন ভাবালু নয়। কেবল সমকালীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে নয়, পূর্বজদের সঙ্গে এই প্রশ্নে তাঁর তফাৎ লক্ষণীয়। জীবনকে দেখার প্রশ্নে জগদীশ গুপ্ত নির্মোহ ও তিক্ত। *কালি-কলম* পত্রিকায় ‘ফিলজফির বুদ্ধদ’ শিরোনামে

একটি প্রবন্ধ লেখেন জগদীশ গুপ্ত। উক্ত প্রবন্ধে সাহিত্য কেমন হয় কিংবা কেমন হওয়া উচিত, বলা ভালো সাহিত্য নিয়ে তাঁর বোঝাপড়া ব্যক্ত করেন লেখক। জগদীশ গুপ্ত লিখেছেন—

“যে-সৃষ্টি কেবল মাটিকেই চেনে, আর মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচাইবার সাহস যার নাই, তাহার মাটি হইয়া যাইবার পক্ষে কোনো বাধাই নাই। আমরা তাই কল্পলোকে বাগিচা কেয়ারী করিতে বসিয়াছি। যদি জগতের মন এতই অবোধ আর ইতর হয় যে, তাহাকে টানিয়া নামাইতে হাত বাড়ায় তবে জগৎকেই কৃপার চক্ষে দেখা ছাড়া আমাদের কিছু বলিবার নাই। জগৎ আত্মঘাতী হইতে পারে; তাই বলিয়া আমরা কেন আকাশের আলোবায়ুউত্তাপের মাঝে জীবনের রস খুঁজিয়া অমর হইয়া থাকিতে চাহিব না!

উত্তম। ইহা জীবনের ফিলজফির উচ্চ আদর্শ হইতে পারে; গল্প-সাহিত্যের নহে। গল্প-সাহিত্যেরও ফিলজফি আছে, কিন্তু আকাশস্থ হইয়া নাই। বহু উর্দ্ধে ফুল ফুটিয়া আছে দেখিয়া আনন্দ বা আমোদ পাইলে আপত্তির কিছু নাই; কিন্তু, যে-মূল বহু নিম্নে নামিয়া যাইয়া ফুলটির দলে দলে তার ক্ষুদ্রতম পরাগে পর্যন্ত রসধারা অবিরাম প্রেরণ করিতেছে তাহাকে ভুলিলে ঠকিতে হইবে। অর্থাৎ গল্প-সাহিত্যে এমন কিছু না থাকাই উচিত যাহা বাস্তবজীবনের রসের দ্বারা পুষ্ট নহে।”^২

আখ্যান লেখা প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্তের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তাঁর উপন্যাস নিয়ে আলোচনার সময়ে এই মন্তব্যটি গুরুত্বসহকারে বিচার করবো। তবে জগদীশ গুপ্ত জীবনকে যে ভাবে দেখতেন, সমাজকে যে ভাবে উপস্থিত করতেন তাঁর আখ্যানে সেটাই যে একমাত্র ধরণ তা তিনি মনে করতেন না। প্রসঙ্গত, স্মরণ করা যেতে পারে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার পাল্টা সমালোচনা করেন জগদীশ গুপ্তই। প্রভাতকুমার ও জগদীশ গুপ্ত একেবারেই ভিন্ন রুচির আখ্যানকার। সেখান থেকে প্রভাতকুমারের লেখাকে সহৃদয়তার সঙ্গে দেখা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে আখ্যান সম্পর্কে তাঁর এই অভিমত অভিনিবেশের দাবী রাখে।

এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার আগে নিয়তি প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকারী। নিয়তি অর্থাৎ অদৃষ্ট, অজ্ঞেয় ও অনিয়ন্ত্রণীয় শক্তি যা কিনা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে এমন ধারণা প্রাচীনকাল থেকে সারা পৃথিবীব্যাপ্ত। কোনো না কোনো চেহারা নিয়তিবাদ থাকলেও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নিয়তি, দৈব, ভাগ্য, বিধি, বিধান, দিষ্ট/দিষ্ট্য বিভিন্ন নামে তা চিহ্নিত হতো। বৈদিক যুগে নিয়তির প্রতিরূপ দেবতা পাওয়া যায় না, তবে রুদ্র, কাল ও যম এই তিন দেবতা মিলে দৈব/নিয়তির কাছাকাছি বলে কল্পনা করে নেওয়া যায়। পরে অবশ্য নিয়তির নানান বিমূর্ত কল্পনা বহু নামে দেখা যাবে।^৭ কোনও ক্ষেত্রে ধর্ম ও দেবতা কল্পনার সঙ্গে নিয়তির সংঘাত ও সহযোগিতার চিত্র পাওয়া গেলেও; নিয়তিকে মূলত, দেব নিরপেক্ষ ও সকল দেবতার উর্ধ্বে স্বয়ম্ভু শক্তি রূপেই দেখা হয়।

কাকে নিয়তি রূপে চিহ্নিত করব? নিয়তি কী? এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যেও দ্বিমত রয়েছে, জার্মান দার্শনিক ফিক্টে (১৭৬২-১৮১৪) নিয়তিবাদ নিয়ে বলেন, যে কোনও যুক্তিহীন কর্মফলই নিয়তি। আরেক পণ্ডিত শেলিং (১৭৭৫-১৮৫৪) বলছেন, নিয়তিবাদ হল সেই ধারণা যা কর্ম ও ইতিহাসকে অন্ধ ও পূর্বনিরূপিত হিসেবে দেখে। শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) কিন্তু নিয়তি একটি মৌলিক সত্য রূপেই দেখছেন। আমাদের দেশে এই বিষয়ে প্রথম বক্তব্য হাজির করছেন আজীবিকরা। তাঁরাই দার্শনিক নিয়তিবাদের প্রবক্তা। এঁদের অভিমত, নিয়তি অমোঘ এবং শেষ কথা, মানুষের জীবনের সবকিছুর প্রামাণ্যতা আছে নিয়তিবাদে। গোসালই হলেন প্রথম এবং খাঁটি নিয়তিবাদী। যে অজানা, দুর্জ্ঞেয় শক্তি সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ করে সেই শক্তির অমোঘতায় পূর্ণ বিশ্বাসী।^৮ এতো গেল বিভিন্ন মত। কীভাবে ব্যাখ্যা করব নিয়তিকে? কী তার লক্ষণ? মূলত, নিয়তির সঙ্গে মন্দ বা খারাপের সম্পর্ক। সুখী ইহজীবনে যখন আনন্দ বা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের আগমন ঘটে, তখন আমরা তাকে নিয়তি রূপে চিহ্নিত করি না,

বলা হয় সৌভাগ্যের কথা। আন্দাজ করা যায়, নিয়তির সঙ্গে অ-সৌভাগ্য অ-সুখের সম্পর্ক। এ বোধের উদয় হয় দুঃখে, যে দুঃখ দীর্ঘ অথবা আকস্মিক। যার তীব্রতা উপলব্ধিকারীকে হতচকিত করে এবং যার সঙ্গে আপাতভাবে (উপলব্ধিকারীর) কর্ম ফলের সম্পর্ক নেই। মানুষ তার কাজকর্মের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য খোঁজে, এটা স্বাভাবিক এবং তা মানুষের লক্ষণ, তৈরি করে ঈশ্বরের ধারণা কিংবা না-ঈশ্বরের, তা না হলে নিয়তি/দৈব-এ সমর্পণ। কেবল অমোঘতাই নয়, খামখেয়ালিপনা ও নিয়তির চরিত্র ধর্ম। যা আপাতভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত না হলেও আদতে সংমিশ্রিত। পৃথিবীর সবদেশেই এ বিশ্বাস আছে, নিয়তির বিরুদ্ধতা অসম্ভব, নিয়তির পরিণতিও খণ্ডন করা অসম্ভব। যদিও এসবের পাশাপাশি পুরুষকারের প্রকাশ দেখা যায়। প্রস্তুতিহীন মানুষের নিয়তির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ অনিবার্য। যে নিগূঢ় শক্তি মানব জীবনকে চালায় তার রূপ দেওয়ার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। শ্রেণি বিভক্ত সমাজের আধ্যাত্মিক অভিভাবকরা তাকে প্রতিষ্ঠা করলেন নিয়তি আকারে, আর তার নিয়ন্ত্রণের (যদিও তা নিয়ে সংশয় আছে) অধিকার রইল এদেরই হাতে।

রামায়ণ-এ খুবই সংক্ষেপে নিয়তির সংজ্ঞা নির্দেশ করা আছে। বুদ্ধি দিয়ে যার নাগাল পাওয়া যায় না তা-ই নিয়তি।^৫ মহাভারত-এও নিয়তি সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। রামায়ণের তুলনায় অনেক গভীরভাবে নিয়তিকে ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন মহাভারতকার। কী বলা হচ্ছে মহাভারতে? অগ্নিময় অক্ষিগোলকের মত এসে মানুষের (ওপরে) পড়ে নিয়তি, মানুষকে দৃষ্টি বিরহিত করে দেয়। (২।৫২।১৮) অগ্নিময় অক্ষি মানুষের চর্ম চক্ষুকে যেন দগ্ধ করে দেয় আর তাই মানুষের বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়; অতএব সে নৈতিকক্ষেত্রে অন্ধের ন্যায় আচরণ করে, ফলে দুর্নিয়তি তাকে ধাওয়া করে এবং তখন তার দুঃখভোগ যেন আত্মদুষ্কৃতির পরিণাম হয়ে দেখা দেয়।^৬ নিয়তির দার্শনিক ছকটা বেশ

চিত্তাকর্ষক। এমনই একটা ছক যেখানে ঘোরতর একটা অন্যায়কে অন্য শক্তির ওপর আরোপ করা হয়েছে, এবং প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিভিন্ন কিসিমের অভিজ্ঞতা (দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, ক্ষতি), যার হয়েছে সেই জানে যে এটা নিয়তি-ই করিয়েছে বা করেছে।

তত্ত্বগতভাবে নিয়তি নিরালস্য। এর সঙ্গে কর্মফল জন্মান্তরবাদের সম্পর্ক নেই, করুণাময় ঈশ্বরের সঙ্গেও এর সহাবস্থান অসম্ভব। কোনও মৌলিক প্রতিপাদ্য এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি না থাকার কারণেই কি অব্যহত থেকে গেল ‘নিয়তি’? মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি মতে যা কিছু দুর্বোধ্য, অজ্ঞেয় সেই সব অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল নিয়তির মাধ্যমে। কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদের পরিপূরক হিসেবে হাজির হল নিয়তি। যা কিছু জ্ঞাত, যুক্তিযুক্ত, প্রত্যাশিত তার বিপ্রতীপ অভিজ্ঞতা আশ্রয় পেল নিয়তিবাদে। নিদারুণ নৈতিক সংকটে পড়ে মানুষ নিয়তির আশ্রয় নিয়েছে। এখানে নিয়তিবাদীদের একটি কৃতিত্ব আছে, বস্তুজগৎকে জানবার ও ব্যাখ্যা করবার তাগিদে একভাবে নিয়তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। যখনই কার্যকারণ সম্পর্ক ও যৌক্তিকপারস্পর্য কোনও ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হয়েছে তখনি জ্ঞানের ফাঁকটিকে ভরাট করার তাগিদে নিয়তির আশ্রয় নিয়েছে মানুষ।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পণ্ডিত ও সমালোচকেরা জগদীশ গুপ্তকে বিভিন্ন ভাবে পড়তে চেয়েছেন। তাঁদের পড়ার মধ্যে তফাৎ যে লক্ষ্য করা যায় না তা নয়, কিন্তু দৃষ্টিকোণের মধ্যে মূলগত তফাৎ নেই। অধিকাংশ সমালোচক জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন তামসিক, আবিল জগৎ, অলক্ষ্য বসে নিয়তি কিংবা অদৃষ্ট সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। এই পর্যবেক্ষণ-ই জগদীশ গুপ্তের আখ্যান প্রসঙ্গে মান্য এবং প্রতিষ্ঠিত। পণ্ডিতদের বক্তব্যকে বাতিল করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই, আর একথাও স্বীকার্য যে তাঁদের পর্যবেক্ষণ জগদীশ গুপ্তকে একভাবে দেখতে ও পড়তে শিখিয়েছে। আমরা বিনীত ভাবে বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করছি।

আরেকভাবে দেখার ও পড়ার চেষ্টা করছি মাত্র। সেই প্রক্রিয়ায় পুরোনো প্রতিষ্ঠিত, মান্য মত ও পর্যবেক্ষণের সঙ্গে বিবাদী আলাপে রত হবো আমরা। প্রাথমিক ভাবে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মত ও পর্যবেক্ষণগুলো দেখে নেবার চেষ্টা করবো। এটাও বোঝার চেষ্টা করবো কেন তাঁর গল্প-উপন্যাস কুচক্রী নিয়তি নিয়ন্ত্রিত বলে চিহ্নিত হয়েছে? সেই প্রসঙ্গে গ্রিক নাটকের নিয়তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাঁর লেখার। আবার অযৌক্তিক তামসিকতার আখ্যান বলেও চিহ্নিত করছেন কেউ। জগদীশ গুপ্তের আখ্যান কি নিয়তি নিয়ন্ত্রিত? যদি তাই হয় তাহলে গ্রিক নিয়তিবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন? আর একথা যদি মেনেও নিই, জগদীশ গুপ্ত তামসিকতার কথাকার; তাহলেও তাঁর আখ্যানের গতি-প্রকৃতি ও পরিণতিকে অযৌক্তিক বলা যায়? তার পূর্বে আমরা দেখে নেবো জগদীশ গুপ্তের আখ্যান সম্পর্কে সমালোচকদের বক্তব্যগুলি।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দে *বিচিত্রা* পত্রিকায় ‘আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, লেখক অনিলবরণ রায়। উক্ত প্রবন্ধে অনিলবরণ রায় কেবল জগদীশ গুপ্তের আখ্যান বিষয়ে মন্তব্য করেছেন এমনটা নয়। সামগ্রিকভাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধের আখ্যানে ‘দুঃখ’ বোধ, অনুভূতি ইত্যাদি ধারণাগুলি কীভাবে ক্রিয়াশীল, সেটাই তাঁর মুখ্য অভিনিবেশের বিষয়। বস্তুত, সে প্রসঙ্গেই জগদীশ গুপ্তের আখ্যান নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। অনিলবরণ রায় ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক আখ্যানগুলি মিলিয়ে পড়তে চেয়েছেন। ভারতীয় দর্শন প্রস্থানগুলির চর্চায় ‘দুঃখ’ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে ‘দুঃখ’ মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও উপায়। দুঃখ উত্তোরণের বিভিন্ন পথ, নির্দেশিকা দর্শন প্রস্থানগুলির আলোচ্য বিষয়। অনিলবরণ রায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এই ঐতিহ্যের অনুবর্তন পেলেও, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আখ্যানে সেই ঐতিহ্যের অভাববোধ করেছেন।

ঐতিহ্যের অনুবর্তন না হলেও তাঁর কাছে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের আখ্যানে ‘নৈতিক’ বা ‘moral order’-এর বিপন্ন হয়নি। তাঁর বিবেচনায়/পর্যবেক্ষণে ‘moral order’ বিপন্ন হয়ে উঠেছে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে। বলা বাহুল্য, তাঁর এই অবস্থান ও পর্যবেক্ষণের অন্তরালে কাজ করেছে আন্তিক্যবোধ এবং সর্বময়, মঙ্গলময় ঈশ্বর বিশ্বাস। সে কথা উক্ত প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন লেখক। এই প্রবন্ধটি আপাতত আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, সে প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো। আপাতত জগদীশ গুপ্ত প্রসঙ্গে অনিলবরণ রায়ের মন্তব্য ও অভিমতগুলি উল্লেখ করবো। অনিলবরণ রায় লিখেছেন—

“তিনি দেখিতেছেন, ভগবান, ধর্ম, নৈতিকতা এ-সবই যে মিথ্যা শুধু তাহাই নহে, এ-সংসারে যে বিধাতা সে এক নির্মম ত্রুর হৃদয় সয়তান। অন্যান্য আধুনিকেরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করুন, তাঁহারা জগতে একটা আদি বৈজ্ঞানিক শক্তি ও জড় অন্ধ শক্তিরই খেলা দেখেন কিন্তু এ জগৎটা যে সয়তানেরই রাজ্য এটাও তাঁহারা বলেন না।”^৭

পরে লেখক স্পষ্ট করেছেন ‘সয়তানী শক্তি’ বলতে তিনি কী বোঝাতে চাইছেন—

“যে শক্তি শুধুই জড় নহে, প্রকৃতির অন্ধ খেলামাত্র নহে, তাহা সজ্ঞান, সচেতন, তাহা জানিয়া গুনিয়া মানুষের সর্বনাশ করে এবং তাহাতেই আনন্দলাভ করে, তাই আমরা ইহার নাম দিয়াছি সয়তানী শক্তি।”^৮

কারা সেই ‘সয়তানী শক্তি’-র দোসর? অনিলবরণ রায় লিখেছেন—

“এখানে মানুষ, জড়প্রকৃতি, প্রেতাছা সকলেই মানুষের মর্ম ছিঁড়িবার জন্যে ব্যস্ত এবং এই সবার অন্তরালে থাকিয়া একজন নিয়ন্তা— তাহাকে সয়তান বলা যায়— মানুষের এই মর্মবেদনায় আনন্দলাভ করিতেছে।”^৯

জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের দিকে নজর করলে বোঝা যাবে, যে মানুষের ‘মর্ম ছিঁড়িবার জন্যে ব্যস্ত’ সে মানুষ বীর নয় পীড়িত, প্রান্তজন। এরপরে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের ‘moral order’ প্রসঙ্গে অনিলবরণ রায় মন্তব্য করেছেন—

“জগদীশ গুপ্তের মধ্যে এরূপ moral order বা নৈতিক নিয়মের কোনও বালাই নাই, সেখানে মানুষ শুধু সয়তানের তৃপ্তির জন্যই কষ্ট পাইতেছে।”^{১০}

পরে গ্রিক নিয়তির সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের তুলনা করেছেন লেখক। সেই বহুল পরিচিত অংশটি উদ্ধৃত করবো —

“প্রাচীন গ্রীসদেশীয় tragedyতে নিয়তির (Doom, Necessity, Act) খেলা বর্ণিত হইয়াছে, জগদীশচন্দ্রের সয়তানী শক্তির সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। ঐ অদৃষ্ট বা নিয়তি যেন ওত্ পাতিয়া বসিয়া আছে, কোথাও একটু ফাঁক পাইলেই মানুষকে আক্রমণ করিবে। সে-শক্তি মানুষের ভোগের, সুখের, উন্নতির শত্রু। তাই পদে পদে মানুষকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করে, যতক্ষণ মানুষের পুরুষাকারের শক্তি থাকে ততক্ষণ সে কিছু করিতে পারে না, কিন্তু, সর্বদা ছিদ্র অন্বেষণ করে এবং একটু, ভ্রান্তি দুর্বলতার সুযোগ পাইলেই মানুষের উপরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু, এই নিয়তিও খামখেয়ালি নহে, কারণ মানুষ যতক্ষণ না অতি বাড় বাড়িতে যায় ততক্ষণ নিয়তি তাহার পিছনে লাগে না, এই নিয়তি যেন বলে, “যদি তুমি বাড়িতে যাও তাহা হইলে সেইরূপ শক্তি অর্জন করা চাই, নতুবা ফাঁকি দিয়া বড় হইতে পাইবে না।” এই জন্যই সকল সকল বিষয়ে পরিমিত ব্যবহার করা গ্রীসদেশীয় আদর্শ, “moderation in all things is the great part of virtue।” অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে একটা moral order, নিয়মের রাজ্য। মানুষের নিজের কর্মফলেই নিজের উপর নিয়তির নিষ্পন্ন আঘাত ডাকিয়া আনে। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মধ্যে এরূপ কোনও নিয়ম নাই।”^{১১}

অনিলবরণ রায়ের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দুটি প্রশ্ন জারিয়ে তোলে। এক, কোন সময়ে তিভ্ কাহিনি লিখছেন জগদীশ গুপ্ত? দুই, নিয়তি, অদৃষ্ট বা নিয়ন্তার স্বরূপটি কেমন? এই প্রশ্নে আমরা পরে আলোচনা করবো। এই প্রবন্ধ লেখার কয়েক মাসে পরে *বিচিত্রা* পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় আশাবতী দেবী ‘আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ ও রবীন্দ্রনাথ’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধটিতে জগদীশ গুপ্ত নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো মন্তব্য করেননি। মূলত এই

প্রবন্ধটি দুঃখবাদের নিরিখে রবীন্দ্রনাথকে ভিন্ন ভাবে পড়ার প্রস্তাব। এই বিষয়ে আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

এবার আমরা জগদীশ গুপ্তের আখ্যান বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদারের পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যগুলির দিকে নজর ফেরাবো। ‘বর্তমান বাংলাসাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা আখ্যান বিষয়ে আলোচনার সূত্রে জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলাল লিখেছেন—

“আমি তাঁহার সেই গল্পগুলির কথাই বলিতেছি, যাহাতে মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জের্য দৈব-নির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে; মনে হয়, জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার একপ্রান্তে একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন আকারহীন হিংস্রতা সর্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে— মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার; তাহার নিষ্ঠুরতাও তত ভয়ঙ্কর নয়— যত ভয়ঙ্কর তাহার সেই অতি-প্রাকৃত রূপ। যাহাকে আদিম মানবের কুসংস্কার, অথবা বিকারগ্রস্ত রোগীর দুঃস্বপ্ন বলা যায়— সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের সুস্থবুদ্ধি যে সকল ঘটনাকে কল্পনারও বিরোধী বলিয়া মনে করে, জগদীশচন্দ্র তেমন ঘটনাকেও তাঁহার গল্পে— শুধু সম্ভাব্যতা নয়— এমন বাস্তবতায় মগ্নিত করিয়াছেন যে, ইংরাজীতে যাহাকে bizarre বলে, সেই ভাব আমাদের কাছে অভিভূত করে। মনে হয়, আমরা এমন একটা বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছি যাহা মানুষের বুদ্ধি বা জাগ্রত-চৈতন্যের অগোচর; সৃষ্টির নেপথ্যে যে পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে— এ সকল যেন তাহারই ক্লেচ্ছ-দৃষ্ট মূর্তি; আদিম মানুষের অপ্রবুদ্ধ চৈতন্য ইহার ছায়া পড়িত।

...এই দৃষ্টি ঠিক রসদৃষ্টি নয় কারণ, ইহা normal বা সুস্থ নয়; তথাপি ইহাও আটের পর্যায়ভুক্ত;”^{১২}

মোহিতলাল মজুমদার স্পষ্ট করে নিয়তির কথা উল্লেখ না করলেও তাঁর মতামত থেকে অনুমান করা যায় এক অজ্ঞেয় শক্তির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। যা কিনা ‘অশুভ’ এবং মানবিক ‘মঙ্গল’-এর ধারণাকে ধ্বস্ত করে। তিনি জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের মধ্যে সন্ধান পেয়েছেন অতিপ্রাকৃত ভয়ের জগতের, যা নিয়ত মানুষিক সম্ভাব্যতাকে ধ্বস্ত করে সৃষ্টি করে হিংস্র, কুটিল

রাজ্য। যা তাঁর কাছে ঠিক ‘normal’ বা ‘সুস্থ’ নয়। মোহিতলাল মজুমদারের কাছে জগদীশ গুপ্তের আখ্যান মানবিক মঙ্গলবোধের পরিপন্থী। যা তাঁর চেনা-জানা ও চাওয়া-পাওয়ার জগতের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। এই পর্যবেক্ষণও আমাদের জিজ্ঞাসু করে তোলে কেন ‘normal’ বা ‘সুস্থ’ নয় জগদীশ গুপ্তের আখ্যান? কিংবা অ-সুস্থতার উৎস-ই বা কী?

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও সমালোচক হাসান আজিজুল হক ‘জগদীশ গুপ্তঃ কথাসাহিত্যে বিপরীত স্রোত’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে জগদীশ গুপ্তের কথন বিশ্ব সম্পর্কে লিখছেন—

“প্রথমেই দেখতে পাবো তিনি বহু যত্নে তাঁর গল্প, উপন্যাসে ও অন্যান্য লেখায় যে জগৎটি তৈরী করেছেন, সেটা একটা তামসী জগৎ।... যে অন্ধকারের কথা একটু আগে বলেছি সে অন্ধকার আসছে মানুষের মনের ভিতর থেকে। আমরা মানুষের বাৎসল্য, নিরুপদ্রব সংসার যাত্রা, প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদিকে মানুষের রিরংসা, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, লোভ ও লালসা ইত্যাদি বৃত্তি থেকে একটু উপরের আসনে বসাতে অভ্যস্ত। কেন তা করি তার হাজারটা যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ নামক জীবটিকে যিনি একটা প্রাকৃতিক জীব হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর কাছে এই দুরকম বৃত্তির মধ্যে কোনো আত্যন্তিক ফারাক নেই। মানুষের প্রবৃত্তিজগতের হিসেব নিলে বাৎসল্য যেমন সত্য, নিষ্ঠুরতাও তেমনি সত্য। নিষ্ঠুরতার চেয়ে বাৎসল্য মহত্তর বৃত্তি কেন একজন নৈয়ায়িকের কাছে তার কোনো যুক্তি নেই। প্রশ্নটা নৈতিকতার নয়, প্রশ্নটা বাস্তবিকতার।”^{১০}

হাসান আজিজুল হক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিলেন জগদীশ গুপ্তের আখ্যান পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে। এর আগে সমালোচকের মূলত নৈতিকতার দিক দিয়েই জগদীশ গুপ্তের আখ্যানকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বাস্তবতা দিক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন জগদীশ গুপ্তের ‘তামসী জগৎ’। কিন্তু তাঁর মতে সেই অন্ধকার বা তামসিকতার উৎপত্তি মানুষের মনে ভিতরে। আমাদের বিচারে এই অভিমত আংশিকতার দোষের দুই কিংবা অতি সরলীকরণ।

বাস্তবতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে হাসান আজিজুল হক লক্ষ্য করেননি বস্তুত যা, সমকালীন সময়ের বাস্তবতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তামসিক জগৎ। যা জগদীশ গুপ্তের আখ্যান বিশ্লেষণের আরেকটি ধারার দিকে নজর টান দেয়। জগদীশ গুপ্তের আখ্যান প্রবৃত্তি ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের ইতিবৃত্ত মাত্র। যেখানে এই জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না— এই টানাপোড়েনের কারণ কী? কোন প্রেক্ষিত নির্মাণ করছে প্রবৃত্তিতাড়িত জীবনের ইতিকথা? এর পরেই আরও লিখেছেন—

“তথাকথিত মহৎ বৃত্তিগুলি কালিমা লিগু হয় এবং সৌহার্দ্য, সহানুভূতি, দয়া, মায়া, ত্যাগ ও সহযোগিতা ইত্যাদি যে মূল্যবোধগুলির উপর সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলি জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে লগুভগু হয়ে যায়। সত্যি বলতে কি সমস্ত বাংলা সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের মতো আর কেউ এতো অবিচ্ছিন্নভাবে এতো রোখের সঙ্গে আগাগোড়া তিক্ত থাকেননি।”^{১৪}

কেন এই তিক্ততা তার নির্দিষ্ট কারণ এই প্রবন্ধে অনুল্লিখিত। কেন খোঁজে যাওয়ার পূর্বে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য দেখে নিতে চাইবো। প্রবন্ধের শেষে হাসান আজিজুল হক বলেছেন—

“আসলে নিয়তিবাদ এক ধরনের হাল ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপার। আমার ধারণা এটা মনুষ্য প্রকৃতি বিরোধীও বটে। গ্রিক নিয়তিবাদের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের গল্প উপন্যাসের মূল বিষয়ের তুলনা মাঝে মাঝে করা হয়েছে বটে, কিন্তু গ্রিক অদৃষ্টবাদ যেমন মানুষের কর্মে অন্তরনিবিষ্ট জগদীশ গুপ্তের রচনায় তা নয়।”^{১৫}

নিয়তিবাদের প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হক পূর্বজন্মের সঙ্গে একমত নন। কিন্তু মঙ্গলবোধ প্রসঙ্গে খুব ভিন্ন অবস্থান তিনি গ্রহণ করেননি। তিনিও নৈতিকতার নয়, বাস্তবিকতার দিক দিয়ে বিচারের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করেও শেষদিক তাঁর নৈতিক ও মঙ্গলবোধ দ্বারা চালিত হয়েছেন। প্রবন্ধের শেষে তিনি লিখেছেন—

“জগদীশ গুপ্ত সে কালের যে সমাজ দেখেছিলেন তার একটা আপেক্ষিক সত্য চিত্রই আমাদের দিয়েছেন।

...তাঁর রচনা আপোষহীনভাবে সত্যসন্ধানী এবং তিনি আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যে একজন প্রধান পথিকৃৎ। তাঁর ভ্রম হয়েছিল একটাই। আপেক্ষিককে তিনি চিরন্তনের স্থান দিয়েছিলেন। স্বকালের সমাজের বদ্ধতাকে চিরস্থায়ী ধরে নিয়েছিলেন এবং ব্যাধিগ্রস্ত মানব সম্পর্কগুলিকে চিকিৎসার অতীত বলে গণ্য করেছিলেন।”^{১৬}

উদ্ধৃতি থেকে ধারণা করা যায় হাসান আজিজুল হক কাকে আপেক্ষিক বলেছেন এবং চিরন্তনের ধারণাটি কেমন? বলা বাহুল্য; দয়া, মায়া, মমতা-ই শাস্ত্রত, চিরন্তন এবং নিষ্ঠুরতা, হিংসা, লোভ, লালসা আপেক্ষিক এবং তা চিকিৎসাযোগ্য। এখানেই ‘জগদীশ গুপ্তঃ কথাসাহিত্যে বিপরীত স্রোত’ প্রবন্ধটি বাস্তবিকতার দিক থেকে জগদীশ গুপ্তের আখ্যান বিচার করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নৈতিক বিচার পদ্ধতি গ্রহণ করে। জগদীশ গুপ্তের আখ্যান সমালোচনার ধারায় সম্ভাবনার সূত্রপাত করেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৮-২০২০) ‘আত্মহত্যার অধিকার (বাংলা উপন্যাসের নায়কঃ স্বেচ্ছামৃত্যুর চিন্তা)’ প্রবন্ধে জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস প্রসঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মত ব্যক্ত করেছেন। অসাধু সিদ্ধার্থ সম্পর্কে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, বাংলাদেশের বোধহয় এই প্রথম উপন্যাস যার নায়ক আসলে একজন অপনায়ক, অসাধু কপট ও দুষ্ক্রিয়, কিন্তু সব অসাধুতা সত্ত্বেও— নগুর্ধকভাবে— শেষ ইন্তক সে সাধক ও শহীদ হ’য়ে ওঠে।^{১৭} সিদ্ধার্থ ওরফে নটবর কেবল মাত্র বাংলা আখ্যানের প্রথম অপনায়ক নয়, সে সাধক এবং শহীদ। কেন নটবর ওরফে সিদ্ধার্থকে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধক এবং শহীদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন? বেঁচে থাকার জন্যে যে কেবল শয়তানীর সাধনা করে গেছে, যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। গল্পাংশের পরিণতি খেয়াল করায় যে, তার মিথ্যাচার ধরা পড়ে সত্যই প্রকাশিত হলো, তাহলে তাকে কেন এভাবে বিশেষিত করা হলো? এই প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করবো। আপাতত

দেখে নিতে চাইবো মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশ গুপ্তের আখ্যানকে কীভাবে পড়তে চাইছেন। আত্মসুদ্ধি বা সংশোধনের কোনো সুযোগ সে আর পাবে না, ফলে শহীদ-ই হতে হয় তাকে। ঐ প্রবন্ধেই তিনি লিখেছেন—

“আত্মার বিকাশ চেয়ে সে শেষ পর্যন্ত আপন আত্মাকেই বিনাশ করলে; কেননা তার আধ্যাত্মিক পরিব্রাজনের হিংস্র পথের নানা কোণায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে নিয়তিপ্রেমিত সেই সব গুপ্তঘাতকেরা যাদের নাম রাসবিহারী দেবরাজ কী কাশীনাথ;”^{১৮}

অসাপ্ত সিদ্ধার্থ উপন্যাস প্রসঙ্গেই এই মন্তব্য করেছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছু পরেই অধ্যাপক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—

“বাঁচবার ও বাঁচাবার কোনো পথ মানুষের সামনে নেই, সে একটি দুর্নিরীক্ষ্য এবং অতি-হিংস্র শক্তির হাতে অশক্ত এক পুতুলমাত্র— এই যেন জগদীশ গুপ্তের বক্তব্য। ধীরে ধীরে আমরা বুঝে নিতে পারিমানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনখান থেকে দাঁড়িয়ে এই কথা বলেছিলেনঃ ‘নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির ইঙ্গিতে মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।’ (পুতুলনাচের ইতিকথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)”^{১৯}

পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬) আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। ঐ প্রবন্ধে তিনি আরো লিখছেন যে জগদীশ গুপ্ত বলছেন কিছুতেই বাঁচা যায় না, কেননা সেই অন্ধ শক্তি প্রবলতর ও ভয়ংকর— তাই তাঁর উপন্যাসে টুকী কিংবা কিশোরীকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারে, যেখানে কোনোখান থেকেই আলো এসে পড়ে না। কিংবা এক ভয়াবহ গহ্বরে রাম বা সিদ্ধার্থর বাঁকাচোরা, তোবড়ানো, ক্লান্ত, বিপন্ন শরীর উলটে মুখ খুবড়ে পড়ে থাকে।^{২০} সিদ্ধার্থ ওরফে নটবর কিংবা রাম কিংবা টুকীর জীবন ও পরিণতি ‘নিয়তি’ নির্দেশিত বলেই চিহ্নিত করছেন। তবে পূর্বজন্মের সঙ্গে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতের ফারাক লক্ষ্য করা যায়। অনিলবরণ রায় যেমন একটা অজ্ঞেয় শক্তির কল্পনা করেছিলেন, সেখানে মানবেন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় কেবলমাত্র নিয়তি কিংবা অজ্ঞেয় শক্তি নয়, বরং ‘নিয়তিপ্রেরিত’ গুণঘাতকদের; অর্থাৎ আখ্যানের চরিত্রদের মিলেমিশে থাকার কথা জানালেন। অনিলবরণ রায়ের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাঁর নৈতিকবোধের দ্বারা। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাছে জগদীশ গুপ্ত পীড়ার আখ্যানকার। পীড়িতের যাতনাই তাঁকে চালিত করেছে এই সিদ্ধান্তের দিকে। এই নতুন দৃষ্টিকোণ জগদীশ গুপ্তের আখ্যান প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। কিন্তু তাঁর বিচারেও শেষ পর্যন্ত জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের নিয়ন্ত্রক নিয়তি নামক ‘দুর্নিরীক্ষ্য’, ‘অতি-হিংস্র’ কোনো এক শক্তি।

জগদীশ গুপ্তের পরিণতি বিষয়ে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি অভিমত রয়েছে বলে উল্লেখ করছেন অধ্যাপক রাজীব চৌধুরী। লোকেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় ছদ্মনামে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়^{২১} সারস্বত প্রকাশ পত্রিকায় ‘কাকতালের ব্যবহার’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের আকস্মিক পট পরিবর্তন, আপাতভাবে অযৌক্তিক পরিণতি প্রসঙ্গে লোকেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“গল্পে-উপন্যাসে কাকতালের ব্যবহার করে সেই রহস্যময় জগৎটিকেই ফোটাতে চাচ্ছেন লেখকেরা; খেই হারিয়ে যায় কখনো, সব খটকা হয়তো কাটে না— কিন্তু একবার কোনো রকমে যখন আপাত-সম্পর্কহীন ঘটনাগুলো কোনো চাপা ও অমোঘ যুক্তির বশে জুড়ে যায়, তখন অনেক লুকানো জায়গায় আলো পড়ে, অনেক ওলোটপালোট মুহূর্ত একটা আরেকটার সঙ্গে মিশে যায়, আর আমরা দেখি আড়ালে সত্যি কোনো অর্থ ছিলো। গল্পে-উপন্যাসে কাকতালের যখন সার্থক ব্যবহার হয় তখন অনর্থ ঘটে না, বরং হাতড়ে পাওয়া যায় পরাবাস্তবের কোনো অর্থ।”^{২২}

এরপরেই তিনি কীভাবে সহসা পট পরিবর্তনকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলছেন সে বিষয়ে লিখবেন যে, গল্পে উপন্যাসে ঘটনা সাজাতে গিয়ে অনেক সময়েই লেখকেরা এমনিভাবে দৈবের সাহায্য নিয়ে থাকেন সব সময় তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না; কেবল তখনই অবিশ্বাস্য হয় না, যখন তা ভিতর থেকে উথিত হয়। অর্থাৎ কিনা, প্রত্যেক গল্পেরই একটি ‘নিজস্ব’ ও ‘অন্তর্লীন’ যুক্তি

আছে এবং সেই যুক্তির দ্বারাই যদি কাকতাল গল্পটির সঙ্গে গ্রথিত হয়ে থাকে, তাহলেই তা পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করতে সক্ষম হয়।^{২৩} বিশ্বাসযোগ্য অসম্ভাব্যতা যে বাস্তবানুগ রূপ পায় সে বিষয়ে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— জগদীশ গুপ্ত তাঁর নিজের বিশৃঙ্খল তৃপ্তিহীন আখ্যান কাঠামোর মধ্যে এমন-একটি জগৎকে উপস্থাপিত করছিলেন ‘যে-জগৎ কেবলমাত্র সাধারণ অর্থেই বাস্তব নয়, সম্ভবত তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু।’^{২৪} মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে নিয়তি বা ‘দুর্নিরীক্ষ্য’, ‘অতি-হিংস্র’ শক্তির খেলা লক্ষ্য করলেও, মানুষের অসহায় পীড়ার পেছনে মানুষের ভূমিকাকে অস্বীকার করেননি, বরং সেই শক্তির সঙ্গে পীড়কের সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। এবং জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে তথাকথিত শৃঙ্খলাহীনতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এহেন বিশৃঙ্খলার নিশ্চিত ভাবেই কারুর সাপেক্ষ নির্ভর, তা পূর্ববর্তী সাহিত্য রীতির।

বিস্মৃতির অতল থেকে জগদীশ গুপ্তকে পাঠকের সামনে হাজির করেন সুবীর রায়চৌধুরী। সেই সংগ্রহের ভূমিকায় সুবীর রায়চৌধুরী জগদীশ গুপ্তের আখ্যান প্রসঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন সেদিকে আমরা নজর দেবো। সুবীর রায়চৌধুরী লিখছেন—

“এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ বাঙলা গল্প-উপন্যাসে যে-বস্তুটির প্রাধান্য তা হ’লো হৃদয়। দু-একজনের রচনায় অবশ্য মস্তিষ্কের প্রাধান্য। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের পাত্র-পাত্রীদের হৃদয় বা মস্তিষ্ক যতোটুকু না থাকলে নয়, ততোটুকুই আছে। তাদের অস্তিত্ব একান্তভাবে দেহসর্বস্ব। আদিম জৈববৃত্তির তাড়নায় ও আগ্রহে তারা বেঁচে থাকে ব’লে সুনীতি-কুনীতি, পাপ-পুণ্য, বিবেক ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। সমাজ যে বদলানো যায় বা যেতে পারে এ আস্থা জগদীশ গুপ্তের বিশেষ ছিলো না।”^{২৫}

দেকার্ত বলেছিলেন, কজিটো এরগো সাম (cogito ergo sum) অর্থাৎ ‘I think, therefore I am’। দেকার্তের এই কথা পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাবনাই দেহ ও মনের দ্বৈততাকে সম্পূর্ণ করেছিল, কিংবা পূর্ণতার খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিল। হয়তো ধান

ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সুবীর রায়চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ ও অভিমত সে কথাকেই খেয়াল করিয়ে দেয়। সেই দেহ ও মনের দ্বৈততা কিছুকাল পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনিতে প্রবাদ বাক্য হয়ে উঠবে। সুবীর রায়চৌধুরীর বিশ্লেষণ বাংলা আখ্যানকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে। এক ধরনের আখ্যানে থাকে হৃদয় ও মস্তিষ্কের প্রাধান্য, অন্যদিকে দেহসর্বস্ব আখ্যান। সেই দেহবাদী আখ্যান রীতির প্রতিনিধি জগদীশ গুপ্ত। এই প্রশ্নে আমরা দ্বিমত পোষণ করবো। সুবীরবাবুর অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমাদের বিনীত প্রস্তাব, জগদীশ গুপ্ত একান্তভাবে দেহবাদী বা দেহসর্বস্ব আখ্যানকার নন। বরং বলা যায় জগদীশ গুপ্তের চরিত্রের প্রবৃত্তি নির্ভর। দ্বিতীয়ত, আরেকদিকে থেকে বলা যেতে পারে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে হৃদয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। শরৎচন্দ্রের সমগোত্রীয় না হলেও, ‘হৃদয়ের প্রাধান্য’ যে তাঁর সাহিত্যে নেই তা নয়। শরৎচন্দ্রের আখ্যানে হৃদয়বেগের জয় প্রার্থনীয়, সেখানে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে হৃদয়ের পরাজয় বা পীড়ায় মুখ্য বিষয়।

পরে সুবীর রায়চৌধুরী লিখছেন যে, জগদীশ গুপ্তের চরিত্রেরা শুধু নির্মম নয়, নিয়তি তাড়িত ও কুচক্রী। অনেকক্ষেত্রে নিয়তির আবির্ভাব হয়তো কাকতালীয় (যেমন ‘হাড়’, ‘দিবসের শেষে’)। অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে শুধু পাত্র-পাত্রী নয়, পাঠকদেরও রেহাই পাওয়া মুশকিল হয়।^{২৬} অভিমত দুটি এক অর্থে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ার প্রস্তাব রাখে। কারণ, সুবীর রায়চৌধুরীও তাঁর আখ্যানের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন সুনীতি-কুনীতি, পাপ-পুণ্য, বিবেক বর্জিত প্রতিহিংসার রাজত্ব! ভূমিকার শেষের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষিত থেকে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানকে পড়ার প্রস্তাব রাখলেও, ব্যাখ্যা করেননি কেন সে প্রয়োজনীয়তা, এখানেই আমাদের ভিন্নমত। বস্তুত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব নৈতিকতা, বিবেকবোধ, মঙ্গলময় ঈশ্বরের ধারণা এবং আলোকপ্রাপ্তির সূত্রে অর্জিত যুক্তিবাদ অসহায় এবং অক্ষম এই

পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে। সে কারণে এই শুভ-অশুভ, মঙ্গলের ধারণা জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের উপর আরোপ করেছে বিভিন্ন বিশেষণ। যা তাঁর আখ্যানকে ভিন্ন ভাবে দেখা ও পড়ার সম্ভাবনাকে রোধ করেছে।

এই আলোচনার সমাপ্তি টানবো রবীন্দ্রনাথের *লঘু-গুরু* উপন্যাসের সমালোচনামূলক লেখাটির মাধ্যমে। *পরিচয়* পত্রিকার ১৩৩৮ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এই লেখাটি। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু সমালোচনার জবাবও দেন জগদীশ গুপ্ত। লেখার শুরুতেই অভিযোগের সুর ঘনিয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, জবাবদিহি করার জন্য তিনি বই পড়েন না, কিন্তু লেখকের অনুরোধ রক্ষা করার জন্যই এক প্রকার বাধ্য হয়ে *লঘু-গুরু* পড়েছেন।^{২৭} এটাও স্পষ্ট করে দিলেন নিতান্তই অনুরোধ রক্ষার্থে এই লেখা। পরে পরে স্পষ্ট করছেন তাঁর এহেন অনীহার কারণ—

“লেখবার ক্ষমতা আছে বললে বোঝায়, লেখক যেটা লেখেন সেটাকে পাঠ্য করে তুলতে পারেন, সেটা পথ্য না হলেও। ...এস্থলে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিললে তো কোনো কথাই নেই, নইলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের দরকার। সে-প্রমাণ মিথ্যে সাক্ষ্যের মতো বানিয়ে তোলা হলেও চলে কিন্তু সত্যের স্বাদ থাকা চাই। সাহিত্যিক এই ব’লে হলফ করে আমার কথা যতই মিথ্যা হোক তবু সেটা সত্য।

...এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত সমুদ্র পারের বিদেশ বললেই হয়, দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও-জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন।”^{২৮}

দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট যে এই সমালোচনা সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নয়। বস্তুত, সাহিত্যে বাস্তবতা এবং নৈতিকতার রাবীন্দ্রিক ধারণা এখানে উপস্থিত। এই বক্তব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তিনটি প্রশ্ন তুলেছেন জগদীশ গুপ্তের *লঘু-গুরু* সম্পর্কে, যে কথাগুলি তাঁর অন্যান্য লেখার ক্ষেত্রেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই মূল্যায়ন ভবিষ্যতের জগদীশ গুপ্ত ‘পাঠ’কে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

এক, সাহিত্য কিংবা বড়ো অর্থে যে কোনো শিল্পকর্ম রবীন্দ্রনাথের কাছে রসাস্বাদনের সামগ্রী, যা মনের পথ্য। কিন্তু তা কোন মনের পথ্য? সেটি কি নীতি-নৈতিকতা, মঙ্গলবোধ, দার্শনিক অবস্থান নিরপেক্ষ কোনো স্থির বিমূর্ত ধারণা? রবীন্দ্রনাথ কোনো ব্যাখ্যা দেননি। কিন্তু যা মনের পথ্য, মনকে আহ্বাদিত করে, মনের ‘সম্পূর্ণ সায়’ পায় তা সেই ব্যক্তির দার্শনিক অবস্থান, মঙ্গলবোধের সাপেক্ষেই। ফলত, মনের সঙ্গে ব্যক্তির জাগতিকবোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আর ব্যক্তি বিশেষে, দার্শনিক দৃষ্টিকোণের ভিন্নতা ‘মন’-এর সায় বদলে দেয়। শিল্প, সাহিত্যের বিচারের ‘মন’ একটেরে, স্থির, সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয় নয় বরং তা সচল, চলমান একটি প্রক্রিয়া। দুই, জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের পরিণতিও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি রবীন্দ্রনাথের। বহুকালে আগে অ্যারিস্টটল (আনু. ৩৮৪ বিসি-৩৩২বিসি) তাঁর *পোয়েটিকস*-এ (আনু. ৩৩০ বিসি) কাহিনির বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে কিছু কথা লিখেছিলেন। সে কথার অনুরণন রবীন্দ্রনাথের লেখায় পাওয়া যায়। “Homer more than any other has taught the rest of us the art of framing lies in the right way. I mean the use of paralogism.”^{২৯} ভ্রান্তি সৃষ্টি ও বিশ্বাসযোগ্য কাহিনি কৌশল প্রসঙ্গে অসামান্য মন্তব্য করেন। বাইওয়াটারের তর্জমা—“A likely impossibility is always preferable to an unconvincing possibility.”^{৩০} শিশিরকুমার দাশের তর্জমায়— “অবিশ্বাস্য সম্ভাব্যতার চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য অসম্ভাব্যতা বেশী গ্রহণযোগ্য।”^{৩১} হামফ্রে হাউসের কথায় আরও ক্ষুরধার হয়েছে— “For the purposes of poetry a convincing impossibility is preferable to an unconvincing possibility”^{৩২} রবীন্দ্রনাথ হয়তো অ্যারিস্টটলের মতো বলতে চাননি কিন্তু জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের পরিণতি তাঁর বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন বাস্তব অভিজ্ঞতা কিংবা বানিয়ে তোলা সত্যের ছাপ *লঘু-গুরু* উপন্যাসে দেখতে পাননি।

রবীন্দ্রনাথ জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের জগৎ ও তার পরিণতি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রেখে গেলেন। আকস্মিক, কাকতালীয় সমাপ্তি এবং কাহিনি বৃত্ত কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? আমাদের প্রস্তাব জগদীশ গুপ্তের গল্প-উপন্যাসের আপাতত অবিশ্বাস্য পরিণতির পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তিক্ততা ও নৈরাশ্য। তিন, জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের রাজ্য রবীন্দ্রনাথের সাত সমুদ্র পারের বিদেশ, এমন কী তাঁর মনে হয়েছে লেখকও হয়তো রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে অপরিচিতের সন্ধান রত ছিলেন। জগদীশ গুপ্ত এই অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলেন *উদয়লেখা* গল্প বইয়ের ‘নিবেদন’ অংশে। তিনি লেখেন—

“লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল’ আমাকে কাটাইতে হইয়াছে সেখানে ‘স্বভাবসিদ্ধ ইতর’ এবং ‘কোমর বাঁধা সয়তান’ নিশ্চয়ই আছে, এবং বোলপুরের টাউন প্ল্যানিং-এর দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারিতে হয় নাই, ‘ও-জায়গা’ আপনি চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি আমার আপত্তি এই যে পুস্তকের পরিচয় দিতে বসিয়া লেখকের জীবন-কথা না তুলিলেই ভাল হইত, কারণ উহা সমালোচকের ‘অবশ্য দায়িত্বের বাইরে’ এবং তাহার ‘সুস্পষ্ট প্রমাণ’ ছিল না”^{৩৩}

জগদীশ গুপ্তের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কেবল রবীন্দ্রনাথই নন, অনেক সমালোচকেরাই জগদীশ গুপ্তকে এভাবে অভিযুক্ত করেছেন। জগদীশ গুপ্তের আখ্যান রবীন্দ্রনাথের রুচিবোধকে আহত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন যে, তাঁর আপত্তি নৈতিক কারণে নয়, কিন্তু এই আপত্তির পেছনে কিংবা তাঁর বিশেষ রুচির নির্মাণে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ, নৈতিকতাবোধ, সর্বপরি মঙ্গলবোধ ক্রিয়াশীল ছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এবং বৃহত্তর পাঠক সমাজের সায় ছিল, নইলে জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে নৈঃশব্দের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এটাও ঘটনা যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের বড়ো পালাবদলের সূত্রপাত, যা কিনা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি বদলে দেয়।^{৩৪} বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে

পরীক্ষা-নিরীক্ষার শুরু হয়। দুই-বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় কী কোনও ভাবে প্রভাবিত করেছে জগদীশ গুপ্তকে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গে আসার আগে অন্য প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার। উনিশ শতক মানবসভ্যতার বিপুল অগ্রগতির সময়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ‘গণতন্ত্র’-এর উন্মেষের কাল। মানুষ একে একে সন্ধান পেল বাষ্প শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি এবং পারমানবিক শক্তির যা মানুষের দেখার জগৎকে নিমেষে বদলে দিল। কী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কী মানব অধিকারের প্রশ্নে সভ্যতার বিরাট উল্ফনের কাল। তা স্থায়ী হয় নি, অচিরেই ১৯১৪-র বিশ্বযুদ্ধ মানুষের বিশ্বাস, আস্থা, ভরসা ভেঙ্গে ফেলে। পৃথিবীকে দেখতে শুরু করে নতুন করে। ঈশ্বরের কল্যাণময় ও মঙ্গলময় সত্তা নিয়ে সংশয়ী হয়ে পড়ে মানুষ। এ কথার অর্থ এই নয় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অবধি ঈশ্বর বিশ্বাস অটুট ছিল, দর্শনচর্চা-জ্ঞানচর্চার পরিধিতে সংশয়ের জন্ম অনেককাল আগেই, আখ্যানের রাজ্যে এই তার প্রথম পদার্পণ, অন্তত বাংলা সাহিত্যে। যুদ্ধের কথা কী এর আগে আমরা শুনি নি বা পড়ি নি? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হ্যাঁ। সেই সব যুদ্ধের অভিঘাতও কম ছিল না। কিন্তু এর আগে অবধি সমস্ত যুদ্ধই চিহ্নিত হয় স্থাননামের ভিত্তিতে, ১৯১৪ সেখানেই আলাদা, যখন সমগ্র পৃথিবী জড়িয়ে পড়ল। কেবল আয়তন বা স্থায়ীত্বের দিক দিয়ে নয়, রীতি-নীতি-কৌশল সব কিছুই বদল ঘটে গেল। আগের যুদ্ধে হত্যাকারী ও নিহত জানে কে মারছে এবং কে মরছে, কে কাকে কত দূর থেকে মারছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৌজন্যে এখন নিহত আর ঘাতকের সাক্ষাতের প্রয়োজন পড়ছে না, পরস্পর পরস্পরের অগোচর। কী কারণে তারা মারা যাচ্ছে, কীসের বাটোয়ারা চলছে তাও অজানা। যুদ্ধ-মারামারি-কাটাকাটি মূর্ত থাকছে না। মানুষ আঘাত করছে বিমূর্তকে, ফলে, তার (হত্যালীলার) অভিঘাত তৈরি করছে ভিন্ন ধরনের অনুভূতি, অনুরণন। যুদ্ধের বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতার প্রত্যক্ষ অভাববোধ

আমদানী করছে এবং গড়ে নিচ্ছে এক অনিশ্চিত সংবেদনশীলতা। যুদ্ধের তাগিদে খুঁড়তে হচ্ছে খাদ, চেষ্টা করছে বাঁচতে আর লুকিয়ে সুযোগ খুঁজছে আঘাত করার। সাধারণ সৈনিকের লড়াই অনিশ্চয়তার সঙ্গে, যুদ্ধ একই সঙ্গে জীবন নামক যাত্রাটিকে করে তুলছে অনিশ্চিত, এ কথার অর্থ এই নয় যে যুদ্ধ এই প্রথম জীবনকে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড় করালো। এর আগেও পৃথিবী অনেক যুদ্ধ দেখেছে, সে যুদ্ধও জীবন নামক যাত্রাটিকে বিপর্যস্ত করেছে। কিন্তু পূর্বের সমস্ত যুদ্ধের সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দার্শনিক তফাৎ রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই প্রথমবার উড়োজাহাজ ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও প্রযুক্তির ব্যবহার যুদ্ধকে করে তুলেছে অনেক বিমূর্ত। ট্রেঞ্চের মধ্যে মাথা নিচু করে শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে পথ খুঁজতে হচ্ছে মানুষকে। বদলে যাচ্ছে মানুষের পরিচয় ও সত্তা। যুদ্ধ তো আর মানুষে মানুষে নয়, প্রযুক্তিই এখন মুখ্য; বলা ভালো যুদ্ধ এখন বিমূর্ত। অ-মানুষতার চিহ্নগুলো আরেকবার আয়ত্ব করেছে সে, হয়ে উঠছে অমানবিক, জান্তব, জন্তবৎ। হোমো সেপিয়েন্স ফিরে পাচ্ছে হোমো ইরেকটুসের প্রাথমিক পর্বকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লোপাট করে দিচ্ছে মানুষের ঋজু হয়ে থাকার ক্ষমতা, মানুষতার চিহ্নগুলোকে; যা সে একদা আয়ত্ব করেছিল শ্রমের মাধ্যমে।^{৩৫} প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব বসুর একটি কাব্যনাটকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ‘প্রথম পার্থ’ নাটকের কৃষ্ণ কর্ণ নানা ভাবে যুদ্ধে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। কেন সে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে যায়, তা আলাদা আলোচনার বিষয় আমরা কেবল যুদ্ধের প্রসঙ্গটিই উদ্ধৃত করবো, কেমন সেই যুদ্ধ? যেখানে হত ও হত্যাকারী সমগ্র সত্তা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কর্ণ বলছে—

“শত্রুতা? কে বলে শত্রুতা?

প্রেম, কৃষ্ণ, তীব্রতম প্রেম!

ঘনিষ্ঠতম ভ্রাতৃত্ব, নিবিড়তম মিলন।

ছিন্ন ত্বক

দীর্ঘ মাংস

শোণিত স্রাব

স্বেদ, কম্পন, মূর্ছা, যন্ত্রণা, আনন্দ—

হত্যার তুরীয়ানন্দে মিলন।”^{৩৬}

কেন আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উড়োজাহাজ ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে এতোটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি? সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখার শরণ নেবো। *জাপানে-পারস্যের* অন্তর্গত গ্রন্থ হিসেবে ‘পারস্য-যাত্রী’র প্রথম প্রকাশ ১৩৪৩-এর শ্রাবণে। গ্রন্থভুক্ত হওয়ার আগে এই লেখাগুলি ‘পারস্যযাত্রা’ নামে *প্রবাসী* ও ‘পারস্যভ্রমণ’ নামে *বিচিত্রা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। *প্রবাসী* প্রকাশিত লেখাটি আমরা উদ্ধৃত করবো। ১৯৩২ সালে পারস্য দেশে যান রবীন্দ্রনাথ। এটি তাঁর দ্বিতীয় বিমানযাত্রা। পারস্য যাওয়ার পথে তাঁদের বাগদাদে নামতে হয়। এবং তিনি শুনলেন যে ব্রিটিশ বিমানবাহিনী বিরোধী শেখের গ্রামে নিয়মিত বোমাবর্ষণ করে চলেছে। এই হত্যালীলা, নিষ্ঠুরতা, নির্বিচারে অপরাধী-নিরাপরাধ মানুষ খুন রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করে। কী সহজে যন্ত্রের সাহায্যে একদল মানুষ হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আকাশ থেকে কিছু অস্ত্রক্ষেপ মাত্র! অবিশ্বাস্য রকমের সহজ হয়ে গেছে হত্যা ও নৃশংসতা। যে উচ্চতায় পৌঁছলে বস্তুজগতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের ভেদাভেদ বোধ মুছে যায়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উঁচুতে ওঠার কৌশলের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার ফলে অমানুষিক প্রবৃত্তিগুলি আরও সহজ হয়ে যায়। যা মানুষের মধ্যে তৈরি করে ভিন্ন কিসিমের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। নিজের বিমানযাত্রার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে বুঝতে চাইলেন। সেই চিন্তা

ফলেই ব্রহ্মতত্ত্বকে আরেকভাবে পড়ার প্রস্তাব রাখলেন। নাটকীয়ভাবে তাঁর লেখায় ভারতীয় আন্তিক দর্শনের প্রসঙ্গ উঠে এলো। ‘উদ্ধৃত যন্ত্রটা’, অর্থাৎ বিমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

“বায়ুতরী যতই উপরে উঠল ততই ধরণীর সঙ্গে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগ সংকীর্ণ হয়ে একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ে এসে ঠেকল, দর্শনইন্দ্রিয়ে, তাও ঘনিষ্ঠ ভাবে নয়। নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে যে-পৃথিবীকে বিচিত্র ও নিশ্চিত করে জেনেছিলুম সে ক্রমে এল ক্ষীণ হয়ে, যা ছিল তিন আয়তনের বাস্তব, তা হয়ে এল এক আয়তনের ছবি। সংহত দেশ কালের বিশেষ বিশেষ কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ রূপ। তার সীমানা যতই অনির্দিষ্ট হতে থাকে, সৃষ্টি ততই চলে বিলীনতার দিকে। সেই বিলয়ের ভূমিকার মধ্যে দেখা গেল পৃথিবীকে, তার সভা হল অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবি এল কমে। মনে হল, এমন অবস্থায় আকাশ-যানের থেকে মানুষ যখন শতাব্দী বর্ষণ করতে বেরোয় তখন সে নির্মমভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে; যাদের মারে তাদের অপরাধের হিসাববোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে, কেননা, হিসাবের অঙ্কটা অদৃশ্য হয়ে যায়। যে-বাস্তবের পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ, অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল সেখান থেকে দেখলে মারেই বা কে, মারেই বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়ো জাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সাস্থনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।”^{৩৭}

এখানেই শেষ নয়, যুদ্ধে প্রযুক্তির ব্যবহার ও নির্মমতাকে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের একটির ধারার সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে চাইছেন, কেবল তাই নয়। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য এই ঘটনাটিকে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বায়িত করলেন। এরপরেই তিনি লিখলেন—

“এই সাম্রাজ্যনীতি ব্যক্তিবিশেষের সত্তাকে অস্পষ্ট করে দেয় বলেই তাদের মারা এত সহজ। খৃষ্ট এই সব মানুষকেও পিতার সন্তান বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু খ্রীস্টান ধর্মযাজকের কাছে সেই পিতা এবং তাঁর সন্তান হয়েছে অবাস্তব, তাঁদের সাম্রাজ্যতত্ত্বের উড়োজাহাজ থেকে চেনা গেল না। তাঁদের সেইজন্যে সাম্রাজ্য

জুড়ে আজ মার পড়ছে সেই খুঁটেরই বুক। তা ছাড়া উড়ো জাহাজ থেকে এই-সব মরুচারীদের মারা যায় এত অত্যন্ত সহজে, ফিরে মার খাওয়ার আশঙ্কা এতই কম যে, মারের বাস্তবতা তাতেও ক্ষীণ হয়ে আসে। যাদের অতি নিরাপদে মারা সম্ভব মারওয়ালাদের কাছে তারা যথেষ্ট প্রতীয়মান নয়। এই কারণে, পাশ্চাত্য হননবিদ্যা যারা জানে না তাদের মানব-সত্তা আজ পশ্চিমের অস্ত্রীদের কাছে ক্রমশই অত্যন্ত ঝাপসা হয়ে আসছে।”^{৩৮}

রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং আধুনিক সমরাস্ত্রের ব্যবহার মানব চৈতন্যে গভীর ভাবে প্রভাব ফেলেছিল। এবং সেই অভিজ্ঞতার প্রভাবে, অনুসঙ্গে নির্মিত হচ্ছিল আরেক কিসিমের বাস্তবতা। পুরোনো ভাষ্যে, অভিজ্ঞতায়, মঙ্গলবোধ, যুক্তিবোধে যা অসংবেদনশীল। শিল্প-সাহিত্য যে তার বাইরে থাকেনি বলা বাহুল্য। বিশেষত, শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংবেদনশীল চৈতন্যে নব উদ্ভূত অভিজ্ঞতার অনুরণন লক্ষণীয়। এখানে এই প্রশ্ন উঠতে পারে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? সে প্রশ্নে যাওয়া আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঙালিদের অংশ গ্রহণ বিষয়ে কিছু কথা প্রয়োজনীয়। প্রায় ১৫ লক্ষ ভারতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তারমধ্যে ৬ লক্ষ সামরিক কাজকর্মের জন্যে, বাকিরা অসামরিক কর্মী হিসেবে। বাঙালিদের অংশগ্রহণ কম হলেও প্রাসঙ্গিক। কবি নজরুল ইসলাম সৈনিক হিসেবে করাচিতে ছিলেন। এর বাইরে যুদ্ধের নানান সংবাদ, পরে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকথা সাময়িকপত্রে ও বই আকারে প্রকাশিত হয়। প্রতক্ষ্য না হলেও সেসব সংবাদ বাঙালিকে যুদ্ধের চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবেই অবহিত করেছিল। ইউরোপের সমর সংবাদ *ভারতী* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের সচিত্র অ্যালবাম বাঙালি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়। ফলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা বাঙালি পাঠক ও বুদ্ধিজীবীদের অগোচর ছিল এমনটা নয়।^{৩৯}

রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধ ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে যে কথাগুলি লিখলেন তা গভীর অভিনিবেশের দাবি রাখে। প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অভাব এবং দূর থেকে কিংবা আকাশ থেকে অপরাধী-নিরাপরাধ নির্বিশেষে মানুষ খুন হত্যাকারীকে দ্বিধাগ্রস্থ করে না, তাকে করে তোলে নির্মম নৃশংস। দূরত্ব এবং উচ্চতার কারণে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাও ক্ষীণ হয়ে পড়ে, মানুষ হয়ে ওঠে অমানুষিক, জান্তব, জন্তুবৎ। হৃদয়বেগের বদলে প্রবৃত্তি মুখ্য ভূমিকা নেয়। বস্তু জগৎ, ব্যক্তিক সম্বন্ধ, সত্তা যত অস্পষ্ট হয়ে আসে হৃদয় ও মস্তিষ্কের উপর নিয়ন্ত্রণ কমে আসে। তাই বলাহীন হয়ে ওঠে নৃশংসতা। যা বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাবাদ, যুক্তিবোধ, মঙ্গলের ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা যে সামাজিক চৈতন্য নির্মাণ করে যার প্রভাব জগদীশ গুপ্তের মধ্যে অস্বাভাবিক নয়। যদিও জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে যুদ্ধের প্রসঙ্গ বা চিত্র অনুপস্থিত, কিন্তু সামাজিক চৈতন্যের প্রভাব কি তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন? সচেতন ভাবেই জগদীশ গুপ্ত এই আখ্যানের রাজ্য প্রস্তুত ও নির্মাণ করেছেন তা আমরা বলতে চাইছি না। বরং প্রস্তাব আকারে রাখছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানকে দেখার। যুক্তির, মঙ্গলবোধের কবর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নির্মাণ করেছিল তার প্রভাব কি দেখা যায় না জগদীশ গুপ্তের কখন বিশ্বে?

সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) মানব মনের স্তরবিন্যাস করেছিলেন, সেই সূত্রে সহজাত মানবিক প্রবৃত্তির তাত্ত্বিক কাঠামো গঠন করেন। ফ্রয়েড মানব প্রবৃত্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন Eros এবং Death Drive (তর্জমার মাধ্যমে যা থ্যানাটস নামে পরিচিতি হয়)। এই দ্বিবিভাজন সাইকোলজি চর্চায় যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বিতর্কিত। বিশেষত তর্কের মুখে পড়ে তাঁর থ্যানাটসের ধারণাটি। কিন্তু এই ধারণাটি গ্রহণ করলে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই ঘৃণা, বিদ্বেষ, ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের একপ্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। Death Drive-এর প্রসঙ্গ

প্রথম সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখিত হয় *Beyond the Pleasure Principle* (১৯২০) বইয়ে। পরে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন *The Ego and the Id* (১৯২৩)। আরো কিছু কাল পরে সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত বই *Civilization and Its Discontents* (১৯৩০) এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। বছর দুয়েক পরে আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) লেখা চিঠির উত্তরে এই নিয়ে আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লীগ অব নেশন আইনস্টাইনকে অনুরোধ করে যুদ্ধ নামক ভয়াবহতা থেকে কীভাবে মানব সমাজ মুক্তি পেতে পারে— এ বিষয়ে কোনো পণ্ডিতের সঙ্গে যেন আলোচনা করেন। সে কারণে আইনস্টাইন চিঠি লেখেন ফ্রয়েডকে, যা ১৯৩৩ সালে *Why War?* নামে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল, সেই বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে লীগ অব নেশনের এই অনুরোধ। আইনস্টাইন চিঠির শুরুতে স্বীকার করে নেন যুদ্ধ কিংবা ধ্বংসের প্রবৃত্তি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেকারণে ফ্রয়েডকে তিনি অনুরোধ করলেন এ বিষয়ে আলোকপাত করতে। উত্তরে ফ্রয়েড জানানলেন, মানুষের মধ্যে দুটো প্রবৃত্তি আছে—

“We assume that human instincts are of two kind: those that conserve and unity, which we call “erotic” (in the meaning Plato gives to *Eros* in his *Symposium*), or else “sexual” (explicitly extending the popular connotation of “sex”); and’ secondly, the instincts to destroy and kill, which we assimilate as the aggressive or destructive instincts. These are, as you perceive, the well known opposites, Love and Hate, transformed into theoretical entities; they are, perhaps, another aspect of those eternal polarities, attraction and repulsion, which fall within your province. ... But we must be chary of passing overhastily to the notions of good and evil. Each of these instincts is every whit as indispensable as its opposite and all the

phenomenon of life derive from their activity, whether they work in concert or in opposition.”⁸⁰

দুই প্রবৃত্তি একা কাজ করে না এবং একটিকে শুভ ও অপরটিকে অশুভ বলে চিহ্নিত করাও ঠিক নয়। এদের সম্মিলনই জীবনপ্রবাহ। দুই প্রবৃত্তি— এরস ও থ্যানাটস— পরস্পর সংলগ্ন বলেই মনোবিজ্ঞানীরা তাদের পৃথক ভাবে চিনে উঠতে পারেননি। ফ্রয়েডের মতে এই দুই প্রবৃত্তি আমাদের ‘pleasure principle’-কে নিয়ন্ত্রণ করে। স্বভাবতই, এই প্রবৃত্তিগুলির বিচারবোধ থাকে না। সেকারণেই নির্বিচারে আত্মরতি নিমগ্ন প্রবৃত্তিগুলি অপরের লাভ-ক্ষতির হিসেব না করে নিজ কাজে প্রবৃত্ত হয়।

এই প্রসঙ্গেই *Civilization and Its Discontents* বইয়ে ফ্রয়েড লিখছেন—

“I may now add that civilization is a process in the service of Eros, whose purpose is to combine single human individuals, and after that families, then races, peoples and nations, into one great unity, the unity of mankind. Why this has happen, we do not know; the work of Eros is precisely this.”⁸¹

পরে মরণ প্রণোদনা (Death Drive) প্রসঙ্গে লিখছেন—

“But man’s natural aggressive instinct, the hostility of each against all and of all against each, opposes this programme of civilization. This aggressive instinct is the derivative and the main reprehensive of the death instinct which we have found alongside of Eros and which shares world-dominion with it. And now, I think, the meaning of the evolution of civilization is no longer obscure to us. It must present the struggle between Eros and Death, between the instinct of life and the instinct of destruction, as it works itself out in the human species.”⁸²

ফ্রয়েড বলবেন মানবিক কর্মকাণ্ড কেবলমাত্র একটি প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, দুই প্রবৃত্তির পেছনে কাজ করে। যার একটি হলো মরণ প্রণোদনা। তাঁর কাছে এটা সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি অঙ্গ।

ফ্রয়েড বলছেন এই প্রবৃত্তি সভ্যতা ও মানব জাতির মধ্যে চিরকালই ছিল। কিন্তু ফ্রয়েড এই বিষয়টি প্রথম খেয়াল করলেন এবং তত্ত্বায়িত করলেন কোন সময়ে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ফেরত আসা সৈনিকদের চিকিৎসা করতে করতে ফ্রয়েড প্রথম উপলব্ধি করলেন এই বিষয়টি। সেই সূত্রেই আবিষ্কার করলেন আরেক মানব প্রবৃত্তির। যা Death Drive, পরে তর্জমাকারদের অনুবাদে থ্যানাটস নামে চিহ্নিত হয়। ফ্রয়েড তাঁর *Beyond the Pleasure Principle*-এ লিখছেন—

“The terrible war which has just ended gave rise to a great number of illnesses of this kind, but it at least put an end to the temptation to attribute the cause of the disorder to organic lesions of the nervous system brought about by mechanical force. 1 The symptomatic picture presented by traumatic neurosis approaches that of hysteria in the wealth of its similar motor symptoms, but surpasses it as a rule in its strongly marked signs of subjective ailment (in which it resembles hypochondria or melancholia) as well as in the evidence it gives of a far more comprehensive general enfeeblement and disturbance of the mental capacities. No complete explanation has yet been reached either of war neuroses or of the traumatic neuroses of peace. In the case of the war neuroses, the fact that the same symptoms sometimes came about without the intervention of any gross mechanical force seemed at once enlightening and bewildering.”^{৪৩}

প্রসঙ্গত, ফ্রয়েডের মরণ প্রণোদনার ধারণা দেন মূলত ব্যক্তি চৈতন্যকে আধার করেই। তা কি সমষ্টির চৈতন্যের সম্পর্ক রহিত? বস্তুত, যুদ্ধের মতো আর্থ-সামাজিক ঘটনা সমষ্টির চৈতন্যকেও প্রভাবিত করে, যার প্রতিফলন ফ্রয়েড পান যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের মধ্যে। কার্যত প্রথম বিশ্বযুদ্ধই ফ্রয়েডকে আবার করে ভাবিয়ে তোলে মানব চৈতন্য সম্পর্কে। যা তাঁর পূর্ববর্তী অভিমতকে পুনর্বিবেচনায় প্রণোদিত করে, Eros বিষয়ক ধারণার চালচিত্রেও লাগে নতুন পরত। রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধে প্রযুক্তির ব্যবহারের মধ্যে দেখেছিলেন— ব্যক্তি সত্তা অস্পষ্টতা, সত্তার সঙ্গে সত্তার যোগাযোগ অস্পষ্ট হয়ে যায় বলেই হত্যার এষণা আরও প্রবল ও নির্মম হয়ে ওঠে। প্রযুক্তি ইন্দ্রিয়কে অবশ করে দেয় বলে— ইন্দ্রিয় যার মাধ্যমে মানুষ জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ রচনা করেছে— মানুষ নির্মম হয়ে ওঠে। আর বাস্তবের উপর মানুষের স্বাভাবিক মমতা ঝাপসা হয়ে যায় বলে হত্যা করতে দ্বিধা করে না। একজন শিল্পী এভাবেই দেখছেন যুদ্ধকে, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ শিল্পী তার ইন্দ্রিয়জাত বোধ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই পৃথিবীকে দেখেন এবং দেখান। আরেকদিকে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড, তাঁর পদ্ধতির মাধ্যমে বুঝতে চান প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজ চৈতন্যকে। দুজনের দেখার পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উভয়ে মিলেছিলেন যে জায়গায় তা হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে নতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আরেক কিসিমের বাস্তবতা তৈরি করেছে।

এরিক হবস্‌বম তাঁর *The Age of Extremes 1914-1991*-এর ভূমিকায় বারো জন বিশিষ্ট মানুষের বিশ শতক সম্বন্ধীয় মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। বিশ শতক সম্পর্কে তাঁদের মতামত ও মন্তব্যগুলি হলো— ‘terrible century’, ‘terrible events which humanity has lived through’, ‘century of massacres and wars’, ‘violent century’⁸⁸ ইত্যাদি। এই মন্তব্যগুলিতে থেকে অনুমান করা যায় যে, মানব সভ্যতার উপর প্রথম

বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের অভিঘাত কেমন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মঙ্গলময় ঈশ্বরকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় যদিও, দর্শনের জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বহু আগেই। ইউরোপের আলোকপ্রাপ্তি ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী রূপে তুলে আনেন যুক্তিবাদকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সেই যৌক্তিকতার দর্শনকেও প্রশ্ন করছে, খারিজও করে দিচ্ছে। যুদ্ধ পূর্ববর্তী যুক্তিবোধ, মানবতাবোধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না ১৯১৪ পরবর্তী সময়কে। কারুর কাছে সর্বময় ঈশ্বর, যিনি সতত-ই মঙ্গলময়, কারুর কাছে এনলাইটেনমেন্টের যুক্তি ঈশ্বরত্ব উভয়ই সংশয়ের মধ্যে পড়ছে। ফিরে আসছে ‘শয়তানী শক্তি’, ‘দৈব-নির্যাতন’, ‘তামসী জগৎ’, অমানুষতা। আর জগদীশ গুপ্ত সেই আবিলতার কথাকার, যেখানে তিনি গুলিয়ে দিচ্ছেন, গ্রাস করছেন অন্য (ভালো/শুভ) মানবিক প্রবৃত্তি গুলোকে। নির্মিত হচ্ছে তিজ্জ কাব্য, যা যাপন করছিল বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী। বস্তুত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধই বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি ভূমিতে মূলগত বদল ঘটায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অনুসঙ্গ হয়তো বাংলা সাহিত্যে বেশি কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-ই বিভিন্ন সাহিত্য (বাংলা) আন্দোলনের বিভিন্ন অভিমুখের সূচক বিন্দু। দেখার পরিধিকে বদলে দিচ্ছে, যার অন্যতম দৃষ্টান্ত জগদীশ গুপ্তের আখ্যান।

আমরা জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের দিকে, মূলত উপন্যাসগুলির দিকে নজর ফেরাবো। বোঝার চেষ্টা করবো তাঁর আখ্যানের রাজ্যটি কেমন? মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় *অসাধু সিদ্ধার্থ* সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন এই উপন্যাসের নায়ক বাংলা সাহিত্যের প্রথম অপনায়ক। শেষ পর্যন্ত সে নায়ক-ই, খল চরিত্র নয়; বরং এ উপন্যাসে খল চরিত্র রাসবিহারী, দেবরাজ, কাশীনাথ। উপন্যাসের কাহিনিটি এরকম— নটবর নামে এক যুবক, শুধুই নটবর, কেউ জোর করলে বিনীতভাবে দাশ শব্দটি উচ্চারণ করত। সে নিজেকে সমাজের কাছে সিদ্ধার্থ নামে পরিচিত করে। সেও আবার সমাজের নাগপাশে বদ্ধ, একদল জাল, জোচ্চর, কপট মানুষ

ঘিরে রেখেছে তাকে। এক অর্থে সিদ্ধার্থের সঙ্গে যাদের কোনো তফাৎ নেই। সিদ্ধার্থ তার গোপনচারিতা, কপটতা নিয়ে ক্লান্ত— পাপবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে। দেনা, সর্বপরি ‘বোধ’ নিয়ে বিপর্যস্ত সিদ্ধার্থ নিজেকে লুকিয়ে রাখার স্থান নেই জেনেও পালিয়ে যায় একটি পার্বত্য উপত্যকায়। চেষ্টা করে আত্মহত্যা করতে, কিন্তু “অনিশ্চিত সুনিশ্চিত হইবার পূর্বেই ঘটনাচক্র আর এক পাক ঘুরিয়া গেল।”^{৪৫} যে কারণে সিদ্ধার্থ মরণের মুখ থেকে জীবনের মঞ্চে হাজির হয় সে একটি নারী, নাম অজয়া। সিদ্ধান্ত বদলের সময়টি জগদীশ গুপ্তের বর্ণনায় উঠে এসেছে এই ভাবে—

“তার শীতল রক্ত দেখিতে দেখিতে জরাক্রান্তের নাড়ীর মত উদ্দাম হইয়া উঠিল।

অতলে গর্জন করিতেছে মৃত্যু।

কিন্তু সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল অশেষ জীবনের নিগূঢ় ইঙ্গিত— অসীম আঁধার-সাগরের উপর জ্যোতির্ময় শতদল ফুটীয়া উঠিয়া তাহারই অঙ্গপ্রভায় দিগন্ত পর্যন্ত স্বর্ণপ্রভাতের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ...পুষ্পস্তর হিল্লোলে হিল্লোলে আকাশের গা বাহিয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়া দিক্-সীমানায় লীন হইয়া গেছে। এই ছবিটা সিদ্ধার্থের আগে চোখে পড়ে নাই।”^{৪৬}

চকিতে পরিস্থিতির বদল জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের পরিচিত লক্ষণ। এক অনিশ্চয়তায় মোড়া তাঁর আখ্যানের রাজ্য এবং সেই অনিশ্চয়তা অনিবার্য।

আমাদের প্রস্তাব জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের এই বিশেষ লক্ষণ বা পরিণতির সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আমরা আগেই বলবার চেষ্টা করেছি যে যুদ্ধে প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষতাকে অনিশ্চিত করে তুলছে। এরসঙ্গে সভ্যতা হয়ে উঠছে অমানুষিক, জান্তব, জন্তবৎ। উপন্যাস শুরু হয় এইভাবে— দেবরাজ দেখা করতে এসেছে সিদ্ধার্থের সঙ্গে। অন্ধকার ঘরে সিদ্ধার্থ বসে আছে। দেবরাজকে সে জানায় বড়ো অন্ধকার, দেবরাজ হেসে জানায় বাইরে তো দিনের মতো ফুটফুটে জ্যোৎস্না।

“দেবরাজের ডান হাতখানা বুকের উপর টানিয়া তুলিয়া লইয়া সিদ্ধার্থ বলিল,— অন্ধকার এইখানে। কান পেতে থাকো, একটা শব্দ শুনতে পাবে। ভগবানের অভিসম্পাত বুকের গহ্বর জুড়ে চেপে বসে আছে; তার ভেতর থেকে অবিশ্রান্ত উঠেছে পৃথিবীর ক্ষুধার গোঙানি।”^{৪৭}

শুরুতেই কথক ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন ঈশ্বরের অভিশাপ এবং পৃথিবীর অনন্ত ক্ষুধার যুপকাঠে বন্দি অপ-নায়কের যন্ত্রণার কথা। ক্রমে ক্রমে পাঠক জেনে যাবে, দেবরাজের আগমনের হেতু। মহাজন রাসবিহারী বেআইনি ভাবে সিদ্ধার্থকে ব্যবহার করে পুরোনো শত্রুকে খেঁতলে দিতে চায়। আর, সেই সুযোগে সিদ্ধার্থের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ হবে। এই প্রস্তাবটি সিদ্ধার্থের মনে সু ও কু-এর কলহ শুরু করায়, যতটা অধঃপতিত ও হীন বলে সিদ্ধার্থ পরিচিত হোক না কেন, বাস্তবে রাসবিহারীদের মতো সে নয়। ‘দুর্বিপাকে’ ও বেঁচে থাকার আশায় সে অসততার আশ্রয় নেয়। সিদ্ধার্থ অবাক হয়—

“মানুষের মনে কতদূর গভীর ইতরতায় নিঃসংশয় বিশ্বাস জন্মিলে তবে সে এ-হেন প্রস্তাব লইয়া আর একজনের টাকার লোভ দেখাইতে আসিতে পারে। ভিখারীও কাণ্ডজ্ঞান আছে— অভাবের তাড়নায় দেহ আর রূপ যার পণ্য তারও ধর্ম আছে; তারও ঘৃণার বস্তু পৃথিবীতে আছে; তার নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা আছে; পরলোক, পাপ-পুণ্য সে মানে; শ্রদ্ধার দাবীও সে করে; কিন্তু কোন্ নরকের অতলে গহ্বরে নামিয়া গেলে মানুষ দুনিয়ার আর সবই একধারে ঠেলিয়া দিয়া কেবল অর্থকেই প্রাপ্তির চরম স্বর্গ মনে করে!”^{৪৮}

লক্ষণীয়, কথক এখানে সিদ্ধার্থের মাধ্যমে সমাজ তথা পৃথিবীর এক বিশেষ চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। শুরুতে যে পৃথিবীর তীব্র, অনৈতিক, অশ্লীল ‘ক্ষুধার গোঙানি’ শব্দ শোনা গিয়েছিল সিদ্ধার্থের বুকের মধ্যে, সেই দুনিয়ার চিত্রই ফুটে ওঠে সিদ্ধার্থের বয়ানে। যারা কেবলই অর্থ প্রাপ্তির কারণে ধ্বংস করে দেয় মানবিক বোধগুলিকে। পাপ-পুণ্য, অপরাধবোধ, মঙ্গলবোধ, মানুষতা নামক ধারণাগুলোর থেকে বড়ো হয়ে ওঠে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির তৃপ্তি। অনৈতিক পথে অর্জিত টাকা নিয়ে সিদ্ধার্থের মত, ওটা ফোঁড়ার মতো, বিষ-ই।

এখানে সিদ্ধার্থ সুদখোর মহাজন রাসবিহারীর প্রস্তাবে ব্যথিত হলেও পরে সে অজয়ার ভাইয়ের বিপদ কামনা করেছে ঈশ্বরের কাছে। জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের জগৎ এই জটিলতাকে ধারণ করে চলে, সেখানে ঈশ্বরের হাত ধরে চলে আসে ‘অমঙ্গল’বোধ কিংবা অমঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করা হয় ঈশ্বরের কাছে। অজয়াকে দেখেই, তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আত্মহত্যার মুখ থেকে ফিরে আসে সিদ্ধার্থ। উপায় খুঁজতে থাকে কোন ছলনার মাধ্যমে অর্জন করবে অজয়াকে, সে কারণেই প্রার্থনা করে পাহাড়ী পথে অজয়ার দাদার আকস্মিক দুর্ঘটনা, যা তাকে ত্রাতার ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ করে দেবে, হয়তো সম্ভব হবে আলাপ। জগদীশ গুপ্ত লিখছেন— “ডাকাতরা কালী পূজা করিয়া লুঠতরাজে বাহির হয়— কিন্তু তাহাতে খরচ বেশী, শব্দও বেশী। সিদ্ধার্থ তাই নিঃশব্দে নিরীহ গনেশের শরণাপন্ন হইয়াছে।”^{৪৯} সিদ্ধার্থ কী লুঠতরাজে যাচ্ছে? নইলে ডাকাতদের কালী পূজার সঙ্গে তার গণেশ আরাধনার তুলনা কেন করবেন? নিঃশব্দ ঘাতকের মতো শিকারে বেরোয় নটবর ওরফে সিদ্ধার্থ। যদিও ডাকাতদের মতো অর্থ বা সম্পদের লোভে সে যাত্রা করছে না, কিন্তু তার যাত্রাও অর্থলিপ্সুদের মতো। সেও আসলে ডাকাতদের মতো কিংবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়ে বনিকদের মতোই অপরের অমঙ্গল কামনা করেছে আত্মসুখের জন্যে। যদিও জগদীশ গুপ্ত জানাচ্ছেন— “সঙ্কল্প তাহার সাধু সন্দেহ নাই।”^{৫০} তার উদ্দেশ্য প্রেয়সীর নৈকট্য, কিন্তু তা রজতের (অজয়ার দাদা) জীবনে সাময়িক ভাবে অমঙ্গলের বার্তা বাহক। “রজতের সে পিছু লইয়াছে। রজত পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ায়; যদি দৈবাৎ সে পা পিছুলাইয়া পড়ে, পা একখানা মচকাইয়া—”^{৫১} ঘটলো তাই, রজতের আর্ত চিৎকারে সিদ্ধার্থ বুঝল গণেশের কৃপা হয়েছে^{৫২}। তার অন্তরটা যেন “আবর্তিত হইয়া অতীব ত্রুর একটি হাসির আকারে দেখা দিল।”^{৫৩} ঈশ্বর যিনি সতত কল্যাণময়, মঙ্গলের বার্তা বহন করে আনেন যুগে যুগে, সে ঈশ্বরের কৃপায় সিদ্ধার্থ উৎফুল্ল, অথচ বিপন্ন রজতের অবস্থা

বাঘের মুখে হরিণ শাবকের মতো। বিপন্ন রজতের একটা ছবি সিদ্ধার্থ কল্পনা করে সে দিকে ছুটে গেল। এই ছবি শিকারের ছবি; শিকারীর, ঘাতকের জান্তব সাফল্য ধরা পরে সেই বিবরণে। “পৃথিবীময় সে মনে মনে হাতড়ে বেড়াচ্ছে মানুষের একখানি মুখ; বাঘের থাবার নীচে মৃগীর মত তার কাঁপুনি— চমৎকার ছবি।”^{৫৪} কাকতাল কিংবা অনিশ্চয়তা জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের কুল লক্ষণ। গুপ্ত ঘাতকেরা নিঃশব্দে আঘাত করে চরিত্রদের উপর, যার সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তীকালের প্রযুক্তির যুদ্ধের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

সিদ্ধার্থ মনে করে সে অপবিত্র। মন্দিরে কলুষিত মনের প্রবেশাধিকার নেই সে জানে। জন্মের সময় ঈশ্বরের আশীর্বাদ জোটেনি তার, পায়নি মানুষের শুভেচ্ছা। সে তার অপরাধ নয়। কিন্তু স্বকৃত অপরাধ ও পাপ কম নয়, নাম ভাঁড়িয়ে সেও ছুটেছে অজয়া অর্জনের লোভে। কিন্তু মিথ্যা পরিচয় দিয়েও তো সে টিকে থাকতে পারল না। তার যে অনুভূতি তাকে মানবিক করে তুলতে পারত, সেই মনই প্ররোচিত করল অসাধুতায়। ‘আত্ম’প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল যে ‘আমি’ সেই ‘আমি’-ই তার বিনাশ ঘটালো। কিন্তু সে কি আদৌ দোষী? “পৃথিবী ত’ আমারই প্রতিরূপে পরিপূর্ণ।... নিজে যা নয়, ছদ্ম আচরণে নিজেকে তা-ই প্রতিপন্ন করবার প্রাণান্ত প্রয়াস ত’ প্রত্যেকেরই জীবনের এক অংশ। কে কবে নিজেকে অকপটে প্রচার করেছে?”^{৫৫} অজয়ার প্রতি তার ভালোবাসা, ‘আত্ম’-বিকাশ, জীবন-প্রণোদনা (Eros) তাকে আরেকবার টেনে নিয়ে গেল মরণ-প্রণোদনার (Death Drive) দিকে। সে জানে পরাজয়ের ভয়ে অধর্ম বিলুপ্ত হয় না, অধর্মও প্রার্থিত বস্তু লাভের আরেক উপায়। রাসবিহারীর মতো পাপী, অপরাধীর নৈতিক প্রস্তাব যখন ফিরিয়ে দেয়, তখন রাসবিহারী জানান দেয়— যখন অনাহারে শুকিয়ে মরছিল সিদ্ধার্থ তখন ধর্ম তাকে বাঁচায়নি। এই (রাসবিহারী) পাপাত্মার অধর্মের পয়সাই তখন তাকে বাঁচিয়েছিল।^{৫৬} সুখের নিশ্চিত আশ্রয় সিদ্ধার্থের জুটবে না। এই বেদনা তাকে আশাহত

করেনি। সে দেখল এক আশ্চর্য মায়াপুরী, সেখানে কৰ্কশতা নেই, নেই দুর্নীতি। সে আশাবাদী
অজয়া ও তার সম্পর্ক পরিণতি পাবে। সেই মুহূর্তে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে প্রবেশ করে
অনিশ্চয়তা, গুপ্ত ঘাতকের মতো। তার নাম কাশীনাথ, অজয়ার পরিবারকে সে জানায়—

“তোমরা সিদ্ধার্থ বলছ কাকে? ওর নাম নটবর। বৈষ্ণবীর গর্ভে এক ব্রাহ্মণের জারজপুত্র ও।

অজয়া আত্ননাদ করিয়া উঠিল,— কি? কি?

— পরিচয় দেয়া এখনো শেষ হয়নি। এক বৃদ্ধা বেশ্যার শয্যাচর ছিল, অর্থলোভে ও তার পরিচর্যা করতো।...

আদন্ত্য ইতিহাস তিনি বলিয়া গেলেন।

আপন বিধবা কন্যার প্রেমপাত্র ছিল যে ও, সে কথাটিও বাদ দিলেন না।”^{৫৭}

নটবর ওরফে সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভ আর হয়ে ওঠে না, প্রত্যাখ্যাত হয় সে। রজতের দিকে
চাহিয়া অসঙ্কোচে বলে— ভগবান জানেন সে নিরাপরাধ। ‘নিয়তি চক্রান্তে’ ভালোবেসেছিল
অজয়াকে। ভালবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের হয়তো লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু
তারা তো একই মানুষ^{৫৮}। এখানেই প্রশ্ন কোন ‘নিয়তির’ হাতে পরাজিত হলো সিদ্ধার্থ?
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে— “বাঁচবার ও বাঁচাবার কোনো পথ মানুষের সামনে নেই,
সে একটি দুর্নিরীক্ষ্য এবং অতি-হিংস্র শক্তির হাতে অশক্ত এক পুতুল মাত্র— এই যেন জগদীশ
গুপ্তের বক্তব্য।”^{৫৯} সিদ্ধার্থ কি অদৃশ্য কোনো শক্তির হাতের পুতুল? নাকি সামাজিক স্বার্থের
সংঘাত এ পরিণতি কারণ? বস্তুত, সামাজিক স্বার্থের সংঘাত-ই অনিশ্চিত করে তোলে সিদ্ধার্থের
‘আত্ম’-বিকাশকে। যদিও সমগ্র পৃথিবীই সিদ্ধার্থের প্রতিক্রিয়া, কিন্তু কেবল তাকেই সহ্য করতে
হবে আত্মনিগ্রহ। ক্ষমাহীন, ক্ষুরশান বিবেক, নৈতিকতা কেবল তাকেই বিদ্ধ করবে। কেন না
সে অক্ষম এই সমাজকে বদলাতে, ফলে ত্রুর, নির্মম পৃথিবী মুহূর্তে অনিশ্চিত করে দেবে তার
জীবন। চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যেই চলতে হবে তাকে।

মহিষী (১৯২৯) ব্রজকিশোর ভাবী বৈবাহিকের সম্পদে মুগ্ধ হয়ে কালো মেয়ের সঙ্গে ছেলে অশোকের সম্বন্ধ করে। অর্থ-সম্পত্তির প্রতি ব্রজকিশোরের আসক্তি দীর্ঘদিনের। নকরি ঘোষের তেজস্বিতা সেরেস্তার হেড মোহর। নকরি ঘোষ সংসারের অনিত্যতায় বিশ্বাসী, সেই সুযোগে ব্রজকিশোর বিস্তর সম্পত্তি তৈরি করেছে। জগদীশ গুপ্ত লিখছেন— “বাবু অনিত্য সংসারের সহিত নির্লিপ্ত রহিতে লালায়িত বলিয়াই তাঁহার টাকায় ভূসম্পত্তি স্থায়ী নামে ক্রয় করা ব্রজকিশোরের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।”^{৬০} নকরি ঘোষের কাছে যা অনিত্য, ব্রজকিশোরের কাছে তাই নিত্য, বলা ভালো ব্রহ্ম। ফলে, পুত্রের সম্বন্ধ ঠিক করার বিষয়েও সেইটি অধিক গুরুত্ব পেলো। ব্রজকিশোর জানে সে যে সম্পত্তি পুত্র অশোকের জন্যে রেখে যাবে তা নিজের নয় অপরের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জিনিস। ব্রজকিশোরের কাছে কৌশলে, গায়ের জোরে, ফন্দি এঁটে অপরের থেকে ছিনিয়ে নেওয়াই পুরুষাকার, পুরুষার্থও। ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ কী তাই নিয়ে দীর্ঘ তর্ক রয়েছে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি এক লহমায় বুঝিয়ে দেয় ছিনিয়ে নেওয়ায় আসল পুরুষার্থ, পুরুষকারও। ব্রজকিশোর বলে, সে যা রেখে যাচ্ছে, এবং আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যে কেউ যা কিছু রেখে গেছে সব পরের কাছ থেকে নিয়ে। ঐ নেওয়ার নামই পুরুষকার।^{৬১} প্রাথমিক ভাবে অশোক কালো মেয়েকে বিয়ে রাজি না হলেও, ব্রজকিশোরের দানপত্রের ভয়ে রাজি হয়। পরে বাবার বন্ধুর কাছে অশোক জানে তাকে মিথ্যা দানপত্রের ভয় দেখিয়ে বিয়েতে রাজি করানো হয়েছে, সেই মুহূর্তে রাগ গিয়ে পড়ে জ্যোতির্ময়ীর উপর। অশোকের মনে হতে থাকে সে ভীরা, কাপুরুষ; সকলের ঠাট্টা-তামাশার পাত্র। অথচ তার কাছেও ‘টাকা একেবারে নির্দৈব, জাজ্জল্যমান’ এবং শেষ পর্যন্ত ‘তুলা দণ্ডে টাকার দিকটা ভারি হইয়াছিল’। তবুও তার যাবতীয় সাহস, পৌরুষত্বের পরীক্ষাগার হয় জ্যোতির্ময়ী। সে মনে করে তার লাঞ্ছনার জন্যে বাবা, গগন, মধুখুড়ো, মা কেউ নয়; দায়ী তার স্ত্রী, জ্যোতির্ময়ী।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনমালিন্যের কারণে জ্যোতির্ময়ী বাপের বাড়ি চলে যায়। অশোক রটিয়ে দেয় হস্তিনী নারীর সব লক্ষণ জ্যোতির্ময়ীর মধ্যে বিদ্যমান। গ্রাম সমাজে সকলেই জানে হস্তিনী নারী স্বামীর আয়ু নাশ করে। জ্যোতির্ময়ী বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসে জানতে চায় এই রটনার কারণ কী? কে রটিয়েছে এসব কথা? জগদীশ গুপ্ত লিখছেন—

“গুজব রটিয়েছে কে, তুমি না আর কেউ?

জ্যোতির মনে সন্দেহটা এই মুহূর্তে হঠাৎ দেখা দিলো।

প্রশ্ন শুনিয়া অশোকের হিতাহিতজ্ঞানটা এক নিমেষে বিলুপ্ত হইয়া গেল— যা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল তাহারই আবরণ উন্মোচিত করিয়া দিলো; জ্যোতির হৃদয় লক্ষ্য করিয়া প্রহরণ নিক্ষেপের দানবীয় উল্লাসে সে অন্ধ হইয়া উঠিল; বলিল,— আমিই, কিন্তু সেটা মিথ্যে নয়।”^{৬২}

অশোক কার্যত ত্যাগ করে জ্যোতির্ময়ীকে। রত্নময়ী ব্রজকিশোরকে জানায়— তোমার উপর রাগ করেছিল ছেলে; তার শোধ নিয়েছে সে ঘরের বউয়ের নামে ঘেন্নার কথা রটিয়ে; তুমি যে পাপ করেছ তার ফলভোগ করছে বউ^{৬৩}। রত্নময়ী হাহাকার করে— টাকা হয়েছিল তোমার বড়, এতটা তুমি ভাবনি। কেন তুমি ছেলেকে ফাঁকি দিতে গিয়েছিলে, আর কেন তুমি ওকে বুঝিয়ে দাওনি যে বউয়ের কোনো ‘অপরাধ’ নেই?^{৬৪} অপরের পাপ বা অপরাধের শাস্তি নিরপরাধের উপর বর্তায়, এ নতুন কিসিমের বোধ ও অভিজ্ঞতার জন্ম দিচ্ছে। বস্তুত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধই এই বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। *মহিষী* উপন্যাসে জ্যোতির্ময়ী চরিত্রটি ট্রাজিক পরিণতি পায়, কিন্তু গ্রিক ট্রাজিডির সঙ্গে তার মিল নেই। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে। আপাতত উপন্যাসের দিকে নজর দেওয়া যাক। ব্রজকিশোর সমস্যার সমাধান করে না, কারণ আপন অপরাধ ও পাপের দায় নিতে নারাজ, কিংবা অর্থপিপাসা, অনৈতিকতাই তাকে শিখিয়েছে, পাপ ও অপরাধ কর্মের মধ্যে লুকিয়ে আছে সত্যিকারের পুরুষাকার। জ্যোতির্ময়ীর ক্ষোভ, ক্রোধ, অভিমান কিছুই নেই; নেই সংসারিক ইষ্টকামনা। দ্বিতীয়বার স্বামীর বিবাহ চায়

নিজেকে বিচ্যুত করতে, সরিয়ে নিতে। সে পীড়িত, লড়াইয়ের ক্ষমতাহীন। পীড়াই তার নিত্যসঙ্গী, লড়াই বা প্রতিবিধান তার কাম্য নয়। কেন ‘বিচ্যুত’ হতে চায় সে? কারণ সে হয়তো জানে বা বোঝে এই কার্যকারণ সম্পর্কটির সঙ্গে সে বিযুক্ত, তার পরিণতির কারণ সে নয় এক বিশেষ সামাজিক বোধ ও চৈতন্য। সে কারণে নেই ইষ্টকামনা কিংবা ক্ষোভ, অভিমান। পাপ ও অপরাধ তার নয়, কেবল পরিণতি/ফল ভোগ করছে সে। অশোকের মা, রত্নময়ী ঈশ্বরের কাছে পাঁচসিকে মানত করেছিল দাম্পত্য সংকট নিরসনের জন্যে। সবই ব্যর্থ হয়।

দুলালের দোলা (১৯৩১) উপন্যাসেও দেখা যায়— পূর্বজর কর্মের (পাপ কিংবা অপরাধ) দায় উত্তর প্রজন্ম নিজ কাঁধে গ্রহণ করে। ভূমিকায় কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলছেন— “এই লেখাটির ভিতরকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু’একটি কথা ভূমিকা-স্বরূপ বলিতে চাই। ইহাতে ‘প্লট’ নাই— আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র; গল্প তৈরী আমার উদ্দেশ্য নয়। উপন্যাসসুলভ গল্পের বস্তুসংস্থান বা পরিপুষ্টি ইহাতে নাই। ...উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া ইহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।”^{৬৫} এই মন্তব্যটি খেয়াল না রাখলেও বোঝা যায় যে দুলালের দোলা-র রচনামূল্যে কিছুটা স্বতন্ত্র। নিটোল কাহিনি ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের ক্রমবিকাশ আখ্যানের মূল উদ্দেশ্য নয়। যে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আখ্যান এগিয়েছে তার সঙ্গে চরিত্রগুলির সম্পর্ক বেশ দূরের। যেন একজন দর্শক ঘটনাগুলিকে দেখছেন। পিরুর কথা সূত্রে জানা যায়, কী ভাবে ‘লক্ষ্মী দিয়া’ নামটি বদলে গ্রামের নাম হয়েছে ‘পোড়া-বৌ’। পিরু সংক্ষেপে যে গল্পো বলল তা অনেকটা এরূপ— হরিশ ঠাকুরের ছেলে ভরত বিধবা দিদি যোগেশ্বরীর অনুরোধে সস্ত্রীক গ্রামে ফেরে। কিন্তু গ্রামে ফেরার পর ভরত আর তার বৌকে সেবা করতে যোগেশ্বরী ও তার বিধবা মেয়ে মৃন্ময়ী হিমসিম খেল। তাই কাজের লোকের বন্দোবস্ত করা হয়, সে মেয়েটির নাম স্বর্ণ। ঐ

মেয়েটির সঙ্গে ভরতের অবৈধ সম্পর্ক। ঘটনাটি জানতে পারল ভরতের স্ত্রী। কিছুদিন যোগেশ্বরী বুঝতে পারল যে, স্বর্ণ সন্তান সম্ভবা। ভরতের স্ত্রীর অজানা রইল না ঘটনাটি। দুঃখে, যন্ত্রণায় একদিন গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করলো ভরতের স্ত্রী। সেই থেকেই গ্রামের নাম বদলে হয়েছে ‘পোড়া-বৌ’।

গল্পের বাকিটা অংশ জানা যায় পিসিমার থেকে। গল্পের সতীশ দাস সেই স্বর্ণের অবৈধ সন্তানের পুত্র। সে মনে করে তার স্ত্রী অসতী, সকলকে সেই কথা সে বলে বেড়ায়। সতীশ দাসের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর থেকে এই সে রটিয়ে বেড়ায়। আরেকটা বদ অভ্যেস আছে তার— লোকের বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘোরে, আর দাঁড়িয়ে শোনে কেউ তার পূর্বপুরুষদের নিয়ে কোনো কথা বলছে কিনা। বৌটি আমৃত্যু গঞ্জনা সহ্য করেছে এখন মেয়ে শুনছে। মেয়ের জন্যে বিয়ে সম্বন্ধ এলে সতীশ বলে যে ও তার মেয়ে নয়, ফলত বিয়ে আর হয় না। কেন করে সতীশ এরকম? নিশ্চিতভাবেই সতীশ রুগী। কেন সে পূর্বজদের পাপ ও অপরাধের বোঝা বয়ে চলে? কেন চায় না মেয়ের বিয়ে হোক? সতীশ জানায়— “যে মনকষ্টে আমি ভুগছি আর পাগলের মত বেড়াচ্ছি, মেয়ে দিয়ে দিলে দৌহিত্র-অংশ তেমনি ক’রে বেড়াক এ হচ্ছে আমার নয়।”^{৬৬} কথক বুঝতে পারেন—

“এই নিরাপরাধ ব্যক্তির সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি বিনষ্ট হয়ে গেছে— আর সে বোধ হয় তা জানে। এই গুরুভার আত্মনির্যাতন বোধ হয় সে সজ্ঞানেই বহন করিতেছে! কেবল অভিশপ্ত সেই ক্লেশই কন্যার উপর অশ্রাব্য কটুক্তি আকারে উদ্গীরিত হইতেছে। পাপের ইচ্ছায় নহে, প্রলোভনে নহে, আত্মকৃত পাপের অনুশোচনায় নহে, একজনের স্থলিত জীবনের পাপের জ্ঞান তাহারই বুকে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে— তাহাকে নামাইবার স্থান নাই, তাহাকে হত্যা করিবার উপায় নাই— তার ছটফটানির অন্ত নাই। লোকের কথা যেখানে ফোটে সেখানেই সে কান পাতিয়া দাঁড়ায়— তার কথা কেউ বলে কিনা!”^{৬৭}

ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৯৬০) *অন্নদামঙ্গল* (১৭৫২)-এ লিখেছিলেন “আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে”। উত্তর প্রজন্মের সুখ পূর্বজের চিরন্তন চাহিদা। ‘বাবরের প্রার্থনা’য় শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১) লিখেছিলেন— বাবা সন্তানের অসুখ মুক্তির বিনিময়ে নিজেকে ধ্বংস করতে রাজি। সতীশের চাওয়া ঠিক এর উলটো। *দুলালের দোলায়* সতীশ এক অর্থে উত্তর প্রজন্মের সুখ চেয়েছেন, সে চায়নি উত্তর প্রজন্ম আবারও যন্ত্রণা পাক, যেমনটা সে পেয়ে চলেছে। তার ‘চাওয়া’ ভিন্ন কিসিমের, যার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে অ-সুখের ইঙ্গিত। জগদীশ গুপ্ত নির্মাণ করলেন এমন এক আখ্যান; যেখানে বাবা মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না পাছে উত্তর প্রজন্ম আবিলতার সম্মুখীন হয়। সতীশ নিশ্চিত ‘সন্তানদের’ আবিল হতেই হবে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ, বস্তুত পক্ষে, মানব জাতিকে ক্রমান্বয়ে আবিলতা থেকে মুক্ত করার প্রক্রিয়া, যা ছিল মানুষতার চিহ্ন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানুষতাকেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। মঙ্গলের ধারণা, যার নিদর্শন পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে, তাকে ঘিরে তৈরি হয় সংশয়। মানুষ হৃদয় ও বুদ্ধির নির্দেশ পালন করে না, প্রবৃত্তির প্ররোচনায় ঠিক করে গন্তব্য। সভার সঙ্গে সভার সম্পর্ক, বন্ধন যখন পালটে যাচ্ছে; তখনই মানুষ হয়ে উঠছে অমানুষিক, জান্তব, জন্তবৎ। পাপ কিংবা অপরাধ সতীশের কিংবা জ্যোতির্ময়ীর নয়, কিন্তু দায় নিতে হয় তাদের। এই আখ্যানগুলিকে আমরা নিয়তি, অদৃষ্ট শক্তি নিয়ন্ত্রিত আখ্যান বলতে পারি? গ্রিক ট্রাজিডির সঙ্গে এই আখ্যানগুলি আপাত মিল লক্ষ্য করা গেলেও মূলগত ভাবে জগদীশ গুপ্ত ভিন্ন রুচি, রীতির ও গোত্রের কথক। প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের নিয়তির পরিণাম একগোত্রের নয়। আধুনিকতা সেখানে বিশেষ কিছু মাত্রা যোগ করে, যা নিয়তির ধারণাটাকেই পালটে দেয় এবং/অথবা চ্যালেঞ্জ করে। বলা ভালো, আধুনিক মানুষ পীড়নে ধস্ত হতে হতে পীড়ন ও তার কারণকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়। এ এক বিশেষ গোত্রের চাওয়া, যার মধ্যে দুঃখ/পীড়নকে

স্বীকার করে নেওয়া আছে। আর আছে দুঃখ/পীড়নকে প্রত্যাখ্যান করার চাপা আর্তি। এখানেই তার অস্তিত্বের সার্থকতা। সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান নতুন এক অভাববোধ তৈরি করে, তাহ'ল মানুষতায় স্থিত থাকার নিশ্চয়তাবোধের অভাব। যার প্রতিফলন ঘটে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে। সেটাই আলাদা করে দেয় গ্রিক নিয়তি ও আধুনিকের নিয়তিকে। গ্রিক ট্রাজিডির নায়করা জানেন যে নিয়তির হাত থেকে আমার রেহাই নেই। পরাজিত হওয়াই ভবিতব্য। অজ্ঞাত নয় বলেই অনিশ্চয়তা নেই। এরপাশে আছে নিয়তিকে প্রতিহত করার, ব্যর্থ করার অসফল অথচ গৌরবময় কাহিনি। প্রাচীরের নিয়তির পীড়ন স্ব-অর্জিত, পুরোনো পাপের শাস্তি। এই পাপবোধের কেন্দ্রে আছেন ঈশ্বর ও ধর্মীয় দর্শন আর তা থেকে তৈরি হওয়া নৈতিকতাবোধ। আমি জানি আমার পরাজয়, মৃত্যু, পীড়ার কারণ। এখানেই পৃথক আধুনিক, তিনি জানেন না কেন তার এই পরিণাম। পরিণতি সম্পর্কে আধুনিক সচেতনই নয়, সে সুযোগও তার নেই। ফলত, অনুপস্থিত পরিণতিকে প্রতিহত করার ভাবনা— বীরত্ব নেই, আছে নিদারুণ পীড়া।

যথাক্রমে (১৯৩৩) শুরুতে গ্রাম ও প্রকৃতির বর্ণনার মাধ্যমে উপন্যাসের প্রতিবেশ রচনা করেছেন জগদীশ গুপ্ত। ছোট নদী চম্পনার ধারে বেতডাঙা গ্রামের হাট। নদীর বুক বৃদ্ধার স্তনের মতো শুকিয়ে যাচ্ছে^{৬৮}। তবুও গ্রামের লোক ভালোবেসে হাটের নাম দিয়েছে চম্পনার হাট। জগদীশ গুপ্ত বর্ণনা করছেন—

“সবই ছোট।

নদী ছোট, গ্রাম ছোট, হাট ছোট, হাটে যারা আসে তারাও বৃহৎ নহে;...ছোটকে আশ্রয় করিয়া যতটুকু অস্তিত্ব তার থাকিতে পারে ঠিক ততটুকুই আছে, ছোট আলিঙ্গনকে ছাড়াইয়া বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই।”^{৬৯}

উপন্যাসের নামটিও গুরুত্বপূর্ণ, ‘যথাক্রমে’। শুরুতে লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন সমৃদ্ধি ধীরে ধীরে শেষ হয়ে এসেছে, যা বেঁচে আছে তা হল ক্ষুদ্রতা। তার আলিঙ্গন ছেড়ে কেউ বড়ো হয়ে উঠতে পারছে না। শেষের যেমন ইঙ্গিত আছে তেমনি নতুন কিছু প্রতিষ্ঠাও পাচ্ছে, তা হলো অসততা। নীতি, নৈতিকতার মৃত্যু হবে আর লোভ, ছলনা, শঠতা সাফল্য পাবে। ‘অখণ্ড বিশ্বাস’ আর টিকবে না, সূচিত হবে এক তামসিক জগৎ। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি হয় তো উপন্যাসের নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে। ওই হাটের দোকানদার রামপ্রসাদ, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ তার জোটে না কারণ আশীর্বাদ উচ্চারণের মতো সময় ঠাকুরের নেই। আরেক ভক্ত গোবিন্দ ঠাকুর, রামপ্রসাদের পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী। এক সময় রামপ্রসাদ অসুস্থ হয়, গোবিন্দ ঠাকুর সেই প্রথম তাকে আশীর্বাদ করে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। বাবার মৃত্যু দীনকে কার্যত সাবালক করে তুলল। ধীরে ধীরে তার ‘অখণ্ড বিশ্বাস’, সততার আদর্শ সরিয়ে রেখে হয়ে উঠল নির্দয়। গোবিন্দ ঠাকুরের শিক্ষা সৎ দীনকে বানিয়ে তুলল নির্দয়, দয়ামায়াহীন কুটিল স্বভাবের ব্যবসায়ী। এমনি কী সে উপকারী নিত্যপদ ডাক্তারের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করলো। পরোপকারী নিত্যপদ ডাক্তার সকলের চিকিৎসা করে, বিনা পয়সায় ওষুধ দিয়েও কুৎসার শিকার হলো। শেষ পর্যন্ত সেও শুরু করলো লোক ঠকানো, ওষুধের নাম করে জল দিতে থাকল। ক্রমে ক্রমে আবিলতা গ্রাস করছে বেতডাঙার জীবন যাত্রাকে।

উপন্যাসে দীনদের বিভিন্ন পারিবারিক সংকটের সময় গোবিন্দ ঠাকুরের হঠাৎ (কাকতালীয়) আগমন বারংবার দেখা গেছে। তার পরামর্শে দীনুরা সংকটের মোকাবিলাও করতে পেরেছে। পিতৃহারা দীনকে যখন সকলে ঠকিয়ে যাচ্ছে, সেই অবস্থায় আবারও দীনুর সহায় হলেন গোবিন্দ ঠাকুর। এখানে শঠতা প্রসঙ্গে গোবিন্দ ঠাকুর অভিমতটি গুরুত্বপূর্ণ—

“মানুষকে ঠকাইয়া কিছু লাভবান হইবার ইচ্ছা মানুষমাত্রেরই আছে, ছোট, বড়, ইতর, ভদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সকলেরই আছে, সুতরাং যে ঠকায়, ঠকান কাজটাই গর্হিত বলিয়া গোবিন্দ তাহাকে নিন্দা করেন না; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাত্রভেদে ঐ কাজটাই কখনো ন্যায়, কখনো হাস্যোদ্দীপক, কখনো মর্মান্তিক হইয়া উঠে।— একটি ঘুঘু মারিলে দোষ আছে; কিন্তু শত শত ইঁদুর মারিলে নাই; বিড়াল মারিলে দোষ আছে, কিন্তু বাঘ মারিলে দোষ নাই। দুটোই হত্যা, কিন্তু হতজীবের প্রয়োজনীয়তা বা কর্মনীয়তা, সক্ষমতা বা অক্ষমতার উপরেই হত্যা-ক্রিয়ার শোভনতা বা শোচনীয়ত্ব নির্ভর করে। ... একটি বৃহৎ পরিবারের যাবতীয় লোককে ঠকাইয়া পয়সা আদায় করায় কিছুমাত্র গ্লানি নাই, কারণ তাহার চাতুর্য্য আছে, কাপুরুষতা নাই।

গোবিন্দের নিজের পেশা তাই।”^{৭০}

মরণ প্রণোদনা, ধ্বংসের প্রবৃত্তি কিংবা শোষণ গোবিন্দের কাছে পাপ বা অপরাধ নয়, কৌশলে হাতিয়ে নেওয়া কাপুরুষচিত নয়। ফ্রয়েডের মতো তিনিও বোধহয় মনে করেন Death Drive (মরণ প্রণোদনা) বস্তুত পক্ষে আত্মরক্ষা, তথা জীবন প্রণোদনারই আরেকটি প্রতিক্রিয়া। *মহিষী* উপন্যাসে ব্রজকিশোর বলেছিলেন অপরের থেকে নেওয়াই পুরুষাকার। জীবন ধারণের তাগিদেই দীনু আয়ত্ত করে গোবিন্দ ঠাকুরের শিক্ষা। এই কৌশল তাকে অকৃতজ্ঞ করে দেয়। বস্তুত, প্রবঞ্চনা তাদের কাছে নৃশংস নয়। মতিলাল অবস্থাপন্ন মানুষ, অথচ মানুষ ঠকানোর জন্যে বিচিত্র কৌশল উদ্ভাবনে সিদ্ধ। সম্ভানসম্ভবা মেয়ের বিনা পয়সা চিকিৎসার জন্যে সে বিচিত্র পস্থা অবলম্বন করে। কিন্তু নিত্যপদের কম্পাউন্ডার কান্তিভূষণের কথায় জানা যায়— নাবালক ছেলেদের বঞ্চিত করে, সদ্য মৃত্যু পিসিমার সিন্দুক থেকে সব নিয়ে পালিয়ে আসে। গোবিন্দের কথাই ঠিক, ঠকিয়ে সম্পদ আহরণে অন্যায় নয়, চাতুর্যের লক্ষণ, কিংবা ব্রজকিশোরের ভাষায় পুরুষকার। মানবিকতা কিংবা ধর্মীয় মূল্যবোধ কোনো কিছুর বিচারেই এহেন কাজ অনভিপ্রেত নয়। এই অভিজ্ঞতা উপন্যাসের মধ্যে চারিয়ে দিচ্ছেন জগদীশ গুপ্ত।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধ পুরুষ গোবিন্দ ঠাকুরও আপাত অনভিপ্রেত, অনৈতিক কাজটিকে ক্ষেত্র বিশেষে শ্রেয় বলে মনে করেন।

এই উপন্যাসে প্রকৃতির বর্ণনাও উপন্যাসিকের দর্শন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। জগদীশ গুপ্ত লিখছেন—

“জল যেখানে যাহা জমা হইয়াছিল তাহা আছেই, পচিয়া উঠিয়াছে, দুর্বলকে আক্রমণ করিয়া আর ভক্ষণ করিয়া যাহারা বৃদ্ধি পায় প্রকৃতির অঙ্গে তাহাদেরই প্রধান্য সে অবিরাম কীট আর জীবাণু প্রসব করিতেছে। গাছের ফল ছোট হইয়া গেছে, তার ভিতরেও কীটের বাসা। ... সূর্য্য নিস্তেজ হইয়া আছেন।”^{৭১}

সভ্যতার অ-সুখের আখ্যান লিখতে চাইছেন জগদীশ গুপ্ত, যার ভেতরে বাসা বেঁধেছে ‘সংক্রমিত মরকের কীট’। ‘অখণ্ড বিশ্বাস’-এর মধ্যে প্রবেশ করেছে সংশয়, মানুষতা স্থিত না থাকার ইচ্ছা। নিত্যপদ বিনা পয়সায় ওষুধ দেয় গ্রামের মানুষের চিকিৎসা করে। গ্রামের মানুষদের প্রবৃত্তির অ-সুখ সারানো জন্যে ভেবেছিল এদের যদি একবার জাহাজে চাপিয়ে পৃথিবী ঘুরিয়ে আনা যায়, তাহলে মনে হয় দৃশ্য এবং বায়ু পরিবর্তনের ফলে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হবে^{৭২}। অ-সুখ যে আসলে সত্তার, তা উপলব্ধি করে নিত্যপদ। বদ্ধ জলার মধ্যে আটকে থাকা গ্রাম্য মানুষ, যাদের সত্তা বিচ্ছিন্ন ‘বিশ্ব’ থেকে, তাদের রোগ মুক্তি কী ভাবেই বা সম্ভব। ক্ষুদ্রতা-হীনতা-ক্রুরতা এদের কুল লক্ষণ। শেষ পর্যন্ত নিত্যপদও অ-সুখে পড়ল। কেন নিত্যপদ বেছে নেয় এই পথ? এটাই ভবিতব্য, অদৃষ্টের লিখন? অসীম ক্ষমতাবান নিয়তির হাতের নিছক ক্রীড়নক? গোবিন্দ ঠাকুর একদা দীনুকে বলেছিল—

“মানুষের স্বকৃত ব্যাপার সংসারে কিছু ঘটে না— অডুত খেয়ালী অদৃষ্টের খেলায় বিশ্বাস থাকিলে অন্যায় কি অহৈতুকী বলিয়া বিস্ময় ও বেদনারও কিছু থাকে না।”^{৭৩}

গোবিন্দের ঠাকুরের কথা শুনে দীনুও উপলব্ধি করে সেটাই বোধহয় সত্যি—

“দুরপনৈয় দুঃখের লেখা কপালে লইয়াই দুঃখী জন্মগ্রহণ করে; দুঃখ কেউ কাহাকে দিতে পারে না। ঝড়ে যেমন চাল ওড়ে, আগুনে যেমন ঘর পোরে, দুঃখও তেমনি কস্ম-নিরপেক্ষ আর চেষ্টা, বুদ্ধি এবং চিন্তার অনধীন অনিবারণীয় অদৃষ্টের কথা— চাও না-চাও সে আসিবেই—”^{৭৪}

নাকি সামাজিক বাস্তবতা, ‘অখণ্ড বিশ্বাস’-এর সংকট নিত্যপদকে বাধ্য করলো ওষুধের নামে জল বিক্রি করতে। ফ্রয়েড বলবেন, মরণ-প্রণোদনাই সভ্যতার আরেক দিক। যা মানুষকে প্রবৃত্ত করে এই পথে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম— প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পালটে দিয়েছে মানুষের পরিচয়, সত্তা তার ঋজু হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা। মানব সভ্যতা নতুন কিসিমের অভিজ্ঞতার সম্মুখে হাজির হয়েছে, যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কখনো অগ্রসর হয়নি। তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তার রাজ্য; পূর্ব অভিজ্ঞতা লব্ধ অনুভূতি, বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ সংশয় ও প্রশ্নের মুখে। বস্তুত, পূর্বজর জ্ঞান মানব সভ্যতাকে যে নিশ্চয়তার আশ্রয় দিয়েছিল তাই এখন সংকটের মুখে। ফলত, পূর্ব অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান দিয়ে যাকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না নব উদ্ভূত পরিস্থিতিতে। সেই ব্যাখ্যাহীন পরিস্থিতির চলন নিয়তি নিয়ন্ত্রিত নয়, অনিশ্চয়তায়(Uncertainty) মোড়া, পুঁজির চলনের কারণে।

রতি-বিরতি (১৩৪১ব) উপন্যাসের কাহিনিটি এরকম— রাম ও গয়ামণির সন্তান লব সাপের কামড়ে মারা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই মৃত সন্তানের শোকে স্বাভাবিকতা হারাল দু’জন। লখীন্দরের মতো সাপে কাটা পুত্র মন্ত্র/দেবতার প্রসাদে বেঁচে উঠবে না, পূরণ হবে না গয়ামণির ঐকান্তিক ইচ্ছা। বদলে মৃত্যু হবে গয়ামণির-ই। ঈশ্বর আজ মৃত অথবা সেই ডীইস্টদের ঈশ্বরের মতো যিনি প্রজাদের বসিয়েছেন অথচ শাসন করার, রক্ষা করার ক্ষমতা আর নেই। নেই প্রজাদের কাজে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা।^{৭৫} যা ভালো মানুষকে (উপন্যাসে যেমন ছিল রাম) ভীতি করে দেয়। গয়ামণি স্বপ্ন দেখছে তার লব ফিরে আসছে, হঠাৎ-ই স্বপ্নপতন।

“কিন্তু কোথাও না পৌঁছিতেই গয়ামণিকে ফিরিতে হইল। পরিচিত এক ব্যক্তি তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া স্মবিস্ময়ে জানিতে চাহিল, রামের স্ত্রী এদিকে এত সকালে একা একা কোথায় চলিয়াছে?

গয়ামণি বলিল,— কেন ছেলেকে আন্তে।— ছেলেকে সেই গুণী আনছে যে। ...

লোকটি বলিল,— ছেলে আসছে না। ফিরে ঘরে চলো।

গয়া ভ্রভঙ্গি করিয়া বলিল— দূর মিথ্যুক”^{৭৬}

মৃত্যু অথবা আত্মহত্যা^{৭৭} যাই বলা হোক না কেন, উপন্যাসে কারুণ্য বদলে আমদানি করল ভীতি। যার থেকে বাঁচার জন্য অভুক্ত অবস্থায় দিনের পর দিন রাম উবু হয়ে বসে থাকে সাপের গর্তের সামনে পুত্রহন্তার সাক্ষাতের আশায়। কিংবা ছেঁড়া থলে থেকে হারিয়ে যাওয়া টাকা খুঁজতে গিয়ে রামের না-জানা, অথচ অতি পরিচিত রহস্য ভেদ করে।

“পৃথিবী কেন আনন্দধাম, এই প্রশ্নের উত্তরটি, এবং সানন্দে পথ চলিবার যে গূঢ় কারণটি লুকাইয়া রাখিয়া মানুষ এতদিন তাকে ঠকাইতেছিল আজ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে— পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ আহরণ করিতে ছুটিতেছে—অপর অর্ধেক আহরণ করিয়া ফিরিতেছে—”^{৭৮}

আহরণই যেন একমাত্র সত্য জগদীশ গুপ্তের জগতে। সেবা, মমতা দান মিথ্যা। কখন ঘটেনি, ঘটলে তা আসলে লোক ভুলানোর যন্ত্র।

এরপরের অংশটা—

“সকল আনন্দ লুপ্ত আর সকল চিন্তাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ একটা বড় কঠিন কথা রামের মনে পড়িল; যে দাতা তাকে টাকাটা দান করিয়াছে সে-ই আবার টাকাটা কাড়িয়া লইতে পশ্চাতে লোক ছুটাইয়া দেয় নাই ত’?”^{৭৯}

ভিখারী ভিক্ষা নিয়ে সংশয়ী, দাতা সেই টাকাটা কাড়তে লোক লেলিয়ে দেয় নি তো? আসলে আমাদের বাঁচতে চাওয়া এই হল সবরকমের দুঃখ, অশুভের কারণ, দুঃখই আমাদের উদ্দেশ্য এবং অস্তিত্বের সার্থক নিদর্শন। গোটা পৃথিবীই চলছে আহরণ করতে, সব কিছু কেড়ে নিতে,

কয়েকজনের মধ্যে ভাগ-বাটোয়রা করে নিতে। সেখানে দান, দয়া, করুণা অসামঞ্জস্য পূর্ণ। তাই জগদীশ গুপ্তর পক্ষেও সম্ভব নয় বিয়োগান্তক কাহিনি লেখা, তা হয়ে উঠবে ভয়ের, লালসার, একাংশের সমালোচকদের মতে অ-যুক্তির এবং রবীন্দ্রনাথের বয়ানে অ‘সত্য’। আদতে জগদীশ গুপ্ত সভ্যতার কারুণ্য-হাহাকারকে বিঁধছেন ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে। আমাদের সমস্ত পাপ-পুণ্য, অপরাধের ধারণার সৃষ্টি মানুষকে বঞ্চিত করার জন্য-ই। আধুনিক রাষ্ট্র নির্মিত আইন যা আমাদের পাপের বোঝা থেকে মুক্ত করেছিল, নিশ্চিত করেছিল মানুষের অধিকার, পাপের স্থান নিয়েছিল অপরাধ, দেওয়া হয়েছিল তার বিধান— শাস্তির মাধ্যমে। সেই অপরাধবোধের আর আইনের মৃত্যু হলেও বেঁচে থাকে মানুষ। বহাল থাকে বেঁচে থাকার ইচ্ছে, হতে চাওয়া ইচ্ছে— তৈরি হয় নারকীয় অনিশ্চয়তার জগৎ, যেখানে মানুষেরা চলে জৈবিক তাড়নায় আর নির্বোধকে আত্মহত্যা করতে হয় স্বর্গীয় বিভ্রমে মেতে।

“রামের মনে হল, মিথ্যার দ্বারা কেবল ভয়ত্রস্ত নির্বোধকে বঞ্চিত করিবার জন্য পাপ পুণ্যের অগণিত কাহিনী হইয়াছে; ... শুধু তাহাই নহে...পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিয়া মানুষকে এমন দুস্ত্যজ্য অভ্যাসের বশবর্তী করিয়া আনা হইয়াছে যে, একটি চোখ নিজের ভিতরের দিকে আর একটি চোখ উর্ধে অহৈতুক আর অপরিচিত একটা স্থানের দিকে না রাখিয়া তার উপায় নাই।

কিন্তু জ্ঞানীরা জানেন যে, ধনে পাপের ছোঁয়াচ লাগে না—”^{৮০}

নির্দ্রিত কুম্ভকর্ণ-এর কেন্দ্রিয় চরিত্র শশধর শরীরচর্চা করে। অসীম বলশালী শশধর ষাঁড়ের হাত থেকে বিপন্ন পথিককে রক্ষা করে, সে কারণে লোকের থেকে ভক্তি শ্রদ্ধাও জোটে। কিছু অনুগামী জুটেছিল তার। শশধরের স্ত্রীও নিজেকে ভীমের স্ত্রী বলে গর্ব বোধ করে। বাকিদের কাছে না হলেও, স্ত্রীর গর্ব-শ্রদ্ধা একটি রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুলিসাৎ হয়ে যায়, আকস্মিক-ই। তাদের প্রতিবেশী নকুলের ঘরে ডাকাত পড়ে।

“শশধর বলিল, ডাকাত পড়েছে নকুলের বাড়িতে।

প্রফুল্ল বলিল, কিন্তু নকুলের ত' কিছুই নেই— বিধবা একটা মেয়ে আছে কেবল। বুঝতে পারছ না? ওঠো, শীগ্গির যাও। — বলিয়া প্রফুল্ল শশধরকে দু'হাতে ঠেলিতে লাগিল”^{৮১}

গত বছরে দূরের একটি বাড়িতে আগুন লাগলে, শশধর ছুটে যায় এবং একাই প্রায় একশো লোকের মতো পরিশ্রম করে। কিন্তু আজ শশধর উঠল না, ‘শুইয়া রহিল’^{৮২}। দরিদ্র নকুলের কোনো সম্পত্তি নেই, তবুও ডাকাত এসেছিল। তারা হরণ করে নিয়ে যায় নকুলের বিধবা কন্যাটিকে। শশধরের স্ত্রী বলে মৃত্যু ভয়ে সে অসহায় মানুষকে রক্ষা করেনি। মেয়েটি এতক্ষণ...প্রফুল্ল আর পারে না। অনামা মেয়েটির সর্বনাশের জন্যে দায়ী করে স্বামীকে বলে— ‘তুমি পাপী’।^{৮৩} ঘৃণায়, লজ্জায় প্রফুল্ল বলে ওঠে—

“মানুষের অস্তিত্ব কেবল তার হাতের পায়ের গা-গতরের নড়াচড়ায় জানা যায় আর মনে থাকে ভেবেছ! অমন নড়া ভূতেরও নড়ে, জানোয়ারেরও নড়ে— সম্ভ্রমবোধ কতটা এই মানুষের অস্তিত্বের পরিচয়— তা তোমার নেই, আর তোমার জন্যে মানুষের তা নষ্ট হয়েছে। তোমার অস্তিত্বই আমি দেখছিলাম।”^{৮৪}

উদ্ধৃত অংশের দিকে নজর দিলে বোঝা যাবে, প্রফুল্লের কাছে বাকি জীবের সঙ্গে মানুষের মূল তফাৎ তার সম্ভ্রমবোধ কতটা তার উপর। তার অস্তিত্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় সেখানেই। আরেক অর্থে মানুষের, মানব জাতির, সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস লুকিয়ে আছে চিন্তায়, চর্যায়, ‘বোধ’-এ। তার চৈতন্যে। শশধর নীতি সম্বন্ধীয় সমালোচনা গ্রহণ করে। তার মনে হয়, “যে ব্যক্তির অক্ষত দেহ বজায় থাকার আশীর্বাদ আকাজক্ষাই নারীর ত্রাণের আর সম্মিতির আর মর্মের একমাত্র কথা”^{৮৫}। সেই নারী কী কারণে বলছে যে, তার স্বামী কেন প্রাণ দিতে দৌড়ল না? এখানেই প্রাসঙ্গিক পারস্য যাত্রী রবীন্দ্রনাথের চিঠি। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— “সেই বিলয়ের ভূমিকার মধ্যে দেখা গেল পৃথিবীকে, তার সত্তা হল অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবি এল কমে।”^{৮৬} যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা মানুষের সামাজিক চৈতন্যে যে অনুরণন তৈরি করে তা বস্তুত মানুষতাকেই দীর্ন করে। যে চিন্তা ও চৈতন্যের সূত্রে মানুষ

অপরাপর প্রজাতির থেকে পৃথক বলে স্বীকৃত হয়েছিল, সেই প্রত্যয়কে সংশয়ের মুখোমুখি দাঁড় করায় প্রফুল্ল। শশধরের যাবতীয় পরোপকার এক লহমায় হয়ে যায় আত্মরতির নামান্তর। প্রফুল্লের কাছে সে হয়ে দাঁড়ায় নিঃস্পৃহ, জড় পিণ্ড মাত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আসলে সত্তার অ-সুখ। সেই অ-সুখের আখ্যান উঠে এসেছে জগদীশ গুপ্তের কথনে। উপন্যাসের শেষে জগদীশ গুপ্ত বলছেন যে, লাঠি যখন ‘দুরাচারি’ আর ‘রক্তপিপাসু’ হয়ে ছুটে আসে তখন সেটির সামনে সে যেতে পারে না এবং প্রতিবাদ করা সৎ সাহস তার নাই। কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত যাঁড়কে শান্ত করতে কিংবা আগুন নেভাতে সে ছুটে যায়।^{৮৭} প্রশ্ন ওঠে মানুষের পরোপকার করার ইচ্ছে নিয়ে। এটাই জগদীশ গুপ্তের বিশেষত্ব, তিনি অস্থির, সংশয় পূর্ণ, নিশ্চিত সুখ কাব্যের রচয়িতা নন। রোমান্টিক, ভাবালুতার মাধ্যমে বাস্তবতাকে দেখতে ও দেখাতে চান না। এখানেই কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর তফাৎ।

জগদীশ গুপ্তের গল্প আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তবুও তিনটি গল্পের শিরোনাম আমরা উল্লেখ করবো। ‘অসংলগ্ন ভবিষ্যত’, ‘অসম্ভব সম্ভব হল’ ও ‘যাহা ঘটিল তাহাই সত্য’; তিনটি শিরোনামকে নিজের আখ্যান সম্পর্কে জগদীশ গুপ্তের মন্তব্য আকারে পড়ার প্রস্তাব রাখবো। একটি গল্পের নাম দিয়েছেন ‘অসংলগ্ন ভবিষ্যত’। অসংলগ্ন অর্থাৎ সঙ্গতিহীন, বিযুক্ত^{৮৮}। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলছেন— যে মিলিত নহে, অযুক্ত, পূর্বাপর-বিরুদ্ধ^{৮৯}। এখানে প্রশ্ন উঠে কিসের সঙ্গে ‘সঙ্গতিহীন’ বা ‘বিযুক্ত’? এবং কিসের সঙ্গে যুক্ত নয় বা মিলিত নয়? জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে, পূর্বাপর-বিরুদ্ধ; অর্থাৎ পূর্ব প্রেক্ষিতের সঙ্গে বিযুক্তি ও বিচ্ছিন্নতা ‘অসংলগ্ন’ শব্দটির কুল লক্ষণ। জগদীশ গুপ্তের আখ্যানের পরিণতির দিকে তাকালে সেই প্রবণতার অনুরণন লক্ষ্য করা যাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরিত্র ও ঘটনাক্রমের আকস্মিক, অনিশ্চিত পরিণতি প্রতিষ্ঠিত, প্রচলিত ক্রম থেকে খানিক বিচ্যুত

এবং বিচ্ছিন্ন। আবার আরেকদিক থেকে জগদীশ গুপ্তের আখ্যান বাংলা আখ্যান রচনার পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত, মান্য রীতির বিরুদ্ধতা করে। তাঁর আগের কথাসাহিত্যিকদের আখ্যানের গড়ে ওঠা এবং পরিণতির যুক্তিক্রমের নিরিখে জগদীশ গুপ্ত খানিক সঙ্গতিহীন ও অসংলগ্ন, অবিশ্বাস্য।

আরেকটি গল্পের নাম ‘অসম্ভব সম্ভব হল’। জগদীশ গুপ্তের আখ্যান প্রসঙ্গে পণ্ডিত ও সমালোচকেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন, বিশেষ কিছু ধারনার বশবর্তী হয়ে তত্ত্বায়িত করেছেন তাঁর আখ্যানকে। যা প্রচলিত, জনপ্রিয় আখ্যান রীতির থেকে খানিক ভিন্ন মার্গের। এর কারণ জগদীশ গুপ্তের গল্প-উপন্যাসের বিশেষ কিসিমের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি। এই গল্পটির নামকরণের মধ্যে সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর আখ্যান অসম্ভব, অসঙ্গত, অদ্ভুত। কিন্তু সেই অসম্ভব, অসঙ্গত বিষয়টি আখ্যানের শেষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে। কোন যুক্তি ও বাস্তবতাকে জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করছে? পূর্বেই উল্লেখ করেছি— আলোকপ্রাপ্তি সূত্রপ্রাপ্ত মানবতাবাদের আদর্শকে এবং ঈশ্বরের বিশ্বাস যে মঙ্গলময় ভবিষ্যতের আশা তৈরি করে সে সম্ভাবনাকেও। বস্তুত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েই কেবল সংশয় জ্ঞাপন করে না, মানবতার আদর্শকে ধ্বস্ত করে, তখন মানুষের সামনে অনিশ্চয়তা ভিন্ন অন্য পথ খোলা থাকে না। জগদীশ গুপ্ত সেই মার্গের কথক।

‘যাহা ঘটিল তাহাই সত্য’ এই শিরোনামটিকে এভাবে পড়া যায় যে, ‘যাহা ঘটিল’ তা ‘সত্য’ বলে মনে হচ্ছে না। কেন ‘সত্য’ বলে মনে হয় না? কারণ আখ্যানের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি। এখানে আরেকটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কে ‘সত্য’ বলে মনে করে না? পাঠক বা সমালোচক। এ উত্তর আরেকটি অনিবার্য প্রশ্ন তৈরি করে। কী কারণে পাঠকের মনে হয় না? পাঠকের পাঠাভ্যাস, রুচি, নীতিবোধ, নৈতিকতা সর্বপরি দার্শনিক অবস্থান সতত খেয়াল করায়

আখ্যানে যা ঘটছে তা ‘সত্য’ নয়। এই প্রসঙ্গে *লঘু-গুরু* উপন্যাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

“সে-প্রমাণ মিথ্যে সাক্ষ্যের মতো বানিয়ে তোলা হলেও চলে কিন্তু সত্যের স্বাদ থাকা চাই। সাহিত্যিক এই ব’লে হলফ করে আমার কথা যতই মিথ্যা হোক তবু সেটা সত্য।”^{৯০}

রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি কেবল *লঘু-গুরু* সম্পর্কে নয়, সামগ্রিক ভাবে প্রায় সকল আখ্যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জগদীশ গুপ্তের দর্শন, কৌশল যেহেতু প্রচলিত রীতির বিপরীত সেকারণেই কি তিনি গল্পের নাম দেন ‘যাহা ঘটিল তাহাই সত্য’ কিংবা ‘অসম্ভব সম্ভব হল’? নিশ্চিত প্রমাণের সুযোগ নেই, কিন্তু এ অনুমান কি খুব অপ্রাসঙ্গিক বা ভ্রান্ত হবে যে তাঁর আখ্যানের বিষয়বস্তু ও পরিণতি এমন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে বলেই লেখককে এরূপ মন্তব্য করতে হয় কিংবা আখ্যানের শিরোনাম নির্বাচন করতে হয়, বোঝাতে হয় আপাত অসঙ্গত ঘটনাক্রম ও পরিণতি আদতে বাস্তব এবং সত্য! আখ্যানের শিরোনাম নির্বাচনকে তাঁর সামগ্রিক আখ্যান কর্ম সম্পর্কে মন্তব্য বা বক্তব্য আকারে পড়া যেতেই পারে। এবং গল্পের নামগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ‘অনিশ্চয়তা’বোধ। সে অর্থে জগদীশ গুপ্তের প্রায় সমস্ত আখ্যানেরই সাধারণ নাম সুতরাং হতে পারত, ‘অসম্ভব সম্ভব হল’ কিংবা ‘যাহা ঘটিল তাহাই সত্য’ কিংবা ‘অসংলগ্ন ভবিষ্যৎ’।

জগদীশ গুপ্ত তাঁর প্রায় সমস্ত উপন্যাসগুলির (বড়ো অর্থে আখ্যান) মধ্যে চারিয়ে দিয়েছেন ব্যক্তি চৈতন্যের আকৃতি, সময় ও সভ্যতার অ-সুখের কথা। তার চরিত্রেরা কেবল নিয়তি, দৈব-নির্যাতন, অদৃষ্টের ক্রীড়নক নয়; যৌনবিকৃতি-নিচতা-শঠতা-লোভ-ক্রুরতা বৃত্তান্ত লিখতে লিখতে পৌঁছাতে চান সমকালীন অনিশ্চয়তা মুখে। যে অনিশ্চয়তা এ পৃথিবী যাপন করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হাত ধরে। তাঁর নিন্দিত, অপ্রিয়, জনপ্রিয়তা না পাওয়া আখ্যানের বিপুল প্রবাহ পাঠকে হাজির করে বিরাট অনিশ্চয়তা সম্মুখে। যেখানে ঘটনা, চরিত্র, বাস্তবতা,

সম্ভাব্যতা তুচ্ছ। আবার এসব কিছু মধ্যস্ততায় নির্মিত হয় এক বিচিত্র প্রতিবেশ, যা আমাদের এই বোধে পৌঁছে দেয় যে, অনিশ্চয়তাই অনিবার্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর সামাজিক চৈতন্য, মরণ-প্রণোদনা, সত্তার সঙ্গে সত্তার বিচ্ছিন্নতা হয়ে ওঠে নির্বিকল্প, সমকালীন বাঙালি পাঠকের কাছে যা ছিল অলীক কিংবা অসম্ভব। এমন এক বিস্ময়কর দার্শনিক বোধে পাঠকে পৌঁছে দেন লেখক, যখন মনে হয় স্বাভাবিকতা নামক বিষয়টি আদতে কোনো ছল বা ছদ্মবেশ, তথাকথিত স্বাভাবিকতাকে খারিজ করে; আরেকবার ফিরে তাকান জীবনের দিকে। নতুন ভাবে পড়তে চান বাস্তবতাকে, বুঝতে চান দার্শনিক সংশয়কে। অভিনিবেশ দেন বিশ্বাস এবং যুক্তির সীমাবদ্ধতায়। নির্মিত হয় আপাত ভাবে অসম্ভব সব আখ্যানের। হয়তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সেটাই ভবিষ্যৎ, মানবতা, যুক্তিবোধ, মঙ্গলের ধারণা যেখানে ধ্বস্ত সেখানে অনিশ্চয়তাই অনিবার্য।

তথ্যসূত্র ও টীকা

^১ সুবীর রায়চৌধুরী, 'ভূমিকা', *জগদীশ গুপ্তের গল্প*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ- ২৩৯

^২ জগদীশ গুপ্ত, 'ফিলজফির বুদ্ধদ', *দুস্ত্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত*, ২য় খণ্ড, কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১০, পৃ- ১২৬

^৩ সুকুমারী ভট্টাচার্য, *নিয়তিবাদ: উদ্ভব ও বিকাশ*, কলকাতা : ক্যাম্প, ১৯৯৪, পৃ-৪২

^৪ ঐ, পৃ- ৪৪

^৫ ঐ, পৃ- ৩০৫

^৬ ঐ, পৃ-৩০৬

^৭ অনিলবরণ রায়, 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ', *বিচিত্রা*, কলকাতা, ভাদ্র, ১৩৩৬, পৃ- ৩৬৯

^৮ ঐ, পৃ- ৩৭১

^৯ ঐ

^{১০} ঐ, পৃ- ৩৭২

^{১১} ঐ, পৃ- ৩৭২-৭৩

^{১২} মোহিতলাল মজুমদার, 'বর্তমান বাংলাসাহিত্য', *সাহিত্য-বিতান*, কলকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, ১৩৫৬, পৃ- ৩১১-১২

- ^{১০} হাসান আজিজুল হক, 'জগদীশ গুপ্তঃ কথাসাহিত্যে বিপরীত স্রোত', *জগদীশ গুপ্তের গল্প*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ- ২৩৫
- ^{১৪} ঐ
- ^{১৫} ঐ, পৃ- ২৩৭
- ^{১৬} ঐ
- ^{১৭} মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *আত্মহত্যার অধিকার এবং অন্যান্য সনদ*, কলকাতা : প্রতিভাস, ২০১২, পৃ- ২৮
- ^{১৮} ঐ, পৃ- ৩৩
- ^{১৯} ঐ, পৃ- ৩৩-৩৪
- ^{২০} ঐ, পৃ- ৩৭
- ^{২১} দ্রঃ টীকা রাজীব চৌধুরী, 'যাহা ঘটিল তাহাই সত্য': জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পে কাকতালের ব্যবহার', *উজাগর*, কলকাতা, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৪২৪, পৃ- ৩৬৮
- ^{২২} ঐ, পৃ- ৩৫৬
- ^{২৩} ঐ, পৃ- ৩৫৭
- ^{২৪} ঐ, পৃ- ৩৬৭
- ^{২৫} সুবীর রায়চৌধুরী, 'ভূমিকা', *জগদীশ গুপ্তের গল্প*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ- ২৩৯
- ^{২৬} ঐ, পৃ- ২৪০-৪১
- ^{২৭} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লঘু-গুরু', *পরিচয়*, কলকাতা, কার্তিক, ১৩৩৮, পৃ- ৩১৪
- ^{২৮} ঐ, পৃ- ৩১৪
- ^{২৯} Aristotle, *On the Art of Poetry*, Trans. Ingram Bywater, Oxford : Oxford Clarendon Press, 1976, p. 84
- ^{৩০} ঐ
- ^{৩১} অ্যারিস্টটল, *কাব্যতত্ত্ব*, তর্জমা- শিশিরকুমার দাশ, কলকাতা : প্যাপিরাস, ২০০৯, পৃ- ৮৬
- ^{৩২} Humphry House, *Aristotle's Poetics*, London : Rupert Hart-Havis, 1956, p. 62
- ^{৩৩} সুবীর রায়চৌধুরী, 'ভূমিকা', *জগদীশ গুপ্তের গল্প*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ- ২৪৭
- ^{৩৪} বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে থেকে জগদীশ গুপ্তকে মনোযোগ দিয়ে পড়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন সুবীর রায়চৌধুরী, তাঁর লেখা ভূমিকায়। দ্রঃ- পৃ- ২৫৪
- ^{৩৫} দ্রঃ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শিল্পকলার রাজনীতি*, কলকাতা : সহজপাঠ ও যাপন, ২০১৬, পৃ- ২২-২৬ এবং Friedrich Engels, *The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man*, New York : International Publisher, 1950
- ^{৩৬} বুদ্ধদেব বসু, *অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ দুটি কাব্যনাট্য*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০২০, পৃ- ১৪৪
- ^{৩৭} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯, পৃ- ৪৪৪-৪৫
- ^{৩৮} ঐ, পৃ- ৪৪৫
- ^{৩৯} বারিদররণ ঘোষের সম্পাদিত *সাময়িকপত্রের আলোকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ* এই বিষয়ে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। এই সংকলনের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ে বিচিত্র সংবাদ, স্মৃতি, যুদ্ধক্ষেত্রের কথা প্রকাশিত হয়েছে। দ্রঃ বারিদররণ ঘোষ, *সাময়িকপত্রের আলোকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ*, কলকাতা : পারুল, ২০১৫
- ^{৪০} Einstein, Albert & Freud, Sigmund, *Why War?*, Dijon : League of Nation, 1933, p.40-41
- ^{৪১} Freud, Sigmund, *Civilization and Its Discontents*, Trans. James Strachey, New York: W.W. Norton & Company INC, 1962, p.69

^{৪০} Freud, Sigmund, *Beyond the Pleasure Principle*, Trans. James Strachey, New York: W.W. Norton & Company, 1975, p. 6

^{৪৪} The Century: A Bird's Eye View

TWELVE PEOPLE LOOK AT THE TWENTIETH CENTURY

Isaiah Berlin (philosopher, Britain): ' I have lived through most of the twentieth century without, I must add, suffering personal hardship. I remember it only as the most terrible century in Western history.'

Julio Caro Baroja (anthropologist, Spain): 'There's a patent contradiction between one's own life experience - childhood, youth and old age passed quietly and without major adventures - and the facts of the twentieth century ... the terrible events which humanity has lived through.'

Primo Levi (writer, Italy): 'We who survived the Camps are not true witnesses. This is an uncomfortable notion which I have gradually come to accept by reading what other survivors have written, including myself, when I re-read my writings after a lapse of years. We, the survivors, are not only a tiny but also an anomalous minority. We are those who, through prevarication, skill or luck, never touched bottom. Those who have, and who have seen the face of the Gorgon, did not return, or returned wordless.'

Rene Dumont (agronomist, ecologist, France): ' I see it only as a century of massacres and wars.'

Rita Levi Montalcini (Nobel Laureate, science, Italy): ' In spite of everything there have been revolutions for the better in this century . . . the rise of the fourth estate, and the emergence of women after centuries of repression.'

William Golding (Nobel Laureate, writer, Britain): ' I can't help thinking that this has been the most violent century in human history.'

Ernst Gombrich (art historian, Britain): 'The chief characteristic of the twentieth century is the terrible multiplication of the world's population. It is a catastrophe, a disaster. We don't know what to do about it.'

Yehudi Menuhin (musician, Britain): 'If I had to sum up the twentieth century, I would say that it raised the greatest hopes ever conceived by humanity, and destroyed all illusions and ideals.'

Severo Ochoa (Nobel Laureate, science, Spain): 'The most fundamental thing is the progress of science, which has been truly extraordinary ... This is what characterizes our century.'

Raymond Firth (anthropologist, Britain): 'Technologically, I single out the development of electronics among the most significant developments of the twentieth century; in terms of ideas, the change from a relatively rational and scientific view of things to a non-rational and less scientific one.'

Leo Va/iani (historian, Italy): 'Our century demonstrates that the victory of the ideals of justice and equality is always ephemeral, but also that, if we manage to preserve liberty, we can always start all over again . . . There is no need to despair, even in the most desperate situations.'

Franco Venturi (historian, Italy): 'Historians can't answer this question. For me the twentieth century is only the ever-renewed effort to understand it.'

দ্র. Hobsbawm, Eric, *The Age of Extremes 1914-1991*, London : Abacus, 1995, p. 1-2

^{৪৫} জগদীশ গুপ্ত, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৫, পৃ- ৮০

^{৪৬} এ

^{৪৭} এ, পৃ- ৭৪

^{৪৮} এ, পৃ- ৭৫

^{৪৯} এ, পৃ- ৯০

^{৫০} এ

^{৫১} এ

^{৫২} এ, পৃ- ৯১

^{৫৩} এ

^{৫৪} এ

^{৫৫} এ, পৃ- ১২০

^{৫৬} এ, পৃ-১৩৩

^{৫৭} এ, পৃ- ১৫১

^{৫৮} এ, পৃ- ১৫২

^{৫৯} মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *আত্মহত্যার অধিকার এবং অন্যান্য সনদ*, কলকাতা : প্রতিভাস, ২০১২, পৃ- ৩৪

^{৬০} জগদীশ গুপ্ত, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৫, পৃ- ১৫৫

^{৬১} এ, পৃ- ১৫৯

^{৬২} এ, পৃ- ১৮৮

^{৬৩} এ, পৃ- ১৮৯

^{৬৪} এ

^{৬৫} এ, পৃ- ২০৪

^{৬৬} এ, পৃ- ২৩০

^{৬৭} এ, পৃ- ২২৯

^{৬৮} জগদীশ গুপ্ত, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৯১, পৃ- ১৫৬

^{৬৯} এ

^{৭০} এ, পৃ- ২০৮

^{৭১} এ, পৃ- ২৫০

^{৭২} এ, পৃ- ২৫১

^{৭৩} এ, পৃ- ২৭০

^{৭৪} এ

^{৭৫} দ্র:- আশিষ লাহিড়ী, *ভগবানের লেভি*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯, পৃ- ৪২ ও ৫০ এবং God may only be thought of as an 'absentee landlord' Simon Blackburn, *The Oxford Dictionary of Philosophy*, OUP, 1996, p.97

^{৭৬} জগদীশ গুপ্ত, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৬৫ব, পৃ-১২৫

^{৭৭} সেই সময় গয়ামণি কার্যত বিকারগ্রস্থ।

^{৭৮} ঐ, পৃ-১৩৫

^{৭৯} ঐ

^{৮০} ঐ, পৃ-১৫২

^{৮১} জগদীশ গুপ্ত, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৫, পৃ- ৩৫১

^{৮২} ঐ

^{৮৩} ঐ, পৃ-৩৫৫

^{৮৪} ঐ, পৃ- ৩৫৫

^{৮৫} ঐ, পৃ- ৩৫৬

^{৮৬} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯, পৃ- ৪৪৫

^{৮৭} জগদীশ গুপ্ত, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৫, পৃ- ৩৫৬

^{৮৮} হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮৮, পৃ- ২০৪

^{৮৯} জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, *বাংলা ভাষার অভিধান*, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃ- ১৫২

^{৯০} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লঘু-গুরু', *পরিচয়*, কলকাতা, কার্তিক, ১৩৩৮, পৃ- ৩১৪

চতুর্থ অধ্যায়

‘তিন বন্দ্যোপাধ্যায়’: আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধ

৪.১ পুতুলনাচের ইতিকথা: নিয়তি, স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ

এই অধ্যায়ে আমাদের অভিনিবেশের বিষয় মূলত কল্লোল ও জগদীশ গুপ্তের পরবর্তী প্রজন্মের আখ্যানকারেরা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) সমস্ত উপন্যাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। মূলত পুতুলনাচের ইতিকথা-কে (১৯৩৬) ভিত্তি করেই আস্তিক-নাস্তিক বোধ বিষয়ে আলোচনা এগিয়ে চলবে, আর সেই সূত্রে একই বছরে প্রকাশিত আরেকটি উপন্যাস— পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)— আলোচিত হবে। আমাদের মূল অভিনিবেশ থাকবে আস্তি-নাস্তিবোধ পুতুলনাচের ইতিকথাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে? দ্বিতীয়ত, এই দুটি উপন্যাস একাংশের পণ্ডিত ও সমালোচকদের মতে নিয়তি নিয়ন্ত্রিত আখ্যান, সেই প্রসঙ্গটিও আলোচিত হবে। পুতুলনাচের ইতিকথা দীর্ঘকাল পাঠকদের ভাবিয়েছে, আলোড়িত করেছে, ভবিষ্যতে করবে। পণ্ডিতেরা বিভিন্ন সময় উপন্যাসটিকে নানান ভাবে দেখতে ও পড়তে চেয়েছেন। মূলত থিম্যাটিক দিক থেকে উপন্যাসটিকে সমালোচকের কীভাবে পড়েছেন; সেই অভিমতগুলিকে আমরা তুলে ধরবো, এবং সেগুলির সঙ্গে বিবাদী সংলাপে রত হবো।

১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারায় পুতুলনাচের ইতিকথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে আলোচনার শিরোনাম দিয়েছেন ‘জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ’ এবং দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫)

পুতুলনাচের ইতিকথা সম্পর্কে লিখছেন যে এই উপন্যাস দুটির মধ্যে অসংলগ্ন অবাস্তবতার সঙ্গে আশ্চর্য পরিণত চিন্তাশীলতা ও বিশ্লেষণনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।^১ পুতুলনাচের ইতিকথায় ‘বাস্তবতার প্রসার’ বেশি থাকলেও ‘অসংলগ্নতা’ দিবারাত্রির কাব্য-এর মতই রয়েছে।^২ এই অংশের আলোচনা শেষ করছেন এইভাবে—

“শশীর চরিত্রের যে দুইটি দিক্ গ্রন্থারাম্বে উল্লেখিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোন নিবিড় সমন্বয় গড়িয়া উঠে নাই।”^৩

বলাই বাহুল্য পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসটির প্রতি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুবিচার করেননি। পদ্মানদীর মাঝি-র হোসেন মিয়া চরিত্রটির মধ্যে তিনি ‘বিধাতা-পুরুষ’-এর লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিমত, গ্রামবাসীদের কাছে হোসেন মিয়ার দ্বীপটি যেন বেহেস্ত-জাহান্নামের অভূত সংমিশ্রণ এবং হোসেন মিয়াই তাদের বিধাতা-পুরুষ।^৪ তাঁর মতে হোসেন মিয়া চরিত্রটি তার প্রতিবেশীদের চোখে প্রায় ‘দেবলোকের মহিমামন্ডিত’ হয়ে উঠেছে। হোসেন মিয়াই কার্যত এই আখ্যানে একাংশের গ্রামবাসীদের আশ্রয় হয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের থিম নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো মন্তব্য না করলেও, তাঁর পাঠে মেটাফিজিক্যাল ইঙ্গিত লক্ষ্য করার মতো। যা পরবর্তীকালের পণ্ডিত সমালোচকদের প্রভাবিত করেছে কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে মেটাফিজিক্যাল ইঙ্গিতকে অস্বীকারও করা যায় না।

২) সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-এর পঞ্চম খণ্ডে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন— “দারিদ্রের ক্ষুধা এবং দরিদ্র-অদরিদ্রের অবচেতন যৌনবিকার মাণিকবাবুর সৃষ্ট চরিত্রের নিয়তি।”^৫ তিনিও যে মানিকের উপন্যাস

সম্পর্কে সুবিচার করেছেন বলা যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য একদর্শিতার দোষে দুষ্ট, এই তাঁর অভিমত।

৩) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৬-২০১৩) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর-এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আলোচনার শুরুতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য করেন— মানিকের শিল্পকর্ম নিয়ে কথা বলার আগে জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝে নেওয়া দরকার। সুকুমার সেনের অভিমতের সঙ্গে তিনি একমত নন, কারণ শশীর সমস্যা আসলে যৌন সমস্যা নয়, তা শশীর মনের সমস্যা, শশীর সত্তার মূলীভূত সমস্যাই *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র প্রধান সমস্যা।^৬ পরে *পদ্মানদীর মাঝি* ও *পুতুলনাচের ইতিকথা* সম্পর্কে লিখছেন—

“অদৃষ্টের হাতের ক্রীড়নক মানুষের কথাই এই দুটি উপন্যাসের উপজীব্য। গাওদিয়া গ্রাম-সমাজ এবং পদ্মা নদী এই দুই উপন্যাসে অদৃষ্টের অন্ধ নিয়তির প্রতীকরূপে উপস্থাপিত। তবে জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়তি বা অদৃষ্টের প্রশ্নে তফাৎ আছে তাও উল্লেখ করেছেন অন্যত্র। জগদীশবাবুর বিষয় হল মানুষের নিঃসহায়ত্ব, আর যাত্রারস্ত্রের মুহূর্তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় ছিল মানুষের নিরুপায়ত্ব। আত্মিক মিলটা এইখানে যে, এই দুই-ই হল মানুষের নৈঃসঙ্গ-চেতনার দুপিঠ। আর, মানিকবাবু জগদীশ গুপ্তের অপেক্ষা অগ্রসর এও কারণে যে, তাঁর চরিত্রেরা এই নিরুপায়বোধের কাছে আত্মসমর্পণ করে না, হেরে গেলেও করে না।”^৭

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যটি প্রথমে উল্লেখিত অভিমতটিকে খানিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র চরিত্রেরা কেবল ক্রীড়নক নন, বরং সচেতনভাবেই অদৃষ্টকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। যে শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যটি বোঝাতে; ‘নিরুপায়ত্ব’ তা এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে যথার্থ নয়। আত্মসমর্পণ যিনি করেন না, তিনি কি কোনো উপায় দেখেন না! সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যত নিয়তি বা অদৃষ্টের আখ্যান রূপেই পড়তে চেয়েছেন এই দুটি উপন্যাসকে।

৪) নবনীতা দেব সেনের (১৯৩৮-২০১৯) ‘ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী : শশী ও রিউ’ প্রবন্ধটি ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে *এক্ষণ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আলবের কাম্যুর (১৯১৩-১৯৬০) *দি আউটসাইডার* (১৯৪২)^৮ উপন্যাসের রিউ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র শশী-ডাক্তারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাই এই প্রবন্ধের বিষয়। সেই সূত্রে তাদের দার্শনিক প্রত্যয় বা অবস্থানের প্রসঙ্গও আলোচনায় উঠে এসেছে। নবনীতা দেব সেনের মন্তব্যগুলিকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে নেবো—

ক) “রিউ ও শশী এই দুজনেরই মূল সমস্যা হল মৃত্যুশাসিত জীবনের অসম্পূর্ণতা মোচনে ব্যক্তিমানুষের প্রয়াসের অর্থহীনতা।”^৯

খ) “কাহিনী দুটির ‘খীম’ বলতে বুঝি অবশ্যম্ভাবী দৈবের প্রবল অযৌক্তিকতার কাছে মানুষের যুক্তিনির্ভরতা ও ইচ্ছাশক্তির অসহায়ত্ব। ব্যক্তিমানুষ যতই সচেতনভাবে বাধা দিক না কেন, নৈর্ব্যক্তিক সমাজব্যবস্থার যান্ত্রিক চাপ তাকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে নেপথ্যে। সেইসব ব্যক্তির, যারা প্রচলিত যান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাকেই শেষকথা বলে মেনে নিতে পারে না, বা মানে না, যাদের অন্তর্লোকে একটি *ক্রটিমুক্ত, যৌক্তিক, মানবিক জগতের স্বপ্ন জাগ্রত আছে, তারাই হয়ে দাঁড়ায় স্বগৃহে প্রবাসী— ‘নির্বাসিত নায়ক’*।”^{১০}

গ) “আমরা ডাক্তার শশীর প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম শববাহক হিশেবে। চিকিৎসক গ্রামে প্রবেশ করছে, নিয়তি-নিহত একটি মৃতদেহ বহন ক’রে— দৈবের এই প্রচণ্ড পরিহাসের মধ্যে সমগ্র উপন্যাসের মূলভাব নিহিত আছে। ... জীবনের দূত হয়ে যে এসেছে, তার প্রথম পদক্ষেপ ঘটল মৃত্যুর দৌত্য নিয়ে। উপন্যাসের প্রথম পাতাতেই ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা, তার অসহায়ত্ব, নির্মম উপায়হীনতা, সন্দেহাতীতভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। দৈবের লীলার পুতুল হয়ে, সুতোর টানে হাত-পা নেড়ে যে মনুষ্যজীবন, রিউ এবং শশীর জীবন তারই সক্রিয় প্রতিবাদ— কিন্তু সে প্রতিবাদ শুধু উচ্চারিতই হয় মাত্র। ফললাভ ঘটে না।”^{১১} পরে একথাও লিখছেন নবনীতা দেব সেন— “প্রতিটি অভিজ্ঞতার মধ্যেই দেখতে পাই ভালো-করার জন্য শশীর ব্যর্থ প্রচেষ্টা, যেমন রিউ পণ্ড্রম করে প্লেগের রুগিদের প্রাণ বাঁচাতে। উভয়ের ক্ষেত্রেই উপলব্ধিটাই এক রকম— মানুষের ইচ্ছাশক্তি, শুভৈষণা কত অর্থহীন!”^{১২}

ঘ) যাদব এবং পাগলদিদির মৃত্যু প্রসঙ্গে লিখছেন—

“সে জানে এই মৃত্যু ইচ্ছামৃত্যু নয়, সামাজিক পরিস্থিতির চাপে মুখরক্ষার দায়ে তাঁকে এই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। অথচ সেই সামাজিক অবস্থারই দায়ে পড়ে শশীর পক্ষে এই নির্মম মৃত্যু অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করা ছাড়া কিছুই করার নেই। ওখানে ডাক্তারির প্রশ্ন ওঠে না। ...শশী শুধু পুতুল— দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কিছুই সে ক’রে উঠতে পারে না।”^{১৩}

ঙ) শশীর স্বপ্ন ছিল এক যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত, স্বচ্ছ, বোধগম্য, অর্থপূর্ণ, ছন্দবদ্ধ জীবনের— কিন্তু সে হাতে পেল ঠিক তার বিপরীত একটা জীবন। যুক্তির অগম্য, অস্বচ্ছ, দুর্বোধ্য, অসমঞ্জস, অর্থহীন, খাপছাড়া এক জগৎ। নবনীতা দেব সেন মনে করছেন এতে ঈশ্বরের কোনো স্পষ্ট বা ব্যক্তিগত ভূমিকা নেই। কিন্তু তবুও সে হাল ছেড়ে দেয়। মনুষ্যত্বের সব উষ্ণতা হারিয়ে সে হয়ে যায় ‘পুতুল’।

“নিরীশ্বর, নিষ্প্রাণ, প্রেরণাহীন ভবিষ্যতহীন, অতীতসর্বস্ব এক মরুদ্বীপে আত্মসম্পর্পিত শশীকে আমরা দেখি চিরপ্রবাসী, চিরনির্বাসিত, অপরিবর্তনীয় ভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে। শশীর সঙ্গে তার পিতার শেষ কথাই হল: ‘অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডাবে।’ মানুষ শশী হয়ে যায় খেলার পুতুল।”^{১৪}

নবনীতা দেব সেনের মতে রিউ বেঁচে যায় কারণ তার আছে অমূল্য রক্ষাকবচ— আত্মজ্ঞান এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস কিংবা ঐশ্বরিক যুক্তিক্রমে আস্থা।^{১৫} শশী তা থেকে বঞ্চিত বা বলা ভালো সচেতন ভাবেই অবিশ্বাসী তাই সে পরিণত হয় পুতুলে।

নবনীতা দেব সেনের অভিমত কিংবা সিদ্ধান্ত বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করি। যাদব ও পাগলদিদির মৃত্যু কালে শশী সত্যি পুতুল নাকি নীরব প্রতিবাদী? সোচ্চার প্রতিবাদ হয়তো সে করেনি, কিন্তু তার নিশুপ হয়ে থাকা এটা প্রমাণ করে না যে শশী অদৃষ্টের হাতের ‘পুতুল’। বরং একথা বলা যায় শশী সামাজিক অবস্থার বন্ধনে অসহায়, ‘নাস্তিক’ বিজ্ঞানমনস্ক শশীর কাছে আত্মহত্যার কারণ পরিস্কার। গাওদিয়ার মানুষজনের কাজ-কর্ম, আচার-বিচার যুক্তির

অগম্য তো নয়; একটি নির্দিষ্ট যুক্তিক্রম আছে, আছে বলেই ইংরাজি শিক্ষিত শশী অসহায়বোধ করে, কিন্তু হাল ছেড়ে দেয় না। চূড়ান্ত আশাবাদ যা নবনীতা দেব সেন খুঁজেছেন, সেই আকাঙ্ক্ষিত আশাবাদ *পুতুলনাচের ইতিকথা* নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) পূর্ববর্তীকালের উপন্যাসে তা প্রায় বিরল, কারণ মঙ্গলময় ঈশ্বর ও আলোকপ্রাপ্তির ফলে অর্জিত মানবতার আদর্শই তখন প্রশ্নের মুখে। কিন্তু জাগতিক নিয়মকে সে অস্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। উপন্যাসটি নিয়ে কথা বলার সময় এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

৬) অশ্রুকুমার সিকদার (১৯৩২-২০১৯), তাঁর *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস* শীর্ষক গ্রন্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদি উপন্যাস, মূলত তিনটি উপন্যাস (দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি) নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি *পদ্মানদীর মাঝি*-র হোসেন মিয়াকে ‘দ্বিতীয় বিধাতা’^{১৬} পুরুষ এবং কেতুপুরের চাষাদের ‘নিয়তি’ রূপে চিহ্নিত করেছেন। সেই সূত্র ধরেই *পুতুলনাচের ইতিকথা*য় প্রবেশ করেন। তাঁর বক্তব্যগুলিকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেবো—

এক, তাঁর মতে, হোসেন মিয়াই কেতুপুরের চাষীদের নিয়তি। আর সেই নিয়তি *পুতুলনাচের ইতিকথা*য় মূল বিষয়। লেখক যতোই অস্বীকার করুন, এই উপন্যাসের বিষয় নিয়তিবাদ, লেখক যতোই দাবি করুন^{১৭}, এই উপন্যাস সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে দরদি প্রতিবাদ নয়।^{১৮} কিছু পরেই বলছেন—

“গাঁওদিয়া গ্রামের বাস্তবতার মধ্যে এক প্রতীকী দার্শনিক সত্যকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্চারিত করে দেন। ইচ্ছার স্বাধীনতা ও অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণের বিরোধের মধ্যে লেখক দ্বিতীয়কেই সত্য বলে স্বীকার করে নেন। গল্প ছাড়িয়ে এই দার্শনিক উপলব্ধির প্রকাশে উপন্যাসটি হয়ে যায় আধুনিক।”^{১৯}

দুই, উপন্যাসের বিভিন্ন অংশ থেকে নিয়তি বা অদৃষ্ট বিষয়ক উক্তি ও প্রসঙ্গগুলিকে অশ্রুকুমার সিকদার তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের সূচনায়, হারু ঘোষের শবদেহ নিয়ে গ্রামে প্রবেশের সময় নবীন মাঝির উক্তি, কিংবা শশীর ছোটো বোনের বড়ো হয়েও পুতুল খেলার ইচ্ছার মধ্যে তিনি বিশেষ আয়রনি খুঁজে পেয়েছেন— উপন্যাসের জীবন্ত চরিত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে কোনো এক ‘নিশ্চেতন শক্তি’। বিন্দুর গাওদিয়া আশা এবং ফের কলকাতায় ফিরে যাওয়া মধ্যেও নিয়তি প্রসঙ্গ খুঁজে পেয়েছেন। যাদব পণ্ডিত ও পাগলদিদির আত্মহত্যা প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন— “মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিলেন, ‘এমনকি আত্মহত্যাও মানুষের নিয়ন্ত্রাণাধীন নয়।’ এই ঘটনায় একটা অদ্ভুত অসহায়তা উপলব্ধি করে শশী।”^{২০} যে শশী বারংবার গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাওয়ার সংকল্প করেছে; তার কাছে রোগীদের গ্রামে রেখে কলকাতায় দিনযাপন ‘বর্বর খেয়ালি’ বলে মনে হয়। ‘এ কি বন্ধন, এ কি দাসত্ব!’ এই দায়িত্ববোধ এও শশীর আর এক নিয়তি।^{২১} গোপালের— শশীর বাবা— হুমকির ফলে শশীর সহপাঠী অমূল্য গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এবং পরে সেনদিদির অবৈধ সন্তানটিকে সঙ্গে করে গ্রাম ছাড়ে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদার লিখছেন—

“গাঁওদিয়া ছাড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শশী পদত্যাগ করে নিজের জায়গায় বিকল্প ডাক্তার নিযুক্ত করে, যদিও গ্রামছাড়ার কথা ভাবতে এখনো ‘কেমন করিয়া ওঠে মনটা।’ কিন্তু গোপাল বিতাড়িত করে ডাক্তারকে, অবৈধ সন্তানটিকে নিয়ে নিজেই গৃহত্যাগ করে। গোপালের এবং নিয়তির চক্রান্তে শশীর গ্রামত্যাগ ঘটে ওঠে না।”^{২২}

গ) এই লেখাটির ২৬ নম্বর টীকায় অশ্রুকুমার সিকদার ভিন্ন মতের একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন, অশোক মিত্রের “জলাভূমির কবিতা?”, যেটির সঙ্গে তিনি একমত নন। টীকাটি উদ্ধৃত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

“তিনি মনে করেন, শশীর বাবা গোপালের ‘অকস্মাৎ নিষ্করণ’ এবং কুসুম-কর্তৃক শশীকে প্রত্যাখ্যান, মানুষ যে নিয়তিনিয়ন্ত্রিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সম্পাদ্যের পরাজয় প্রমাণ করে। অশোক মিত্র কিন্তু প্রকারান্তরে মেনে নিচ্ছেন, এই উপন্যাসে, পুতুলনাচের ক্রীড়নক আমরা, এটাই সম্পাদ্য ছিল।”^{২০}

অশোকুমার সিকদার হোসেন মিয়াকে নিয়তি রূপে দেখেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে স্পষ্ট করে ঘোষণা করছে— এই উপন্যাস আদতে ‘নিয়তি’ নিয়ন্ত্রিতই। নিয়তি বলতে ঠিক কী বুঝিয়েছেন তা খুব স্পষ্ট নয়, বলা ভালো উপন্যাসে চরিত্রদের প্রায় সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই তিনি ‘নিয়তি’র খাপে ফেলে পড়তে চেয়েছেন। এখানে আমাদের আপত্তি। ব্যাখ্যাতিত (যদিও তা নির্দিষ্টায় বলা যায় না) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং প্রত্যক্ষ কোনো একটি ঘটনার অভিঘাতের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিও, তাঁর বিচারের নিয়তি। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা নিয়তি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো— তত্ত্বগতভাবে নিয়তি নিরালম্ব। এর সঙ্গে কর্মফল জন্মান্তরবাদের সম্পর্ক নেই, করুণাময় ঈশ্বরের সঙ্গেও এর সহাবস্থান অসম্ভব। কোনও মৌলিক প্রতিপাদ্য এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি না থাকার কারণেই কি অব্যাহত থেকে গেল ‘নিয়তি’? মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি মতে যা কিছু দুর্বোধ্য, অজ্ঞেয় সেই সব অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল নিয়তির মাধ্যমে। কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদের পরিপূরক হিসেবে হাজির হল নিয়তি। যা কিছু জ্ঞাত, যুক্তিযুক্ত, প্রত্যাশিত তার বিপ্রতীপ অভিজ্ঞতা আশ্রয় পেল নিয়তিবাদে। নিদারুণ নৈতিক সংকটে পড়ে মানুষ নিয়তির আশ্রয় নিয়েছে। এখানে নিয়তিবাদীদের একটি কৃতিত্ব আছে, বস্তুজগৎকে জানবার ও ব্যাখ্যা করবার তাগিদে একভাবে নিয়তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। যখনই কার্যকারণ সম্পর্ক ও যৌক্তিক পারস্পর্য কোনও ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হয়েছে তখনই জ্ঞানের ফাঁকটিকে ভরাট করার তাগিদে নিয়তির আশ্রয় নিয়েছে মানুষ। শশীর দায়িত্ববোধ, গোপালের চক্রান্তে গ্রামে রয়ে যাওয়া, যাদব পণ্ডিত ও পাগলদিদির

আত্মহত্যা অসহায়ের মতো প্রত্যক্ষ করা সবই অশ্রুকুমার সিকদারের ব্যাখ্যায় নিয়তি নিয়ন্ত্রিত। এই ভাবে পড়তে গেলে ‘নিয়তি’ ভিন্ন আর কোনো সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। মানুষ যে চৈতন্য যুক্ত একটি প্রাণী, নিঃসাড় নয়, সেই প্রত্যয়টি খারিজ হয়ে যায় এই সিদ্ধান্তের ফলে। অশ্রুকুমার সিকদারের কাছে ‘নিয়তি’ একটি সর্বরোগহর বটিকা। এমন কী উপন্যাস এমন একটি শিল্পরূপ যেখানে সকল চরিত্রেরাও লেখকের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, চরিত্রের আপন প্রত্যয় লেখকের অভিমতকে অগ্রাহ্য করে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অশ্রুবাবুর বয়ানে সেই সম্ভাবনাটিও বাতিল হয়ে যায়।

৭) অশোক মিত্রের (১৯২৮-২০১৮) অচেনাকে চিনে-চিনে প্রবন্ধ সংকলনে “জলাভূমির কবিতা?” শিরোনামে একটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। সম্ভবত অশোক মিত্রই প্রথম পুতুলনাচের ইতিকথাকে নিয়তির দৃষ্টিকোণ থেকে না পড়ার প্রস্তাব রাখেন। তাঁর সমস্ত বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়েও বলা যায়, মেটাফিজিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে থেকে দেখার ইঙ্গিত অশোক মিত্র এই প্রবন্ধে রেখেছেন। যদিও অশোক মিত্রের কবিসত্তা তাঁর সমালোচক সত্তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়^{২৪} এই বিশেষ প্রবন্ধে, হয়তো উপন্যাসটি নিয়ে অভিভূত থাকার কারণেই এই অস্পষ্টতা। যে অস্পষ্টতার কারণেই অশ্রুকুমার সিকদার সিদ্ধান্ত করেছেন অশোক মিত্রও প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন সকলেই পুতুলনাচের ক্রীড়নক এটাই মানিকের সম্পাদ্য। আমরা অশোক মিত্রের দীর্ঘ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করবো। অশোক মিত্র লিখছেন—

“কতকগুলো মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক দায়িত্ব বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি যত কিছু অর্জন করিয়াছিল সব সে দিয়া গেল শশীকে, মরিয়া গেলে যেমন সে দিত’। এটাও কি পুতুলনাচ? ঢোঁক গিলতে হবে এ-ধরনের কোনো ব্যাখ্যা মেনে নিতে হ’লে যে নিয়তি আমাদের বাধ্য করে, নিয়ন্ত্রণ করে, গোপাল দাসের অকস্মাৎ-নিষ্ক্রমণ নিয়তি-বিধান, অতএব পুতুলনাচেরই অন্যতম দৃষ্টান্ত। বরঞ্চ, এই উক্তি কি ঘোর দুস্পর্ধা হবে, গোপাল দাস-শশীর পিতা-পুত্র সম্পর্ক ধ্রুপদী দ্বন্দ্বিকতারই প্রকাশ, এই দ্বন্দ্ব শশীর পরাজয় তার পিতার

কাছে, এবং, হয় তো, সেই সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলনাচের যে-সম্পাদ্য, তার পরাজয়? জীবনের জটিলতার ক্রীড়নকবৃত্তি পেরিয়ে, মানুষ নিঃসাড় নয়। মানুষের প্রক্রিয়ায় বুদ্ধির পাশাপাশি আবেগ আলোড়ন তোলে, বিবেক এবং ষড়রিপুর মধ্যে সতত সংঘাত, এই সংঘাতের উপসংহারে কে কোথায় পৌঁছবো তা বহির্প্রকৃতি কর্তৃক নির্ধারিত, এই অনুশাসন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রগুলি কিন্তু মানেনি। যদি কেউকে [কাউকে], পুতুলনাচের ইতিকথা প্রেক্ষিতে, পরাজিত নায়ক ব'লে অভিহিত করতে হয়, তা হ'লে তা সুতরাং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই করতে হয়।”^{২৫}

এটা স্পষ্ট যে অশোক মিত্র পুতুলনাচের ইতিকথাকে নিয়তি নিয়ন্ত্রিত আখ্যান হিসেবে পড়েননি। বস্তুত তা মানবিক আখ্যানই। অশোক মিত্র কিন্তু স্পষ্ট করে বলেননি তাঁর কাছে এই উপন্যাসের ‘সম্পাদ্য’ ঠিক কী? এই অস্পষ্টতার ফাঁকটি অশ্রুকুমার সিকদার ভরাট করেছেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ‘নিয়তিনিয়ন্ত্রিত’ শব্দটির মাধ্যমে। বরং তিনি মনে করেছেন হঠাৎ করে গোপালের ‘অকস্মাৎ-নিষ্কমণ’ আদতে নিয়তি-বিধান এইটেই যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত এবং সম্পাদ্য। এই প্রবন্ধটি প্রকাশের বছর কয়েক বছর আগে এফ্‌গ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি এবং কিছু ছিন্ন লেখা। সে লেখাগুলি অশোক মিত্রের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এমনটা মনে করা অস্বাভাবিক। ‘ছিন্ন লেখা’য় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন পুতুলনাচের ইতিকথা নিয়তি নিয়ন্ত্রিত আখ্যান নয়। বরং ব্লার্বে প্রকাশকের তরফে লেখা মন্তব্যই অস্পষ্টতা তৈরির জন্যে দায়ী। পরে এই নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো। তারপরেও অশোক মিত্রের “জলাভূমির কবিতা?”-ই পুতুলনাচের ইতিকথাকে নিয়তি নিয়ন্ত্রিত আখ্যানের বদলে সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কের নিরিখে পড়ার প্রস্তাব রাখে। যদিও ঐ প্রস্তাবনায় অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপক সুজিত ঘোষের (১৯৪৫-২০১৭) বক্তব্য অনুযায়ী সকল খ্যাতিমান সমালোচকেরা এই উপন্যাসটিতে অন্ধ জৈবিক শক্তি ও অদৃষ্ট বা

নিয়তির হাতে মানুষের ক্রীড়নক রূপটি দেখেছেন, যে ধারায় একমাত্র ব্যতিক্রম অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী,^{২৬} যে লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে।

৮) এবার আমরা নজর দেবো অধ্যাপক আব্দুল কাফির একটি প্রবন্ধের দিকে। ‘স্বাধীনতার সুখদুঃখ : জ্ঞান স্মৃতি স্বাধীনতা আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ক খুচরো ভাবনা’ শীর্ষক প্রবন্ধটি *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কয়েকটি প্রশ্ন, পাঠকের পানে ছুঁড়ে দিয়ে, *পুতুলনাচের ইতিকথা* প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করছেন।

“*পুতুলনাচের ইতিকথা*র শশী-ডাক্তার কেন শেষ পর্যন্ত থেকেই গেল গাওদিয়ায়? কেন সে ক্রমে হয়ে এল ধীর? ...কোন বোধ তাকে এমন ‘পীড়িত’ কিংবা ‘বিমুখ’ করে তুলেছিল? বিমুখ শব্দটি কি ঠিক হল? নাকি আসলে অন্য কোনো অভিমুখ খুঁজে পেয়েছিল শশী?”^{২৭}

এই প্রশ্নের দিশা খুঁজতে গিয়ে অনিবার্য ভাবে এসে যায় আরেকটি প্রশ্ন, উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বটি। কেউ তো আর গাওদিয়ায় নেই যে, বাধা হয়ে দাঁড়াবে শশীর স্বপ্ন ও আকাজক্ষার মধ্যে।

“এই উপন্যাসের সবচেয়ে গভীর ও রহস্যময় প্রশ্ন এইটাই— কেন শশী থেকে যায় গাঁয়ে, কোনো বাধা সে এখন বোধ করে? কে তাকে আটকায়? সে কি কুসুমের টান? সে কি নিছক হাসপাতাল? সে কি জীবনের প্রতি গভীর বিরাগ? নাকি এক গভীর স্বাধীনতা আসলে? যে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন সার্ব? যে স্বাধীনতায় আসলে মিশে আছে “রেস্পন্সিবিলিটি?”^{২৮}

স্বাধীনতার প্রশ্নে নিয়তির ক্রীড়নক মানুষ এই প্রস্তাবটিকে খারিজ করে আরেক ভাবে পড়ার প্রস্তাব রাখেন তিনি—

“উপন্যাসের কথক জানিয়েছেন, একে একে যাত্রার সব আয়োজন শশী বাতিল করে ‘গভীর বিষণ্ণমুখে’। জানান, ‘*কাজ আর দায়িত্ব* ছিল জীবনে, *কাজ আর দায়িত্বে* জীবনটা আবার *ভরপুর* হইয়া উঠিল’। (বাঁকা হরফ আমার। ইচ্ছাকৃত।) দায়িত্ব এবং ভরপুর শব্দ দু’টি সচারচর সমালোচকেরা (ইচ্ছাকৃত কিনা কে

জানে) উপেক্ষা করেন। কিন্তু এই শব্দ দু'টি শশীর মনোভাব এবং অবস্থান বুঝাতে সাহায্য করবে আমাদের।... 'অজানা শক্তি', এবং তার 'অনিবার্য ইঙ্গিত' শব্দগুচ্ছে চক্চক্ করে ওঠে মেটাফিজিক্স-লৌপ সমালোচকের চোখ। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হয়, নিয়তি কিংবা ঈশ্বরের কথাই লেখক বলেন এখানে। ...কিন্তু তাঁরা খেয়াল করেন না, শেষ লাইনের অমোঘ উপমাটিকে। 'মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন'— রহস্য তা ঠিকই, কিন্তু মেটাফিজিক্যাল গোত্রের নয়, চূড়ান্তভাবেই পার্থিব। প্রাকৃতিক। জাগতিক। ...এই নিয়মটির বোধ অর্জন করতে পারার নামই স্বাধীনতা।”^{২৯}

প্রবন্ধটি স্বাধীনতা বিষয়ক হলেও, উপেক্ষিত থাকে না, বরং ভীষণ ভাবে প্রাসঙ্গিক ওঠে ঈশ্বর/নিয়তি প্রসঙ্গটি। *পুতুলনাচের ইতিকথা* সম্পর্কে এই প্রবন্ধটি ভিন্ন একটি প্রস্তাব হাজির করে।

সমালোচকদের মন্তব্য এবং অভিমতগুলিকে উল্লেখ করার পর আমরা মূল আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করবো। কিন্তু তাঁর আগে এই উপন্যাসটি নিয়ে লেখকের মন্তব্যগুলিকে দেখে নিতে চাইবো। ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে *এক্ষণ* পত্রিকায় 'ছিন্ন লেখা' শিরোনামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে *পুতুলনাচের ইতিকথা*র দ্বিতীয় অর্থাৎ ১৯৪৭-এ প্রকাশিত বুকম্যান সংস্করণের ব্যাক কভারে প্রকাশকের বক্তব্যটি উল্লেখ করা জরুরি।

“পৃথিবীর এই বিরাট রঙ্গমঞ্চে মানুষ যেন শুধু পুতুল। কোন অদৃশ্য হাতের সুতোর টানাপোড়েনে মানুষ নাচে, কাঁদে, কথা বলে। ...যে সীমাহীন নীড়-প্রেমের স্বপ্ন দেখেছিল শশী, সে স্বপ্ন তার চুরমার হয়ে গেল কেন?... *পুতুলনাচের ইতিকথা* এই বিপর্যস্ত জীবন্ত পুতুলদের হাসিকান্নার মর্মান্তিক অভিনয় আর তাদের প্রেরণাহীন যান্ত্রিক জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস।”^{৩০}

এর প্রতিবাদ করতেই ‘পুতুলনাচের ইতিকথা আত্মসমালোচনা’ শীর্ষক লেখাটিতে মানিক লিখছেন—

“পুতুলনাচের ইতিকথা? তবে আর কথা কী, মানিকবাবু মানুষকে পুতুল বানিয়েছেন, ভাগ্যের দাস বানিয়েছেন।

এটা হল বিচারকদের রায়।”^{৩১}

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়ানে এই উপন্যাসটি— মানুষকে যারা পুতুলের মতো নাচায় তাদের বিরুদ্ধে দরদি প্রতিবাদ। প্রচণ্ড বিক্ষোভ নয়, স্থায়ী দরদি প্রতিবাদ।^{৩২} কিছু পরেই আক্ষেপ করেছেন কেন তিনি একটা ভূমিকা লিখে দেননি। নিজের কথা লিখে দিলে প্রকাশক তাঁকে ভাগ্যবাদী ঘোষণা করতে পারতেন না।

পুতুলনাচের ইতিকথা/র দ্বিতীয় খণ্ড লেখার পরিকল্পনা ছিল মানিকের। যদিও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। সেই খসড়ার পাণ্ডুলিপি থেকে একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি—

“আবার সেই শশীর কাহিনী? গ্রামের ডাক্তার যে শশীর সমস্ত বড় বড় স্বপ্ন আর কল্পনা ঝলসে গিয়েছিল খালের ধারে বাজ-পড়া গাছটার মতো? গ্রাম্য জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিসরে দায় আর দায়িত্বগুলি পালন করে যাওয়া ছাড়া জীবন থেকে মুছে গিয়েছিল আশা আনন্দের রঙ?

‘কেন নয়!

‘সত্যি তো আর পুতুল নয় মানুষ। অদৃশ্য শক্তি বা অন্য অন্য মানুষের আঙ্গুলে বাঁধা সূতোর টানে সত্যি তো মানুষ অচেতন পুতুলের মত নাচে না। মানুষের বেলা ওই উপমা তো নিছক কথার কথা, অনেক কিছু জড়িয়ে অবস্থার চাপে বড় বেশী কাবু মানুষের অবস্থার নিছক একটা বর্ণনা মাত্র।

‘নইলে শশীর কি দরকার ছিল বাপের ফেলে যাওয়া সংসারের দায়, হাসপাতালের দায়, গাঁয়ের চাষাভূষো মানুষগুলির চিকিৎসার দায় থেকে আরও অনেক রকম দায় ঘাড়ে নেবার— তার নিজের স্বপ্ন আর কল্পনাকে যা সার্থক করে না?

‘পুতুলের কি দায়িত্বজ্ঞান থাকে!’^{৩৩}

উপন্যাস নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে সেই উপন্যাস নিয়ে লেখকের অবস্থানটি উল্লেখ করে রাখা প্রয়োজন। তবে একথাও ঠিক যে উপন্যাস এবং তার চরিত্রেরা সর্বদাই যে লেখকের

অঙ্গুলি হেলনে এগিয়ে চলে বা বিকশিত হয় তা সর্বদা ঠিক নয়। শিল্পীর বক্তব্য বা দৃষ্টিকোণই শিল্পকর্মকে দেখার বা বোঝার একমাত্র বা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত তা আমাদের বক্তব্য নয়। বরং আমরা বলতে চাইছি, শিল্পীর অবস্থান ও দৃষ্টিকোণটিকে গুরুত্ব সহকারে পড়া দরকার। শিল্পকর্মের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিল্পটি সম্পর্কে শিল্পীর বক্তব্যটি নৈব্যক্তিক ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা দরকার।

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের শুরুর দৃশ্যটির স্মৃতি উপন্যাসে ফিরে এসেছে অনেকবার। “খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।”^{৩৪} উপন্যাসে মরে যাওয়া ছাড়া আর হারুর কোনো ভূমিকা ছিল না। ছিল না কি? পরবর্তী অংশের শুরুতেও ফিরে আসে হারুর কথা। শুধু কি তাই? যে দীর্ঘ দ্বন্দ্ব ও তর্ক উপন্যাসের মধ্যে চারিয়ে গেছে, সেটির ভিত্তি কিংবা দার্শনিক প্রেক্ষাপট রচনা করে দিয়েছে এই দৃশ্যটি। এরপরেই মানিক লিখছেন— “শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মূক অবচেতনার সঙ্গে একাল্প বছরের আত্মমমতায় গড়িয়া তোলা চিন্ময় জগৎটি চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।”^{৩৫} লক্ষণীয় ‘চিন্ময়’ শব্দ প্রয়োগটি, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যময় জগৎটি ‘নেই’ হয়ে গেল। হারুর জগৎ নেই হয়ে গেলেও, উপন্যাসের শুরুতেই কথক ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন আস্তিক-নাস্তিক দার্শনিক প্রশ্নান দুটি এ উপন্যাসের থিম ও মুখ্য দ্বন্দ্বকে চালনা করেছে। মতির জন্যে ছেলে দেখতে গিয়েই হারুর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু শশীর মধ্যে দুটি ভাবনার এবং জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। যা এই উপন্যাসের নিয়তি নিয়ন্ত্রিত ব্যাখ্যার বিপক্ষতা করে। মৃত্যু প্রসঙ্গে শশী জীবনের কাছেই ফিরে যায়, বলা ভালো মৃত্যুই তার জীবনবোধকে নির্মাণ করে। মানিক লিখছেন—

“শ্মশানে শশীর শ্মশান-বৈরাগ্য আসে না। জীবনটা সহসা তাহার কাছে অতি কাম্য, অতি উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, এমন একটা জীবনকে সে যেন এতকাল ঠিক ভাবে ব্যবহার করে নাই। মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্ক বাঁচিয়া থাকার মধ্যে জীবনের অনেক কিছুই যেন তাহার অপচয়িত হইয়া যাইবে। শুধু তাহার নয় সকলের। জীবনের এই ক্ষতি প্রতিকারহীন।”^{৩৬}

সাধারণত পুতুলনাচের ইতিকথার আলোচনা প্রসঙ্গে এই অংশটি তেমন নজরে আসে না। হারুর মৃত্যুই ‘সহসা’ জীবনকে অর্থবহ করে তোলে শশীর কাছে। সে বোঝে ‘অন্যমনস্ক’ হয়ে বাঁচা জাগতিক জীবনের বিপুল অপচয়। শশী এক প্রকার আত্মজ্ঞান লাভ করে। কী সেই আত্মজ্ঞান? যাকে মানিক অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপিতে চিহ্নিত করবেন ‘দায়িত্ববোধ’, সার্ব তঁর লেখায় যেটিকে চিহ্নিত করবেন ‘রেসপন্সিবিলিটি’ রূপে^{৩৭}। সে বোধের মাধ্যমেই কী শশী হয়ে ওঠে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী? কিংবা ‘নিয়তি’র প্রতিস্পর্ধী? শশী মনে মনে বলে— “(মতিকে) জোর করিয়া বাড়িতে আটকাইয়া রাখিলে আর সকলকেই হয়তো সে ক্ষমা করিবে, নিয়তিকে পর্যন্ত, কিন্তু শশীকে সে সহজে মার্জনা করিবে না।”^{৩৮} শশী ডাক্তার, ধুলো মাখা পৃথিবীই তার জীবন। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও সে লড়াই করে মৃত্যু সঙ্গে, ফলে সকলে পার পেলেও সে পাবে না। যামিনী কবিরাজের স্ত্রী সেনদিদির চিকিৎসার দায়িত্ব নেয় শশী, যামিনী ও গোপালের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাঁচিয়ে তোলে সেনদিদিকে। রূপসী সেনদিদি কুৎসিত হয়ে বেঁচে গেলেও শশীকে শুনতে হয় সে আপদ। “ভালো এক আপদ আসিয়া জুটিয়াছিল,— শশী। মানুষকে ও মরিতেও দিবে না?”^{৩৯} উপন্যাস জুড়েই শশী অসফল হলেও নিয়তি কিংবা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী রত থাকে। শশীর কাছে এই রত থাকার অর্থই জীবন। এবং স্বাধীনতাও। যার আরেক নিদর্শন পাওয়া যাবে উপন্যাসের একেবারে শেষে। ‘বিষণ্ণতা’ ঘুচবে না জেনেও, “আলো হাতে সকলের আগে আগে”^{৪০} সে চলে।

কথক জানান শশীর চরিত্রে দুটি স্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধ অন্য কোঠরে সাংসারিক বুদ্ধি এবং ধনসম্পত্তির প্রতি মমতা। বাবার শাসনে বড়ো হয় শশীর। কলকাতায় পড়তে যাওয়া সময় তার হৃদয় ছিল সংকীর্ণ, চিন্তাশক্তি ভোঁতা এবং রসবোধ স্থূল। বস্তুত, কলকাতা শহর ও কুমুদ তাকে নতুন করে গড়ে তোলে। নির্মিত হয় তার আরেকটি সত্তা, যার সঙ্গে অহরহ বিবাদ চলেছে উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের এমনি নিজেরও। কথক জানাচ্ছেন— “শহর তাহার মনে যে ছাপ দিয়াছিল তাহা মুছিবার নয়, কিন্তু সে শুধু ছাপ, দাগ নয়।”^{৪১} সে কারণেই বোধহয় যাদব পণ্ডিত ও পাগলদিদির সান্নিধ্য তাকে ‘শান্তি’ দেয়, তার মন ‘জুড়াইয়া’ যায়। ‘নাস্তিক’ শশী, দু-পাতা ইংরেজি পড়া ‘ম্লেচ্ছাচারী’ শশীকে শেষাঙ্গি হাসপাতালের দায়িত্ব দিয়ে যান যাদব পণ্ডিত। এখানেই গ্রাম-শহর এবং বিশ্বাস-যুক্তিবাদের চিরন্তন দ্বন্দ্ব লুকিয়ে আছে। নবনীতা দেব সেন মন্তব্য করেছেন—

“শশীর আশা ছিল এক যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত, স্বচ্ছ, বোধগম্য, অর্থপূর্ণ, ছন্দবদ্ধ জীবনের— কিন্তু সে হাতে পেল ঠিক বিপরীত : যুক্তির অগম্য, অস্বচ্ছ, দুর্বোধ্য, অসমঞ্জস, অর্থহীন, খাপছাড়া এক জগৎ।”^{৪২}

অথচ উপন্যাসে জানান দেন—

“শশীর মন শান্ত হইয়া স্থিতিলাভ করিয়াছিল। ... সে অবাক হইয়া দেখিয়াছে যে এইখানে, এই ডোবা আর জঙ্গল আর মশা ভরা গ্রামে জীবন কম গভীর নয়, কম জটিল নয়। একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে গ্রামে ডাক্তারি শুরু করিয়া ক্রমে ক্রমে এ জীবন শশীর যে ভালো লাগিতেছে,”^{৪৩}

কেন ভালো লাগছে গাওদিয়া কেন থেকে যেতে চাইছে সে? তার কারণ কি দায়িত্ববোধ? যা একথা জানান দেয় নাকি যে, সে পুতুল নয়? যে শশী-ডাক্তার বিশ্বাস করে টীকা নিলে বসন্ত হবে না। কিন্তু মতিকে তা বোঝাতে পারে না। নিজের পরিবার ও গ্রামবাসীদেরকেও স্বাস্থ্য সচেতন করতে পারে না সে। নাস্তিক, শশী-ডাক্তার যে মানুষকে মরতেও দেবে না, সে বুঝতে পারে— “তার স্বাস্থ্যনীতিও পালন করিতে গেলে জীবনের সঙ্গতি ওদের একেবারে নষ্ট হইয়া

যাইবে, অসুখী হইবে ওরা।”^{৪৪} রুগ্ন, সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ওদের বসবাস, ওরা বস্তুত, ‘অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির কবিতা’।

যাদব পণ্ডিত, পণ্ডিত বলে খ্যাতি তার নেই, ধার্মিক মানুষ, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে গাওদিয়া ও চারপাশের গ্রামে খ্যাতি রয়েছে। সিদ্ধপুরুষের পদধূলির জন্যে সকলেই লোলুপ। অথচ তিনি পদধূলি দেন না, আশীর্বাদ করেন না, পাষণ দেবতার মতো উপেক্ষা করেন ভক্তের ভক্তিকে। শশী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না যাদবকে, তার সন্দেহ এসবই ভক্তি টিকিয়ে রাখার কৌশল। নির্লোভ সদাচারী এই মানুষটির কোনো পার্থিব সুখ বা ভোগের জন্যে করেন তাও শশী মনে করে না, এটা যাদবের শখ। যে শশীকে জানায় তার পৈতে পরিষ্কার রাখার বরাত দিয়েছে সূর্যকে। সূর্যবিজ্ঞান যার করায়ত্ব তার কাছে এসব তুচ্ছ। যদিও কথক জানিয়ে দেন, শশীর মতো অবিশ্বাসী নাস্তিকের মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে পৈতের ঐ অংশটি জল-কালিতে চুবিয়েছেন।

“শশীর হাসিও পায়, মায়াও হয়। তাকে অভিভূত করার জন্যে এত ব্যাকুল প্রয়াস কেন যাদবের? অলৌকিক শক্তিতে অবিশ্বাস করিলেও যাদবকে শ্রদ্ধা সে তো কম করে না!”^{৪৫}

যাদবের কাছে বিজ্ঞানের ভিত্তি-ই মিথ্যে, আর শশী সেই নিয়েই মেতে রইল। শিখল না সূর্যবিজ্ঞান। সূর্যবিজ্ঞান যে জানে তার অসাধ্য কিছুই নেই। অতীত, ভবিষ্যৎ সবই তার জানা, এমন কী মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত তিনি বলে দিতে পারেন অনায়াসে। সহসা অবিশ্বাসী হাসি ঢাকার জন্যে শশী জিজ্ঞাসা করে কবে? যাদব জানান রথের দিন। কিন্তু কোন রথের দিনে তা আর বলা হয় না। কারণ কথাটা বলার পরে যাদব হঠাৎ এমন ‘ভীতভাবে স্তব্ধ’ হয়ে যান আর পাগলদিদি এমন করে অস্ফুট একটা শব্দ করে ওঠেন যে শশীর জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হয়।^{৪৬}

লক্ষণীয় ‘ভীতভাবে’ শব্দটির প্রয়োগ। মৃত্যুতে যাদব পণ্ডিতের মতো সিদ্ধপুরুষও ভীত হন, তা অনিবার্য জেনে। যদিও মুখে বলেন—

“আমার কাছে কি জীবন মরণের ভেদ আছে? গুরুর কৃপায় সূর্যবিজ্ঞান যেদিন আয়ত্ত হল, যেদিন সিদ্ধিলাভ করলাম, ও পার্থক্য সেদিন ঘুচে গেছে শশী।”^{৪৭}

যদিও শশী জানে যতই যাদব পণ্ডিত বলুন না কেন ‘বাসাংসি জীর্ণানি’, জীবনের প্রতি, পার্থিব জগতে থাকার বাসনা তার কম নেই। কলকাতা থেকে ফেরার পথে, রাত্রিবেলায় সাপের ভয়ে লাঠি ‘ঠুকিয়া ঠুকিয়া’ বাড়ি আসছিলেন। তা দেখে শশীর মনে সংশয় দানা বাঁধে। “জীবনের সেই ভিন্ন মমতা কোথায় গেল যাদবের? কোথা হইতে আসিল মৃত্যু সম্বন্ধে এই প্রশান্ত উদাস্য? যাদব সম্বন্ধে সে কী আগাগোড়া ভুল করিয়াছে?”^{৪৮} নাকি “তার অবিশ্বাস শুধু অজ্ঞানতার অন্ধকার!”^{৪৯} শশী আপ্রাণ চেষ্টা করে বিভিন্ন ভাবে, বিচিত্র প্রস্তাবে নিরস্ত করার চেষ্টা করে, আবারও সে অসফল— ‘বিষণ্ণতা’ অনিবার্য। কিন্তু সাফল্যহীনতাই কি নিয়তির কাছে সমর্পণ? এভাবেই এই ঘটনাটিকে পড়েছেন অশ্রুকুমার সিকদার।

কথক জানিয়ে দেয় এবং শশীও উপলব্ধি করে রথের দিন যদি যাদব পণ্ডিত না মরেন তাহলে সিদ্ধিলাভ নিয়ে প্রশ্ন উঠবে ভক্তের মনে। “যাদবের কাছে তাহা মৃত্যুর চেয়ে শতগুণে ভয়ংকর। মানুষের অন্ধ ভক্তি ছাড়া বাঁচিয়া থাকিবার আর তো কোনো অবলম্বন তাহার নাই!”^{৫০} শশীর কথা সহজে লোকে অবিশ্বাস করেও না, আর যাদবের অর্জন অন্ধ ভক্তি। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব *পুতুলনাচের ইতিকথা*র অন্যতম প্রধান দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের এক পিঠে রয়েছে জীবন ও পার্থিব জগতের প্রতি শশীর অকৃত্রিম ভালো লাগা, অপর প্রান্তে যাদব পণ্ডিতের সমস্ত জীবনের অর্জন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। ভক্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে এবং ভক্তি ও অলৌকিকত্ব বাড়িয়ে নেওয়ার অদ্যম পিপাসায় যাদব আত্মহত্যা করল। সিদ্ধপুরুষকে “মরণ অথবা অপযশের

মধ্যে একটা যাকে বাছিয়া লইতে হইবে কদিনের মধ্যে, তাকে বাঁচিবার উপায়”^{৫১} বাংলাতে গেলে ‘ম্লেচ্ছাচারী নাস্তিক’ অপবাদ ছাড়া আর কোন পুরস্কারই বা পাবে শশী! “মরণের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক”^{৫২} শশী-ডাক্তারের। সে মৃত্যুর প্রতিস্পর্ধী ফলে নাস্তিকতা ছাড়া আর কোনো রাস্তাই নেই তার। মৃত্যু তাকে জীবনের লগ্ন করে, বিষণ্ণ অসহায়ও করে বটে। কথক জানিয়ে দেন— “একটা অদ্ভুত অসহায়তার উপলব্ধি হয় শশীর। প্রাত্যহিক জীবনে যাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না মানুষের, তাদের সমবেত মতামত যে কতদূর অনিবার্য একটা অন্ধ নির্মম শক্তি হইয়া উঠিতে পারে, আজ সে তাহা প্রথম বুঝিতে পারে।”^{৫৩} অশ্রুবাবু এই বাক্যটিকে পড়বেন ‘মব-সাইকোসিস’ কীভাবে নিয়তি হয়ে নিয়ন্ত্রণ করে দুটি মানুষের জীবন। ব্যাখ্যা যোগ্য বিষয়কে ব্যাখ্যাভীত ধারণা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা কৌশল মেটাফিজিক্যাল/আধিদৈবিক প্রীতির লক্ষণ। অথচ কথকের কথনে কিংবা মানিকের বয়ানে স্পষ্ট পার্থিব জগৎ, ধুলো মাখা পৃথিবীর নিয়ম ‘অন্ধ নির্মম শক্তি’তে রূপান্তরিত হয়। ‘অন্ধ’ শব্দটিকে ঈশ্বরিক কিংবা নিয়তি অর্থে ব্যবহার করা যায় বটে, কিন্তু এখানে আখ্যানের বুননে, চরিত্রের উপলব্ধিতে স্পষ্ট, যে শব্দটি জাগতিক জীবনেরই ব্যঞ্জনা বহন করে চলেছে। ‘মব-সাইকোসিস’ শব্দটি ব্যবহার কার্যত খারিজ করে দেয় অশ্রুবাবুর যুক্তিক্রমটিকে।

কলিযুগে ইচ্ছা-মৃত্যুর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে আগত জনসমাবেশ দেখে শশীও সংশয়ী হয়ে যায়। তার ইংরেজি পড়া, বিজ্ঞানের সাধনা করা যুক্তিবাদী মনকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন যে করে ফেলে না তা নয়। তার মনে হয়—

“বাঁধা যুক্তির অতিরিক্ত কিছু হয়তো আছে জগতে, যাদব আর যাদবের মতো মানুষেরা যার সন্ধান রাখেন।

দলে দলে লোক আসিয়া যে যাদবের পায়ে লুটাইয়া পড়িতেছে, এদের সকলেরই বিশ্বাস কি মিথ্যা?”^{৫৪}

পরে শশী এটাও উপলব্ধি করে—

“প্রাত্যহিক জীবনের হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতার সঞ্চিত গ্লানি তার পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, ভুলিয়া গিয়াছে পার্থিব সুখের কামনা, লাভের হিসাব।”^{৫৫}

আমাদের চমকিত করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন তাঁর তথাকথিত মার্কসবাদী পর্বের^{৫৬} সূত্রপাত হয়নি। এই বাক্যগুলি খেয়াল করিয়ে দেয় না কি মার্কসের *Critique of Hegel's 'Philosophy of Right'*-এর কথা? ধর্ম প্রসঙ্গে যেখানে মার্কস লিখছেন—

“The wretchedness of religion is at once an expression of and a protest against real wretchedness. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.”^{৫৭}

কুসুম এই মৃত্যু প্রসঙ্গে বলে সত্তর বছরের একটা বুড়ো মরবে তাই নিয়ে দশটা গ্রামের লোকজন হৈ হৈ করছে। কত কিছুই যে দেখতে হবে। তীব্র শ্লেষ! শশীর যাবতীয় চেষ্টা বিফল হয়ে যায়, যখন পাগলদিদি জানিয়ে দেয় বিদেশে পালিয়ে গিয়ে দুটো বছর বেশি বেঁচে থেকে কী লাভ! বরং এইভাবে চলে যাওয়া ঢের ‘গৌরবের’।

যাদব আর পাগলদিদির মৃত্যু সকলকে মোহগ্রস্ত করলেও শশী-ডাক্তারের কাছে অজানা রইল না। মানিক লিখছেন—

“যাদবের মুখ ঢাকিয়া গিয়াছিল চটচটে ঘামে আর কালিমায়, চোখের তারা দুটি সংকুচিত হইয়া আসিয়াছিল। তিন-চার হাজার ব্যগ্র উত্তেজিত লোকের মধ্যে ডাক্তার শুধু শশী একা, সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তবু পলক সে ফেলিতে পারে নাই। যাদব ও পাগলদিদির দেহে পরিচিত মৃত্যুর লক্ষণগুলির আবির্ভাব একে একে চাহিয়া দেখিয়াছিল।”^{৫৮}

শশী বুঝতে পারে সুপরিকল্পিত আত্মহত্যা, কিন্তু সে কিছু করতে পারে না। কিছু পূর্বেই আমরা ‘অন্ধ’ শব্দটির কথা উল্লেখ করেছিলাম। ‘অন্ধ নির্মম শক্তি’ এই শব্দবন্ধটি সমালোচকদের অদৃষ্ট কিংবা নিয়তি নিয়ন্ত্রিত ব্যাখ্যায় অন্যতম আশ্রয়। তাঁর অনুমান করে ফেলেন যে ‘নিয়তি’ কথাই

বলতে চেয়েছেন লেখক। এমন কি অশোক মিত্র, যিনি প্রথম *পুতুলনাচের ইতিকথা*কে নিয়তির বাইরে জাগতিক আখ্যান হিসেবে পড়ার প্রস্তাব করলেন, তিনি খানিক দিকভ্রষ্ট হয়েছেন। সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায় আত্মহত্যার পরে অংশটি। “সত্যি-মিথ্যায় জড়ানো জগৎ। মিথ্যারও মহত্ত্ব আছে। হাজার হাজার মানুষকে পাগল করিয়া দিতে পারে মিথ্যার মোহ। চিরকালের জন্য সত্য হইয়াও থাকিতে পারে মিথ্যা।”^{৫৯} শশী বোঝে ‘কলিযুগে’ এই ঘটনা আদন্ত অসত্য, সাজানো।

“তাদের মধ্যে কে দুজনের মৃত্যুরহস্য অনুমান করিতে পারিবে? চিরদিনের জন্য এ ঘটনা মনে গাঁথা হইয়া রহিল,— এক অপূর্ব অপার্থিব দৃশ্যের স্মৃতি। দুঃখ যন্ত্রণার সময় এ কথা মনে পড়িবে। জীবন রক্ষা নীরস হইয়া উঠিলে এ আশা করিবার সাহস থাকিবে যে খুঁজলে এমন কিছুও পাওয়া যায় জগতে, বাঁচিয়া থাকার চেয়ে যা বড়ো। শোক দুঃখ, জীবনের অসহ্য ক্লান্তি এসব তো তুচ্ছ, মরণকে পর্যন্ত মানুষ মনে জোরে জয় করিতে পারে। কত সংকীর্ণ দুর্বল চিন্তে যে যাদব বৃহত্তের জন্য, মৃদু হোক, প্রবল হোক ব্যাকুলতা জাগাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, শশী তাই ভাবে।”^{৬০}

অপার্থিব মোহ শশীকেও মোহগ্রস্ত করে ফেলে, ভুলিয়ে দেয় আফিমের কথা। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, মার্কসের *Critique of Hegel's 'Philosophy of Right'*-এর কথা ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা কীভাবে পীড়িতের আশ্রয় হয়ে ওঠে, কীভাবে তা ‘illusory happiness’^{৬১} নির্মান করে। ‘জীবন রক্ষা নীরস’ হলে যার মধ্যে মানুষ আশার আলো দেখতে পায়, যতই তা সুখ কিংবা আশার বিভ্রম হোক না কেন! মানিকের দেখার মধ্যে ঐ সন্দর্ভের ইঙ্গিত হয়তো লুকিয়ে আছে। অনেককাল পরে, *পুতুলনাচের ইতিকথা* প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে সেই শোষণের ও দার্শনিক সহাবস্থানের স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন মানিক। *পুতুলনাচের ইতিকথা*, বস্তুত সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড না হোক, স্থায়ী দরদি প্রতিবাদ।^{৬২} কথকের বয়ানে, শশীর উপলব্ধিতে যা প্রকাশিত। শশী-ডাক্তার মৃত্যু রুখতে পারে না, কিন্তু সে কি নিয়তির

হাতের পুতুল? আমাদের প্রস্তাব শশীর আত্মজ্ঞান ও উপলব্ধি ছিল বলে সে বুঝতে পারে কোথায় এর উৎস। সে কোনো অদৃশ্য নির্মম শক্তির হাতের পুতুল নয়, পারিপার্শ্বিকতা এবং সমাজের চাপে, আধ্যাত্মিক উন্মাদনার বিরুদ্ধে করণীয় নেই বলে নিশ্চুপ অসহায়। বরং তার ধর্মীয় উন্মাদনা ও আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে তার নৈঃশব্দই যথার্থ প্রতিবাদ। শশী ঈশ্বর বিষয়ে উদাসীন, ঔদাসীন্যের জন্যেই তর্কে প্রবৃত্ত নয়। রামতারণের মতো আন্তিক বিশ্বাস করে জরা নেই, ব্যাধি নেই, “ইচ্ছা হল আর দেহ ছেড়ে আত্মা অনন্তে মিশিয়ে গেল”^{৬৩} এই জ্ঞান ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথায় বা আছে? কিন্তু শশী আজ সব বুঝতে পারে। যে রকম ‘অপূর্ব ও লোভনীয়’ হয়ে উঠে ছিল মরণ, মানুষের পক্ষে সে লোভ সংবরণ করা কার্যত অসম্ভব।^{৬৪} ম্লেচ্ছ, নাস্তিক শশী-ডাক্তার যে অবিশ্বাস করেছিল যাদবের অলৌকিক শক্তিতে তার হাতেই কেন তুলে দিয়ে গেল হাসপাতালের সমস্ত কর্তৃত্ব? তার কারণ কি এটাই যে তথাকথিত পরাজিত, নির্বাসিত, নিঃসঙ্গ হলেও সে ‘পুতুল’ নয় বলে? যে কিনা নিয়তি ও ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী! যার আছে নাস্তিক্যের আশ্বর্য অভিজ্ঞান!

উপন্যাসের শেষাংশে নজর ফেরাবো। যখন শশীকে গাওদিয়া ছেড়ে যাবার সমস্ত উদ্যোগ বাতিল করে দিতে হয়। যখন গোপালের চক্রান্তে গাঁ ছাড়া হয় অমূল্য। শশী জানতেও পারে না এসব। বাবার সঙ্গে তার শেষ কথাটাই হলো— “অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডাবে।”^{৬৫} নবনীতা দেব সেন তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মানুষ শশী হয়ে যায় অদৃষ্টের খেলার পুতুল।^{৬৬} কেন সে পুতুল হয়ে যায়? নবনীতা দেব সেনের বলছেন—

“কিন্তু জীবনের কাছে শশীর প্রত্যাশা বড়ো বেশি। তাই তার আশাভঙ্গের আঘাতও তীব্র। সে-ধাক্কা থেকে আত্মরক্ষা করবার উপায় শশীর জানা নেই। ঈশ্বর বিষয়ে নির্বিকার শশী স্রোতের টানে ভেসে যায়,”^{৬৭}

নবনীতা দেব সেনের বক্তব্যানুসারে নাস্তিক্য-ই শশীর নৈরাশ্যের কারণ। যেহেতু কোন পরমের আশ্রয় শশীর জীবনে নেই তাই তাকে হতে হবে বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত; স্বপ্নভঙ্গের মধ্যেই দম দেওয়া পুতুলের মতো করে বেঁচে থাকতে হবে তাকে। যেন এক হাল ছেড়ে দেওয়া নাবিক। তাই কি? গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে যখন সব কিছু বাতিল করে দিলো শশী কী ঘটল তার পর? না, তেমন কিছু ঘটনাবহুল পরিসমাপ্তি উপন্যাসে দেখা গেল না বটে কিন্তু অন্য বোধে উত্তরণের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। যে বাক্যগুলির তাৎপর্য সমালোচকেরা অস্বীকার করেছেন। “গাঁয়ে থাকিতে হইলে হাসপাতালের প্রত্যেক রোগীর নাড়ি টিপিতে না পারিলে শশীর চলিবে কেন?”^{৬৮} শশী কি পুতুল মতো কেবল কাজ করে চলে, যা না করলে তার চলবে না? এর পরের বাক্যদুটি খেয়াল করলে স্পষ্ট হয়ে যায় শশী পুতুল নয়, বৃহত্তর মহত্বের আকাঙ্ক্ষা শশীর মধ্যে স্পষ্ট, কিন্তু সে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও অস্বীকার করে উঠতে পারে না। মানিক লিখছেন— “কাজ আর দায়িত্ব ছিল জীবনে, কাজ আর দায়িত্বে জীবনটা আবার ভরপুর হয়ে উঠল।”^{৬৯} সত্যি তো পুতুলের দায়িত্ববোধ থাকে না। তারপরেই সেই বিখ্যাত বাক্যগুলি—

“নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।”^{৭০}

‘অজানা শক্তি’, ‘অনিবার্য ইঙ্গিত’ শব্দগুচ্ছগুলি নিয়তিবাদী ব্যাখ্যাকাদের প্রধান আশ্রয়। মনে হয় সেই অজ্ঞাত শক্তির কাছে যেন শশী পরাজিত হচ্ছে। তার যাবতীত লড়াই অনেকটা ট্রাজেডির মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু শেষ বাক্যটি তাঁদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। এই শক্তি রহস্যময় ঠিকই, কিন্তু তা যুক্তিবোধাতীত নয়, পার্থিব, প্রাকৃতিক, জাগতিক সেই শক্তি, মাধ্যাকর্ষণের মতো। ‘মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি’, মানুষ বড়ো অর্থে মানব সমাজই যে গতির নিয়ামক কিংবা নিয়ন্ত্রক। জীবনের এই নিয়মের সঙ্গে তার জানা-

বোঝা স্পষ্ট হয়েছে আজ, তীব্র আশাবাদ হয়তো ধ্বনিত হয়নি। এই নিয়মের সাক্ষাৎকার তাকে উল্লসিত করেনি। কিন্তু মানবিক অন্বেষণ নিয়েই সেই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সেই নিয়মের।^{৭১} পুতুলনাচের ইতিকথায় ব্যক্তি শশীর আকাজক্ষা বারংবার বাধা পেয়েছে সমষ্টির আকাজক্ষা দ্বারা। ব্যষ্টির চৈতন্য, দার্শনিক অবস্থানের সঙ্গে সমষ্টির দ্বন্দ্বের মধ্যে অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে। টিলার উপরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার ইচ্ছে আর কখনো হবে না শশীর। হারুর মৃত্যু ও বজ্রাহত বটগাছটির প্রসঙ্গ আরেকবার ফিরে আসে উপন্যাসে, যেমন ফিরে এসেছিল অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে। যে ঘটনা বিষণ্ণ শশীকে জীবনের লগ্ন করেছিল উপন্যাসের শুরুতে, শিথিয়েছিল মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে বাঁচা কার্যত জীবনী শক্তির বিপুল অপচয়;^{৭২} সেই স্মৃতি আরেকবার ফেরত আসে। বাজিতপুর থেকে মামলা করে ফেরার পথে সেই বোধ আরেকবার উপলব্ধ হল। এই নিয়মটি উপলব্ধিই করার অর্থ স্বাধীনতা^{৭৩}। যে স্বাধীনতা পরম নয়, একান্তভাবে দেশ-কাল-পাত্র স্বাপেক্ষ। শশী-ডাক্তার বিষণ্ণ, অথচ দায়িত্ববোধে পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র একজন মানুষ, স্বাধীনও।

৪.২ দেবযান : মর্ত্যলাভের অফুরান আকাজক্ষা

১৯৪৪ সালে *দেবযান* প্রথম প্রকাশিত হলেও, বস্তুত পক্ষে তা বিভূতিভূষণের (১৮৯৪-১৯৫০) দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসল। ১৯৩২ সালে এই উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন বিভূতিভূষণ, কিছুটা লিখে বন্ধ করে দেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল ‘ভূতুড়ে’ গল্প মনে করে কেউ পড়বে না এই উপন্যাস। পরে আবার লেখা শুরু করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) চলাকালীন ১৯৪০ সালে।^{৭৪} কেন সিদ্ধান্ত বদলালেন বিভূতিভূষণ? নিজেই জানান যে, পরলোক বিষয়ক লেখাপড়া ও উপলব্ধি মত বদলের কারণ।^{৭৫} *দেবযান*-এ যে পরলোকের কথা আছে তা কি

লেখকের কল্পনা? ভাষার মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ড, উর্দ্ধলোকের যে বিবরণ দিয়েছেন বিভূতিভূষণ তা সত্যি বিস্ময়কর। কিন্তু এই বিবরণ লেখকের কল্পনা নয়, তাঁর নিবিড় বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ফলশ্রুতি। পরলোক, ঈশ্বর, আন্তিক্য দর্শন বিষয়ে বিপুল লেখাপড়া ও চিন্তার ফলশ্রুতি এই উপন্যাস। উপন্যাসের প্রারম্ভে বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে তা স্পষ্ট হয়। *দেবযান* তাঁর মতে, ব্যক্তিক অনুভূতি, উপলব্ধি ও অশেষার ফসল।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে (১৯০৩-১৯৭৬) লেখা একটি চিঠিতে সেই অনুভূতি, উপলব্ধির সুরই ধ্বনিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ সেখানে বলছেন যে, প্রেতলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। পৃথিবীর উর্ধ্বে বহু স্তর বিদ্যমান, মৃত্যুর পর সেখানেই জীবের গতি হয়। এসব ‘Super munde worlds’ আছে, প্রাচীন ঋষিরা এসবের কথা জানতেন। তাঁদের সেই জানা গ্রন্থিত আছে *বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ও *ঈশোপনিষদ*-এ। পার্থিব জীবন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেখানে গতি হয় জীবের। তখন পৃথিবীর আনন্দ তুচ্ছ বলে প্রতীত হয়। আবার এই আনন্দাসক্তি-ই পুনর্জন্মের বীজ বপন করে।^{৭৬} পরলোক বিষয়ে তাঁর এই মনোভাব দীর্ঘ চিন্তার ফলশ্রুতি। *স্মৃতির রেখা* দিনলিপিতেও রয়েছে যার স্বাক্ষর। ১৯২৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, ভাগলপুরে বসে লিখছেন যে, গতকাল রাতে অন্তরের মধ্যে জীবনের বিশাল তরঙ্গোদ্যম অনুভব করলাম, ওমন আর কখনো হয়নি।^{৭৭} কী সেই অনুভূতি? অকপটে বলছেন বিভূতিভূষণ—

“...এই জন্ম-মৃত্যু, পায়ের নীচের লক্ষকোটি প্রাণীর মরে যাওয়ার লীলাউৎসব। মৎস্যযুগ অঙ্গার যুগ, সরীসৃপযুগের প্রাণীদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল কত ফুল ফল বন নদী পাহাড় ঝর্ণা কত কূলহীন, দিক্হীন গর্জমান মহাসমুদ্র— অনাদি, অনন্ত, লীলাময়, রহস্যময়, অজ্ঞেয় জীবন মৃত্যুর প্রবাহ। এর মধ্যে তুমি জন্মেছ। আত্মাকে প্রসারিত করে দাও এদের মধ্যে। ...দ্যাখো জীবন কি মহিমাময়, কি বিরাট, কি ঋদ্ধিশীল! কি অক্ষয় অনাদি অনির্ব্বান জীবন, সঙ্গীতের কি মধুর লয়-সঙ্গতি।”^{৭৮}

১৯৩০ সালে লেখা শুরু করলেও *দেবযান* লেখার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে তারও বেশ কিছুকাল আগে প্রবাসে আরণ্যক জীবনকালে। এই বিপুল, অসীম, অনন্তের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক ‘ব্যথা’র অনুভূতিও অনুরণিত হচ্ছে তাঁর চৈতন্যে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা—

“আবার যদি জন্ম হয় তবে যেন ঐরকম *দীনহীনের* পর্ণকুটিরে, *অভাব-অনটনের* মধ্যে, পঙ্কীরস্বচ্ছতায় গ্রাম্যনদী গাছপালা নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়।”^{৭৬} (বাঁকা হরফ আমার)

একদিকে অনন্তে, বিরাটত্বের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়ার টান আরেকদিকে পার্থিব জগতের অমোঘ আকর্ষণ, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব-টানাপোড়েনের আখ্যান কি *দেবযান*? সেকারণেই কি প্রথমে এই উপন্যাসটির নাম দিতে চেয়েছিলেন ‘দেবতার ব্যথা’^{৭৭}? পরলোকের বিবরণ দিতে দিতে, ‘ব্যথা’র কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে ঐহিক আখ্যানের জন্ম দিলেন লেখক? উপন্যাসটি পড়তে পড়তে সেই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের ব্রতী হবো আমরা। এই আখ্যানকে ‘ভূতুড়ে’ বা অবাস্তব ভেবে ফেলার আশঙ্কা করেছিলেন বিভূতিভূষণ। *দেবযান* কি সত্যি একটি কল্পরাজ্যের কল্প-কথা, বাস্তবের কোনো ছোঁয়াই কি নেই সেখানে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পৃথিবীতে, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে *দেবযান* রচনা, স্বর্গের মহিমা বর্ণনা কি বাস্তবের দিকে পেছন ফিরে থাকার নামান্তর? মঙ্গলবোধ যখন ধ্বস্ত হচ্ছে, কল্যাণময় সাবেক ঈশ্বরের অস্তিত্ব যখন প্রশ্নের মুখোমুখি, কার্যত খারিজ হয়ে যাচ্ছে, তখন বিভূতিভূষণের এহেন আখ্যান রচনা কিসের প্রণোদনায়? তা কি সংকটেরই আরেক কিসিমের প্রতিক্রিয়া? সেই বিষয়ে অভিনিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করবো।

দেবযান-এর মুখ্য চরিত্র যতীন ও পুষ্প, আর আছে যতীনের স্ত্রী আশা। তবে মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে যতীন ও পুষ্পকে ঘিরে, তারা ছোটোবেলার খেলার সঙ্গী। পুষ্প বহুদিন হলো পরলোকের বাসিন্দা, যতীন অনেক পরে আসে সেখানে। ঐহিক স্মৃতি ও প্রেম তাদেরকে

পরলোকে একসূত্রে বেঁধে রাখে। যদিও পরে যতীনকে আবারও পৃথিবীতে ফিরতে হয়ে, নতুন জীবন নিয়ে। ইহলৌকিক বিচ্ছেদের করুণ সুর পরলোকেও ধ্বনিত হয় উপন্যাসের শেষে। যতীনের জীবন দুঃখময়, মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রী আশা তাকে ছেড়ে চলে গেছে বাপের বাড়ি। অভিমানী যতীন আশাকে চিঠি লেখে না আর। প্রেমাস্পদের ছেড়ে যাওয়ার ‘ব্যথা’ নতুন উপলব্ধির জন্ম দেয় যতীনের মনে, দুঃখী মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধ করে সে। ‘ব্যথা’র আত্মীয়ত্ব-ই তাকে বারেবারে ফেরত আনে পৃথিবীতে। *দেবযান*-এর শুরুতে এভাবেই মূল সুরটি বেঁধেছেন বিভূতিভূষণ। গ্রামের ঘরে বসে যতীন ভাবছে এই জগতে দেশে-দেশে, গ্রামে, নগরে কত মানুষকে তারই মতো ব্যথা পাচ্ছে। তারা সকলেই নিরুপায় দুঃখী মানুষ। তাদেরই একজন সে। বিভূতিভূষণ লিখছেন—

“এই সব দুঃখীদের সেও একজন। আজ পৃথিবীর সকল দুঃখীর সঙ্গে সে দেন একটা অদৃশ্য যোগ অনুভব করলে নিজের ব্যথার মধ্যে দিয়ে।”^{৮১}

ব্যথিত হৃদয়ের ঐক্য সারা উপন্যাসে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে যতীনকে, সহৃদয় অনুভব স্বর্গীয় সুখাপেক্ষা মর্ত্যের দারিদ্রকে শ্রেয় বলে স্বীকার করবে। এরপরেই যতীনের মৃত্যু ঘটে। অন্যতম মুখ্য চরিত্র যতীনের জাগতিক কর্মকাণ্ড ইতি এখানে। এরপর সবই ঘটে উর্ধ্বলোকে, অন্তরীক্ষে। সেখানে বিবিধ সাধন মার্গের সঙ্গে পরিচয় হয় যতীন ও পুষ্পের। এই উপন্যাসে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নানা কথা রয়েছে। জ্ঞান ও ভক্তি মার্গের তর্কের কথা উল্লেখিত হয়েছে। রয়েছেন বিভিন্ন দেব-দেবী। প্রণয় দেবী, করুণা দেবী যাদের স্নেহ বর্ষিত হয়েছে পুষ্পের উপর। আছেন কবি ক্ষেমদাস, বৈষ্ণব উপাসক। দুজনেই ভক্তি মার্গের মানুষ কিন্তু ক্ষেমদাস কবি, তিনি মনে করেন ঈশ্বর আদতে কবি-ই। আছেন জ্ঞানমার্গী, অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। যিনি মনে করেন সংসার আদতে মায়া। আছেন গ্রহদেব, যেখানে স্নেহ, ভক্তি, প্রেম সেখানেই তাঁর অধিষ্ঠান। ঈশ্বর

প্রসঙ্গ, ঊর্ধ্বলোকের বিভিন্ন স্তর এই উপন্যাসের মুখ্য বিষয় নয় বরং এই সকল অনুসঙ্গের সম্মিলনে পৃথিবীকেই আরেক ভাবে দেখার ইঙ্গিত দিয়ে যায় *দেবযান*। আন্তিকের ঐহিকতাই উপস্থিত করা বোধহয় বিভূতিভূষণের উদ্দেশ্য। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

“*দেবযান*-এ স্বর্গ-সৃষ্টিতে বিভোর হয়ে যে জগৎ বিভূতিভূষণ সৃষ্টি করে গেছেন, আসলে তা প্রেমের জগৎ।

এই প্রেম হৃদয়ে সঞ্জাত না হলে ঈশ্বরের স্বরূপকেও ধারণার মধ্যে আনতে পারা যায় না।”^{৮২}

আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। বিভূতিভূষণ *দেবযান*-এ আসলে ব্যথা ও প্রেমের জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং সে ব্যথা ও প্রেমের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি অপেক্ষা ধুলো-ধুসর, সুখ-দুঃখের বন্ধনে আবদ্ধ বস্তুজগতের ভালোবাসাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। *স্মৃতির রেখা* যখন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পাশাপাশি আরেকটি প্রসঙ্গে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ২৮ আগস্ট, ১৯২৫-এ বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লিখছেন—

“তরল আনন্দ আধ্যাত্ম জীবনের পরিপন্থী নয়। Sadness জীবনের একটা বড় অমূল্য উপকরণ— Sadness ভিন্ন জীবনে profundity আসে না... সেই হিসাবে এই emotional sadness জীবনের একটা খুব বড় সম্পদ।”^{৮৩}

প্রেম নয় দুঃখবোধ ভিন্ন জীবন খানিক কেন অনেকটাই অজানাই থেকে যায়। প্রেম যেমন লগ্ন হতে শেখায় তেমনই দুঃখও তাই শেখায়। উপন্যাসের শুরুতেই যতীন সকলের দুঃখীর সঙ্গে লগ্ন হতে পেরেছে আপন ব্যথার কারণের।

এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো। যতীন ও পুষ্প আশাদের পুকুর পাড়ের তেঁতুল গাছের তলায় বসে। যতীন উপলব্ধি করে—

“কি সুন্দর পৃথিবীর বসন্ত! সেই বহুপরিচিত প্রিয় পৃথিবী, কত দুঃখ-সুখ, আশা-আনন্দের স্মৃতিতে ভরা। সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়ে ভাল আছে কি মন্দ আছে জানে না, কিন্তু পৃথিবীতে এলেই মন সরে না এখান

থেকে যেতে। এই বৈশাখে কচি আমের ঝোল, বেলের পানা, ঐ অদূরবর্তী চূর্ণী নদীতে এই গরমের দিনে অবগাহন স্নান, হাট থেকে পাকা তরমুজ কিনে আনা ... নাঃ, পৃথিবীই ভালো। কোথায় এ সব সুখ?”^{৮৪}

অন্য আরেক জায়গায় যতীন বলে তোমাদের ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে তোমরা থাকো, আমি ওর মধ্যে নেই। তাকে পৃথিবীতে ফিরতেই হবে মাকে দেখার জন্যে।^{৮৫} পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ কী কেবল যতীনের? পুষ্পকেও একই ভাবে টানে পৃথিবী। পার্থিব স্মৃতি, ফেলে আসা দিনগুলির প্রতি মমত্ব, সর্বপরি বস্তুজগতের প্রতি প্রেম বারেবারে ঝুঁকি দেয় পুষ্পের মনে। দ্বীপাশ্বিতা অমাবস্যার দিন বুড়োশিবতলার ঘাটে ফেরত যায় পুষ্প আর যতীন। মনে পড়ে শৈশবের দিনগুলির কথা।

“পুষ্প বল্লে— এসো যতীনদা, আমরা আমাদের ছেলেবেলার কথা ভাবি বসে বসে। মনে পড়ে কেওটা-সাগরের দিন? আমি পিদিম দিচ্ছি, তুমি এক পয়সার কুচো গজা কিনে আনলে—”^{৮৬}

উপন্যাসের একেবারে শেষে যখন যতীন দ্বিতীয়বারের জন্যে ফিরে গেছে পৃথিবীতে, তখন ঐ বুড়োশিবতলার ঘাটে একা পুষ্প বসে থাকে। কয়েক বছর হলো সে সঙ্গী ছাড়া। করুণা দেবী তাকে উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সে প্রত্যাখ্যান করে। কী জন্যে এই প্রত্যাখ্যান? প্রেমের কারণে। উচ্চস্তরে গেলে আর পৃথিবীতে ফেরার রাস্তা থাকবে না। শৈশবের স্মৃতি আর যতীনের প্রতি ভালোবাসায় সে সব ত্যাগ করে। পাকেচক্রে সে স্বর্গের মানুষ, কিন্তু মনের বাস তো ধুলো-ধুসর পৃথিবীতেই। তাই

“এই গঙ্গার ঘাট আঁকড়ে পড়ে আছে। এই তার পরম তীর্থ— তার মহর্লোক, জন-লোক, তপোলোক, সত্যলোক, ব্রহ্মলোক— লোকাতিত পরমকারণ পরব্রহ্মলোক। কোথাও পোষাবে না তার।...

কেউ নেই আজ এখানে।

যতীনদা চলে গিয়েচে আজ দশটি বছর।...

উর্ধ্বে যতদূর দৃশ্যটি যায়— আজ এতকাল পরে তার কাছে শূন্য অর্থহীন!”^{৮৭}

কিন্তু পুষ্প কেন ফেরা হয় না পৃথিবীতে? ‘থাকা’র অর্থ যদিও কোথাও থাকে তাহলে সে তো পৃথিবীতেই আছে। থাকা অর্থে অস্তিত্ব, কারণ পুষ্প অনেককাল হলো মৃত। আক্ষরিক অর্থে ‘থাকা’ সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকে বেঁচে থাকার অনুসঙ্গ। এখানে আমরা আত্ম অস্তিত্বের (জাগতিক নয়) স্বীকৃতি অর্থে ‘থাকা’ শব্দটি ব্যবহার করেছি। বস্তুত, তার সেই আত্ম গচ্ছিত আছে যতীনের কাছে। ফিরতে পারে না কারণ সে উত্তম প্রকৃতির আত্মা বলে! নাকি ‘ব্যথাবোধ’-এর অনুপস্থিতির কারণে? জগতের প্রতি পুষ্পের প্রেম অস্পষ্ট নয়, কিন্তু একটা অভাব পুষ্পের মধ্যে আছে, তা হলো ‘ব্যথা’। জগতের সকল দুঃখীর সঙ্গে যে কারণে অদৃশ্য যোগ অনুভব করে যতীন, যা তার আত্মজ্ঞান। সেটি যতীনকে দেয় আত্মোপলব্ধি, শেখায় সত্তার প্রকৃত মানে। সেই বিশেষ বোধ অনুপস্থিত পুষ্পের মধ্যে। পুষ্প নির্বাসিত পৃথিবী প্রেমিক, যার প্রেয়সী পৃথিবীতে। তাকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয় দুঃখের বা emotional sadness-এর অনুপস্থিতির কারণে। যতীন জানে

“পৃথিবীতে আবার জন্ম নিতে হবে। শত সুখ-দুঃখের বন্ধনে আবার জড়ানো, মন্দ কি? সেই গরীব ঘরের বৌটির কোল আলো করে আবার শিশু হয়ে কত বাল্যলীলা করবে”^{৮৮}।

সে ফিরবে কারণ মায়ের কান্না তার মনেও দুঃখের সঞ্চার করেছে। কারণ সে তো ‘দুঃখীদের’ একজন। যতীন বলে—

“পুষ্প, আমায়— তোমাদের ভাষায়— ‘বাঁচিয়ে’ খুব ভাল করেচ, কিন্তু ওই মেয়েটির কান্না— আমার মায়ের ওই কান্না—

যতীনের চোখে জল এসে পড়লো।”^{৮৯}

দুঃখবোধই সেই আশ্রয় আয়ুধ যা শেখায়, স্বর্গাপেক্ষা মর্ত্যলোকই আনন্দের।

যে প্রশ্ন দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়, সেগুলির কাছে ফেরত যাবো এবার। তবে নিশ্চিত উত্তর আকাঙ্ক্ষায় নয়, বরং প্রশ্নগুলি যে সম্ভাবনা ও সংকট তৈরি করেছে সেটি আমাদের

অভিনিবেশের বিষয় হবে। পরলোকের কথা ও অনন্তের আখ্যান শোনানোর জন্যে এই উপন্যাস লেখেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু শেষাঙ্গি কি সেটি পরিকল্পনা মাফিক এগিয়েছে? না, বরং ‘মানুষের হট্টগোল, কলকোলাহল’^{৯০}, ‘তাদের সুখ-দুঃখ’^{৯০ক}, ‘সত্যিকার জীবনচিত্র’^{৯০খ} ইহজাগতিক আখ্যানই সৃষ্টি করেছে। ইহলোকের বোঝা-পড়ার ভিত্তিতেই নির্মিত হয়েছে পরলোকের জগৎ।^{৯১} দেবতার নয়, ব্যক্তি মানুষের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হয়েছে *দেবযান*-এ। দেবলোক যতীন চায় না। এই প্রত্যাখ্যান কি নাস্তিক্যের চিহ্ন? না। একান্তভাবে আস্তিক্যের চাওয়া, কিন্তু সেই আস্তিক ‘মোক্ষ’ চায় না, চায় বারংবার মানবিক বন্ধন। প্রকৃতিকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রচেষ্টা বিভূতিভূষণের পরিচিত লক্ষণ। *দেবযান*-এও সেই লক্ষণ চোখে পড়ে। মানবিক অনুভূতি, প্রকৃতি ও বস্তুজগতের সহাবস্থানে রচিত হয় এই আখ্যান। ঈশ্বর, স্বর্গলোক যে সেই মানবিক আকাঙ্ক্ষা ও মানবিক সত্তার সম্প্রসারণ তা অস্পষ্ট থাকে না পাঠকের কাছে। দেবলোকের বাসিন্দা পুষ্প, যতীনের ভাবনা চিন্তার পেছনে ঐহিক চাওয়া-পাওয়া ও তার অভাববোধের উপস্থিতি বিদ্যমান তা অনুমান করা এমনি কী কঠিন? বস্তুত পক্ষে ঐহিক জীবনবোধ, ঐহিক জীবনের বিশেষ অভাববোধই পারলৌকিক জগতের নির্মাতা তা ঘোষিত হয় *দেবযান*-এ। ‘বাস্তব’-এর উপস্থিতি, স্মৃতি ছাড়া কি পরলোকের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে? বিদ্যাকর সংকলিত *সুভাষিতরত্নকোষ* (আনু. ১১০০খ্রিঃ) যৌথ ভাবে সম্পাদনা করেন ডি.ডি. কোসম্বি (১৯০৭-১৯৬৬) ও ভি.ভি. গোখলে। সেই বইয়ের ভূমিকায় কোসম্বি জানাচ্ছেন যে, ওই সংকলনে দুঃখ-দারিদ্র, অন্নচিন্তা নিয়ে বেশ কিছু কবিতা আছে, যদিও ঐ কবিদের সঙ্গে প্রকৃত দারিদ্রের সম্পর্ক হয়তো কমই কারণ কবিতায় দারিদ্রের চিত্রণ, বস্তুত পক্ষে বুদ্ধিজীবীশ্রেণির দারিদ্র।^{৯২} কিন্তু প্রাকৃত কবিতায় যা উঠে এসেছে তাকে বাস্তব না বলা অপরাধ। ঐ অনামা কবিরাজ বিভূতিভূষণের ‘দুঃখীদলের’ অংশ। জাগতিক দুঃখবোধই হয়তো

বাধা দাঁড়িয়েছে স্বর্গীয় আখ্যান রচনায়। প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ, আধ্যাত্মিক, পরলোক বিশ্বাসী বিভূতিভূষণ কি বাস্তবতাবাদী? ত্রিশের অন্যান্য আখ্যানের মতো কিংবা তাঁর অন্য উপন্যাসগুলির মতো বাস্তবতার প্রতিফলন *দেবযান*-এ নেই। কিন্তু যা আছে তাকে কি পরলোকের বাস্তবতা বলা যায়? আপাতভাবে এই উপন্যাসে তথাকথিত বাস্তবতার ছোঁয়া নেই। বাস্তবতাবাদী উপন্যাস বলতে যা বোঝায়, সেই ঘরাণার প্রতিনিধি নয় *দেবযান*। আমাদের প্রস্তাব আপাত স্বর্গীয় প্রতিবেশ ‘বাস্তব’কে উপস্থাপিত করার কোনো ছল বা ছদ্মবেশ। পরলোকের আচ্ছাদনটুকু সরিয়ে নিলে যা থাকে তাকে বাস্তব না বলা অপরাধ। ‘দুঃখ’, ‘ব্যথা’-ই বস্তুজগতের ইঙ্গিত। জাগতিক দুঃখবোধ-ই বাস্তবতার ভিত্তি। সেটিই যতীনকে ফিরিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে। আর জাগতিক প্রেম, স্মৃতি পুষ্পকে করে তুলেছে মর্ত্য পিপাসু, তার মধ্যে জন্মেছে ব্রহ্মলোকের প্রতি অনাকাঙ্ক্ষা। আস্তিক, পরলোক বিশ্বাসী, ঈশ্বর বিশ্বাসী বিভূতিভূষণের পৃথিবীর প্রতি অফুরান আকর্ষণের পেছনে সদা ক্রিয়াশীল থাকে ‘ব্যথা’ নামক বোধ। সেটি তাঁকে দুঃখী মানুষের লগ্ন করে। সুখে নয়, দুঃখেই পান স্বর্গীয় সুখ। বিশ্বযুদ্ধ, স্বপ্নভঙ্গ, মানুষতার অবক্ষয়ের মধ্যে তিনি হয়তো ফিরে পেতে চেয়েছিলেন সতত মঙ্গলময় ঈশ্বরকে, যিনি ব্যথার মধ্য দিয়ে মিলিয়ে দেবেন। *দেবযান* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মানুষতার সংকটের আরেক কিসিমের প্রতিক্রিয়া। উপন্যাসে সেই সংকট, অ-সুখের অনুপস্থিতি জানান দেয় যুদ্ধের উপস্থিতিতেই।^{৯০} ধ্বংসের কালে দুঃখীর সঙ্গে দুঃখীর অদৃশ্য যোগ আদতে মানুষতার কাহিনি।

৪.৩ *যোগভ্রষ্ট*: সত্তার অনন্ত জিজ্ঞাসা

যোগভ্রষ্ট ১৩৬৭ সালে প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়। বই আকারে প্রকাশের আগে ১৩৬৬ সালে ‘যবনিকা’ নামে প্রকাশিত হয় *উল্টোরথ* পত্রিকার পুজো সংখ্যায়। আমাদের গবেষণা

প্রকল্পে যে সময় কাল উল্লেখ করা হয়েছে, এই উপন্যাস তার পরে প্রকাশিত। তাহলেও এই উপন্যাসটিকে কেন আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পেল? *যোগদ্রষ্ট*-এর আখ্যান কাল বিশ শতকের তিনের দশকের শুরুর দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও দেশভাগের সময় পর্যন্ত। ঐ সময়ের ঘটনা ও সংকট এই উপন্যাসে বিধৃত আছে এবং উক্ত সময় কালকে ঘিরেই গবেষণা প্রকল্প। সে কারণেই তারাক্ষরের এই উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে। আরেকটি কারণ আন্তিক-নাস্তিক বিসংবাদ, তা বলাই বাহুল্য। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *আমার সাহিত্য-জীবন*-এ এই উপন্যাসের কিছু অপ্রধান চরিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আরেকটি বই *বিচিত্র*, সেখানেও বেশ কিছু গৌণ চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমরা উপন্যাসের ভূমিকাটির দিকে নজর দেবো। নিজের আখ্যান ও তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কী বলছেন লেখক? গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখক নাম বদল করেছেন। যদিও তা নিয়ে তিনি যে সংশয়ে তাও কবুল করেছেন ভূমিকায়— হয়তো গোড়ারটিই ঠিক ছিল, এখন ভূমিকা লেখার সময় তাই মনে হচ্ছে।^{৯৪} এই মতটির সঙ্গে আলোচনার শেষে খানিক তর্ক করবো, দেখার চেষ্টা করবো কেন ‘যোগদ্রষ্ট’ নামটি-ই ‘যবনিকা’-র থেকে অধিক যুক্তিযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক। কেন দুটি শিরোনামই প্রাসঙ্গিক দুই অর্থে। তারাক্ষর এটিকে ঠিক উপন্যাস বলতে রাজি নন, কারণ সে যুগে উপন্যাস বলতে যা বোঝানো বা বোঝা হতো, সেই সমাজের কথা, দৈনন্দিন যন্ত্রণার কথা এখানে নেই। যা আছে—

“আমার জীবনের অণুপরমাণুতে, বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে, অতীত সংস্কার-বিশ্বাসে, নূতন শিক্ষার বুদ্ধিতে যে আমি মর্মাস্তিক প্রচণ্ড সংঘর্ষ অনুভব করছি— যার ফলে আজ সব ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে গেল, সেই ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে আজ যে মনে হচ্ছে জীবনের পৃথিবীর দিক নেই, দিগন্ত নেই, সূর্য ক্ষণজীবী, চন্দ্র একটা বুদ্বুদ, সব মরুভূমি, সব মরুভূমি, শুধু বালু; কোন বিশ্বাস নেই, আশ্বাস নেই। এখানে সত্যতা কী? এখানে আজ উলঙ্গ প্রশ্ন— আমি কে? আমি কেন? আমি কী?”^{৯৫}

এক অর্থে চিন্তা ও বিশ্বাসের ইতিহাস। এবং এ কথা স্বীকার্য যে বিশ্বাস ও বিশ্বাস ভঙ্গের ইতিহাসও এবং সমাজের ইতিহাস। কী তাঁর বিশ্বাস? তারাক্ষর লিখছেন—

“একদা বিশ্বাস করেছিলাম সৃষ্টির মূলে এক স্রষ্টাকে। ঈশ্বরকে। সঙ্গে সঙ্গে গড়েছিল মনোরাজ্য সপ্তস্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, নন্দনকানন, পারিজাত, মন্দাকিনী। গড়েছিল আদর্শ কর্তব্য। তাই ছিল স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ নির্দেশ।”^{৯৬}

সমাজচিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ হয়তো নেই *যোগদ্রষ্ট*, কিন্তু সুদর্শনের কাহিনি; আরেক অর্থে এষণা তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক চৈতন্যের অংশ। তারাক্ষরের বক্তব্যই সে কথা জানান দিচ্ছে,—

“আজ জগতে এসেছে নাস্তিবাদ। ঈশ্বরবাদ আজ জীর্ণ বৃদ্ধ পিতার শবদেহের মত পড়ে রয়েছে। কোথাও আমরা সর্বময় উত্তরাধিকারী কর্তা বলে চিৎকার করছি। কোথাও মর্মান্তিক যন্ত্রণায় চিৎকার করছি। শুধু তাই নয়— আজ ওই ঈশ্বরের উপাধানের তলদেশে একটা চিরকুট পেয়েছি। যাতে লেখা আছে— ঈশ্বর চিরকালই এই শবের মত মিশরের মমির মতো সাজানো ছিল। জীবন্ত মনে হয়েছিল কিন্তু জীবন্ত কোনকালে ছিল না। তবে? তবে আমরা কে? আমরা কী? আমরা কেন? জন্তুর পুত্র? সার্কাসের শিক্ষিত জন্তু? আমরা কি শুধু মরবার জন্যে এবং যতদিন বাঁচি ততদিন শুধু ভোগের জন্যে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণু— তাকে ভেঙেও মহানাস্তিতে পৌঁছুতে পারি না! পৌঁছুই এক মহাশক্তির প্রলঙ্কর প্রকাশে। সে কি অস্তি? না, সে নাস্তি? সেই তো যবনিকা।”^{৯৭}

মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর জিজ্ঞাসা। দুই বিশ্বযুদ্ধ মানব সভ্যতাকে কার্যত নিক্ষেপ করে ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে, যেখানে দাঁড়িয়েই সুদর্শন এবং লেখকের মনে এই প্রশ্নগুলো ঘনিয়ে উঠেছে। বস্তুত লেখক এবং কথক দুজনেই খুঁজে চলেছেন ‘পরম’ মঙ্গলময় এক আশ্রয়। অস্তিবাদে হোক, নাস্তিবাদে হোক, সে খুঁজেছে সেই পরম উত্তর অর্থাৎ একটি পরম বিশ্বাস।^{৯৮} এই আখ্যান ‘পরম’ প্রতি অনাস্থারই কাহিনি। নামকরণ নিয়ে যে সংশয় লেখক প্রকাশ করেছিলেন সেই সূত্রধরে একটি তর্ক ঘনিয়ে উঠতে পারে পাঠকের মনে, যে এই আখ্যান

‘ঈশ্বর’ বিশ্বাসের যবনিকা ঘোষণা করছে নাকি ‘ভ্রষ্ট’ ব্যক্তির কাহিনি। এক অর্থে এই আখ্যান ‘ঈশ্বর’ বিশ্বাসের ‘যবনিকা’, আরেক অর্থে এই কাহিনি ভ্রষ্টব্যক্তির কাহিনি, যার ইঙ্গিত রয়েছে শেষে। সুদর্শন ‘যোগভ্রষ্ট’ কিন্তু তার নীল ‘পরম’-এর প্রতি বিশ্বাস না হারিয়ে স্থিতধী, নিশ্চিত।

মূল আখ্যানে প্রবেশ করার পূর্বে লেখকের ব্যক্তি জীবনের যে অভিজ্ঞতা উপন্যাসে ঠাঁই পেয়েছে সে দিকে নজর দেবো। ‘ঈশ্বর’, ‘পাপ-পুণ্য’ নিয়ে তারাশঙ্করের ঔৎসুক্য যে ছিল না তা নয়। এই বিষয়গুলি তাঁকে সারা জীবন ভাবিয়েছে। মূলত আস্তিক তারাশঙ্করের বিশ্বাস বিশ শতকের তিনের দশকে খানিক নাড়া খেয়েছিল। *আমার সাহিত্য-জীবন*-এ লিখছেন—

“১৯৩০ সালের আন্দোলনের দু-এক বৎসর আগের কথা। কথাটি তখন আমার মনে রেখাপাত করেছিল। এবং আন্দোলন জেল ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় ও জেলের মধ্যে ইউরোপীয় বিপ্লববাদের ইতিহাস ও দর্শন কিছু পড়াশুনা ও আলোচনার ফলে মনের গতি এমনই পশ্চিমাভিমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ওই ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম এই উপদেশের জন্য।”^{৯৯}

দীক্ষা ও আধ্যাত্মিক পথ নিয়ে কী উপদেশ দিয়েছিলেন গুরুমশাই? “এ পথে তোমার তৃপ্তি হবে না বাবা। তোমার মন ছুটছে আলাদা সড়ক ধরে। তার দুধারে বাড়ি, কাতারে কাতারে লোক। এ পথ জনমানবহীন।”^{১০০} *আনন্দমঠ*-এর শেষে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন লিখেছিলেন যে জ্ঞান দূরকমের। একদল মানুষ বাইরের জ্ঞান নিয়েই তৃপ্ত থাকে আর আরেকদল মানুষ ‘অন্তর্বিষয়ক’ জ্ঞানকে মুখ্য বলে মনে করেন, এখানে গুরুদেবের কথার মর্মবস্তু অনেকটা তাই। তিনি জনমানবহীন পথের পথিক। সেই সময়ে তারাশঙ্করের মন ‘বহির্বিষয়ক’ পথেই ঘোরা ফেরা করছিল। তিনি এ সাবধান বাণীও লেখককে দিয়েছিলেন ঐ পথে চললে শেষাব্দী নাস্তিক হওয়া ছাড়া গতি নেই। গুরুদেব বলেছেন যে, তাঁরা তান্ত্রিক মানুষ, বামুন পণ্ডিত লোক, ইংরিজি মত তেমন বোঝেন না। কিন্তু জানেন ওতে ইহলোকের খুব ভালো মন্ত্র আছে।

একশোটা ধনদা-কবচ ধারণ করলে যা হবে না , ঐ মত তাই করতে পারে। তবে ও মন্ত্বে খুব বেশি দূর এগিয়ে যাওয়া বড় কঠিন। যারা চেষ্টা করে, তারা প্রায় দেখি নাস্তিক হয়ে যায়। গুরুদেবের মতে তারাশঙ্কর এখন সেই পথের পথিক।^{১০১} নাস্তিকতা বিভিন্ন বাঙালি ও ভারতীয়দের বয়ানে ইউরোপের সমর্থক হয়ে ওঠে, সে আনন্দমঠ হোক কিংবা তারাশঙ্করের আমার সাহিত্য-জীবন। ভারতীয় দর্শনের এই বিশেষ অবদানটির কথা সততই বিস্মৃতি থেকে যায়, বরং বারবার অনুচ্চারে উচ্চারিত হয় যে, আস্তিকতাই আমাদের একমাত্র ঐতিহ্য। সেই আমাদের একমাত্র মুক্তির উপায়।

কন্যা বুলার মৃত্যুর পর দিকভ্রান্ত পিতা আশ্রয় খুঁজতে লাগলেন। শেষাধি সাহিত্যের মধ্যে সাঙ্ঘনা খুঁজে পেলেন। কিন্তু মনের দ্বন্দ্বের অবসান হলো না। বিচিহ্ন তিনি লিখছেন—

“জীবনে হ’ল প্রথম সন্তান-বিয়োগ। এই আঘাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অশান্তিতে বেদনায় জীবনটা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অশান্ত চিত্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম দেশময়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মেলা থেকে মেলায়; সাঙ্ঘনা খুঁজতে চেষ্টা করলাম সাহিত্যের মধ্যে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব বাধল— বস্তুবাদ— বিশ্বাসে এবং প্রেততত্ত্ব-বাদে।”^{১০২}

আমার সাহিত্য-জীবন-এ এই প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছেন তারাশঙ্কর। কন্যার মৃত্যুর পর লাভপুরে থাকলে প্রায়ই শ্মশানে বসে থাকতেন। কী দীক্ষা নেবেন অর্থাৎ কোন মন্ত্বে সেই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁদের কুলগুরু বলেছিলেন শক্তিতন্ত্রে দীক্ষা নিতে গেলে ‘তারা’-মন্ত্বে নিতে হবে। শক্তিতন্ত্রে ‘তারা’-ই হলেন সরস্বতী। যার অপর নাম নীল সরস্বতী। আর কালী হলেন মহালক্ষ্মী। সাহিত্যিক তিনি হতে চাননি, চেয়েছিলেন জন্ম ও মৃত্যুর রহস্যকে জানতে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যার সন্ধান দিতে পারে না, সেই মৃত্যুর পরে কথা জানতে

চেয়েছিলেন। অর্থাৎ ‘তবে আমরা কে? আমরা কী? আমরা কেন?’ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেয়েছিলেন। তারাশঙ্কর লিখছেন—

“আমি সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাই নি; আমি জানতে চেয়েছিলাম জন্ম-মৃত্যুর রহস্যকে— বায়োলজি ও মেডিকেল সায়েন্সের পরও যা আছে তাই অনুভব করতে চেয়েছিলাম। অন্তত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও চিত্তের আনন্দ অনুভবের শক্তি অর্জন করতে চেয়েছিলাম। সংযম নয়, ভয় সংবরণ নয়, আনন্দ অনুভব-শক্তি, যা আজ নেই। তাকে অর্জন করা যায় বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ দীক্ষা দিতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনে তাঁর সাকার না হলেও নিরাকার একটি দেবতা ছিলেন। তিনি তাঁকে ধ্যান করেছেন নিত্য-নিয়মিত। কিন্তু তাঁ কাছে যাওয়ার আমার সাহস ছিল না, পূর্বেই বলেছি। তাই মোহিতলালকে লিখলাম।”^{১০৩}

দিকভ্রান্ত তারাশঙ্কর পরমের আশ্রয় খুঁজছিলেন, যে আশ্রয় তাঁকে নিশ্চয়তা দেবে, দুঃখ-যন্ত্রণা-কষ্ট উপশম হবে। যাতে পাবেন সেই আশ্বর্য ঔষুধ। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী বিশ্বে পরম ‘মঙ্গলবারতা’ কার্যত অলীক! মোহিতলালের (১৮৮৮-১৯৫২) উত্তর তাঁর মনপ্রকৃত হয়নি। মোহিতলাল লিখলেন যে, দীক্ষা নিয়ে আপনি কী করিবেন? দীক্ষায় তাঁর ‘বিশ্বাস নাই’। তিনি সাহিত্যের লোক, আর সেই দীক্ষা তো তারাশঙ্করের আছে। মোহিতলালের এই উত্তর তারাশঙ্করকে বিষণ্ণ করে। শান্ততন্ত্রের প্রতি মোহিতলালের আকর্ষণ ছিল। কিন্তু সেই মন্ত্রে দীক্ষা নিতে তাঁর কোথায় যেন একটা বাধা ছিল। তারাশঙ্করের অনুমান— “সম্ভবত নূতন কালের ইউরোপীয় সাহিত্যের মাধ্যমে নাস্তিক্য-মতবাদের প্রভাবই ছিল সেই বাধা।”^{১০৪} এরপরে গুরুর সন্ধানে ক্ষান্ত হননি তারাশঙ্কর, বস্তুবাদী যে ভাবে জীবনকে দেখে, ব্যাখ্যা করে তার সঙ্গে তিনি সহমত নন। ফলে গুরুর সন্ধান করতে থাকেন। পরে এক সন্ন্যাসীর দেখা পান। সেই সন্ন্যাসীর কথাই আছে *যোগদ্রষ্ট* উপন্যাসে। তাঁর আত্মকথা ও উপন্যাস পাশাপাশি রাখলে তা স্পষ্ট হবে। উপন্যাসে কিছু প্রতাপশালী মানুষের সঙ্গে সন্ন্যাসীর বিরোধের কথা উল্লেখ করা আছে। যারা সুদর্শনকেও বলে ছিল সন্ন্যাসীর বিরোধিতা করতে। সেই সকল মানুষের কথা

তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিকথায় উল্লেখিত রয়েছে।^{১০৫} ডেটিন্যু ধীরেনবাবু উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সুদর্শন বার কয়েক তাঁর সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছে। ধীরেনবাবু নাস্তিকতার পাঠ দিতে চেয়েছিলেন সুদর্শনকে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে যিনি বিশ্বাস রাখেন না। এমনই একটি চরিত্রের কথা পাওয়া যায় *আমার সাহিত্য-জীবন*-এ। নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডেটিন্যু হয়ে লাভপুরে কিছুদিন ছিলেন, তারাশঙ্করের বাগানের একটি অংশে বাড়িও বানান। তাঁর সম্পর্কে তারাশঙ্কর বলছেন যে তিনি অতি চতুর ব্যক্তি। তাঁর ধারণা ছিল তিনিই আমাকে মানুষ করছেন এবং আমি তাঁরই একান্ত অনুগত। এই বিরোধে^{১০৬} সবচেয়ে বেশী অনিয়ম এবং অনাচার করেছিলেন তিনি। যে সভা হয়নি সে সভা কাগজে কলমে খাড়া করে আমাকেই তার সভাপতি দেখিয়েছিলেন।^{১০৭} এবার নজর ফেরাবো *যোগদ্রষ্ট*-এর দিকে, সেই সূত্রে আলোচিত হবে আন্তিক-নাস্তিক বিসংবাদের কাহিনি।

উপন্যাসের আরেকজন মুখ্য চরিত্র শিবনাথ, যার সঙ্গে সুদর্শনের— যার চৈতন্যের সংকট ও আত্ম জিজ্ঞাসা উপন্যাসের মুখ্য বিষয়— সম্পর্ক মধুর ছিল না। সেই শিবনাথের যবানিতেই শুরু হচ্ছে উপন্যাসটি। একটি ফাঁসির আদেশনামা ঘোষিত হচ্ছে।

“ফাঁসি। মৃত্যুদণ্ডদেশ।

মৃত্যু পৃথিবীর প্রবলতম, প্রচণ্ডতম শক্তি। ভয়ঙ্করতম। সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্নতা। মৃত্যুও কী, কেমন— আজও কেউ জানে না, জানতে পারে নি।”^{১০৮}

জীবনে বিবিধ পথ পেরিয়ে এসে আজ সুদর্শন মৃত্যুর মুখোমুখি। যে জিজ্ঞাসা ও এষণার তাগিদে তার পথ চলা, তা কি খুঁজে পেলো সে? সত্তার আদি ও অনন্তের খোঁজে ব্যপ্ত সুদর্শন কী পেলো শেষাব্দি? এই জিজ্ঞাসার ছলে চিরন্তন দার্শনিক তর্কটিকে আখ্যানে চারিয়ে দিয়েছেন কথক। যে জিজ্ঞাসা আরেক অর্থে লেখকেরও বটে, যার নমুনা আছে তাঁর আত্মকথা *আমার*

সাহিত্য-জীবন-এ। সুদর্শনের জন্ম ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর রাত্রে। সে রাতও ছিল বর্ষণমুখর। গ্রহাচার্য ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন, এ ছেলে মহাপ্রতাপশীল রাজতুল্য ব্যক্তি হবে। দুষ্টির দমন আর শিষ্টির পালন করবে। হবে মহাজ্ঞানী। ফলে বাল্যকাল থেকেই পাপীকে দমন করার ভার গ্রহণ করে। সাপকে পাপের প্রতীক হিসেবে দেখতো সুদর্শন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ বিনা কারণে কালীয় নাগকে দমন করেনি। কৈশোর পর্যন্ত সুদর্শনের ‘ঈশ্বর’ বিশ্বাস চালিত হয়েছিল মঙ্গলবোধের মাধ্যমে। ঈশ্বর সততই মঙ্গলময়, তাঁর রাজত্বে পাপের স্থান নেই। কিন্তু গুরুর দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন সে বোধ করেনি। অন্যায়কে সে ‘পাপ’ হিসেবেই চিহ্নিত করেছে, ‘অপরাধ’ হিসেবে নয়। স্কুলে পড়াকালীন সে বিপ্রপদকে মারে, কারণ বিপ্রপদ একটি বাচ্ছাকে সিগারেট দিচ্ছিল। হেডমাস্টারমশাই তাকে শাসন করেন এই বলে—

“বিশ্বসংসারকে শাসন করবার অধিকার তোমাকে দিলে কে?

—অন্যায়কে শাসন করবার অধিকার সবারই আছে।

—না, নেই। তার জন্যে সমাজ আছে, গভর্নেন্ট আছে, কোর্ট আছে। তুমি সমাজপতি? তুমি কোর্ট? তুমি পুলিশ? সুদর্শন জানায় সে ওসব কিছুই মানে না। তার বুদ্ধি আছে, গায়ে বল আছে, সুতরাং বিচার সেই করবে। যখনই অন্যায় দেখবে, তখনই তার প্রতিকার করার চেষ্টা করবে। সে বিপ্রপদ হোক বা অন্য কেউ। “ঈশ্বর এই জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন।”^{১০৯}

প্রগাঢ় বিশ্বাস ভরে, সোচ্চারে একথা ঘোষণা করে সুদর্শন। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আন্তিক-নাস্তিক শব্দযুগ্ম কত রকম অর্থ তৈরি করেছে। *যোগদ্রষ্ট* উপন্যাসে আন্তিক-নাস্তিক বিসংবাদের মধ্যে প্রবেশ করলো ‘পাপ’ ও ‘অপরাধ’-এর ধারণা। ‘পাপ’ নামক ধারণাটির কেন্দ্র রয়েছে ধর্মীয় নৈতিকতাবোধ, আর ‘অপরাধ’ নামক ধারণাটির নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্রীয় নৈতিকতাবোধ (এথিকস্, মর্যালিটি)। এই দু-ধরনের শাস্তির ধারণা শব্দযুগ্মের মধ্যে জুড়ে

দেয় আরেক কিসিমের ব্যঞ্জনা। ‘ঈশ্বর’ প্রদত্ত শাস্তির সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয় রাষ্ট্র, সুদর্শন ও হেডমাস্টারের তর্ক সেই ভাবনাকেই তুলে ধরে। একদিকে রয়েছে সয়ম্ভু ও পরম সত্তার বিচার ও বিধানের ধারণা, যে ধারণা কেবলই ইহজাগতিক নয়, পারলৌকিক বিশ্বাসও সেটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। অন্যপ্রান্তে রাষ্ট্র শাস্তি দেয় ‘অপরাধ’-এর। যে শাস্তি নির্ধারক পরম বা সয়ম্ভু কোনো সত্তা বা সত্তা প্রেরিত দূত নন, যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণের সন্নিবেশে বিশেষ তর্ক প্রণালীর মাধ্যমে একদল মানুষের কিংবা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। যা একান্ত ভাবে ইহজাগতিক, মৃত্যু অতিরিক্ত অস্তিত্ব বা আত্মা সম্বন্ধে যে বিচার পদ্ধতি অকৌতুহলী। প্রাথমিকভাবে সমাজের সঙ্গে সুদর্শনের দ্বন্দের মধ্যে দুটি ভিন্ন দার্শনিক অবস্থান ক্রিয়াশীল ছিল।

কিন্তু যত বড়ো হচ্ছে সুদর্শন ছোটোবেলার সমস্ত ধারণা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। কোথায় তার মধ্যে ‘ভগবানত্বের’ অংশ? সে তো অনুভব করে না ‘দিব্যশক্তির’ স্ফূরণ। স্বপ্নালু অবসরে তার মনে হতো গভীর রাতে ঘোড়ায় চেপে তলোয়ার হাতে পাপীদের সংহার করতে যাবে সে, কিন্তু কোথায় কী?

“ঈশ্বর কোথায়? বিজ্ঞানের বই অল্প কিছু পড়েছি। রুশ দেশে বিপ্লব হয়ে গেছে। সোনালী গম্বুজওয়ালা গির্জা-ঘর রক্তে ভেসে গেছে। ঈশ্বর নেই— সব মিথ্যা বলে ধ্বনি তুলেছে; আকাশলোক থেকে একটি বজ্রনাদ হয় নি, মাটির তলা থেকে বাসুকী মাথা নাড়ে নি,...ক্রীস্টান দেশ, সেখানে ক্রাইস্ট কোন পলায়নপর ভক্তকে দেখা দিয়ে বলেন নি— আমি চলেছি রাশিয়ায়— ‘টু বি ক্রুসিফায়েড এগেন’— নূতন করে ক্রুসবিদ্ধ হতে চলেছি।”^{১১০}

নিষ্ঠুর যন্ত্রণা, হতাশা অবসাদে তলিয়ে যায় সুদর্শন। ‘ঈশ্বরের মৃত্যু’ কিংবা ‘মৃত ঈশ্বর’ প্রসঙ্গে সুদর্শন বলছে—

“বাল্যকাল থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতাম। প্রথমেই মন্ত্রে আছে— উর্ধ্ব ব্রহ্মণে নমঃ, অধঃ অনন্তায় নমঃ। উর্ধ্বের ব্রহ্ম নিশ্চিহ্ন হল। রইল শুধু অনন্ত— হারিয়ে গেলাম অন্তহীন অন্ধকারে— দিকহীনতায়। কিসের পাপ। কিসের পুণ্য। কী অন্যায়, কী ন্যায়? তা শুধু অন্ধকারের মত উলঙ্গ শক্তি। যে মৃত্যু হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লঙ্ঘন করলেই মৃত্যু দিয়ে দণ্ড দেবে। গাছের উপমা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম শিবনাথ, তাই দিয়েই বলি— সূর্যহীন বিশ্বে কোন্টা অধোলোক, কোন্টা উর্ধ্বলোক কে বলবে?... সূর্য গেল, আলো গেল, স্বর্গ গেল, বৈকুণ্ঠ গেল, ব্রহ্মলোক গেল, ইন্দ্রলোক গেল, রইল শুধু পৃথিবী— মাটির পৃথিবী— এর বুক থেকে চুষে খাও মাটির রস, ভোগ কর দেহে বেঁচে থাকার অনেক সুখ, আকাশচারী চৈতন্য হোক এরই মধ্যে বন্দী। সে মরুক। খাঁচার মধ্যে মরা-পাখির মত সে পচে নিশ্চিহ্ন হোক।”^{১১১}

‘অস্তি’তে বিশ্বাস যখন হারিয়ে যায় তখন কী অনন্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় মানুষ? ন্যায়, নীতিবোধ বিবর্জিত ভোগের বাসনাই ভিন্ন আর কিছুই কি অবশিষ্ট থাকে না? সুদর্শন ‘নাস্তি’-র যে বিশেষ ধারণা বা সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করলো ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন? ঈশোপনিষদ-এ উচ্চারণ করা হচ্ছে— “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা / মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।” অর্থাৎ ত্যাগের অনুশীলন করো এবং সর্বভূতের চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও। অপরের ধনে লোভ করো না।^{১১২} এই মন্ত্রের শাক্তরভাষ্য— কিন্তু কিভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব? ত্যাগের অনুশীলন দ্বারা। সর্বদা মনে রাখতে হবে এই জগৎ এবং তার নানা প্রলোভন সত্য নয়; সত্য নয় এই অর্থে যে তা অনিত্য। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, কারণ ব্রহ্ম অবিনশ্বর। অনিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা চিরতরে ত্যাগ করে ব্রহ্মে মনকে একাগ্র করতে হবে। আমরা সোনা দেখে মুগ্ধ হই, কিন্তু তা নশ্বর। যা ক্ষণস্থায়ী তার পেছনে ছোটা, অপরের ধনে লোভ করা বা নিজের ধনেও আসক্ত হওয়া উচিত নয়। যিনি জানেন এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী, তাঁর কাছে ধনসম্পদ ও ইন্দ্রিয়সুখ নিতান্তই তুচ্ছ। ব্রহ্মই একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।^{১১৩} ‘ভোগ’ প্রসঙ্গে চার্বাক দর্শন নিন্দিত। যে শ্লোকটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয় তা হলো—

“যাবজ্ জীবৎ সুখং জীবদ্ ঋণং কৃত্বা মৃতং পিবেৎ ।

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমং কুতঃ ।।”^{১১৪}

এই শ্লোকটির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ সহযোগে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সায়ণ-মাধব এই শ্লোকটিকে বিকৃত করেছেন। বরং মূল পাঠে দার্শনিক মতের কথাই বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর নাগালের বাইরে কিছুই নেই (নাস্তি মৃত্যোর্ অগোচর)। চার্বাক এবং সেই সূত্র ধরে নাস্তিকের সম্পর্কে অভিযোগ তারা ভোগবাদী, কেবলমাত্র ঐহিক সুখ ছাড়া তাদের আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। সেই ইঙ্গিত সুদর্শনের মন্তব্যের মধ্যেও রয়েছে। সেটি আদতে ‘সিদ্ধান্ত-পক্ষ’দের বিকৃত বক্তব্যই।^{১১৫} অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে, সুদর্শনের কথার মধ্যেও *ঈশোপনিষদ* ও *সর্বদর্শনসংগ্রহ*-এর সুর রয়েছে। যদিও ভোগবাদী শ্লোকটি বিকৃত এবং খণ্ডন করার সুবিধার্থে ‘পূর্বপক্ষ’কে দুর্বল করা প্রচেষ্টা মাত্র। সে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য। *ঈশোপনিষদ*-এর প্রথম শ্লোকটির মধ্যে ‘ভোগ’ মাত্রই যে খারাপ নিন্দনীয় কাজ বা গর্হিত অপরাধ তা বলা হচ্ছে কি? সেই বস্তুই ‘ভোগ’ করবে না যা ‘অপর’-এর। মানবিক ও জাগতিক ভাবে অর্জিত বস্তুর ‘ভোগ’ অন্যায় কি? এই নিয়ে সিদ্ধান্ত জানানোর যোগ্যতা আমাদের নেই, দীর্ঘকাল ধরে পণ্ডিত, দার্শনিকেরা এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ‘ত্যাগ’ মহৎ হয়েছে এবং ‘ভোগ’ বা ভোগাকাঙ্ক্ষা নিন্দিত হয়েছে। সেই ধারণার দ্বারা চালিত সুদর্শনও ‘নাস্তি’র সমার্থক করেছে অনৈতিকতাকে। মূলত আস্তিক দর্শন প্রস্থানের ভাবনা সুদর্শনের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে শেষাঙ্গি। ঈশ্বর ও নৈতিকতা সমার্থক হয়ে উঠেছে তার বিশ্বাসে।

কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই নয়, সুদর্শনের মনকে সংশয়ী করার ক্ষেত্রে ডেটিন্যু ধীরেনবাবুরও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। অস্তি-নাস্তির প্রসঙ্গে তার উপলব্ধির কথা শিবনাথকে জানায় সুদর্শন।

“ধীরেনবাবুর খোঁচা খেয়েই আমার অগাধ বিশ্বাসে আঘাত লাগল। আন্তিক্যবাদের একটা বড়ো দায়িত্ব, শিবনাথ, তাকে অস্তির প্রমাণ দিতে হয়। নাস্তিকের সুবিধে, সে নাস্তিবাদী— নাস্তির আবার প্রমাণ কি দিতে হবে?”^{১১৬}

এরপর সুদর্শন সন্ন্যাসীও হয়ে যায়।

“ঈশ্বর-বিশ্বাসের পাহাড়, সভ্যতার আদিকাল থেকে আজও পর্যন্ত— কালের প্রবলতম ভয়ঙ্করতম ভূমিকম্পে চুরমার হয়ে অতলের কোন্ নিরুদ্দেশে তলিয়ে গেছে এবং সেখানে সৃষ্টি হয়েছে গভীর সমুদ্রের সেখানে ওসব বিশ্বাস নেই, অর্থাৎ জীবনাতীত কিছু নেই, যা আছে তা জীবনেই আছে”^{১১৭}

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে জ্ঞানচর্চার জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় বহু কাল ধরেই আছে। দার্শনিকরা যুগে যুগে সে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত সামাজিক চৈতন্যের মধ্যে ঈশ্বরের মৃত্যুর বার্তা নিয়ে আসে। হয়তো সেই কথাই বলতে চেয়েছে সুদর্শন, পাহাড় ও সমুদ্রের উপমা দিয়ে। মানুষের অটল বিশ্বাস সমুদ্রের খাতে তলিয়ে গেল। এসবের পরেও সে বিশ্বাস করতো আছে, মৃত্যুর পরেও কিছু আছে। ঈশ্বরের খোঁজে এরপর সন্ন্যাস নেয় সুদর্শন।

এরপরের পাঁচ বছর ঈশ্বর সন্ধানরত। অনেক ঘুরেছে সে কেদার-বদ্রী, কৈলাস, মানস সরোবর, কন্যাকুমারিকা সারা ভারত। সে কী পেলে অভীষ্টের সন্ধান? না। সুদর্শন জানিয়েছে, পৃথিবীর মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একই ভাবে ঈশ্বরকে খুঁজে বের করার প্রত্যাশায় হেঁটে চলেছে।^{১১৮} অনেকেই বলেছে দেখেছে সে দেখাতে তারা পরিতৃপ্ত হলেও সুদর্শন নয়, বস্তুত সে যা খুঁজছে তা কি সত্যিই পাওয়া যায়? পেয়েছে কেউ? সুদর্শনের উত্তর, না। কারণ

সে তো পায়নি।^{১১৯} আন্তিক-সুদর্শন বিরাটের কল্পনায় মুগ্ধ বা ভোলার পাত্র নয়। উপমার আড়াল থেকে ঈশ্বরকে ধুলোময় পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ করতে চায়।

“আমি খুঁজছি আমার মূলকে, যিনি আমার মত কথা বলবেন অথবা নিজের সকল আবরণ উন্মোচন করে দেখাবেন নিজেকে এবং তারই মধ্যে জানব সমস্ত কিছুকে।”^{১২০}

উপমা বা কল্পনার আড়ালে থাকা ঈশ্বর নন তিনি। কারণ, সুদর্শন ‘বিংশ শতাব্দীর মানুষ’ প্রমাণ বিনা পরিতৃপ্তি নেই তার।^{১২১} এখানেই নিজের আন্তিক্য দর্শনের আরেকটি বৈশিষ্ট্যকে/লক্ষণকে প্রকাশ করে ফেলে সুদর্শন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন গ্রন্থানগুলির মধ্যে চার্বাকরা প্রত্যক্ষ প্রমাণকে মুখ্য প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছে। অনুমানকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও, তা প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ। সুদর্শনের মধ্যেও কি সেই ঝোঁক কাজ করছে? এই অভিমতটি আরও স্পষ্ট হচ্ছে সুদর্শনের বয়ানে। সে বলছে—

“বিংশ শতাব্দী না হলে, অন্য রকম হত আমার জীবনে; আমিই অন্য রকম বলতাম। আমার মন ওই বিরাট, ওই অপরূপের মধ্যে মগ্ন হয়ে থেকে যে আনন্দ পেত, তাকেই ঈশ্বর-দর্শনের স্বাদ বলে মনে নিত।”^{১২২} (বাঁকা হরফ আমার)

‘বিংশ শতাব্দী’ এই শব্দদ্বয়ের প্রতি কথক বা লেখকের বাড়তি নজর টান পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না। প্রত্যক্ষের প্রমাণের প্রতি বাড়তি পক্ষপাতিত্ব আরেকটি কারণ কি ইউরোপের আলোকপ্রাপ্তি সূত্রে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অভিজ্ঞানের প্রভাব? কারণ সুদর্শন জানিয়েছিল শিবনাথকে যে, সবটুকু বুঝতে বা ধরতে না পারলেও সে বিজ্ঞানের চর্চা করেছে এককালে। ফলত বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবের কথাও অস্বীকার করা যায় না। তা যে আধুনিক ‘বিংশ শতাব্দী’র একজন অনুসন্ধিৎসু মানুষকে প্রভাবিত করবে তা স্বাভাবিক। সুদর্শনের এসব প্রশ্ন বা মন্তব্যের জবাবে সন্ন্যাসী ত্রুদ্র না হলেও ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন—

“দোষ তোমার নয়, দোষ এই কালের। বাবা, আমি কী জানি, কী বুঝি জগৎজীবন স্রষ্টার প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা, দোষ যা তোমার কাল চায়; তবে অনুভবে বুঝি তিনি আছেন, সেই অনুভবে আমার আনন্দ আছে। নিরানন্দ অশান্তি নেই। ...এতকালের সব অবতারকল্প পুরুষ, সিদ্ধপুরুষ মহাত্মা, তাদের কথায় বিশ্বাস রেখো বাবা, তাঁরা ঈশ্বরকে জেনেছিলেন।”^{১২৩} (বাঁকা হরফ আমার)

সন্ন্যাসী অনুভবে আনন্দ পেতে পারেন কিন্তু সুদর্শনের অনুভবে আনন্দ নেই, কারণ সে তো ‘বিংশ শতাব্দী’র মানুষ। শতাব্দীর যন্ত্রণা, মঙ্গলময় পরম সত্তার মৃত্যু তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তার অনুভবে, চৈতন্যে চারিয়ে দিয়েছে জিজ্ঞাসার অ-সুখ, সেটাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অর্জন। সন্ন্যাসী আর সে যে ভিন্ন কালের বাসিন্দা, তাদের চৈতন্যও ধারণ করে আছে দুটি ভিন্ন দার্শনিক প্রেক্ষাপটের অর্জিত অভিজ্ঞান। ‘তাঁরা ঈশ্বরকে জেনেছিলেন’ বলে বিংশ শতাব্দীও নির্দিধায়, বিনা তর্কে নিশ্চিত থাকবে তা সম্ভব নয়। সুদর্শন তর্ক করেনি ঠিকই, কিন্তু এ অভিমত তাকে আরেকটি সিদ্ধান্তের দিকে চালিত করে যা খুবই বিতর্কিত, সুদর্শন বলে—

“তাঁরা পেয়েছিলেন একটা কালের ঈশ্বরকে, সে কাল গত হওয়ার সঙ্গে সে ঈশ্বর-দর্শনের প্রসাদও বাসি হয়েছে। না হলে মানুষের এত সংশয় কেন, যন্ত্রণা কেন?”^{১২৪} (বাঁকা হরফ আমার)

এই বক্তব্য অনিবার্যভাবে আরেকটি তর্কের সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করে দেয়। ‘ঈশ্বর’ কি কাল সাপেক্ষ না কাল নিরপেক্ষ? সন্ন্যাসীর বিচারে ‘ঈশ্বর’ পরম সত্তা, তিনি কাল নিরপেক্ষ, সময় দিয়ে তাঁর পরিমাপ চলে না। কিন্তু ‘বিংশ শতাব্দীর মানুষ’ সুদর্শন অখণ্ড কালের ধারণার বিপক্ষতা করে। এর পেছনে তার একটি যুক্তিও আছে ‘ঈশ্বর’ যদি ত্রিকালজ্ঞ হন, সব কালেই যদি একই ঈশ্বর বিরাজ করেন তাহলে সংশয় ও যন্ত্রণা কেন? তিনি তো সদা মঙ্গলময়। ঈশ্বর বিশ্বাসী সন্ন্যাসী এই উত্তর দিতে পারতেন যে, সংশয় যন্ত্রণা সবই তাঁর লীলার অংশ। সে যাই হোক, সুদর্শন জেনেছে মানব সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কারণ ফলে সে স্বীকার করতে নারাজ মানুষ

অমৃতের সন্তান। সুদর্শনের এই ধারণাকে ঈশ্বর বিশ্বাসী আন্তিক মানুষ কি লোকাযত ভাবনার অংশ হিসেবে চিহ্নিত করবে? কারণ সে তো আগু বাক্যে ভরসা রাখে না, আকাঁড়া প্রমাণ চায়।

সন্ন্যাসের পথ ত্যাগ করে সুদর্শন সংসারে ফেরার উদ্যোগ নেয়। সেই সময় আলাপ হয় এক পতিতার সঙ্গে, নলিনী যার নাম। ঘটনাচক্রে যার এই পরিণতি। সুদর্শন তাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষাও করে। সুদর্শনের সঙ্গে সে ফেরে সংসার জীবনে। নলিনী বাবা ছিলেন নাস্তিক, কিছুই মানতেন না। প্রথাগত বিশ্বাস, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। কিন্তু নলিনী আস্তে আস্তে আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে সুদর্শনের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে জীবন সম্পর্কে দুজনের দু-রকমের অবস্থানের জন্য। উপন্যাসের শেষে পাঠক জানতে পারে সে এখন একটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। *যোগদ্রষ্ট* যদিও সুদর্শনের আখ্যান, আন্তিকতা থেকে নাস্তিকতার দিকে যাত্রার কাহিনি, তাহলে একটি বিপরীত যাত্রার কথা উপন্যাসে আছে, যা নলিনীর যাপিত জীবন। তা উপন্যাসের মুখ্য সংকটের অংশ না হলেও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তর্কাতীত না হলেও, এই অংশটিকে লেখকের আকাজক্ষা পূরণের কাহিনি-অংশও বলা যায়। সুদর্শন সোনার মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে সংসার চালানোর জন্যে। এ ঘটনা নলিনীকে ব্যথিত করে। এই সময়ে সুদর্শনের অবস্থান তার নিজের বয়ানেই ধরা রয়েছে। সে বলছে—

“মিথ্যার পিছনে ছুটতে আর পারবো না, বোল না। সন্ন্যাস নয়, ঘর। ঘর-সংসার, তুমি-আমি। এই সত্য।

আমি বলছি, এই সত্য। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে জীবন সত্য। অমৃত না থাকে, জীবনে মধু আছে।”^{১২৫}

সোনার মূর্তির প্রয়োজন আর তার নেই, তার দরকার সোনা। নলিনীকে সে বলছে—

“আজ ঈশ্বর [GOD] যেখানে নেই, সেখানে দেবতা [সোনার মূর্তিটি] কোথায়? ধর্ম কোথায়? *ধর্মের চেয়ে জীবন বড়। পূজার চেয়ে ক্ষুধা*, আমার নিজের প্রয়োজন বড়। তুমি আমার। তাই তোমাকে সাজাব এই সোনায়ে।”^{১২৬} (বাঁকা হরফ আমার)

ঐ মুহূর্তে ট্রেন প্রবেশ করছে হাওড়া স্টেশনে, ‘বিংশ শতাব্দীর মর্মকেন্দ্র’-এর প্রবেশ দ্বারে। এরপরেই সুদর্শন বেছে নেবে নাস্তিক্যের পথ। সুদর্শনের বয়ান লক্ষ করলে মনে হবে এতো নাস্তিকেরই যুক্তি। ঈশ্বর অবিশ্বাসী জীবনকে এভাবেই দেখে। আমাদের প্রস্তাব এই বয়ানটিকে পুরোপুরি নাস্তিকের বয়ান বলা অসুবিধে জনক। ‘আজ’ শব্দটির জন্য। সুদর্শনের বর্তমান বিশ্বাসের জগতটি নির্মিত হচ্ছে ‘আজ’ অর্থাৎ বর্তমানের প্রেক্ষিতে। এই বয়ানটি খোলামুখ (open ended) বয়ান। তার মনে এই বিশ্বাস রয়ে গেছে যে গতকাল অর্থাৎ অতীতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছিল। ফলত অতীতে ‘ধর্ম’ ছিল, ‘পূজা’ ছিল, পারলৌকিক জীবন ছিল, কেবল ‘তুমি-আমি’ নয় পরম সত্তাও ছিলেন। এই অবস্থান ঠিক নাস্তিকের বিশ্ববীক্ষা নয়, ‘অস্তিবোধ’ নিয়ন্ত্রিত নাস্তিকতা। ফলে তার কাছে নাস্তিকতার আরেক অর্থ হয়েছে অনৈতিকতা। এই প্রসঙ্গে তার শঙ্করের ‘ভূমিকা’টিও স্মরণীয়। কী লিখছেন সেখানে?

“আমার জীবনের অণুপরমাণুতে, বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে, অতীত সংস্কার-বিশ্বাসে, নূতন শিক্ষার বুদ্ধিতে যে আমি মর্মাস্তিক প্রচণ্ড সংঘর্ষ অনুভব করছি— যার ফলে আজ সব ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে গেল, সেই ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে আজ যে মনে হচ্ছে জীবনের পৃথিবীর দিক নেই, দিগন্ত নেই, সূর্য ক্ষণজীবী, চন্দ্র একটা বুদ্ধদ, সব মরুভূমি, সব মরুভূমি, শুধু বালু; কোন বিশ্বাস নেই, আশ্বাস নেই।”^{১২৭}

পরের অংশে লিখছেন—

“আমরা কি শুধু মরবার জন্যে এবং যতদিন বাঁচি ততদিন শুধু ভোগের জন্যে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণু— তাকে ভেঙেও মহানাস্তিতে পৌঁছতে পারি না! পৌঁছাই এক মহাশক্তির প্রলঙ্কর প্রকাশে।”^{১২৮}

নাস্তিক কি অনৈতিক? নীতি, মূল্যবোধ, স্নেহ, ভালোবাসা সবই কি মূল্যহীন নাস্তিকের কাছে? গ্রিক ও ভারতীয় দর্শনে এপিকিউরাস কিংবা চার্বাকদের অপরাপর দার্শনিক প্রস্থানগুলি নিছক ভোগবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। *যোগব্রহ্ম* এ কি সেই ভাবনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে? নাস্তিক-

সুদর্শনের অবস্থান ও নলিনীর বাবার কার্যকলাপ এই প্রশ্ন বা তর্কটিকে আহ্বান করে। নলিনী জানায়—

“সংসারে এক ধরনের নাস্তিক আছে, যারা কিছুই মানে না। আমার বাবা সেই নাস্তিক। পৃথিবীতে নিজের ছাড়া কিছু নেই, কেউ নেই। আমাদের বাড়ি যখন তারা [ডাকাতরা] ভাঙছে তখন তিনি পায়খানার উপর লাফ দিয়ে পালিয়েছিলেন। আমি যুবতী মেয়ে, কটি নাবালক ছেলে— তারা পড়ে রইল।”^{১২৯}

ন্যায়, মূলবোধ, দায়িত্বহীন এক নাস্তিক নলিনীর বাবা। যদিও নলিনীর বয়ানে এইটি একমাত্র লক্ষণ নয় নাস্তিকের, কারণ উদ্ধৃত মন্তব্যে ‘এক ধরনের’ শব্দটির উল্লেখ। কিন্তু সুদর্শন দ্বিধাহীন যে নাস্তিক নীতি বিবর্জিতই হবে। তার মন্তব্যগুলিকে পর সাজিয়ে নেবো।

“ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সাফল্যে বিজ্ঞানবাদ যেদিন তাদের জীবনে আসন জুড়ে বসল, সেদিন ঈশ্বরের পুত্রের পুনর্জীবন, মোজেসের *টেন কমান্ডমেন্টস্*— সমুদ্র ভাগ হয়ে পথ দেওয়ার গ্রন্থখানির সত্যতার মূল্য কোথায় রইল? নেই। শিবনাথ নেই। আজ ইউরোপের অবশ্যম্ভাবী গতি এবং পরিণতি নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিজ্‌মে অথবা এমনি কোন ইজ্‌মে। উপায় নেই তার। এদেশেরও গতি সেই মুখে। গান্ধী রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব ঘটেছে। ...যখন ঈশ্বর নেই তখন আর মানবার আমার কেউ নেই।”^{১৩০}

আমাদের দেশের ধনী ও তাদের ধন সম্পদ সঞ্চয়ের প্রসঙ্গে সুদর্শন বলে যে, এরা—

“ভগবানের নাম নিয়ে ব্যাভিচার করে, ভগবানকে মানে না বলে আধুনিকত্ব জাহির করে, বিপদে পড়ে কালীঘাটে পূজো দেয়, আইনকে মানে না— ...জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে কোন সন্ধান নেই, কোন কৌতুহল নেই। যাবৎ জীবৎ সুখং জীবৎ। হেসে নাও দুদিন বই তো নয়— এই হল জীবনমন্ত্র। বুদ্ধিমান জন্তুর জীবন।”^{১৩১}

যে ভোগবাদী শ্লোকটির অংশত উল্লেখ করা হয়েছে তা চার্বাকদের। চার্বাকরা ঘোষিত ভাবে ঈশ্বর, পরজন্ম, বেদ, কর্মফলের বিরোধী। ভারতীয় দর্শন গ্রন্থানে এই সকল অর্থে নাস্তিক একমাত্র চার্বাকরা। সুদর্শন যে ধনীদের সঙ্গে চার্বাকদের বক্তব্যকে মিলিয়ে দিয়েছে তা প্রকার

কপটতা, কারণ এই বিশেষ শ্রেণিভুক্ত মানুষগুলি ধর্মেও আছে জিরাফে আছে গোত্রের মানুষ।

চার্বাকদের মতো র্যাডিক্যাল অবস্থান তাদের নয়। এরপরে সুদর্শন বলছে—

“আমি ঈশ্বর মানি না, সুতরাং কোন নীতি-ন্যায়, যা মানুষ গড়েছে, তা তখন আমি মানি না। কিন্তু এই না-মানা আমার একটা সন্ধান।”^{১৩২}

কিছু পরে নৈতিকতা সম্পর্কে সে বলে—নতুন জীবনে সে মদ খেতে শুরু করেছিল, কারণ তার কাছে ওটা নাস্তিবাদের অঙ্গ। সে মনে করে নাস্তিক সংস্কার দিয়ে তৈরি করা মর্যালিটির প্রতিবাদের জন্যও মদ খাবে।^{১৩৩} মদ খাওয়াকে নাস্তিকতার অঙ্গ বললে আমাদের পূর্ব মীমাংসকদেরও নাস্তিক বলতে হয়। সে অন্য বিষয়। সুদর্শনের মূল বক্তব্যটি এই রকমের যে ঈশ্বর থাকলে নৈতিকতা থাকবে, নইলে ধর্ম, নীতি, ন্যায় বলে কিছুকে সে মানবে না। অর্থাৎ অনৈতিক হবে।

ভারতীয় নৈতিকতার মূল ধারায় চার্বাকীয় নীতি চিন্তার সবচেয়ে বিতর্কিত ও র্যাডিক্যাল ভাবনা হলো পুরুষার্থ বিষয়ক ধারণাটি। মাধবাচার্য *সর্বদর্শনসংগ্রহ*-এ চার্বাকদের পুরুষার্থ বিষয়ে লিখছেন—

“অঙ্গনাদ্যালিঙ্গনাদি-জন্য-সুখমেব পুরুষার্থ। অর্থাৎ অঙ্গনার আলিঙ্গন, চুম্বন, মর্দন, প্রভৃতি জন্য এবং কাম্য বিষয়ের প্রাপ্তিজন্য সুখই পুরুষার্থ। এই সুখ দুঃখ-সম্মিশ্র অর্থাৎ দুঃখ মিশ্রিত বলিয়া পুরুষার্থ-ই নহে; ইহা মনে করিবেন না। কারণ অবর্জনীয়রূপে প্রাপ্ত দুঃখের পরিহারের দ্বারা সুখমাত্রই সকলের ভোক্তব্য ইহয়া থাকে।”^{১৩৪}

কামকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলে বলে স্বীকার করা ক্ষেত্রে প্রধান আপত্তি, কামজ সুখ সব সময়েই দুঃখ সম্পৃক্ত সে কারণে তা কখনই মুখ্য পুরুষার্থ হতে পারে না। এ আপত্তি প্রধানত আস্তিক দর্শন প্রস্থানগুলির, কারণ ভারতীয় আস্তিক দর্শন প্রস্থানগুলি প্রধানত যে প্রশ্ন নিয়ে চর্চা করেছেন তা হলো জীবন দুঃখময়, তা থেকে মুক্তির সন্ধানই তাদের লক্ষ্য, অর্থাৎ কিনা

মোক্ষ। ফলত যে ধরণের সুখ আদতে দুঃখ সংলিপ্ত তাকে কখনই চূড়ান্ত প্রাপ্তি বলে তারা স্বীকার করবেন না। সে কারণেই ধর্ম, অর্থ, কামকে পুরুষার্থ না বলে মোক্ষকেই পুরুষার্থ বলে স্বীকার করা হয়েছে। এমনকি ধর্মজনিত সুখকেও তারা চিরস্থায়ী বলে মনে করেন না। কামজ সুখ দুঃখ সংলিপ্ত হতে পারে, সে কথা চার্বাকরাও মনে করেন। তার অর্থ এই নয় যে সুখকে পরিহার করতে হবে। দুঃখের আশঙ্কায় সুখকে ত্যাগ করাও অমুযোচিত।

“সে কারণে চার্বাক্ষষ্টিতে বলা হয়েছে, ‘বিষয় প্রাপ্তিজন্য সুখ দুঃখের দ্বারা সংসৃষ্ট বলে তা পুরুষগণের ত্যাজ্য হবে— এ ধরণের বিচার মূর্থতা পরিচায়ক। এই জগতে এমন কোন সুখার্থী আছে কি যে তুষযুক্ত ও কণায়ুক্ত বলে সিতবর্ণের উত্তম তণ্ডুল যুক্ত ধান পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করবে?’”^{১৩৫}

এই বক্তব্যকে ভোগবাদী বলে অভিযুক্ত করেছে অপরাপর আন্তিক দর্শন প্রস্থানগুলি। সুদর্শন বয়ানে এই কাজ জন্তুর মতো অনৈতিক। কিন্তু দুঃখের সম্ভাবনাকে পরিবর্তিত করে সুখলাভের চেষ্টাকে কি অনৈতিক বলা চলে? দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী চার্বাকদের নানা শ্রেণির কথা উল্লেখ করেন। তৃতীয় একদল চার্বাকমতে কথা উল্লেখ করেন যারা সুখের প্রশ্নে মানুষ ও মনুষ্যের প্রাণীর মধ্যে তফাৎ করেন। যারা কেবলমাত্র জৈব সুখকেই একমাত্র সুখ বলে স্বীকার করেন না।^{১৩৬} এই বক্তব্য থেকে খানিক স্পষ্ট হয়ে যায় যে নাস্তিকের নৈতিকতা থাকে, যদিও তা ঈশ্বর কেন্দ্রিক নয়।

প্রদীপ পি. গোখলে তাঁর *Lokayata/Carvaka a Philosophical Inquiry*-তে চার্বাক দর্শনের মূল্যবোধ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। চার্বাকদের নৈতিকতা প্রসঙ্গে *ন্যায়মঞ্জরী* লেখক জয়ন্ত ভট্ট বলছেন—

“na hi lokayate kincit kartavyamupadiyate
vaitandikakathaivasau, na punah kascidagamah”^{১৩৭}

In Lokayata doctrine no obligation is instructed. It is just a talk of baseless disputants (*vaitandika*). There is no scripture (that they accept).”^{১৩৮}

জয়ন্ত ভট্টের বক্তব্য হলো চার্বাকরা কোনো স্পষ্ট বক্তব্য হাজির করেনি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ে। বিষয় হলো, চার্বাক/লোকায়ত দর্শনের কোনো টেক্সট পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ‘সিদ্ধান্ত-পক্ষ’-এর টেক্সটে ‘পূর্ব-পক্ষ’ রূপে যতটুকু উল্লেখ করা আছে তাই সম্বল। সেখান থেকে যতটুকু জানা যায়, চার্বাক/লোকায়ত দর্শন প্রস্থান করণীয়-অকরণীয় বিষয়ে কোনো বিধি দাখিল করেনি। প্রদীপ গোখলে তাঁর বইয়ে চার্বাকদের নৈতিক অবস্থানকে স্পষ্ট করেছেন। চার্বাকেরা যেহেতু ভারতীয় বাকি দর্শন প্রস্থানগুলির মূল প্রকল্পের বিরোধী সে কারণে ধর্ম ও মুক্তি বিষয়ে তাদের অবস্থান আস্তিকের কাছে অনৈতিক বলে প্রতিভাত হয়। চার্বাকেরা মৃত্যুর অতিরিক্ত কোনো সত্তায় বিশ্বাসী নয়। যেহেতু পরজন্ম নেই তাই অনৈতিক হওয়া যায় এমনই মনে করে সুদর্শন। কিন্তু তা ‘সিদ্ধান্ত-পক্ষ’-এর বক্তব্য, চার্বাকদের নয়। বরং মানবিক নৈতিকতার প্রসঙ্গ চার্বাক দর্শন অস্বীকার করে না।

ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তে সুদর্শন আবার বিশ্বাস করতে শুরু করে এটাই জগতের একমাত্র পরিণতি নয়।

“বাইরের বস্তুজগৎ জুড়ে খোঁজা শেষ করে আবার সেই মনের জগতে প্রবেশ করতে হবে। ওইখানেই আছে চৈতন্যময় প্রাণজগতে প্রবেশের সিংহদ্বার। তার আগে এই খোঁজার পর্ব শেষ করতে হবে।”^{১৩৯}

এবার স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে সুদর্শন জীবনের প্রান্তে; মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আবার বিশ্বাসের পথে ফেরত যেতে চাইছে। কিন্তু তা কি নাস্তিক-সুদর্শনের পুনরায় আস্তিক্যে প্রত্যাবর্তন? বস্তুত সুদর্শন কখনই প্রকৃত অর্থে নাস্তিক হয়ে উঠতে পারেনি, তার তথাকথিত নাস্তিক্য পর্বটি আদতে আস্তিক্যবোধ নিয়ন্ত্রিত। সে মনে করে নাস্তিক মানেই অনৈতিক, আস্তিক ধর্ম

প্রচারকদের বিপরীতে রাখে ত্রুর শাসকদের। নাস্তিক প্রস্থান সম্পর্কে আস্তিক্যবাদী দার্শনিকদের অভিমত খানিক তাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাসের বিরুদ্ধে স্টোইকদের অভিযোগকে। দাস এবং গণিকাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের কারণেই বিকৃত হয়েছে তাঁর বক্তব্য। যার নিদর্শন পাওয়া যাবে অক্সফোর্ড অভিধানে। এপিকিউরাসের অর্থ হয়েছে পান-ভোজন বিলাস।^{১৪০} একই ভাবে চার্বাকদের বিষয়ে প্রচলিত ধারণা ‘যতদিন বাঁচবে, সুখে বাঁচবে; ধার করে ঘি খাবে। ছাই হয়ে যাওয়া দেহ কোথায় আবার ফিরে আসবে?’ চার্বাকদের সম্বন্ধে এ বক্তব্য বিকৃত।^{১৪১} তারাশঙ্কর ভূমিকায় লিখেছিলেন যে ‘যবনিকা’ নামটি হয় তো ঠিক। লেখকের এই বক্তব্য সমর্থনযোগ্য, কারণ এই আখ্যানের কেন্দ্রে রয়েছে মঙ্গলময় সত্তার মৃত্যুর প্রসঙ্গ কিংবা বলা যায় ঈশ্বরের যবনিকা পাত-ই যোগদ্রষ্ট-এর বিষয়। আরেকদিকে যোগদ্রষ্ট নামটিও অনুপোযুক্ত নয়, কারণ এ আখ্যান আদতে দ্রষ্ট নায়কের সত্তানুসন্ধানের কাহিনি। যে আস্তিক্যে স্থিতি না পেয়েও আস্তিক দর্শনের ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল, হতে চেয়েছিল নাস্তিক। কিন্তু সে পথে ‘পরম’ আশ্রয় নেই। নাস্তিক কোনো পরম সত্তার আশ্রয়ের জন্যে চলে না। ফলে শেষাঙ্গি সুদর্শনকে বিশ্বাস ও আস্তিকতার পথেই ফিরতে হবে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

^১ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ২০০৬-০৭, পৃ- ৫১৩

^২ এ, পৃ- ৫১৪

^৩ এ, পৃ- ৫১৫

^৪ এ, পৃ- ৫১৭

- ^৫ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৫ম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০১০, পৃ- ৩৬০-৬১
- ^৬ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮, পৃ- ৩৩২
- ^৭ ঐ, পৃ- ৩৩৮
- ^৮ ফরাসী ভাষায় উপন্যাসটি ১৯৪২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, প্রথম ইংরাজি তর্জমা হয় ১৯৪৬ সালে। স্টুয়ার্ট গিলবার্টের সেই তর্জমাটি লন্ডনে *দি আউটসাইডার* এবং নিউ ইয়র্কে *দি স্ট্রেনজার* শিরোনামে প্রকাশিত সেই বছরেই।
- ^৯ নবনীতা দেব সেন, *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী : শশী ও রিউ*, *এক্সণ*, কার্তিক-মাঘ, ১৩৭৯, পৃ- ৫৭
- ^{১০} ঐ,
- ^{১১} ঐ, পৃ- ৬১
- ^{১২} ঐ
- ^{১৩} ঐ, পৃ- ৬৭
- ^{১৪} ঐ, পৃ- ৭১-৭২
- ^{১৫} ঐ, পৃ- ৭২
- ^{১৬} অশ্রুকুমার সিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ- ২১১
- ^{১৭} মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, সম্পা. শুভময় মণ্ডল ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : দীপ প্রকাশন, ২০১৫, পৃ- ২১১
- ^{১৮} অশ্রুকুমার সিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ- ২১২
- ^{১৯} ঐ, পৃ- ২১৩
- ^{২০} ঐ, পৃ- ২১৪ এবং ২৭ নম্বর টীকা, পৃ- ২২০
- ^{২১} ঐ, পৃ- ২১৬-২১৭
- ^{২২} ঐ
- ^{২৩} ঐ, পৃ- ২২০
- ^{২৪} অধ্যাপক মালিনী ভট্টাচার্যের কাছে ঋণী এই অভিমতের জন্য।
- ^{২৫} অশোক মিত্র, *অচেনাকে চিনে-চিনে*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬, পৃ-৭২-৭৩
- ^{২৬} সুজিত ঘোষ, *মানিক-সাহিত্যে অবচেতন*, কলকাতা : প্রতিভাস, ২০১৭, পৃ- ২২ এবং দ্রঃ ৫নং উল্লেখ সূত্র, পৃ-১৬৪
- ^{২৭} আব্দুল কাফি, *স্বাধীনতার সুখদুঃখ : জ্ঞান স্মৃতি স্বাধীনতা আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ক খুচরো ভাবনা*, *পরিচয়*, ২০১৮, পৃ- ৭৫-৭৬
- ^{২৮} ঐ
- ^{২৯} ঐ, পৃ- ৭৭
- ^{৩০} দ্রঃ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *রচনাসমগ্র*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃ- ৪৯২ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, সম্পা. শুভময় মণ্ডল ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : দীপ প্রকাশন, ২০১৫, পৃ- ২২৮
- ^{৩১} মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, সম্পা. শুভময় মণ্ডল ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : দীপ প্রকাশন, ২০১৫, পৃ- ২১১
- ^{৩২} ঐ
- ^{৩৩} মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃ- ৪৯৫
- ^{৩৪} ঐ, পৃ- ৩২৭
- ^{৩৫} ঐ, পৃ- ৩২৭

^{৩৬} ঐ, পৃ- ৩২৯

^{৩৭} দ্রঃ আব্দুল কাফি, 'স্বাধীনতার সুখদুঃখ : জ্ঞান স্মৃতি স্বাধীনতা আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ক খুচরো ভাবনা', *পরিচয়*, ২০১৮, পৃ- ৬৩-৬৫, ৭৫-৭৬

^{৩৮} মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃ- ৩৩১

^{৩৯} ঐ, পৃ- ৩৬৭

^{৪০} ঐ, পৃ- ৩৩২

^{৪১} ঐ, পৃ- ৩৩৫

^{৪২} নবনীতা দেব সেন, 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী : শশী ও রিউ', *এক্ষণ*, কার্তিক-মাঘ, ১৩৭৯, পৃ- ৭১

^{৪৩} মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃ- ৩৬৭

^{৪৪} ঐ, পৃ- ৩৭৮

^{৪৫} ঐ, পৃ- ৪১০

^{৪৬} ঐ

^{৪৭} ঐ, পৃ- ৪১২

^{৪৮} ঐ, পৃ- ৪১৩

^{৪৯} ঐ

^{৫০} ঐ, পৃ- ৪১২

^{৫১} ঐ, পৃ- ৪১৫

^{৫২} ঐ, পৃ- ৪৬৩

^{৫৩} ঐ, পৃ- ৪১৪

^{৫৪} ঐ, পৃ- ৪১৬

^{৫৫} ঐ

^{৫৬} যদিও ফ্রয়েড পর্ব এবং মার্কস পর্ব এই দুটি ভাগে মানিককে দেখা এবং পড়া অযৌক্তিক বলেই মনে হয়। একজন শিল্পীকে সামগ্রিকভাবে দেখাই শ্রেয়।

^{৫৭} Marx, Karl, *Critique of Hegel's 'Philosophy of Right*, Tr. Annette Jolin & Joseph O'malley, Cambridge : CUP, 1982, p. 131

^{৫৮} মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃ- ৪১৮

^{৫৯} ঐ

^{৬০} ঐ

^{৬১} Marx, Karl, *Critique of Hegel's 'Philosophy of Right*, Tr. Annette Jolin & Joseph O'malley, Cambridge : CUP, 1982, p. 131

^{৬২} মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, সম্পা. শুভময় মণ্ডল ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : দীপ প্রকাশন, ২০১৫, পৃ- ২১১

^{৬৩} মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃ- ৪২২

^{৬৪} ঐ

৬৫ ঐ, পৃ- ৪৮৪

৬৬ নবনীতা দেব সেন, 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী : শশী ও রিউ', *এফণ*, কার্তিক-মাঘ, ১৩৭৯, পৃ- ৭২

৬৭ ঐ

৬৮ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃ- ৪৮৪

৬৯ ঐ

৭০ ঐ

৭১ ডঃ আব্দুল কাফি, 'স্বাধীনতার সুখদুঃখ : জ্ঞান স্মৃতি স্বাধীনতা আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ক খুচরো ভাবনা', *পরিচয়*, ২০১৮, পৃ- ৭৫-৭৮

৭২ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃ- ৩২৯

৭৩ ডঃ আব্দুল কাফি, 'স্বাধীনতার সুখদুঃখ : জ্ঞান স্মৃতি স্বাধীনতা আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ক খুচরো ভাবনা', *পরিচয়*, ২০১৮, পৃ- ৭৭

৭৪ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গ্রন্থপরিচয়', *বিভূতি রচনাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৩, পৃ- ৭২৭

৭৫ ঐ

৭৬ ঐ, পৃ- ৭২৮

৭৭ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬৩, পৃ- ৩২

৭৮ ঐ, পৃ- ৩৩

৭৯ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গ্রন্থপরিচয়', *বিভূতি রচনাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৩, পৃ- ৭২৯

৮০ ঐ, পৃ- ৭৩১ এবং তপোব্রত ভাদুড়ি, 'বিভূতিভূষণের বিরহচেতনা: ভাবজীবন থেকে সাহিত্যে', *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী*, ৪র্থ দিন, বিভূতিভূষণ ব্যানার্জি ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল আয়োজিত বক্তৃতামালায় প্রদত্ত ভাষণ, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০, শেষবার দেখেছি ৭মে, ২০২১ তারিখে।

ডঃ<https://www.youtube.com/watch?v=XLBZXwmM438>।

৮১ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেবযান*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪১২, পৃ- ৬

৮২ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গ্রন্থপরিচয়', *বিভূতি রচনাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৩, পৃ- ৭৩০

৮৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬৩, পৃ- ১৭-১৮

৮৪ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেবযান*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪১২, পৃ- ৫২

৮৫ ঐ, পৃ- ৭৮

৮৬ ঐ, পৃ- ১০৫

৮৭ ঐ, পৃ- ১৬৬

৮৮ ঐ, পৃ- ১৩৩

৮৯ ঐ, পৃ- ৭৭-৭৮

৯০ ক, খ ও গ প্রতিটি শব্দ বিভূতিভূষণের 'সাহিত্যের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। যেখানে লেখক সাহিত্য ও বাস্তবতা বিষয়ে বলতে চাইছেন যে বাস্তবতাকে, বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার কথাশিল্পীর। কীভাবে তা করবেন তিনি? তাকে বাস করতে হবে মানুষের মধ্যে, মানবিক জগৎ-ই সাহিত্যের উপাদান। শোভনতার জন্যে কিছু

বাদ দিলে কথা-সাহিত্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দ্রঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সাহিত্যের কথা’, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬৩, পৃ- ১৪০

^{৯১} আব্দুল কাফি, ‘বিভূতিভূষণ ও তাঁর প্রিয় ‘দুঃখীদল’, *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী*, নবম দিন, বিভূতিভূষণ ব্যানার্জি ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল আয়োজিত বক্তৃতামালায় প্রদত্ত ভাষণ, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০, দ্রঃ <https://www.youtube.com/watch?v=XxKlKnQQ6Zk>। শেষবার দেখেছি ৭মে, ২০২১ তারিখে।

^{৯২} রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তবতাবাদ*, কলকাতা : চিরায়ত, ২০১৩, পৃ- ২৪ এবং Kosambi D.D, ‘Introduction’, *The Subhasitaratnakosa of Vidyakara*, Kosambi & Gokhale (Ed.), Cambridge : Harvard University Press, 1957, Sec 5 & Sec 6

^{৯৩} আব্দুল কাফি, ‘বিভূতিভূষণ ও তাঁর প্রিয় ‘দুঃখীদল’, *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী*, নবম দিন, বিভূতিভূষণ ব্যানার্জি ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল আয়োজিত বক্তৃতামালায় প্রদত্ত ভাষণ, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০, দ্রঃ <https://www.youtube.com/watch?v=XxKlKnQQ6Zk>। শেষবার দেখেছি ৭মে, ২০২১ তারিখে।

^{৯৪} তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘কয়েকটি কথা’, *তারাশঙ্কর-রচনাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৭ব, পৃ- ২৮৮

^{৯৫} ঐ

^{৯৬} ঐ

^{৯৭} ঐ

^{৯৮} ঐ

^{৯৯} ঐ, ‘গ্রন্থ-পরিচয়’, পৃ- ৪৪৪

^{১০০} ঐ

^{১০১} ঐ

^{১০২} ঐ, পৃ- ৪৪৯

^{১০৩} ঐ, পৃ- ৪৪৫

^{১০৪} ঐ, পৃ- ৪৪৫-৪৬

^{১০৫} দ্রঃ ঐ, পৃ- ৪৫৭

^{১০৬} “এদিকে বাংলা দেশে লাগল কংগ্রেস নিয়ে বিরোধ। একদিকে সুভাষচন্দ্র [১৮৯৭-?], অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত [১৮৮৫-১৯৩৩]। দুজনকে কেন্দ্র করে প্রাদেশিক কংগ্রেস নির্বাচনে জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল। আমি তখন কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব ত্যাগ করলেও কংগ্রেসের সভ্য।” দ্রঃ ঐ

^{১০৭} ঐ

^{১০৮} তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর-রচনাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৭ব, পৃ- ২৮৯

^{১০৯} ঐ, পৃ- ২৯৬

^{১১০} ঐ, পৃ- ৩০৫

^{১১১} ঐ

^{১১২} স্বামী লোকেশ্বরানন্দ(অনু.), *উপনিষদ প্রথম ভাগ*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ- ৪-৫

^{১১৩} ঐ

^{১১৪} সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী (তর্জমা), *সায়ন মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ*, কলকাতা : সাহিত্যশ্রী, ১৩৮৩, পৃ- ১৬

- ^{১৫} এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে- রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *চার্বাক চর্চা*, কলকাতা : সদেশ, ২০১০, পৃ- ২৬১-২৬৪ এবং Ramkrishna Bhattacharya, *Studies on the Carvaka/Lokayata*, Delhi : Anthem Press, 2012, p- 123-129 বই দুটিতে।
- ^{১৬} তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর-রচনাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৭ব, পৃ-৩১৪
- ^{১৭} ঐ, পৃ- ৩২১
- ^{১৮} ঐ, পৃ- ৩৪৪
- ^{১৯} ঐ, পৃ- ৩৪৫
- ^{২০} ঐ
- ^{২১} ঐ
- ^{২২} ঐ
- ^{২৩} ঐ
- ^{২৪} ঐ
- ^{২৫} ঐ, পৃ- ৩৬৩
- ^{২৬} ঐ, পৃ- ৩৬৭
- ^{২৭} ঐ, পৃ- ২৮৮
- ^{২৮} ঐ
- ^{২৯} ঐ, পৃ- ৩৭৩
- ^{৩০} ওই, পৃ ৩৭৪
- ^{৩১} ঐ, পৃ- ৩৯০
- ^{৩২} ঐ, পৃ- ৩৯০-৯১
- ^{৩৩} ঐ, পৃ- ৩৯৫
- ^{৩৪} পঞ্চগনন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রীণা, *চার্বাক-দর্শনম্*, ২৪ পরগনা, শ্রীসাম্যব্রত চক্রবর্তী, ১৩৯৪ব,পৃ- ১৪
- ^{৩৫} সৌমিত্র বসু, 'নৈতিকতাঃ চার্বাকের দৃষ্টিতে', *ভারতীয় ধর্মনীতি*, অমিতা চ্যাটার্জি(সম্পা), কলকাতা, যা বি প্রকাশনা, পৃ- ২৪৮
- ^{৩৬} দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাকদর্শন*, কলকাতা : পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২, পৃ-১৫০
- ^{৩৭} *Nayamanjari of Jayantabhatta*, Varanasi : Chaukhamba Sanskrit series, 1971, p. 247
- ^{৩৮} Gokhale, Pradeep P., *Lokayata/Carvaka a Philosophical Inquiry*, New Delhi : OUP, 2015, p. 149
- ^{৩৯} তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর-রচনাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৭ব, পৃ- ৩৭৪
- ^{৪০} দ্র. হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, *চার্বাক দর্শন*, অবভাস, কলকাতা, ২০১৬, পৃ- ৬০
- ^{৪১} দ্র. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *চার্বাক চর্চা*, সদেশ, কলকাতা, ২০১০, পৃ- ২৬১-২৬৪ এবং Ramkrishna Bhattacharya, *Studies on the Carvaka/Lokayata*, Anthem Press, Delhi, 2012, p- 123-129

পঞ্চম অধ্যায়

প্রসঙ্গ ‘বাস্তবতা’: অস্তি-নাস্তি বোধ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বাস্তবতা ও ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্য বিষয়ক বিতর্কের কথা উল্লেখিত ও আলোচিত হয়েছিল। এই অধ্যায়ে সেই প্রসঙ্গগুলিই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। এই অধ্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে অস্তি-নাস্তিবোধের সঙ্গে ‘বাস্তবতা’ ও ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যের সম্পর্ক কেমন? সাহিত্যে কী উপস্থাপিত হবে এবং কী ভাবে তা নিয়ে সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিকদের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছে এবং আছেও। আস্তিক ও নাস্তিক দার্শনিক বোধ কি সেই বিতর্কে কোনো ভূমিকা পালন করেছে? এই প্রশ্নটি আমাদের এই অধ্যায়ের মুখ্য জিজ্ঞাসা। নিশ্চিত ভাবে একটি বিন্দুতে মিলতে হবে তা নয়। বরং এই প্রতর্কের টানাপোড়েন, বিভিন্ন পিছুটান, বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা আমাদের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু। তবে ‘বাস্তবতা’ এবং ‘অতি-আধুনিক সাহিত্য’ এই বিষয় দুটির মধ্যে আলোচনা কেন্দ্রীভূত থাকবে এই অধ্যায়ে।

শিল্প-সাহিত্যের জগৎ চিরকাল-ই ‘বাস্তব’কে উপস্থাপনার প্রসঙ্গে দ্বিধাশ্রিত, নির্দিষ্ট একটি বিন্দুতে তা মিলতে পারেনি। বস্তুত, ‘বাস্তব’ কী তা নিয়ে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দর্শন প্রস্থানগুলির দীর্ঘ অমীমাংসিত তর্ক, বিবাদ, বাক-বিতণ্ডার ছাপ সাহিত্যের জগতে পড়েনি তা নয়। অদ্বৈত বৈদান্তিকরা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতকে ভ্রম বা মিথ্যা বলে চিহ্নিত করেন। রামানুজ বস্তু জগতকে স্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত পরমের কথাই বলেন। বিপরীতে চার্বাক/লোকায়ত

দার্শনিকরা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতকেই একমাত্র জগৎ বলে মনে করতেন। মৃত্যুর অতীত কোনো জগতের অস্তিত্বে তাঁরা বিশ্বাসী নন। পাশ্চাত্য দার্শনিক প্লেটো তাঁর *সফিস্ট* গ্রন্থে যে বাস্তবতার ধারণা দেন, তা সফিস্টদের থেকে আলাদা। প্লেটোর বাস্তবতাবোধের কেন্দ্রে আছে ধারণার বিশ্ব, আদল বিশ্বের কথা, বিপরীতে সফিস্টের যে বাস্তবতা তা আসলে বস্তুবিশ্ব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব ও প্রতীয়মানতার বিশ্বের মধ্যে ঘটে চলা একটি ধারণা। ফলত; বস্তুজগৎ, পার্থিব জীবন-যাপন এসব কিছুই ‘বাস্তব’ অস্তিত্ব নিয়ে ভিন্নতার ছোঁয়া দর্শন প্রস্থানগুলির মধ্যে লক্ষণীয়। সম্ভবত সে কারণেই শিল্প-সাহিত্যের জগৎও বাস্তবতা নিয়ে খানিক দ্বিধাতুত, দোদুল্যমান এবং ক্ষেত্র বিশেষে অস্বস্তিও অনুভব করেছে। সাহিত্যে ‘বাস্তব’-এর প্রসঙ্গ থাকবে কিনা তা বিতর্কের বিষয় নয়, সাহিত্যে কী থাকবে এবং কতটা তাই মূলত বিতর্ক ও বিবাদের বিষয়। বস্তুজগৎ, জীবনের কোন্ প্রসঙ্গগুলি শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাবে এবং কোন্ কোন্ এলাকা নিষিদ্ধ থাকবে সে সব নিয়ে বিশ শতকে বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে কম বিতর্ক হয়নি। এই বিচার বিবেচনার সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে শীল-অশীল, নৈতিকতা, মঙ্গল ও সত্য সংক্রান্ত ধারণা। আমাদের প্রস্তাব এই বিতর্কের আপাত কারণগুলিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, কার্যত নিয়ন্ত্রণ করে দর্শন শাস্ত্রের চির-পুরাতন প্রতর্কটি। অস্তি-নাস্তি বোধ ‘বাস্তবতা’ ও ‘অতি-আধুনিক সাহিত্য’ বিষয়ক প্রতর্কের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

বাংলা সাহিত্যের জগতে ‘বাস্তব’-এর উপস্থাপনা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার সূত্রপাত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু প্রমুখ বিভিন্ন প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। যেহেতু উনিশ শতক আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র বসুর অভিমতটি

উল্লেখ করবো প্রক্ষাপট হিসেবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘উত্তরচরিত’ প্রবন্ধে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এ নিয়ে মন্তব্য করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—

“কেবল স্বভাবানুকারণী সৃষ্টিও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনার মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্যের প্রশংসা কি?”^১

পরে নিজের মতটি আরও স্পষ্ট করছেন—

“সে কেবল প্রতিকৃতি— অনুলিপি মাত্র— তাহাকে “সৃষ্টি” বলা যায় না। যাহা সত্যের প্রতিকৃতি মাত্র নহে— তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারণী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্র বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্র আকৃষ্ট হয় না। কেন না তাহা অসম্পূর্ণ, দোষসংস্পৃষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন— সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন এবং স্পষ্ট হইতে পারে।”^২

বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব ও কল্পনার যৌথতায় নির্মিত সাহিত্যকেই প্রকৃত সাহিত্যের মর্যাদা দিতে আগ্রহী, যা কেবল বাস্তবের অনুকৃতি নয়, বরং আদর্শায়িত বাস্তব। তাঁর বিচারের আকাঁড়া বাস্তব ‘দোষসংস্পৃষ্ট’ এবং ‘অসম্পূর্ণ’। যাকে পূর্ণতা দেন, মার্জিত করেন লেখক। গ্রিক দার্শনিকদের বাস্তবতা বিষয়ক ভাবনার সঙ্গে বঙ্কিমের মিল এখানে লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য তাঁর সাহিত্য ও বাস্তবতা বিষয়ক ভাবনা আন্তিক দার্শনিক প্রশ্নগুলির দ্বারা প্রভাবিত। আরেকটি প্রশ্ন ও তর্ক বঙ্কিমের লেখায় উঠেছে— পরে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে— যে সত্য ও বাস্তবের মধ্যের সম্পর্ক কী? আরেকটি ঝোঁক উনিশ শতকেই পরিলক্ষিত হচ্ছিল যে, ‘পাপ চিত্র’-এর চিত্রায়ণ কি সাহিত্যিকের পক্ষে উচিত কাজ? মূলত পূর্ণচন্দ্র বসুর লেখার মধ্যে এই প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি। ‘শৈবালিনী’ শীর্ষক লেখায় তিনি মন্তব্য করেছেন—

“যে পাপচিত্র দর্শনে পাপের প্রতি অপরক্তি এবং ঘৃণা না জন্মায়, সে পাপ-চিত্র অঙ্কিত না করাই ভাল।

এরূপ পাপ চিত্রের ধর্মনৈতিক ফল কখন সাধু বলিতে পারা যায় না। যাঁহারা বলেন ইহা চিত্রের দোষ

নহে মানব-প্রকৃতির দোষ, তাঁহারা ঔপন্যাসিক কাব্য এবং প্রকৃত ইতিহাসের প্রভেদ জানেন না। রামায়ণের

পাত্র এবং পাত্রীগণের চরিত্র পর্যালোচনা করিলে আমাদের কথার মর্ম প্রকাশিত হইবে।”^৩

পূর্ণচন্দ্র বসুর মতামতের সঙ্গে নৈতিকতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং বঙ্কিম অপেক্ষা তাঁর সাহিত্য

ভাবনা অনেক বেশি রক্ষণশীল। ভারতীয় দর্শনের পুরুষকার সংক্রান্ত অভিমতের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্র

বসুর মতামতকে মিলে পড়া যায়। বিশ শতকে ‘সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা’বাদীদের অভিমতের সঙ্গে

তাঁর মতামতের আশ্চর্য মিল আমরা লক্ষ্য করি। বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁদের বক্তব্যের কিঞ্চিৎ পার্থক্য

আছে, সাহিত্য কেবল সৌন্দর্যের চিত্রণ নয়, চরিত্র ও সমাজ গঠনেও তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সেকারণে ‘কুপ্রবৃত্তি’ চিত্রণ সমাজের জন্যে অশুভ বলে রায় দেন তাঁরা। ‘বাস্তবতা’ অপেক্ষা

নৈতিকতাই তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত এই বিচারকসুলভ মানসিকতা উনিশ শতকে

‘বাস্তবতা’ সংক্রান্ত বিতর্কটিকে খুব বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এই প্রবণতা বা

ঝোঁক বিশ শতকেও যে লক্ষ্য করা যায় না, তা নয়। কিন্তু নব উদ্ভূত সামাজিক পরিস্থিতি ও

বিভিন্ন সাহিত্য গোষ্ঠীর অবস্থান এই বিতর্কটিকে নতুন করে প্রণোদনা যোগায়। প্রকৃত প্রস্তাবে

বাংলা সাহিত্য চর্চার জগতে বাস্তবতা সংক্রান্ত বিতর্কের সূত্রপাত বিশ শতকেই। এবং তার

শুরুয়াৎ রবীন্দ্র সাহিত্যকে ঘিরেই।

বাংলা সাহিত্য চর্চার জগতে ‘বাস্তবতা’ সংক্রান্ত বিতর্কটিকে মূলত দুটি পর্বে বিভক্ত

করা যায়। এক, রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যথেষ্ট বাস্তবোচিত নয় এবং

বৃহত্তর জনজীবনের ছাপ তাঁর আখ্যানে কার্যত অনুপস্থিত। দুই, দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ-ই

পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্যিকদের আক্রমণ করেন ‘বিলেতের আমদানী’ করা সাহিত্য সৃষ্টির

জন্যে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন আরোও অনেকানেক সমালোচকই আধুনিক সাহিত্যিকদের সমালোচনা করেছিলেন বিভিন্ন প্রক্ষে। এই পর্বের বিতর্কের মধ্যে নানান স্তরায়ণ লক্ষ করা যায় এবং তাঁদের ‘বাস্তবতা’ ও ‘অতি-আধুনিক সাহিত্য’ ভাবনার সঙ্গে লগ্ন হয়ে থেকে অস্তি-নাস্তি সম্বন্ধীয় বোধ, মঙ্গল-অমঙ্গলের চেতনা। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিপিনচন্দ্র পালের (১৮৫৮-১৯৩২) ‘চরিত-চিত্র রবীন্দ্রনাথ’। তিনি অভিযোগ করেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে ‘বস্তুতন্ত্রহীন’, ‘মায়িক’ সৃষ্টি হিসেবে অভিহিত করেন। এটিই বাংলা সাহিত্যের জগতে বাস্তবতা সংক্রান্ত বিতর্কের শুরুয়াৎ।^৪ বিপিনচন্দ্র পালের অভিযোগকে খণ্ডন করতে এগিয়ে আসেন রবীন্দ্রানুরাগী মানুষজন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) প্রমুখ কলম ধরেন বিপিনচন্দ্র পালের বিরুদ্ধে। এই তর্ক চলে ১৩২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। *প্রবাসী* পত্রিকায় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে ‘রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রহীন?’ শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন সাহিত্য কেবলমাত্র বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়, বরং তা বাস্তব ও কবি কল্পনার সংযোগে নির্মিত সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবনের আখ্যান। তাঁর বিচারে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাস্তববাদী। বিপিনচন্দ্র পালের মতের প্রতিধ্বনি করেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৬৮)। তিনটি বিষয়ের দিকে তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন— এক, রবীন্দ্রসাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। দুই, বৃহত্তর জনজীবনের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায় না তাঁর লেখায়। তিন, তাঁর সাহিত্যকে কোন ভাবেই লোকশিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যায় না। এর বিরোধিতা করে প্রবন্ধ লেখেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩২১ বঙ্গাব্দে *সবুজ পত্র* পত্রিকার শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ‘বাস্তব’ ও ‘লোকহিত’ প্রবন্ধ দুটি। পরে ‘কবির কৈফিয়ত’ নামে আরেকটি প্রবন্ধ লেখেন। যেগুলিতে তিনি স্পষ্ট করেন বাস্তবতা বিষয়ে তাঁর অবস্থান।

‘চিরকালের বাস্তব’ নামক একটি ধারণার কথা বলেন, যা কিনা ঠিক আঁকাড়া বাস্তব নয়, বস্তুজগৎ ও কবি চৈতন্যের সংযোগে নির্মিত বাস্তব। আমরা মূল প্রবন্ধগুলির দিকে নজর দেবো, দেখার বোঝার চেষ্টা করবো এই বিতর্কের সঙ্গে অস্তি ও নাস্তি বোধের সম্পর্ক কেমন?

১৩১৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে। একাংশের মানুষ সেই সম্বর্ধনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র সমালোচনা ও নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। বিপিনচন্দ্র প্রবন্ধের শুরুতে এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে বেশ উদ্ভা প্রকাশ করেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ কবিত্ব বা শিল্পীসত্তার কারণে নয়, বরং ‘কুলের গৌরব ও ধনের গৌরব’-এর কারণেই সম্বর্ধিত হচ্ছেন। কেবল কবিত্ব শক্তির বিচারে এই সম্মান পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব কারণ প্রকৃত বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যে সৃষ্টিতে তিনি খানিক ব্যর্থ। কেন বলছেন এই কথা? বিপিনচন্দ্র পালের মতে—

“প্রাচীন ধর্ম সকলেই গুরুমুখী। সকলেই অবতাররূপে বা গুরুরূপে ভগবানের একটা বহিঃপ্রকাশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবিগণ ভগবানের দ্বিবিধ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এক অন্তরে— চৈত্যান্তরূপে; অপর বাহিরে— মোহন্ত-গুরুরূপে। এই জন্যই তাঁদের সাধনা যুগপৎ অন্তর্মুখীন ও বস্তুতন্ত্র হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তে ও সাধনায় কেবল চৈত্যান্তরুই স্থান আছে, বৈষ্ণবেরা যাঁহাকে মোহন্তগুরু বলেন, তার স্থান নাই।”^৫

এরপরে বৈষ্ণব সাধনা সম্পর্কে তিনি লিখছেন যে, বৈষ্ণব সাধনায় ভেতর-বাইরের এই অপূর্ব সমাবেশ আছে বলে, বৈষ্ণব কবিরা একান্ত অন্তর্মুখীন হয়েও, বস্তুতান্ত্রিক। এটাই রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব সাধনার মধ্যকার পার্থক্য। তাঁরা একই সঙ্গে অন্তর্মুখী এবং বস্তুতান্ত্রিক।^৬ রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখীনতা সম্পর্কে বলছেন—

“অন্ধকার ও নিরাকার উভয়ই জ্ঞানসীমার বহির্ভূত। দুই-এর কোনোটাকেই জ্ঞানগোচর করা সম্ভব নহে।

... ইহার ফলে মনে ও সত্যে, কল্পনাতে ও বস্তুতে মূলতঃ কোনো প্রভেদ আর থাকে না। এ অবস্থায়

পরিণামে কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই বস্তুর প্রামাণ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং একমাত্র অনুভূতিই সত্যের আসন অধিকার করিয়া বসে। সত্যের সার্বজনীনতা রাখা তখন একান্তই দুষ্কর হইয়া উঠে। যে তত্ত্বে এই সার্বজনীনতা রক্ষা পায়, রবীন্দ্রনাথ এখনো সে তত্ত্বকে ভাল করিয়া ধরিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।”^৭

তাঁর মনে নিরাকার উপাসনাই রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার বিকাশের প্রধান বাধা। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবারের বিশেষ দার্শনিক বিশ্বাস ও অভ্যাসকে বিপিনচন্দ্র দায়ী করছেন। বৈদান্তিক সাধনা বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে সত্য বা ব্রহ্মের সাধনা করতে বলে, বিপিনচন্দ্রের মতে এই বিশেষ জ্ঞানমার্গী সাধনা সম্ম্যাসীর, গৃহীর জন্যে নয়। এই দার্শনিক অবস্থান রবীন্দ্রনাথ পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছেন, যা তাঁর সাহিত্যিক বিকাশের পক্ষে অন্তরায়। বিপিনচন্দ্র লিখছেন— “এই অন্তর্মুখীনতার আতিশয্য হইতে, ইংরাজীতে যাহাকে Subjective Individualism বলে, তাহার উৎপত্তি হয়।”^৮ এই ‘নিঃসঙ্গ স্বানুভূতি’-ই ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি। আর রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়নি, সেকারণে বস্তুজগতকে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অপারগ এবং ব্যর্থ। ‘বাস্তবতা’ প্রসঙ্গে এই আপত্তি সাকার ও নিরাকার ঈশ্বর চিন্তার দ্বন্দ্ব। অস্তিবাদী দুই দর্শন প্রস্থানের দ্বন্দ্ব-ই এই বিতর্কের ভিত্তি।

দার্শনিক অবস্থান থেকে সমালোচনা করার পাশাপাশি, আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে পড়তে চেয়েছেন বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিনচন্দ্র বলছেন—

“যাঁদের অল্পচিন্তা নাই, সঞ্চিৎত ধন যাঁহাদিগকে দৌনন্দিন জীবিকা-উপার্জনের শ্রম ও ব্যস্ততা হইতে মুক্তি দিয়াছে, তাঁরাও কেবল আপনার সমশ্রেণীর ধনীজনের সঙ্গেই আলাপ-আত্মীয়তা করেন, জনসাধারণের সঙ্গে কোনোরূপ ঘনিষ্ঠতা তাঁদের জন্মিতেই পারে না।”^৯

ফলে— এদের ‘অন্তঃপুরে’ জনসাধারণের প্রবেশ করতে পারেনি এবং বৃহত্তর জনসাধারণের জীবনের ‘অন্তঃপুরেও’ রবীন্দ্রনাথের প্রবেশাধিকার নেই।^{১০} তাঁর সিদ্ধান্ত— বাংলাদেশের অতি

নিকটে থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সাহিত্য পল্লীজীবন ও বাঙালির প্রকৃত প্রাণের সন্ধান পায়নি। প্রবন্ধের শেষে অভিযোগ করলেন রবীন্দ্র সাহিত্য ‘মায়িক’। বিপিনচন্দ্র লিখছেন—

“উর্গনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপন অন্তর হইতেই অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তু সকল বাহির করিয়া, আপনার অদ্ভুত কাব্য সকল রচনা করিয়াছেন। তাঁর কাব্য যেমন কচ্চিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও অনেক সময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।”^{১১}

কিন্তু পাঠককে সেই ‘অঘটনপটীয়সী মায়াশক্তি’ তৃপ্ত দেয় না। এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে চলে আসে কিছু নিন্দা বাক্য যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সর্বদা কানে ‘মধু ঢালে’, ‘প্রাণে সাড়া জাগায়’, বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করে কিন্তু কখনই কোনো ‘স্থির সিদ্ধান্তে’ উপনীত হতে সাহায্য করে না।^{১২} সেটিই মায়ার ধর্ম। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তব্য সিদ্ধান্ত জানানোও সাহিত্যের কাজ এবং রবীন্দ্রনাথ সে কাজে ব্যর্থ। তাঁর বাস্তবতা বিষয়ক ধারণা সাহিত্যকে আনন্দের সামগ্রী হিসেবে দেখে না। সাহিত্যের সঙ্গে কর্তব্যবোধ, হিতাহিতের যোগ স্পষ্ট। কিন্তু মায়াকে অতিক্রম করাই প্রকৃত কবিত্বের লক্ষণ, বিপিনচন্দ্রের মতে। মায়িক সৃষ্টি ও মায়া শক্তি অতিক্রম করলেই কবি ঋষিত্ব লাভ করেন। ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথ কেবল একটি বস্তুর অভাবহেতু সত্যলোক ও ব্রহ্মলোক স্পর্শ করতে পারছেন না। কী সেই বস্তু? ‘সাধুবৈদ্যের’ সঙ্গ। বিপিনচন্দ্র প্রবন্ধ শেষ করছেন—

“যুরোপপর্য্যাটনে না যাইয়া রবীন্দ্রনাথ যদি ভারতের পূণ্যতীর্থভ্রমণে আজ বাহির হন, তবে হয় ত, ভাগবৎ প্রসাদে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোনো ‘সাধুবৈদ্যের’ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এ অভাব পূরণ করিতে পারিতেন।”^{১৩}

বস্তুতন্ত্রতার প্রসঙ্গ তুলেও শেষ পর্যন্ত বিপিনচন্দ্র পাল ‘বাস্তবতা’ বিষয় তর্কটিকে যে দিকে নিয়ে গেলেন তা কি বস্তুতন্ত্রতার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে? করলে, আধুনিক সাহিত্যের একজন

পাঠক হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির তুলনা করতেন না। এবং বস্তুতন্ত্রতার দোহাই দিয়ে কবিকে সাধুসঙ্গের পরামর্শ দিতেন না। এই তর্ক শেষাঙ্গি সাকার ও নিরাকার উপাসন পদ্ধতির তরজায় পর্যবসিত হয়েছে। যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলেছিল তাঁর লেখায়; বৃহত্তর জনসাধারণ, জনজীবনের কথা উপস্থাপিত করাও সাহিত্যিকের দায় সেই সম্ভাবনাটি আর বিকশিত করতে পারেন না বিপিনচন্দ্র।

প্রসঙ্গত, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক থাকাকালীন সাকার উপাসনার মতোই নিরাকার উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিলেন। ১২৯২ব. শ্রাবণ মাসে ‘সাকার ও নিরাকার উপাসনা’ শীর্ষক বক্তৃতা দেন রবীন্দ্রনাথ। সেই বছরেই ভারতীয় শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের টীকা সমেত পুনর্মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেখানে পৌত্তলিকতার বিরোধিতা তো করেনই পাশাপাশি ব্রাহ্মদের উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। খেয়াল রাখা দরকার তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিত। সেই অবস্থাতে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের ঈশ্বর সাধনার পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

“পৌত্তলিকতার এক মহদোষ আছে। চিহ্ন^{৪৮} যথার্থ বলিয়া মনে করিয়া লইলে অনেক সময়ে বিস্তর ঝগড়াট বাঁচিয়া যায় এই জন্য মনুষ্য স্বভাবতই সেইদিকে উন্মুখ হইয়া পড়ে। পুণ্য অত্যন্ত শস্তা হইয়া উঠে। পুণ্য হাতে হাতে ফেরে। পুণ্যের মোড়ক পকেটে করিয়া রাখা যায়, পুণ্যের পঙ্ক গায়ে মাখা যায়, পুণ্যের বীজ গাঁথিয়া গলায় পরা যায়। হরি নামের মাহাত্ম্যই এত করিয়া শুনা যায় যে, কেবল তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তৎসঙ্গে তাঁহার স্বরূপ মনে আনা আবশ্যিক বোধ হয় না। ব্রাহ্মদের কি এ আশঙ্কা নাই! কেবল মূর্তিই কি চিহ্ন, ভাষা কি চিহ্ন^{৪৯} নয়! আমি এমন কথা বলি না। মনুষ্যমাত্রেরই এই আশঙ্কা আছে। এবং সেই জন্যই ইহার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করা আবশ্যিক। সকল চিহ্ন অপেক্ষা ভাষা-চিহ্নে এই আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অল্প থাকে। তথাপি ভাষাকে সাবধানে ব্যবহার

করা উচিত। ভাষার দ্বারা পূজা করিতে গিয়া ভাষা পূজা করা না হয়। দেবতার নিকটে ভাষাকে প্রেরণ না করিয়া ভাষার জড়ত্বের মধ্যে দেবতাকে রুদ্ধ করা না হয়।”^{১৬}

সাকার উপাসনাকে সমালোচনা করার পাশাপাশি ব্রাহ্মদের উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে সংশয় যে তাঁর মধ্যে তৈরি হয়েছিল এই লেখাটি সে কথা বুঝিয়ে দেয়। কার্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, কিন্তু সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মতের দ্বন্দের স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে এই লেখাটিতে। ভাষার মাধ্যমে পূজোও যে আসলে সত্যের থেকে চিহ্নকে বেশি মর্যাদা দিতে পারে সেই বিষয় তিনি সচেতন হচ্ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য দর্শনের পেছনে নিরাকার ঈশ্বর সাধনার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কতটা নিরাকার উপাসনায় আস্থা রাখতেন তা সন্দেহের বিষয়। ‘ধর্ম’ প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ দিনে দিনে উদার হয়েছেন, আনুষ্ঠানিকতাকে সরিয়ে রেখে আত্মানুসন্ধান ব্যপ্ত থেকেছেন।

এর প্রত্যুত্তরে অজিতকুমার চক্রবর্তী *প্রবাসী*তে লেখেন ‘রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্য্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন?’। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর অনুরাগীদের লেখাতে ‘বাস্তবতা’ প্রসঙ্গে যে দৃষ্টিকোণ পরিস্ফুট হয় তার মধ্যে অস্তিবাদী বা ভাববাদী দর্শনের প্রভাব লক্ষণীয়। অজিতকুমার চক্রবর্তী কবির ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যের সম্পর্কে বলছেন যে, বিপিনচন্দ্র পাল ঠিক সাহিত্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে পড়েননি, তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য মিলিয়ে পড়তে চেয়েছেন। ফলে জীবনের এমন সব ঘটনা উঠে এসেছে তাঁর বিচারে, যার সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ নেই।^{১৭} পরে মন্তব্য করেছেন— “কবিত্বের বিচারকালে জীবনের ঘটনার দিক হইতে বিচার করা অন্যায়। কবিত্বের রসের আদর্শের দিক হইতে, তাহার আপনার দিক হইতেই বিচার করিতে হইবে।”^{১৮} কেন পার্থিব জীবনের দিক থেকে সাহিত্যকে বিচার করা

অন্যায় বলছেন অজিতকুমার? কিছু পরেই তাঁর অবস্থানটি স্পষ্ট করছেন, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতা বিষয়ক ভাবনার মিল আছে তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ভাবনা সঙ্গে মিল লক্ষণীয়। যদিও পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক অ্যারিস্টটল কাব্যকে বস্তুজগৎ ও মানবিক কর্মকাণ্ডের অনুকরণ হিসেবেই দেখেছেন। অজিতকুমার লিখছেন—

“আমি বলিয়াছি তাঁহার কাব্যের ভিতরকার কথাটি হইতেছে, সর্ব্বানুভূতি বা বিশ্ববোধ— অর্থাৎ তিনি খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে, রূপের মধ্যে অপরূপকে, সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব করিবার একটি আশ্চর্য্য স্বাভাবিক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি খণ্ডতা অর্থাৎ যাহাকে আমরা বলি বাস্তব তাহাকে খুবই মানেন এবং তাহার সমস্ত স্বাদ ও সমস্ত অভিজ্ঞতা না লাভ করিয়া ক্ষান্ত হন না। কিন্তু তিনি সেই খানেই দাঁড়ি টানেন না— তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার দৃষ্টি যেখানে তাহার সত্যতা, তাহার অখণ্ডতা, সেইখানে গিয়া পৌঁছায়। সৌন্দর্য্য বল, প্রেম বল, স্বাদেশিকতা বল, তাঁহার অনুভূতি সর্ব্বত্রই অতি প্রবল; কিন্তু সেই প্রবলতাই তাঁহার সত্য নয়। সত্য— যখন সেই সকল খণ্ড আবেগকে তিনি অখণ্ড বিশ্বানুভূতির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া সত্য করিয়া দেখিতে পান তখনই।”^{১৯}

কেবল আকাঁড়া বাস্তবের অনুকৃতি কবি বা সাহিত্যিকের কাজ নয়। বস্তু জগতের খণ্ড খণ্ড উপাদানগুলিকে জুড়ে গভীর সত্যকে উপস্থাপিত করেন, সেটি হলো কবি বা সাহিত্যিকের বাস্তব। বাস্তবের নতুন সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। পরে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরীর লেখার এই ধারণাটি আরও বলিষ্ঠ ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ঐ প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের দিকে নজর দেবো। যিনি এই বিতর্কে বিপিনচন্দ্রের মতাবলম্বী। যদিও উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

প্রবাসী ও সবুজপত্র-এ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ‘লোকশিক্ষক বা জননায়ক’ শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠে এবং ‘সাহিত্যে বাস্তবতা’ শীর্ষক প্রবন্ধটি সবুজ পত্র-এ ১৩২১ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা

প্রকাশিত হয়। কালানুক্রমিক ভাবে না হলেও প্রথমে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যগুলিকে উল্লেখ করার পর তাঁর প্রতিপক্ষগণের, অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি উল্লেখ করবো। তিনি মূলত বিপিনচন্দ্র পালের অভিমতটির সমর্থক, তবে নিজস্ব বক্তব্য যে নেই তা নয়। মূলত তিনটি বৈশিষ্ট্য বা ঝোঁক তাঁর অভিযোগের মধ্য দিয়ে উঠে আসে— এক, রবীন্দ্র সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। দুই, এ সাহিত্য বৃহত্তর জনসমাজের উপযোগী নয়। তিন, এ সাহিত্যকে কোনো ভাবেই লোকশিক্ষার কাজে ব্যবহার করা চলে না। তাঁর ‘লোকশিক্ষক বা জননায়ক’ প্রবন্ধটির প্রত্যুত্তরের রবীন্দ্রনাথ ‘বাস্তব’ ও ‘লোকহিত’ শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। পাল্টা রাধাকমল লেখেন ‘সাহিত্যে বাস্তবতা’ নামক প্রবন্ধ। এরপর কলম ধরেন প্রমথ চৌধুরী, *সবুজ পত্র*-এ প্রকাশিত হয় ‘বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?’। রাধাকমল ‘সাহিত্য ও স্বদেশ’ শীর্ষক একটি লেখায় উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। এরকিছু পরে প্রকাশিত হয় ‘কবির কৈফিয়ত’, রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহযোগীরা একের পর এক প্রবন্ধে আকাঁড়া বাস্তবতার ধারণাটি নাকচ করে ‘আদল’ বা কবির সত্য নামে একটি আদর্শায়িত বাস্তবতার তত্ত্ব খাঁড়া করেন, এবং ক্ষেত্র-বিশেষে বাস্তবতাবাদীদের খানিক উপহাসও করেন।

রাধাকমল প্রবন্ধটি শুরু করছেন সাক্ষরতা প্রসার, বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রসঙ্গ তুলে। সেই সঙ্গে বলেছেন যে, শিক্ষার প্রসারের উদ্যোগ জনমানসে গভীর ছাপ ফেলেছে। বাংলা কৃষিজীবী, শ্রমজীবী সমাজের একাংশের মধ্যে নতুন জীবনের উন্মেষ দেখা দিয়েছে। ‘শিক্ষা’ বৃহত্তর জনসমাজকে জীবিকা নির্বাহের সহায়কার ভূমিকা পালন করছে। প্রবন্ধের শুরুতেই যে ইঙ্গিতটি রাধাকমল দিলেন, তা থেকে স্পষ্ট যে তিনি সাহিত্যকে কীভাবে দেখছেন এবং সাহিত্যে ‘বাস্তবতা’ বলতে কী বুঝতে চাইছেন। তাঁর মতে বাঙালি জনসাধারণের প্রধান চারিত্র গুণ ‘আধ্যাত্মিকতা’, যেটির সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকে বিশেষ কিসিমের অস্তিবোধ। যা নিয়ত

খেয়াল করায় জগৎ-সংসার, পরিবার, আত্মজন সবই ‘অনিত্য’। বাঙালির সেই চারিত্র লক্ষণটি এখনো উজ্জ্বল আছে *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও বিভিন্ন ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের কারণে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করছেন—

“এরূপ ভাব, সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে এরূপ দৃঢ় ধারণা, ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তি, অদৃষ্টের প্রতি অটল নির্ভরতা, অন্য কোন জাতির জনসাধারণের হৃদয়ে কখনই স্থান পায় না। ... আমাদের লোকসাহিত্যে এরূপ একটা ভাবুকতা আছে— যাহা ইউরোপীয় জাতিসমূহের উচ্চ সাহিত্যেও বিরল। ... যাহা একজন ইউরোপীয় দার্শনিককে বিশ্লেষণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয়।”^{২০}

কিন্তু যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বল্লেন, যা কিনা শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবিকা নির্বাহে মস্ত ভূমিকা পালন করছে সেই শিক্ষার সঙ্গে এই সাহিত্যের সম্পর্ক ঠিক কোথায়, সেটি তাঁর লেখায় স্পষ্ট নয়। বরং যে শিক্ষার কথা বলেছেন এবং যে সাহিত্য জনসাধারণকে আধ্যাত্মিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে; তাদের মধ্যে সম্পর্ক বিরোধের-ই। পরে আরেক জায়গায় ‘হিন্দুসমাজ’-এর লোকসাহিত্য প্রসঙ্গে লিখছেন—

“শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে, বাংলার জনসাধারণ কৃষক শিল্পীগণই বাঙালীর বাঙালীত্বকে এখনও সজীব সতেজ রাখিয়াছে। বাঙালীত্ব কি তাহা পূর্বেই সূচনা করিয়াছি,— ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুর অনন্তবোধ,— সংসারের সমস্ত বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও একটা অসীমে প্রীতি একটা অনন্তের আকর্ষণ। ... সংসার ও সন্ন্যাস, বন্ধন ও মুক্তি, ভোগ ও ত্যাগ, ইন্দ্রিয় ও তুরীয়, সসীম ও অসীমের সমন্বয় সাধন। ... ইহাই হিন্দুসমাজের, বাঙালী সমাজের অন্তরতম প্রাণের আকাঙ্ক্ষা; ইহাই হিন্দুসাহিত্যের, বাংলার লোকসাহিত্যের বাণী।”^{২১}

তাঁর মতে সাহিত্যের মুখ্য কাজ মোক্ষ লাভের পথ দেখানো। বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে খোঁজেন আনন্দের সুর।

উনিশ শতকে তৈরি হওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি বৃহত্তর জনসমাজের থেকে যে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সে কথা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রাধাকমল মুখোপাধ্যায় যে নিদান দিলেন সাহিত্য রচনার তা বাস্তবোচিত নয়। তাঁর কাছে আধুনিক মধ্যবিত্তের সৃষ্ট সাহিত্য কৃত্রিম, যাকে সমূলের উৎপাতন করা উচিত।^{২২} কেবল রবীন্দ্রনাথ নয়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ে প্রমুখের লেখাও কৃত্রিম, কারণ হিসেবে উল্লেখ করছেন— প্রকৃত জাতি ত কয়েকজন ইংরেজী শিক্ষিত উকিল, ব্যারিস্টার, মাস্টার, কেরানী, সম্পাদককে নিয়ে নয়। সত্যিকারের বাঙালি জাতিকে চিনতে হলে ‘পর্ণকুটীরবাসী’ অশিক্ষিত কৃষক, তাঁতি, জোলা, মজুর, কামার, তেলী ও নাপিতের অভাব ও অভিযোগ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানতে হবে।^{২৩} রবীন্দ্রনাথ ও অপারারপর সাহিত্যিকদের লেখায় প্রকৃত বাঙালির জীবনের স্পন্দন রাধাকমল খুঁজে পাননি। যে সাহিত্যের পক্ষপাতিত্ব তিনি করছেন, তার মধ্যে ‘পর্ণকুটীরবাসী’ অশিক্ষিত বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বর কি পাওয়া যায়? দ্বিতীয়ত, সেই সাহিত্যকে প্রকৃত প্রস্তাবে কি বাস্তবতাবাদকে সমর্থন করে? এককথায় বলা যায় না। বরং তাঁর বাস্তবতা সংক্রান্ত ভাবনার একপ্রকার ভ্রান্তি-ই ছিল। পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি যে, তিনি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে এক অর্থে চারিয়ে দিতে চেয়েছেন সংসারের ‘অনিত্যতা’ সম্বন্ধীয় ধারণা। ফলত, প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তুজগতের অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর মধ্যে এক প্রকার সংশয় রয়েছে, বিপরীতে তিনি সাহিত্যের কাছে চেয়েছেন সেই দর্শনেরই সমর্থন। উনিশ শতকের শেষের দিকে যে হিন্দু পুনরুত্থানের জাগরণ হয়েছিল, সেই ভাবনা অনেকাংশে রাধাকমলকে প্রভাবিত করে। সে কারণেই তিনি প্রবন্ধের শেষে বলবেন— “সুপ্ত জাতিকে বহু শতাব্দীর নিদ্রা ও অবসাদ হইতে উদ্ধার করিতে হইলে ভগবানের অংশসম্ভূত লোকচরিত্রনিয়ামক কর্ম্মীর প্রয়োজন।”^{২৪} (বাঁকা হরফ আমার) যিনি ‘হীনবল জনসাধারণকে’ বিন্দু বিন্দু করে শক্তিদান করে কর্মের উৎসাহিত করবেন।^{২৫} বস্তুত, সাহিত্য তাঁর কাছে ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার অংশ, সেটির

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকারে রাধাকমল অপারগ। বাস্তবতা তাঁর কাছে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার উপলক্ষ্য মাত্র, বরং আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনায় বৃহত্তর জনসমাজের অনুপস্থিতি মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অপেক্ষা, আধ্যাত্মিকতার অনুপস্থিতি বেদনা ও অভিযোগের মূল কারণ।

বাস্তবতা বিষয়ে রাধাকমলের অবস্থান স্পষ্ট হয় ‘সাহিত্যে বাস্তবতা’ শীর্ষক প্রবন্ধে। শুরুতেই তিনি বলেন আধুনিক সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন। আধুনিক সাহিত্যিকেরা শিল্পী বা ধর্মপ্রচারক নন তাঁদের প্রধান কাজ যুগধর্মকে উপস্থাপিত করা ও নবযুগ আনা।^{২৬} কিন্তু যুগধর্মকে একজন সাহিত্যিক কীভাবে প্রকাশিত করবেন? রাধাকমল মতে, যুগধর্মকে প্রকাশ কতে চাইলে সাহিত্যকে অবশ্যই বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন করতে হবে। সাহিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করেই রস সৃষ্টি করে। বস্তুত পক্ষে, বাস্তব হলো রসের आधार।^{২৭} বাস্তবকে অস্বীকার করে সাহিত্য রচনা করলে তা হবে কাগজের ফুলের মতো ‘অলীক ও কৃত্রিম’^{২৮}। রাধাকমল ‘বাস্তবতা’ পক্ষে তীব্র ভাবে সাওয়াল করছেন, এবং বাস্তবতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সমর্থকদের মতামতকে খারিজ করছেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত কি তিনি বাস্তবানুগ থাকছেন? রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘বাস্তব’ চৈতন্যের বা আত্মানুভূতির প্রকাশ, এবং অবশ্যই জাগতিক বাস্তবের সৌন্দর্যময় প্রকাশ। আর রাধাকমলের কাছে ‘বাস্তব’ হিন্দু ধর্ম, সংস্কার; বস্তুত প্রাচীন আদব-কায়দা, রীতি-নীতি, আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার নামান্তর। গোটা প্রবন্ধটি স্ববিরোধীতায় পরিপূর্ণ। একাধারে তিনি মনে করেন বাস্তবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-রসেরও বদল ঘটছে। তবুও বাস্তবের মধ্যে ‘নিত্যতা’ আছে, সেকারণেই দেশ-কাল-অতিক্রম করে, সমকালীন বাস্তবতার ছোঁয়া না থাকলেও রসাস্বাদন সম্ভবপর হয়। তাঁর মতে, ‘রস ও বস্তু, দুইয়ের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে, একটা অনিত্যতাও আছে।’^{২৯} তাহলে সাহিত্যিকের কাজ কী? রাধাকমল লিখছেন—

এক, “অনিত্য বাস্তবের মধ্যে নিত্য-রস ও নিত্য বস্তুকে লাভ করা সাহিত্যের চরম সাধনা। শুধু লাভ করা নহে, নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে প্রকাশ করাও সাহিত্যের সাধনা।”^{৩০}

দুই, “বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা প্রত্যেক সাহিত্যের ভিতর যুগধর্মের প্রভাব ও দেশকালপাত্রভেদকে অতিক্রম করিয়া স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধ হইতে একটা নিত্য রসের পরিচয় লাভ করিতে পারি। সাহিত্যের চঞ্চল রস-স্রোতের মধ্যে সেই সনাতন পুরুষ ও নারী নিত্য ভাসমান।”^{৩১}

তিন, “বাস্তবের মধ্যে যাহা কিছু হয়, ঘৃণ্য, নগণ্য, তাহা ধসিয়া পড়ে, একটা সুন্দর, মহনীয় বাস্তব গড়িয়া উঠে। এখানেই সাহিত্যের গুরু ও শিক্ষকের কার্যের পরিচয় পাওয়া যায়।”^{৩২} (বাঁকা হরফ আমার)

তিনি বলেন বটে সাহিত্যিক ধর্মপ্রচারক নন, কিন্তু তাঁর প্রস্তাবগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে একটি বিশেষ ধর্মীয় ভাবনাকে সাহিত্যের জগতে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর উদ্দেশ্য, বাস্তবতা সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র। প্রকৃতই যদি তিনি বাস্তবতাবাদী হতেন তাহলে বস্তুজগতের যথাযথ ভাবে উপস্থাপনার বিরোধীতা তিনি করতেন না। তাঁর নৈতিকতায় যা ‘ঘৃণ্য’, ‘হীন’ ও ‘নিকৃষ্ট’ তাকে ‘ধসিয়ে’ দিয়ে ‘সনাতন’ বাস্তবকেই প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখেন। রাধাকমলের শব্দ চয়ণ গুরুত্বপূর্ণ। শব্দ চয়ণ থেকেই বোঝা যায়, আর যাই হোক বাস্তবতা নয় বরং একটি বিশেষ ধর্মীয় দর্শনের পক্ষপাত-ই সাহিত্যিকের একমাত্র কর্তব্য। যা ‘লোকশিক্ষক ও জননায়ক’ প্রবন্ধে স্পষ্ট করেছেন। হিন্দুসমাজ গঠনই তাঁর আদর্শ। আপাতভাবে ‘বাস্তবতাবাদী’ রাধাকমল প্রকৃত পক্ষে অধ্যাত্মবাদী। বাক্যে বাস্তবতাবাদের পক্ষে সওয়াল করলেও সাহিত্যে বাস্তবে ‘বাস্তবতা’ নামক অবস্থানটিকে নিকেশ করার পক্ষপাতী।

রবীন্দ্রগোষ্ঠীর দুটি প্রবন্ধের কথা আমরা উল্লেখ করবো। একটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখা, অপরটি প্রমথ চৌধুরীর। ১৩২১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে *সবুজ পত্র*-এ প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরীর ‘বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?’। বাস্তবতা বিষয়ক বক্তব্য অপেক্ষা প্রমথ চৌধুরীর অধিক নজর ছিল রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য খণ্ডনে। তিনি ভারতীয় দর্শনাচার্যদের মত উদ্ধৃত করে

রাধাকমলের অভিমত কতটা বস্তুহীন তা প্রতিষ্ঠা করা চেষ্টা করেছেন। রামানুজ, শঙ্করাচার্যের পাশাপাশি এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২) কথাও এসেছে লেখার মধ্যে। সেই সূত্রে ইউরোপীয় বাস্তবতার সমালোচনাও করেছেন তিনি। তাঁর কাছে যা কিছু চিত্তে ‘আনন্দ’ সঞ্চার করে তাই বাস্তব। পরে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। যুক্তি, প্রতियুক্তি প্রমথ চৌধুরীর অনন্যতা, এই প্রবন্ধেও সেই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ‘বাস্তবতা’ ও ‘রিয়ালিজম’-এর যে প্রভাব বাংলাদেশে পড়েছে তা আদতে ইউরোপের অনুকরণ, এমনটাই মনে করেন প্রমথ চৌধুরী। প্রসঙ্গত, ইউরোপীয় দর্শনে আইডিয়ালিজমের সঙ্গে রিয়ালিজমের দ্বন্দ্বের কথাও তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। তাঁর মতে, Idealism-এর মূল কথা হচ্ছে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; এবং Realism-এর মূল কথা ঠিক উলটো।^{৩৩} রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০)-এর কথা উল্লেখ করেছেন রিয়ালিজম প্রসঙ্গে, কিন্তু বার্নার্ড শ-এর সঙ্গে যে রাধাকমলের মত ঠিক মেলে না, সে দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন লেখক। রাধাকমল যে আদতে বাস্তবতাবাদী নন, তিনি শেষাঙ্গি সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মীয় আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চান। আর বার্নার্ড শ-দের লেখার মধ্যে ঐ আদর্শকে-ই প্রশ্ন করার, খারিজ করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তা প্রমথ চৌধুরীর নজর এড়ায়নি। রোমান্টিক গীতি কবিরা কেবল ‘সুন্দর’-এর চর্চা করতে গিয়ে যেমন ‘সত্য’ ভ্রষ্ট হয়েছেন, তেমনই রিয়ালিস্টদের ‘সত্য’-এর চর্চা করতে গিয়ে অসুন্দরকে সাহিত্যে তুলে স্থান দেওয়া দোষের।^{৩৪} খেয়াল করার বিষয় প্রমথ চৌধুরী এই প্রবন্ধে একটি নতুন সংকটের জন্ম দিলেন, ‘সত্য’ এবং ‘বাস্তব’কে সমার্থক করে তুললেন। তা অনিবার্য ভাবে সংযুক্ত করলো আরেকটি সমস্যা-পটের (problem) যে, ‘অ-সুন্দর’ কি সাহিত্যে ক্ষেত্রে একটি ব্যাধি? ‘সাগরপারের’ অনুকরণের মাধ্যমে সস্তা জনপ্রিয়তার প্রচেষ্টা? প্রমথ চৌধুরীর বয়ানে এসব প্রশঙ্গ নেই ঠিকই। ‘বাস্তবতা’ প্রশঙ্গ রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রবন্ধে

এই সব কথা বলার চেষ্টা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাবাদী। সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদীদের নিয়ে তাঁর অভিমত কী দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো। প্রমথ চৌধুরীর বলছেন যে, জোলা প্রভৃতি বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিকরা ‘সরস্বতীকে আকাশপুরী হতে শুধু নামিয়েই সন্তুষ্ট হন নি’, তাঁকে জোর করে মর্ত্যের ব্যাধিমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রোগও যে বাস্তব, সে কথাটা বাস্তবতাবাদীরা চিৎকার করে ঘোষণা করতে চায়।^{৩৫} বাস্তবতা কী ‘ব্যাধি’? এই প্রশ্নে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, প্রমথ চৌধুরী বাস্তবতা বলতে অ-সুন্দরকেই বোঝাতে চাইছেন। তাঁর শব্দ চয়ণ সে কথাই বলে। অমল হোমের মতো তাঁরও অভিমত ‘সাহিত্য মন্দিরে’ কেবল চর্চা হবে ‘সত্য, শিব এবং সুন্দর’-এর। সাহিত্যের দেবীকে ‘ব্যাধিমন্দিরে’ প্রতিষ্ঠা করা তাঁর না-পসন্দ। ‘রোগ’-এর বাস্তবতা তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু এটাও মনে করেন সাহিত্যিকের দায়িত্ব ‘কবির বাস্তব’ নামক একটি বাস্তবতাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করা, যা কিনা আঁকাড়া বাস্তবতার অনুকৃতি মাত্র নয়। যদিও রামকমল মুখোপাধ্যায় ‘বিলাতি’ সাহিত্যের অনুরণন বাংলা সাহিত্যে আমদানি করতে চান না তবুও তাঁর প্রস্তাব কি সেই সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দেয় না? প্রমথ চৌধুরী আদতে ‘পঙ্ক’ অপেক্ষা ‘পঙ্কজ’-এর কথাই সাহিত্যে উপস্থাপিত করতে অধিক আগ্রহী।

বিশিষ্টাধৈতবাদী বৈদান্তিক রামানুজকে উদ্ধৃত করে প্রমথ চৌধুরী তাঁর অবস্থানটি স্পষ্ট করেন। রামানুজের মতে জীবেরা একাধারে বদ্ধ এবং মুক্ত। সেই সূত্রে প্রমথ চৌধুরী বলছেন— “আমরা যখন বহির্জগতের সত্যসুন্দরমঙ্গলের কেবলমাত্র দ্রষ্টা, তখন আমরা বদ্ধ জীব; এবং আমরা যখন নূতন সত্যসুন্দরমঙ্গলের স্রষ্টা, তখন আমরা মুক্ত জীব।”^{৩৬} এরপরেই আক্ষেপের সুরে বলেন, যে দেশে ‘আমি’কে জানাই সাধনার চরম লক্ষ্য সে দেশে রবীন্দ্রনাথকে আত্মতান্ত্রিক বলে নিন্দা করা বিস্ময়কর। প্রবন্ধের শেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন প্রমথ চৌধুরী

তার পেছনে অস্তিবাদী দার্শনিকবোধই ক্রিয়াশীল, তা বলা বাহুল্য। তাঁর মতে, অর্থহীন বস্তু এবং পদার্থহীন ভাব কোনোটি-ই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয়। যেহেতু সাহিত্য জীবনের কথাই বলে, সেহেতু বস্তু ও ভাবহীনতা কখনই কাব্য-সাহিত্যের বিষয় হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ইউরোপের রিয়ালিজম চর্চা নিয়ে চির-পুরাতন অভিমতটিই বিবৃত করেন প্রমথ চৌধুরী। ইউরোপে মানুষ বিজ্ঞানের জোরে বস্তুজগতের উপর আধিপত্য কায়েম করেছে, আর আমাদের দেশে হয়েছে তার উল্টো। তাঁর মতে, বৈজ্ঞানিক-দর্শন আমাদের মনের উপর প্রভুত্ব তৈরি করেছে।^{৩৭} আর ইউরোপের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য ভারতের ক্ষেত্রে তা নয়। বস্তুবাদী, বৈজ্ঞানিক দর্শন প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর অবস্থান যে বেশ গোলমালে; তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বৈজ্ঞানিক মন ব্যতিরেকে কীভাবে বস্তুজগতের উপর বিজ্ঞানের আধিপত্য কায়েম করা যায় তা বোঝা যায় না তাঁর মন্তব্য থেকে। খানিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে রিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজমের সংমিশ্রণকে তিনি সাহিত্যিকের আদর্শ বলে মনে করেন। তাঁর বক্তব্য— “পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেরই একাধারে Realist এবং Idealist; কি বহির্জগৎ কি মনোজগৎ দুয়ের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।”^{৩৮} সময়ের বাধ্যবাধকতার জন্যে বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারেন না, আবার বাস্তবানুগ সাহিত্য রচনাও তাঁর কাছে কাক্ষিত নয়। সে কারণেই এহেন সংমিশ্রিত আইডিয়ার কথা বলেন।

‘কবির কৈফিয়ত’ প্রবন্ধটি সবুজ পত্র-এর ১৩২২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য ‘বস্তুতন্ত্রহীন’ সংক্রান্ত বিতর্কের শেষ রচনা এটি। এবং বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতা সম্বন্ধীয় বিতর্কের প্রাথমিক পর্বেরও সমাপ্তি ঘটে এর মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবস্থানটি স্পষ্ট করেছেন এই প্রবন্ধে। ‘বাস্তব’ ও ‘কবির বাস্তব’ নামক দুটি আইডিয়ার জন্ম দিচ্ছেন এই প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ‘অহেতুক অনির্বচনী’ আনন্দের জগৎ সৃষ্টি সাহিত্যিকের কাজ।

সেটি বোঝাতে, তিনি উপনিষদের বাণী ও জন কীটসের (১৭৯৫-১৮২১) কবিতার উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের বিরোধের কথাও উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন আলাপ, যেখানে বাস্তবতা ও মানবিক সত্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন দুই ভিন্ন জগতের মানুষ। প্রবন্ধের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন বিজ্ঞান কীভাবে পার্থিব জগৎকে ‘দেখে’ এবং ব্যাখ্যা করে? আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জগৎ জুড়ে চলছে ‘অনুতে পরমাণুতে লড়াই’। কিন্তু বাস্তবে কবি কী দেখেন? তিনি দেখেন; সেই অনু-পরমাণুর লড়াই ফুল হয়ে ফুটছে, আকাশে তারা হয়ে জ্বলছে, মেঘ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ কিনা সমস্তটিকে যখন প্রত্যক্ষ করা যায় তখন সুরের সঙ্গে সুরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ-ই ‘দেখা’ যায়। “বিজ্ঞান সেই সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দলাদলি ঠেলাঠেলি হানাহানি দেখতে পায়। সেই অবচ্ছিন্ন সত্য বিজ্ঞানের সত্য হতে পারে কিন্তু তা কবির সত্যও নয় কবিগুরুর সত্যও নয়।”^{৩৯} রবীন্দ্রনাথের মতে বিজ্ঞান জাগতিক বিষয়কে খণ্ডিত করে দেখে। রবীন্দ্রনাথের এহেন অভিমত ‘জ্ঞান’ বিষয়ে একটি জটিল সংকটের জন্ম দেয়। লোকায়ত/চার্বাকরা প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে স্বীকার করেছে। আবার বিজ্ঞানের দর্শন নির্ভর করে পরীক্ষা লব্ধ সিদ্ধান্তের উপর। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ— অর্থাৎ কিনা অনু-পরমাণুর লড়াই— ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বোধগম্য নয়, কিন্তু তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা মূর্থ্যমি। বিজ্ঞানীর এই ‘দেখা’র সঙ্গে কবির ‘দেখা’র মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ ‘দেখা’ বিষয়ে যে সমগ্রতার ধারণা দেন তা খণ্ডিত না হোক পূর্ণ দেখা নয়। বিপরীতে বিজ্ঞানীর ‘দেখা’ যাকে রবীন্দ্রনাথ ‘অবচ্ছিন্ন’ বলে চিহ্নিত করছেন, তার অপূর্ণ বলা যায় না। বস্তুত এই দুই ‘দেখা’ পক্ষে একটি স্থির বিন্দুতে মিলিত হওয়া বেশ কঠিন। বিরোধের কারণ সম্ভবত, বিজ্ঞানী ‘সমগ্র’কে নিরন্তর বিল্লিষ্ট করে সত্যকে বুঝতে, দেখতে চান শেষাঙ্গি কী রয়েছে? আর কবি কিংবা ‘কবিগুরু’ ‘সমগ্র’-এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে চান সৌন্দর্যকে। এই

সৌন্দর্য-ই তাঁর কাছে সত্য। প্রবন্ধের শেষে কীটসে কবিতা স্মরণ করে এই কথাই বলতে চেয়েছেন। এই দুয়ের মিলন বাস্তবিক অসম্ভব একে প্রেরণা জানার আকাঙ্ক্ষা অপরের আনন্দ।

সাহিত্য, বড়ো অর্থে শিল্প কী এবং তার কাজ কী এই সম্পর্কে নিজের ধারণা ও বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে রবীন্দ্রনাথ *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*-এর শরণাপন্ন হবেন। কী সেই কথা? “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাক্তেব খন্নিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।” অর্থাৎ আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ থেকেই সমস্ত প্রাণীর জন্ম। জন্মের পর তারা আনন্দের দ্বারাই বেড়ে ওঠে। এবং যখন তারা ধ্বংস হয়ে যায় তখন আনন্দের কাছেই ফিরে যায়, তাতেই লীন হয়।^{৪০} জগতকে অনু-পরমাণুর লড়াইয়ের দৃষ্টিকোণ ‘দেখা’ আদতে খণ্ডিত দর্শন, গানকে কেবল সুরের কসরত রূপে গ্রহণ করার সামিল। আনন্দই বস্তুত পক্ষে ‘দেখা’ নামক ধারণাটিকে পূর্ণতা দেয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘আনন্দ’ মানে ঐহিক সুখ বা Happyness নয়। দুঃখকে বোঝাও আনন্দের-ই আরেক দিক। দুঃখ আনন্দের অনিবার্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। সাহিত্যিকের কাজ ‘অহেতুক অনির্বচনী’^{৪১} আনন্দকে পরিস্ফুট করা। এই ভাবেই তিনি সমগ্রতাকে উপলব্ধি করেন ও প্রকাশ করেন। এটাই ‘কবির সত্য’। এই মতে বিরোধীদের, অর্থাৎ আঁকাড়া বাস্তবতাবাদীদের তীব্র সমালোচনা করেন। উপনিষদিক ‘আনন্দ’কে অবজ্ঞা তাঁর আছে নিছক বাহাদুরি বলেই মনে হয়। অনুকরণীয় ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন— “চন্দন মাখিতে লজ্জা, তাই রাই-সরিষার বেলেস্তরা মাখিয়া আমরা দাপাদাপি করি। আমার লজ্জা ঐ বেলেস্তরাকে।”^{৪২} আমরা পূর্বেই বলেছিলাম প্রমথ চৌধুরী এই বিতর্কে আরেকটি সমস্যা বা সংকটের সংযোজনা করেছেন যে অ-সুন্দর কী সাহিত্যে ব্রাত্য, নিষিদ্ধ? রবীন্দ্রনাথের উপমা কার্যত নির্দেশাত্মক ভঙ্গিমায় অ-সুন্দরকে সাহিত্যের আগ্নেয়ায়— প্রমথ চৌধুরী বয়ানে ‘মন্দির’— নিষিদ্ধ বলেই চিহ্নিত করলো। প্রবন্ধের শেষে উপনিষদের বাণী ও

কীটসের কবিতাকে মিলিয়ে একটি বিশেষ রীতির সাহিত্যের প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ রাখেন। যেখানে উপনিষদের ‘আনন্দ’-এর সঙ্গে ‘Truth’ ও ‘Beauty’কে একাকার করে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কীটসের বক্তব্যটি উলটে পেশ করেন রবীন্দ্রনাথ। কীটস লিখেছিলেন— “Beauty is truth, truth beauty”^{৪৭} রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেন “Truth is beauty, beauty truth”^{৪৮} রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘সত্য’ অর্থাৎ ‘কবির সত্য’ সততই সুন্দর এবং সুন্দর-ই সত্য। এবং ‘আনন্দ’ ও ‘সুন্দর’-এর যুগল নির্মাণ করে ‘কবির সত্য’, কবির বাস্তব; যা ‘অবচ্ছিন্ন’ নয়, পূর্ণ। যে বাস্তবতার ধারণা রবীন্দ্রনাথ দিলেন, বলা বাহুল্য তার ভিত্তি আস্তিক্যবাদী দর্শন।

পরশুরাম (১৮৮০-১৯৬০) ‘ভূশগীর মাঠে’-এর খানিক দিশেহারা হয়ে স্মরণ করেছিলেন কয়েকজনের^{৪৯}, সমস্যা মেটাতে অপারগ পরশুরাম ভেবেছিলেন তাঁরাই হয়তো এই ভূতাদের আজব সমস্যার সমাধান করবেন। সুষ্ঠু ভাবে বিলি-বন্দোবস্ত একমাত্র তাঁরাই করতে পারেন। পরশুরাম স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রূপের ছলেই মন্তব্য করেছিলেন। এই গল্পটি আলোচনার বিষয় নয়, কেবল রেফারেন্স আকারে উল্লেখ করতে চাইছি, বাস্তবতা ও আধুনিকতা সংক্রান্ত সাহিত্যিক বিতর্ক কোনমাত্র পেয়েছিল; যে কারণে আখ্যানকার আখ্যানের আভ্যন্তরীন সমস্যাটির সমাধানের জন্যে মজার ছলে হলেও সমকালীন অন্যান্য আখ্যানকারদের পরামর্শ নিতে চান। এই পর্বে মূলত তিনটে ধরন লক্ষ্য করা যায়^{৫০}। যদিও প্রত্যেকটি ধরনের মধ্যে ভিন্নতা লুকিয়ে আছে। প্রথম পর্বে আক্রান্ত-রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতা নিয়ে নিজের অভিমত পাঠকের দরবারে রাখেন, সেই তিনি পরবর্তী সময়ে উত্তরসাধকদের রিয়ালিস্ট লেখার সমালোচনা করেন। তিনি যে অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন এমন নয়, বরং তাঁর পূর্ববর্তী অবস্থানই উত্তরসাধকদের সমালোচনা প্রবৃত্ত করে। তিনি মনে করেছিলেন আধুনিক আখ্যানকারদের লেখা ‘সত্য’ বলে মনে হচ্ছে না, এবং কোথাও কোথাও ‘কলমের আঁক’ ঘুচে গেছে। একদল লেখক মূলত

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক লেখকদের সমালোচনা করেন। যাদের কাছে ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্য অসামাজিক। এঁদের মধ্যে নানান বিভিন্নতা দেখা যায়। আধুনিক, বাস্তবতাবাদী লেখকদের স্বপক্ষীয় বয়ান আরেকটি ধরন। তাঁদের ব্যক্তিগত দার্শনিক বোঝাপড়া, অবস্থান এই ধরনটির মধ্যে নানান বৈচিত্র্য তৈরি করে। কিছু প্রশ্নে তাঁরা দ্বিধাহীন, কিছু প্রশ্নে দোদুল্যমান। কী উপস্থাপিত হবে এবং কীভাবে তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও, মোটের উপর তাঁরা সাহিত্যে বস্তুজগতের প্রতিফলন চেয়েছিলেন তা সত্য। আমরা প্রথমে বাস্তবতার সমালোচকদের আপত্তিগুলিকে উল্লেখ করবো তারপর বাস্তবতাবাদের সমর্থকদের বক্তব্যগুলিকে উপস্থাপন করবো।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে *সবুজ পত্র*-এ প্রকাশিত হয় বরদাচরণ গুপ্তের ‘সামাজিক সাহিত্য’ প্রবন্ধটি। আধুনিক বাস্তবতাবাদীদের সমালোচনা করে লেখা হলেও তাঁর মূল আপত্তির জায়গা এই যে ‘সমাজের বায়না’ মেটানো সাহিত্য বা সাহিত্যিকের কাজ নয়। সামাজিক প্রয়োজনে সাহিত্য রচনার তীব্র সমালোচনা করেন বরদাচরণ। তিনি লিখছেন—

“...সমাজের প্রয়োজন খুঁটিয়ে, সমাজের বায়না, সমাজের তাগিদে কখনো সাহিত্য গড়ে উঠেছে? আমার বিশ্বাস এমন ধারা ‘সামাজিক সাহিত্য’ গড়বার চেষ্টা নিতান্তই পণ্ডশ্রম। ...প্রতিভার দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে আত্ম-সমাহিত সাহিত্যিক যে কল্পলোকের সৃষ্টি করেন বর্তমানের বস্তুতন্ত্রতার মাপ কাটিয়ে তা যতই কেন নিরর্থক প্রমাণিত হোক না, ভবিষ্য-সমাজের সেই হবে পাথেয়।”^{৪৭}

লক্ষণীয়, বরদাচরণ যে সাহিত্যের প্রস্তাবক ও সমর্থক তার সঙ্গে বস্তুজগতের ঘনিষ্ঠতা নেই। লেখকের ‘আত্ম-সমাহিত’ চৈতন্যের মাধ্যমে নির্মিত ‘কল্পলোক’-ই আদর্শ সাহিত্য। যদিও তিনি সামাজিক প্রয়োজনে সাহিত্য চর্চার পক্ষপাতী নন, কিন্তু তিনি মনে করেন ঐ অতীন্দ্রিয় কল্পলোকই ভবিষ্য সমাজের পাথেয় হবে। কিন্তু তা কীভাবে হবে সে বিষয়ে কোনো বক্তব্য

তিনি পেশ করেননি। সমাজ সচেতন সাহিত্যকে তিনি সাহিত্যের পদমর্যাদা দিতে নারাজ, বড়ো জোর সেগুলিকে সামাজিক সন্দর্ভ বলা চলে। এক দোদুল্যমান, স্ববিরোধী বয়ান রচনা করেন বরদাচরণ, যেখানে সাহিত্যিকের কল্পনা, অনুমান এবং আকাঙ্ক্ষার সম্মিলনে যে বিষয় ফুটে উঠবে তাই হবে প্রকৃত সমাজ। দিব্যদৃষ্টির এই সমাজের বাস্তব অস্তিত্ব না থাকলেও চলবে। অনায়ত্তের আভাস ও অনাগতের আহ্বান ও নতুন বিধানের ইঙ্গিতের মাধ্যমে যা সৃষ্টি হবে সেটিই স্বাভাবিক সত্যানুভূতি।^{৪৮} তাঁর মতে, এই বিষয়টির অভাব দেখা যাচ্ছে বর্তমান বাস্তবধর্মী সাহিত্য-কর্মের মধ্যে। এই সত্যের ধারণার সঙ্গে বাস্তবের যোগাযোগ ক্ষীণ, বরং ‘আমি’র সঙ্গেই তার সম্বন্ধ। যে ‘আমি’ সমাজ সম্পর্কে অজ্ঞ নন, তবে অনাচ্ছন্ন, খানিক নির্লিপ্ত। কিন্তু নির্লিপ্ত, অনাচ্ছন্ন চৈতন্য সামাজিক পাপ ও মিথ্যাকে তিরস্কৃত করবে।^{৪৯} অর্থাৎ কিনা সাহিত্যিক সমাজ সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকবেন, আবার সেই অনাচ্ছন্ন, নির্লিপ্ত সাহিত্যিক-ই আবার পাপের সমালোচনা করবেন। এই বয়ান যে বৈদান্তিক দর্শন প্রভাবিত তা অস্পষ্ট থাকে না। বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে মায়াবাদী, বস্তুজগৎ বিষয়ে অনাগ্রহী শঙ্করাচার্য যে ভাবে বস্তুবাদীর যুক্তিধারা^{৫০} অনুসরণ করেন, সেই ধারা সঙ্গে বরদাচরণের খানিক মিল লক্ষ করা যায়।

১৩২৭ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ‘সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা’ প্রবন্ধটি। যতীন্দ্রমোহন সিংহ (১৮১৭-১৯৩৭) মনে করতেন আধুনিক আখ্যানগুলি পাপ ও কলুষময় প্রণয় কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত করছে। তাঁর লেখাকে সাহিত্য সমালোচনা বলা যায় না, বরং সামাজিক শুচিতা রক্ষাই তাঁর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, বরদাচরণের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য। সাহিত্যিকের কাজ আসলে সমাজ সেবা, এই তাঁর প্রতিপাদ্য। কীভাবে তিনি সমাজসেবা করবেন? কী তাঁর বিচারের মানদণ্ড? শিল্প বা উপন্যাসটি

সফল হবে তখনই, যখন তা অনৈতিক প্রেমলাপকে বর্জন করে ধর্মীয় শুচিতা, ত্যাগ তিতিক্ষার আদর্শকে তুলে ধরবে। সৌন্দর্যানুভূতির প্রকাশ ও বস্তুজগতের আঁকাড়া উপস্থাপনা ব্যাধি, তা সমাজের সংযম শাস্ত্র আদর্শকে ভুলুষ্ঠিত করে। বিধবার অনুভূতি বা আকাঙ্ক্ষার কথা সাহিত্যে প্রকাশিত করাই উচিত, কারণ এতে সমাজিক আদর্শই ভুলুষ্ঠিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত সকল সাহিত্যিক তাঁর বিচারের অনৈতিকতার দোষে দুষ্ট। প্রত্যেকেই পাপ চিত্রের প্রচারক। ‘প্রেম’/‘Love’ তাঁর কাছে বিদেশী বস্তু, যা ‘বঙ্গীয় সমাজে’ ব্যভিচার বা পীরিত বলে নিন্দিত। তাঁর আদর্শ কারা? প্রাচীন কবিরা।

‘প্রেম’ নিয়ে যতীন্দ্রমোহন বহু কথা লিখেছে দীর্ঘ প্রবন্ধে, সেগুলির শরণ নেব। ‘উপন্যাসে সাহিত্য ও প্রেম’ শীর্ষক অংশে তিনি জানাচ্ছেন যে, এখনকার অধিকাংশ নভেল বাঙালির অন্তপুরে প্রবেশ করে সমাজকে রসাতলে পাঠাচ্ছে^{৫১}, বস্তুত রক্ষণশীল যতীন্দ্রমোহন ‘প্রগতি’ নামক ধারণাটি বা প্রকল্পটির বিরোধিতা করেন। তাঁর এহেন অবস্থান যে পর্দাপ্রথার সমর্থক তা বলাই বাহুল্য। তাঁর আরও অভিযোগ প্রকৃত, প্রতিভাশালী সাহিত্যিকরা এই পাপ-চিত্র (‘unhealthy atmosphere’^{৫২}) উপস্থাপনার মাধ্যমে সমাজের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা তৈরি করছেন। এর উদাহরণ হিসেবে তিনি *চোখের বালি* (১৯০৩) কথা বলেন। *চোখের বালি* নিয়ে তাঁর আরও আপত্তি কারণ তা হিন্দু বিধবাকে প্রেমিকাকে রূপে উপস্থিত করেছে, এবং তা জনপ্রিয় হচ্ছে। ‘বিধবার প্রেম’ এর আগে ভারতীয়/হিন্দু সাহিত্যে ছিল না। হিন্দু সমাজের চোখে তা দোষের, এতে করে সমাজের ক্ষতি হয়। তিনি মন্তব্য করছেন— “এত অধিক পাপচিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠতা দ্বারা পাঠক-পাঠিকার মনে পাপের প্রতি ঘৃণা কমিয়া যাইবে”^{৫৩} যতীন্দ্রমোহনের বয়ানের সঙ্গে সাহিত্যের যোগাযোগ বড়োই ক্ষীণ, সমাজ বিধাতার স্বরে তিনি হুকুম দেন যে বিধবার প্রেমে পড়া হিন্দু আদর্শের বিরোধী, কেবল বিধবা নয় সধবারও

পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্যরা তাঁদের বিভিন্ন আখ্যানের এই বিলাতি প্রেমের প্রচার করে অপরাধ করছেন। বিপরীতে বঙ্কিমচন্দ্র পাপের কথা লিখলেও শেষ পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন পাপীকে। যা থেকে পাঠকের মনে পাপের প্রতি বিতৃষ্ণাই তৈরি হয়। এই সবার কারণ হিসেবে যতীন্দ্রমোহন যা চিহ্নিত করেছেন তা হলো—

“বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের যুবকগণ যে *নিরীশ্বর শিক্ষা (godless education)* পাইতেছে, তদ্বারা সমাজের বিশেষ *অনিষ্ট* সাধিত হইতেছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।”^{৫৪} (বাঁকা হরফ আমার)

এই সূত্রধরে তিনি বাল্যবিবাহ যে ন্যায্য তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। তাহলে কবি বা সাহিত্যিকের কর্তব্য কী হবে? যতীন্দ্রমোহনের প্রস্তাব, কবির কাজ সত্যকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা। এইখান থেকেই তিনি ফিরবেন ‘ঈশ্বর’-এর ধারণায়। তাঁর বিচারে সত্য এবং সুন্দরের ধারণার সঙ্গে ‘মঙ্গল’-এর ধারণা সম্পৃক্ত না থাকলে তা পূর্ণতা পায় না। কারণ জগৎ স্রষ্টার স্বরূপই হলো ‘সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্’। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর মতের অনুগামীরা যে ‘সত্য’-এর ধারণা প্রতিষ্ঠা করা চেষ্টা করছিলেন, সেটির সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনে মস্ত ফারাক। এমন কী ‘মঙ্গলবোধ’ নিয়ে তফাৎ লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে। যতীন্দ্রমোহনের প্রস্তাব—

“...সৃষ্ট জগৎ তাঁহারই স্বরূপের বহিঃপ্রকাশমাত্র। কবির সৃষ্টিও যদি সেই বিশ্বসৃষ্টির অনুসরণ করে, তবে তাহাতে আমরা সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে শিব বা মঙ্গলকেও দেখিতে আশা করি। কবি কেবল সত্যকে সুন্দর করিয়া দেখালেই চলিবে না, তাহার সঙ্গে মঙ্গলও থাকা চাই।”^{৫৫}

তাঁর ‘মঙ্গলবোধ’ স্থিতিাবস্থাপন্থী, বিতর্ক বা পুরোনো অবস্থাকে প্রশ্ন নৈব নৈব চ! কাব্য-সাহিত্যে তিনি ‘Moral order of the universe’-এর প্রতিচ্ছবি দেখতে চান যেখানে পাপীর দণ্ড হবে, ধর্মের জয় গান শোনা যাবে। ‘ঈশ্বর’ নির্দেশিত ‘কর্মবিধান’-এর মধ্যে মানুষের জীবনের

সুখ-দুঃখ মীমাংসা করাই সাহিত্যে দায়, এমনটাই যতীন্দ্রনাথের প্রস্তাব। ‘Love’ ইউরোপের সত্য, বাঙালির নয়, তাকে বর্জন করে আমাদের সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কী সেই সত্য? “মানুষকে সদাচার, সংযম, তিতিক্ষার মধ্যে দিয়া ঈশ্বরভীতি মুখী করা, ইহাই আমাদের লক্ষ্য!”^{৫৬} বস্তুত যতীন্দ্রমোহনের কাছে সাহিত্য মানে নীতি শিক্ষা। আনন্দানুভূতি অপেক্ষা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শরৎচন্দ্রের ‘সাহিত্য ও নীতি’ প্রবন্ধের সমালোচনা করে যতীন্দ্রমোহন সিংহ লেখেন ‘আর্টের অনুশাসন’। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে *তামানসী ও মর্ম্মবাণী*তে প্রকাশিত হয়। ‘সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা’রই অনুরণন শোনা যায় এখানে। যে সাহিত্য সু-নীতির প্রচারক নয়, সেই সাহিত্য বর্জনীয় তাঁর কাছে। সাহিত্য বা ‘আর্ট’ তখনই সুন্দর, কল্যাণকর যখন তা ঐশ্বরিক নৈতিক বিধান নিয়ন্ত্রিত। সে কারণে পুণ্য মাত্রই সুন্দর এবং পাপচিত্র অসুন্দরই।^{৫৭} সাময়িক ভাবে পুণ্য পরাভূত হতে পারে কিন্তু শেষাব্দি পুণ্যের জয় হবেই। কেবল যতীন্দ্রমোহন নন, আরও অনেকেই এই ভাবে সাহিত্যকে দেখতে চেয়েছেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে *ভারতবর্ষ*-এ প্রকাশিত হয় অমল হোমের ‘অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য’। তিনি আধুনিক কথাসাহিত্যের বিশেষ প্রবণতাকে তীব্র আক্রমণ করেন এই প্রবন্ধে, আধুনিক কথাসাহিত্যকে চিহ্নিত করেন ‘কামায়ন’ নামে। কী বলছেন তিনি? জীবনের সত্যের সঙ্গে আর্টের সত্যকে একাকার করতেন নারাজ তিনি। বাংলা কথাসাহিত্যে যে বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটছে তার সঙ্গে দেশের-দেশের যোগ নেই। এ সাহিত্য ইউরোপ থেকে আমদানী করা। কবির বাস্তবের সঙ্গে জীবনের বাস্তবতার মস্ত তফাত আছে এই তাঁর অভিমত। অমল হোম লিখছেন—

“যাহা স্থূল, যাহা অসুন্দর, যাহা লোভে ও মোহে অশুচি, জীবনে তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আর্টে তাহা সত্য কিছুতেই হইতে পারে না, কারণ আর্ট শুধু জীবনে বিধৃত হইয়া নাই, আর্টের রাজ্য বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে জীবনকে অতিক্রম করিয়া।”^{৫৮}

আর্টের কাজই হলো দৈনন্দিন তুচ্ছতা, ক্ষণিকত্বকে অতিক্রম করে বিরাতের সাধনা করা। ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিকরা তা পরেছেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্য সেই বিরাত, পরমকে কল্পনা, সত্যানুভূতির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম। শাস্ত্রতলীলার বদলে কুশ্রীতাই প্রকাশিত হয়েছে আমাদের সাহিত্যে। প্রাবন্ধিকের শব্দচয়ন খেয়াল করলে একথা স্পষ্ট হবে, তিনি ‘অতি-আধুনিক সাহিত্য’-কে নৈতিক ভাবে গ্রহণীয় বলে মনে করেন না। *কল্লোল*, *কালি-কলম*, *ঝরণা* পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলির সম্পর্কে তাঁর প্রয়োগ করা বিশেষণ লক্ষণীয়— ‘ভাষা ও ভাবের বিকৃত অসংযম’, ‘ইন্দ্রিয়-লালসার’ ইঙ্গিত ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত শব্দ বা বিশেষণ প্রয়োগ সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকেই চিহ্নিত করে দেয়। যে ভঙ্গি গড়ে ওঠার পেছনে বিশেষ নৈতিক ও দার্শনিক ভাবনাই ক্রিয়াশীল। ঐ প্রবন্ধের অন্য একটি অংশে নজর দিলে আমাদের অনুমান স্পষ্ট হবে। তিনি এটাও মনে করেন যে, এই সাহিত্য আন্দোলন আমাদের সমাজ ও সাহিত্যকে কলুষিত করছে এবং এর প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। তিনি আশাবাদী যে অনাগত সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যের ‘ক্লেদ-পঙ্কিলতা’কে মুক্ত করবেন। আবারও আর্টের ‘পূজারবেদী’ মুখরিত হবে ‘সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্’-এর মন্ত্রে। মঙ্গলচন্দ্র শর্ম্মার ‘মাসিক গল্প-সাহিত্য’ ১৩৩১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আখ্যানে বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনাকে ‘মেথরের আস্তাকুঁড়’ বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেন। বাস্তবতা তাঁর কাছে তথ্য বা ঘটনার বিবরণ মাত্র। পুঞ্জানুপুঞ্জ বর্ণনা দেওয়া সাহিত্যিকের কাজ নয়। যিনি সে কাজ করেন, অর্থাৎ যা দেখছেন তাই তুলে ধরছেন, তবে তিনি ‘ডাক্তার’ কিংবা

‘স্যানিটারি ইনস্পেকটর’ হতে পারেন, সাহিত্য চর্চা তাঁর কাজ নয়^{৫৯}। সাহিত্য কী? বা সাহিত্যিক কী উপস্থাপিত করবেন? মঙ্গলচন্দ্র লিখছেন— “মানুষের কল্পনা, মানুষের আদর্শ, মানুষের কামনা মানুষের নৈপুণ্য ইত্যাদি নানা মশলায় বাস্তবকে যে নূতন রূপ দেওয়া হয় সেই ত সাহিত্য সৃষ্টি।”^{৬০} যা বস্তুলোকের মধ্যে কল্পলোককে জায়গা করে দেয়। যা কিনা “কদর্যতাকে ঢেকে দেয়, বহু অবাস্তবকে সরিয়ে দেয় এবং বাস্তবে যা নেই এমন বহু সত্য ও সুন্দরকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে।”^{৬১} অর্থাৎ সাহিত্যিক সত্য, শিব এবং সুন্দরের উপাসক; তিনি বাস্তবের কদর্যতাকে সরিয়ে কাল্পনিক সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা দেবেন। এই প্রস্তাবনা আরেকটি দিক আছে, তা হলো ‘অ-সুন্দর’ কখনোই সাহিত্যের বিষয় নয়। একটি ভালো-মন্দের বাইনারি হাজির করলেন প্রাবন্ধিক এবং সোচ্চারে ঘোষণা করলেন অ-সুন্দর অর্থাৎ কিনা মন্দের বিবরণ সাহিত্যিকের কাজ নয়। কোন আদর্শ বা ভাবনার প্রভাবে সুন্দর ও অ-সুন্দরে সীমানা নির্ধারণ করলেন তিনি, বলাই বাহুল্য সেটির পিছনে ক্রীড়াশীল আস্তিক্যবোধ ও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নৈতিকতা।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে *বঙ্গবাণী* পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের ‘সাহিত্য ও রস’ শীর্ষক প্রবন্ধটি। সাহিত্য ও রসের সম্পর্ক নির্ণয় করা অপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যের গুণগান প্রচারই এই প্রবন্ধের মুখ্য লক্ষ্য। বাকিদের তুলনায় তাঁর লেখায় আধ্যাত্মিক দর্শনের অনুসঙ্গ অনেক স্পষ্ট। আধুনিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্যকে তিনি ‘তরল সাহিত্য’ বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর কাছে ভারতের গৌরব লুকিয়ে আছে আধ্যাত্মিক চিন্তার মধ্যে, তার নিদর্শন হলো— *বেদ*, *উপনিষদ* ও বিভিন্ন দর্শন গ্রন্থ। সে সব সাহিত্যিকরা ‘ভোগ’-এর থেকে ‘ত্যাগ’কে উচ্চ স্থান দিয়েছেন। সেই বিশেষ ধর্মীয় সাহিত্য-ই তাঁর কাছে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের দৃষ্টান্ত ও আদর্শ। তাঁর নিজের কালের সাহিত্যের মধ্যে মহৎ আদর্শ, নৈতিকতা, সংযমের অভাব তিনি

লক্ষ করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার কারণে ‘ধর্মবিশ্বাস’ শিথিল হয়েছে আমাদের দেশে, সেই সুযোগে ‘আধ্যাত্মিক চিন্তা’ বিমুখ একদল সাহিত্যিক সুকুমার মতি পাঠকদের নষ্ট করছেন, এই তাঁর অভিযোগ। তিনি মনে করেন এ সকল সাহিত্য পাশ্চাত্যের জঞ্জাল, আধুনিক লেখকরা ধর্মবিশ্বাস, শুদ্ধ নীতি থেকে ভ্রষ্ট। স্মৃতি শাসনের দেশে এই অসংযমী সাহিত্যে তাঁর ঘোর আপত্তি^{৬২}। তিনি আধুনিক সাহিত্যিকদের পরামর্শ দেন ‘পুরুষোচিত দৃঢ়তা ও ওজস্বিতা’ পূর্ণ সাহিত্য রচনার। উনিশ শতকে গীতিকাব্য সম্পর্কে এমনতাই অভিযোগ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। গীতিকাব্য লালিত বাঙালির মধ্যে তিনি লক্ষ করেছিলেন বাহুবল, ওজস্বিতার অভাব^{৬৩}। যেমনটা পাওয়া যায় মাইকেল মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩), হেমচন্দ্র (১৮৩৮-১৯০৩), বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায়^{৬৪}। লক্ষণীয়, বিশ্বেশ্বর ধর্মীয় সাহিত্য ও রস-সাহিত্যের মধ্যে কোনো তফাৎ রাখেননি বা করতে চাননি। তাঁর কাছে সাহিত্য আনন্দের সামগ্রী নয়, তা নীতি শিক্ষার পাঠ্যক্রম। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ‘সাহিত্যের আবহাওয়া’ শীর্ষক প্রবন্ধে বাস্তবতা বিষয়ক বিতর্কের আন্তিক্যবাদী দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে বাস্তবতাবাদীদের দারিদ্র, ক্ষুধার চিত্রায়ণ আদতে ধার করা বাস্তবতা। এর সঙ্গে সঙ্গে রায় দেন যে, তাঁদের ভাষা ও কৃত্রিম, রঙের জ্ঞান নেই এবং পরের মুখের ঝাল খেয়ে তাঁরা সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন^{৬৫}। তিনি উপলব্ধি করেন যে দেশের আবহাওয়া বদলেছে, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় সমাজ যে ভাবে বদলেছে তার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কতটুকুই বা!^{৬৬} কেন আধুনিক সাহিত্যের এই অবক্ষয়? তিনি লিখছেন—

“দারিদ্র্য অভাব লালসা ও ক্ষুধার তাড়নায় আজ তোমরা ভগবান ভূত ও ভালোবাসার উপর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হারাও নাই, হারাইয়াছ সেই দিন যেদিন হইতে মানুষকে ভগবান বলিয়া পূজা করিয়াছ, সেই দিনই ভাব-দারিদ্র্য এদেশে দেখা দিয়াছে।”^{৬৭} (বাঁকা হরফ আমার)

তাঁর অভিমত থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাস্তবতাবাদীরা মানুষের কথা ও কাহিনিকে আখ্যানে স্থান দিচ্ছেন। মানুষের যন্ত্রণা, লোভ, ক্ষোভ, কামনাকে চিত্রিত করাই বাস্তবতাবাদীদের উদ্দেশ্য, সাবেক ঈশ্বরের মহিমা কীর্তনে তাঁরা অনাগ্রহী। এসবে মূলে রয়েছে নাস্তিক্যবাদী বিশ্ববীক্ষাই যা সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের না-পসন্দ। সেকারণে কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) *দাস ক্যাপিটাল* (১ম খণ্ড- ১৮৬৭, ২য় খণ্ড- ১৮৮৫, ৩য় খণ্ড- ১৮৯৪) বইটি সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ উগরে দেন^{৬৮} উক্ত প্রবন্ধে।

সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) আধুনিক সাহিত্য ধারা বিরোধী মানুষ। তাঁর ‘যুগ সাহিত্য’ প্রবন্ধটি ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে *শনিবারের চিঠি*তে প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নেই এবং তা যুগপযোগী নয়। ভাষাগত ও বিষয়গত উভয় দিক থেকে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। ড্রইংরুমের ভাব বিলাসীরাই এই সাহিত্য নিয়ে মাতামাতি করছে। সজনীকান্তের কাছে তাই যা, সাহিত্য দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনকে অতিক্রম করে রস সৃষ্টি করে। সাহিত্য ভোগ ও ঐশ্বর্যের আওতায় বেড়ে উঠলেও ভোগ, বিলাসের থেকে অনেক দূরে নিভূতে ছিল তার ‘সূতিকা গৃহ’। কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমেই সাহিত্যের সৃষ্টি।

“মেদমজ্জাসহ নিজের দেহগত জীবনকে জ্বালাইয়া ধরিয়া দেবীর দেউলে ভক্তের পূজারতি চলিত। ...দেবী

ও ভক্তের নিগূঢ় সম্বন্ধটাই তখন সত্য ছিল।”^{৬৯}

সজনীকান্তের শব্দ প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে, নাস্তিক্যবাদী দর্শন তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধীয় চিন্তা ভাবনার নিয়ন্ত্রক। সাহিত্য সৃষ্টিকে তিনি ব্যাখ্যা করার জন্যে ব্যবহার করছেন পুজোর উপমা। প্রসঙ্গত, অমল হোম ও প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-দর্শনের মধ্যেও এই ঝোঁক লক্ষ করা যায়। ফলে বাস্তবতাবাদী, যাঁদের অনেক কাছেই সাবেক ‘ঈশ্বর’ মৃত, যাঁরা ‘ঈশ্বর’ পরিত্যক্ত পৃথিবীর

কাব্য রচনা করছেন, তাঁদের সঙ্গে সজনীকান্ত ও বাকিদের ভাবনার মিল অসম্ভব। ব্রহ্মবাদীদের মতো তিনিও বাইরে নয়, অন্তরের মধ্যে সত্যের সন্ধান করবেন। *আনন্দমঠ*-এর শেষে বঙ্কিম জানিয়েছিলেন, ‘বহির্বিষয়ক’ ও ‘অন্তর্বিষয়ক’ জ্ঞানের মধ্যে ‘অন্তর্বিষয়ক’ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। সজনীকান্তের কণ্ঠস্বরেও সেই অনুরণন শোনা যাবে, তিনি আক্ষেপের সুরে বলবেন ‘মন’ নামক বিষয়টিকে আধুনিক সাহিত্য ছুটি দিয়ে বহিরিন্দ্রিয় পথেই সাহিত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা হচ্ছে।^{৭০} সজনীকান্ত মনে করছেন সেই কারণেই সমাজ ‘কল্যাণ’-এর স্পর্শ পাচ্ছে না। বস্তুত, তাঁর এই ভাবনা ও প্রস্তাবনার পেছনে রয়ে গেছে ঐশ্বরিক ‘কল্যাণের’ আদর্শ যার সঙ্গে বাস্তবতাবাদীদের বিবাদের সম্পর্ক।

সাহিত্যে বাস্তবতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে দুটি ভিন্ন প্রতিক্রিয়া মুখোমুখি হতে হয়। প্রথম পর্বের কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। এই দ্বিতীয় পর্বে তিনি বাস্তবতাবাদের বিরুদ্ধ-পক্ষ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রুচি ও সাহিত্য আদর্শ গড়ে ওঠার পেছনে পশ্চিমী রোমান্টিক কাব্যাদর্শের বড়ো ভূমিকা ছিল। ‘আধুনিক কাব্য’ প্রবন্ধে নতুন বাঁক বদলের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, যার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ‘বিষয়ীর আত্মতা’^{৭১}। কবি/লেখকের ‘আমি’র কথাই সেই সাহিত্যে প্রাধান্য পায়। ফলত এই সাহিত্য চূড়ান্তভাবে সাবজেক্টিভ। বিশ শতকের সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথের মতে, ‘বিষয়ের আত্মতা’। দ্বিতীয় ধরনটিতে বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, বিষয়টিকে প্রকাশ করার জন্যে^{৭২}। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার প্রস্তুতি পর্বের (১৮৮৭-১৮৯২)^{৭৩} সবটাই শিলাইদহবাসের সঙ্গে সংযুক্ত। এই পর্বেই প্রথম বাস্তব জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে রবীন্দ্রনাথের। ‘বাস্তব’ বা বস্তুজগতের সঙ্গে সংযোগ, সংস্পর্শের কারণে এই পর্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বেই সৌন্দর্য অভিমুখী সাহিত্য, সর্বপরি জীবন দর্শনের সঙ্গে বাস্তবমুখী জীবন দর্শনের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ শেষতক রোমান্টিক, কিন্তু

একান্ত আত্মমুখী সাহিত্য-দর্শন থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। বিশ শতকীয় আধুনিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কী? ‘আধুনিক কাব্য’-এ লিখছেন—

“আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাতা কী, তা হলে আমি বলবো, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা।”^{৭৪}

তৃতীয় পর্বে (১৮৯৪-১৯০৭), অর্থাৎ উত্তরণ পর্বে^{৭৫} রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা বহুলাংশে নৈতিকতা প্রভাবিত। নান্দনিকতার পাশাপাশি নৈতিকতাও সাহিত্য বিচারের অন্যতম উপাদান হিসেবে যুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবনা খানিকটা এই রকমের— সাহিত্যের সৌন্দর্য ‘মঙ্গলবোধ’ নিরপেক্ষ নয়। লক্ষণীয়, এই পর্বে প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা, উপনিষদের প্রভাব, ‘তপোবন’-এর আদর্শ রবীন্দ্রনাথের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সে কারণে তিনি সুন্দরকে সত্য ও মঙ্গলের সঙ্গে একাত্ম করে উপস্থিত করছেন। সে কারণে ‘সৌন্দর্যবোধ’ প্রবন্ধে সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গলের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে উল্লেখ করছেন ‘সংযম’ ও ‘ব্রহ্মচর্য’-এর কথা। এই ভাবনাগুলি কী রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সাহিত্যচিন্তার মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল? পরবর্তীকালে আধুনিক সাহিত্যিকদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে রবীন্দ্রনাথের ‘বাস্তবতা’ সংক্রান্ত ধারণা কোথায় উপনীত হলো, সেটাই আপাতত আমাদের অভিনিবেশের বিষয়।

আধুনিকতা প্রসঙ্গে ‘আধুনিক কাব্য’-এ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বিশ্বকে ‘নির্বিকার তদ্গত’ ভাবে দেখাই আধুনিকতার লক্ষণ। এবং আধুনিকতা তাঁর কাছে রুচি, মর্জির বিষয়। ১৯৩০ সালের ১৪ জুলাই আইনস্টাইনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের মধ্যে কথাবার্তায় ‘সত্য’, ‘বাস্তবতা’ প্রসঙ্গ উঠে আসে। ঐ বিষয়ে উভয়েই তাঁদের নিজ-নিজ বক্তব্য হাজির করেন। ‘বাস্তবতা’ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

“আমাদের বাদ দিয়ে এ বিশ্বের কোনো অস্তিত্বই নেই; এটা একটা আপেক্ষিক বিশ্ব, যার বাস্তবতা আমাদের চৈতন্যের ওপর নির্ভরশীল।”^{৭৬} (বাঁকা হরফ আমার)

এমনকী সত্য কিংবা সৌন্দর্যকেও রবীন্দ্রনাথ মানব-নিরপেক্ষ বলতে নারাজ। বিশ্বে এমন কিছু নেই যা কিনা মানব-ব্যক্তিতে অধীন নয়, সকল কিছুই মানবীয় সত্য।^{৭৭} যদিও আইনস্টাইনের মতে, ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি বিষয়ে দু-ধরনের ধারণা আছে— একটি হলো, বিশ্ব মানবের ওপর নির্ভরশীল একক সমগ্র, আরেকটি বিশ্বের বাস্তবতা মানবসত্তা-নিরপেক্ষ।^{৭৮} আইনস্টাইন এরপরেই বলবেন, এই ঘরের টেবিলটি কেউ না থাকলেও থেকে যাবে। টেবিলের থাকা আমাদের অস্তিত্ব, অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলবেন, মানুষের মন যাকে টেবিল বলে জানছে, সেই মনটি যদি না থাকে তাহলে টেবিলের কোনো অস্তিত্ব থাকে না।^{৭৯} তাঁর মতে, বিজ্ঞান যাকে সত্য বলে চিহ্নিত করে তা মানবীয় যুক্তিসম্মত পথেই আয়ত্ত করা যায়। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথ বৈদান্তিক ব্রহ্মের প্রসঙ্গ তুলে আনেন। বলেন, ভারতীয় দর্শন যাকে সত্য বলেছে তা অনির্বচনীয়, তাকে উপলব্ধি করার একমাত্র পথ হলো ব্যক্তিসত্তাকে ‘অনন্তের’ মধ্যে বিলীন করে দেওয়া। কিন্তু বিজ্ঞান সেই সত্য নিয়ে চর্চা করে না, বিজ্ঞানের চর্চাধীন সত্যকে রবীন্দ্রনাথ বলবেন তা ‘সত্যের বাহ্যরূপ’^{৮০}। সেই মানবীয় সত্যকে রবীন্দ্রনাথ, অদ্বৈত বৈদান্তিক লঞ্চে মায়া বা বিভ্রম হিসেবে চিহ্নিত করবেন। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা ও বাস্তবতা সংক্রান্ত বিতর্ক প্রসঙ্গে কেন এসব কথা আমরা উল্লেখ করছি? তার কারণ রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘বাস্তবতা’ চৈতন্য সাপেক্ষ ধারণা। ‘আধুনিক কাব্য’তে বিশ শতকের সাহিত্যচর্চাকে ‘বিষয়ের আত্মতা’ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন তাঁর সাবজেক্টিভ ‘দেখা’ থেকে। কিন্তু বাস্তবতাকে যখন তিনি চৈতন্য সাপেক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেন, তখন কি তিনি ‘বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গত’ ভাবে দেখা অবস্থানে স্থিত থাকতে পারেন?

এই ‘চৈতন্য’ নামক বিশেষ বিষয়টি ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাস্তবের উপস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় তর্ক, বিবাদ, মতান্তরে কারণ। রবীন্দ্র-চৈতন্যের নির্মিতি, তার বিকশিত হওয়া, পরিণতি প্রাপ্তির সঙ্গে রোমান্টিক কাব্যাদর্শ, উপনিষদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনস্বীকার্য। এই বিশেষ আন্তিক দর্শন ও সাহিত্যতাত্ত্বিক অবস্থান যে ভাবে তাঁকে নির্মিত করেছে, তার সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী চৈতন্যের বিরোধের সম্পর্ক হওয়াই স্বাভাবিক।

১৩৩০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বক্তৃতা দেন রবীন্দ্রনাথ। পরে সেই বক্তৃতাগুলি ঈষৎ পরিমার্জিত হতে *বঙ্গবানী* পত্রিকায় ‘সাহিত্য’, ‘তথ্য ও সত্য’ এবং ‘সৃষ্টি’ নামে প্রকাশিত হয়। আরও কয়েকদিন পরে প্রবন্ধ তিনটি *সাহিত্যের পথ* (১৯৩৬) বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ‘তথ্য ও সত্য’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সাহিত্য প্রয়োজনের উর্ধ্বে। আপাত দৃষ্টিতে খেলার সঙ্গে তার মিল থাকলেও, আদতে আলাদা বিষয়। সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, “আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা,”^{৮১}। ‘বাস্তব’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সত্যের ধারণা দিয়েছিলেন, এখানে সেটিকে আরও স্পষ্ট করলেন। তথ্য কী? যেমনটি আছে তেমনটির ভাবই হলো তথ্য, আর তথ্য যাকে অবলম্বন করে থাকে, সেটি হলো সত্য। “তথ্য খণ্ডিত, স্বতন্ত্র— সত্যের মধ্যে সে আপন বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে।”^{৮২} তথ্য খণ্ডিত কারণ তা সর্বদা বিশেষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ঐ বিশেষ-এর সংলিপ্ততা হেতু তার মধ্যে আসক্তি ক্রিয়াশীল। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার পেছনে উপনিষদ তথা বেদান্ত দর্শনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সত্য তো খণ্ডিত নয়, বিশেষকে প্রকাশিত করার দায় তার নেই। নিছক তথ্যের বন্ধন থেকে সে মুক্ত, মুক্ত বিশেষ কিছুকে প্রকাশ করার দায় থেকে। যেহেতু সত্য বিরাটকে প্রকাশিত করে সে কারণে আসক্তি সত্যকে বাঁধতে পারে না। তথ্যকে অবলম্বন করে, অর্থাৎ বিশেষকে অবলম্বন করে নির্বিশেষ অনুভূতিকে রূপ দেওয়াই সত্যের কাজ।

সাহিত্যও নিছক তথ্যের কারবারি নয়, সে সত্যের কারবারী। তথ্য অর্থাৎ অভিজ্ঞতা সবটুকুকে উন্মোচিত করতে খানিক অপারগ, সেই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতা দেয় কল্পনা। রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে সচেতন। সত্যের দাবি কেবল ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির কাছে নয়, অনুভূতির কাছেও। সত্যকে মানুষ গ্রহণ করে সমগ্র সত্তা দিয়ে। তথ্য কল্পাল মাত্র, অনুভূতি যখন তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চর করে তখন তা হয়ে ওঠে সত্য। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে বহিরঙ্গের যান্ত্রিক অভ্যাস প্রাধান্য পায় না। এর অর্থ এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ বস্তুজগতকে গুরুত্ব দেন না। তা অনুভূতি প্রকাশের বা রূপদানের কাঠামো মাত্র। সে কারণেই জগতের সমস্ত কিছু রবীন্দ্রনাথের কাছে মানবীয়, চৈতন্যের উপস্থিতি ছাড়া সকলই বিফল। কিন্তু খেয়াল করার বিষয় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা। কারণ তাঁর দর্শনে তথ্য ও সত্য অসংলগ্ন, বিরোধী। আনন্দরূপকে ব্যক্ত করাও যে এক প্রকার প্রয়োজন সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নীরব-ই থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মতে, রবীন্দ্রনাথ যাকে সত্য বলছেন তা আসলে রিয়ালিজমের অগ্নিস্ট। আর ন্যাচারালিজম বাইরের রূপ ছাড়া কিছুই নয়, অর্থাৎ তথ্য।^{৮৩}

১৯২৭ সালে দঃ-পূঃ এশিয়া ভ্রমণের ঠিক আগে *বিচিত্রায়* প্রকাশিত হয় ‘সাহিত্যধর্ম’ এবং ফিরে আসার পরে *প্রবাসীতে* প্রকাশিত হয় ‘সাহিত্যে নবত্ব’ নামে দুটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধ দুটিতে তদকালীন আধুনিক সাহিত্যিকদের সমালোচনা-ই করেন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের শাস্ত্রত্ব ধর্ম সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যিকদের লেখাকে যথার্থ সাহিত্য নয় বলে অভিযোগ করছেন। সতর্ক রবীন্দ্রনাথ খেয়াল করিয়ে দেন এর পেছনে কোনও নৈতিক অবস্থান নেই, শুদ্ধ সাহিত্যিক বিচারেই তা গ্রহণে তিনি অপারগ। সেখানে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সাহিত্যে যে আকর্ষণ ও আভিজাত্য আছে তাই নিত্য বা চিরকালীন। বিদেশ থেকে

আমদানীকৃত বে-আব্রুতাকে কেউ কেউ নিত্য বলে মনে করছেন, তাঁরা ভুলে যান যে নিত্য/চিরকালীন/শাস্বত অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না।^{৮৪} লেঙ্গট পরা, ধুলোমাখা আধুনিকতা বাংলা সাহিত্যে এসে পড়েছে, তাকে অসত্য না বলে, ‘অসঙ্গত’ বলেই মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং সেগুলিকে সাহিত্যের বিষয় করে তোলায় তাঁর ঘোর আপত্তি। নৈতিক আপত্তির পাশাপাশি, অমল হোমের আধুনিক সাহিত্য সংক্রান্ত আপত্তির কেন্দ্রে ছিল বিষয় (content)। কী হবে সাহিত্যের বিষয়? কী স্থান পাবে? আর কোন বিষয়কে সযত্নে এড়িয়ে যাবেন সাহিত্যিক? রবীন্দ্রনাথের অবস্থান কিঞ্চিৎ সে রকমের। সবকিছুকে নির্বিচারে সাহিত্যে স্থান দিতে তিনি নারাজ, কারণ

“মানুষের রসবোধেই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসংগত বলেই আপত্তি করব, অসত্য বলে নয়।”^{৮৫}

তবে সতর্ক, বিচক্ষণ রবীন্দ্রনাথ নৈতিক অবস্থানকে বাতিল করে, তাঁর আপত্তিকে কেন্দ্রীভূত করলেন দুটি প্রশ্নে— এক, বিষয়গত। দুই, সাহিত্যের চিরন্তনত্ব। ‘সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধে তিনি জানাবেন—

“বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ।”^{৮৬}

রবীন্দ্রনাথ যে অভিযোগ তুললেন আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে, এককালে তাঁর বিরুদ্ধে এই রকমের অভিযোগ তুলেছিলেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ। আক্রমণকারী রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই রকমের অভিযোগ শানাচ্ছেন বিরুদ্ধ-পক্ষের দিকে। রবীন্দ্রনাথের আপত্তি কেবল সত্য কিংবা সাহিত্য গুণের কারণে নয়। আপত্তির পেছনে দীর্ঘকাল লালিত

নৈতিকবোধও যে ক্রিয়াশীল ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। তিনি নিজেই জানিয়েছেন কিছু বিষয় সাহিত্যে না থাকাই শ্রেয়, তা যত সত্য হোক না কেন।

বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মতামত প্রবীন রক্ষণশীলদের খুশি করলেও, নবীন আধুনিক সাহিত্যিকদের ক্ষুব্ধ করে। এই বাদানুবাদের মীমাংসার দায়িত্ব পেলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী সম্মিলনীর আহ্বানে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে মিলিত হয় দুই বিবদমান পক্ষ, সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। সভার দুই অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন তিনি যা পরে ‘সাহিত্যরূপ’ ও ‘সাহিত্যসমালোচনা’ শিরোনামে প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায়, যথাক্রমে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। ‘সাহিত্যরূপ’ শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, প্রত্যেক মহৎ সাহিত্যিক সাহিত্যে নতুন বিষয় (content) নয়, একটা নতুন রূপ নিয়ে আসেন। যেমন বাংলা সাহিত্যে নতুন রূপ এনেছেন মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র। বিষয় ও রূপ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

“...রূপের আনন্দেই রচনার বিষয়গুলি হয়েছে সার্থক। বিষয়গুলি অনিবার্য কারণে আপনিই কালোচিত হয়ে ওঠে। মানবজীবনের মোটা মোটা কথাগুলো আন্তরিক ভাবে সকল সময়েই সমান থাকে বটে কিন্তু তার বাইরের আকৃতি-প্রকৃতি বদল হয়।”^{৮৭}

উপস্থাপনা ও প্রকাশের বিভিন্নতাই সাহিত্যকে চিরন্তন করে তোলে, এই যেন রবীন্দ্রনাথের মত, কারণ বিষয় সবকালে প্রায় একই থাকে। যদিও রবীন্দ্রনাথ যেসব পূর্বজদের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর লেখায়, তাঁদের সাহিত্যের ‘বিষয়’ ও রবীন্দ্রনাথের উপস্থাপিত ‘বিষয়’ সত্যি কি অভিন্ন? কে প্রকৃত সাহিত্যিক আর কে নন? সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

“রচনার বিষয়টি কালোচিত যুগোচিত, এইটেতেই যাঁর একমাত্র গৌরব তিনি উঁচুদরের মানুষ হতে পারেন, কিন্তু তিনি কবি নন, সাহিত্যিক নন।”^{৮৮}

রবীন্দ্রনাথের মতে আধুনিকতা বিষয়টি মর্জি বা রুচির উপর নির্ভরশীল। ‘কাল’ যে গুরুত্বপূর্ণ তা এই প্রবন্ধে তিনি অস্বীকার করবেন। কিন্তু ‘আধুনিক কাব্য’-এ তিনি ‘কাল’-এর গুরুত্ব

অস্বীকার করেননি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কাছে আধুনিকতা ও আধুনিকতাবাদবাদ সমার্থক বিষয়। কিন্তু আদতে আধুনিকতা ও আধুনিকতাবাদ আলাদা বিষয়। ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় কোন ‘নবরূপের অবতারণা’ করেছেন? রবীন্দ্রনাথের বিচারে এর উত্তর হয়তো না-ই। পরের দিনের বক্তৃতা, অর্থাৎ ‘সাহিত্যসমালোচনায়’ তিনি বললেন যে, ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যে অসংযমী, যৌনতাময় রচনার বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তির কারণ নৈতিকতা নয়। বরং “কতকগুলি লেখা আমার চোখে পড়েছিল যেগুলিকে সাহিত্যধর্ম-বিগর্হিত মনে হয়েছিল।”^{৮৯} দৈন্য প্রচার কিংবা মানুষের লজ্জা ঘোষণা করা সাহিত্যের কাজ নয়, মানুষের মাহাত্ম্য স্বীকার করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। এই প্রশ্নে আধুনিক, বাস্তবতাবাদীদের সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ বলেই মনে হয়। যা এতো কাল সাহিত্যে নিষিদ্ধ ও বর্জিত ছিল, যাকে রবীন্দ্রনাথ ‘কলুষ’ বলে চিহ্নিত করেন, সেটিকে চরম বর্ণনীয় বিষয় করে তোলা আধুনিকতার একটি বিশেষ লক্ষণ। যা রবীন্দ্রনাথের না-পসন্দ। ‘ঈশ্বর’, ‘ভালোবাসা’ ইত্যাদিকে অস্বীকারের মধ্যে কোথাও সাহিত্যিকতা নেই, এই তাঁর সিদ্ধান্ত^{৯০}। দীর্ঘদিনের সাধনায় মানুষ যা অর্জন করেছে তাকে অবিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। মানব সভ্যতার ‘মর্মগত সত্য’কে লঙ্ঘন করার অধিকার কারুর নেই। ‘মর্মগত সত্য’ বলতে তিনি চিরায়ত নীতি, নৈতিকতার উল্লেখ করেছেন^{৯১}। তরুণ সাহিত্যিকদের বাস্তবানুগ রচনা ঘিরে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির পেছনে কেবল বিশেষ আন্তিক দর্শন নয়, সেই দর্শন জারিত নৈতিকতাবোধও ছিল, তা অস্বীকার করা ভুল হবে। নৈবক্তিকতাকে বিশ শতকের সাহিত্যের কুল লক্ষণ, বললেও, সর্বদা প্রসন্নচিত্তে সেই অবজ্যেষ্ঠিভিটিকে গ্রহণ করতে তিনি অপারগ ছিলেন। এর মূলে রয়েছে তাঁর আত্ম-চৈতন্য নির্ভর বাস্তবতার^{৯২} ধারণা এবং রোমান্টিক কবিসত্তা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সাবেক আন্তিক্যের অবক্ষয় বা মৃত্যু যে নতুন সামাজিক বাস্তবতা তৈরি করেছিল আধুনিক

সাহিত্যিকদের আখ্যান সেই সংশয় ও দ্বিধার কাব্য। যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসজগতের দুষ্টর ব্যবধান। বিশ্বাস, বিশ্বাস-ভঙ্গ, মঙ্গলময় ‘ঈশ্বর’-এর মৃত্যু উভয়পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করে, যা ভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। এই ভিন্নতাই বিবাদের কারণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘বাস্তবতা’ বিষয়ক বিতর্কটি নিয়ে শরৎচন্দ্রের অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল শেষ প্রশ্ন উপন্যাসটির প্রেক্ষিতটি বোঝানোর জন্যে। এই অধ্যায়ের ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্য ও ‘বাস্তবতা’ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের বক্তব্যগুলি বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১৬ আষাঢ় হাওড়া টাউন হলে শরৎচন্দ্র ‘আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে বিরোধীদের সমালোচনা করে শরৎচন্দ্র বলছেন যে, তাঁরা বারবার বিশ্ব সাহিত্যের কথা উল্লেখ করেন বটে— বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের সম্যক পরিচয় থাকলে তাঁরা যেটিকে সাহিত্যে ‘আবর্জনা’ বলে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করছেন, তা করতেন না^{৩৩}। তাঁর মতে আবর্জনাই সাহিত্যের ভিত্তি। আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঠকদের ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করছেন শরৎচন্দ্র, বলছেন ‘তार्কিক’^{৩৪} পাঠকেরাও এক অর্থে ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যের স্রষ্টা। পাঠকেরা বিনা ‘বিচার’^{৩৫}-এ কোনো কিছুতে “বিশ্বাস করিতে চাহে না”^{৩৬}। বস্তুত, নির্বিচারে ‘বিশ্বাস’-এর কাল যে গত হয়েছে, সে অনুসঙ্গ অস্পষ্ট থাকে না শরৎচন্দ্রের বয়ানে। শরৎচন্দ্রের আধুনিক পাঠক মনন মনে করে, বঙ্কিমচন্দ্র খানিক জবরদস্তি করেই কৃষ্ণকান্তের উইল-এর (১৮৭৮) পরিসমাপ্তি করেছেন। নীতিশিক্ষা দেওয়া সাহিত্যের বা সাহিত্যিকের কাজ নয়। শরৎচন্দ্রের প্রস্তাব, গভীরভাবে ভেবে দেখলে ‘সাহিত্যিক-দুর্নীতির’ মূলে, এই চেষ্টাই ধরা পড়ে যে, সে মানুষকে মানুষ বলে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। পরের বছর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নদিয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে একটি বক্তৃতা দেন, যা পরে প্রবন্ধাকারের স্বদেশ ও সাহিত্য-তে (১৯৩২) অন্তর্ভুক্ত হয়। ‘সাহিত্য ও নীতি’ শীর্ষক

প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলছেন যে, বিশ্বমানব একটা বস্তুর দিকে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে— তার তিনটি অংশ— art, morality এবং ধর্ম (religion)। মানুষের সত্যিকারের ঐশ্বর্য চিরদিনই নিত্য ভোগের বাইরের সামগ্রী। সেই ঐশ্বর্যের চরম পরিণতি কোথায়? শরৎচন্দ্র লিখছেন—

“সুন্দর এবং মঙ্গলের সাধনায়,— art, morality এবং ধর্মে। ...অতএব, যা অসুন্দর, যা immoral, যা অকল্যাণ, কিছুতেই তা art নয়, ধর্ম নয়।”^{৯৭}

রবীন্দ্রনাথের স্বর শোনা যায় শরৎচন্দ্রের বয়ানে। শরৎচন্দ্র খানিক দ্বিধাতুর, দোদুল্যমান। সাহিত্যে বাস্তবতার গুরুত্বকে অস্বীকার তিনি করেন না, পূর্বোক্ত প্রবন্ধে সে কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর বাস্তবতার ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে নৈতিকতা ও মঙ্গলের ধারণা। ঐশ্বরিকতা, ধর্মীয় নৈতিকতার আদর্শকে ছেড়ে আসতে তিনি অপারগ। সেকারণেই উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখবেন—

“সংসারে যা-কিছু ঘটে,— এবং অনেক নোংরা জিনিস ঘটে,— তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে?”^{৯৮}

দুটি বক্তব্য হাজির করলেন শরৎচন্দ্র— এক, তাঁর বিচারে অ-সুন্দর বা ‘নোংরা’ বিষয় সাহিত্যে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত নয়। তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বাস্তবতাবাদ বিরোধী গোষ্ঠীর মিল লক্ষণীয়। দুই, সামাজিক ঘটনার হুবহু বর্ণনাই কি বাস্তবতাবাদের একমাত্র কাজ? এই অধ্যায়ের শুরুতে এই বিষয়ে বঙ্কিমের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরে আলোচনার সূত্রে অন্যান্য সমালোচকদের বক্তব্যও উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রশ্নে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাস্তবতা বিরোধীদের বক্তব্যের মিল লক্ষ করা যায়। যদিও ‘সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি’ প্রবন্ধটি শেষ করছেন এই বলে যে, আজকের দিনে রাজারাজড়াদের কাহিনি পাঠকের মনকে তৃপ্তি দিতে পারে না, ফলে আধুনিক সাহিত্যে উঠে আসবে সাধারণের কথা, তাদের সুখ-দুঃখ, বেদনা,

আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। তবে আমাদের সাহিত্য বিশ্বের দরবারে স্থান নিতে পারবে। কিন্তু বিষয় নির্বাচন করার ক্ষেত্রে, নির্বিচারে সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করতে ও স্থান দিতে নারাজ। বিশেষত, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, যৌনতাকে ‘অবারিত’ ভাবে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দিতে নারাজ^{৯৯}। একদিকে বাস্তবতা ও ঐশ্বরিক নৈতিকতার চাপে শরৎচন্দ্র খানিক দ্বিধাতুর, দোদুল্যমান। বস্তুত, প্রাচীন ভারতের আদর্শ সম্পর্কে নির্মোহ হলেও, শেষাঙ্গি নৈতিকতার প্রশ্নে তিনি আস্তিক্যবাদী আদর্শকে ছেড়ে আসতে পারেননি।

১৩৩০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে সরলা দেবীর ‘সিংহের বিবরে’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় *বঙ্গবাণী* পত্রিকায়। প্রবন্ধটি যতীন্দ্রমোহন সিংহের *সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা* বইটির সমালোচনা। বাস্তবতার প্রসঙ্গে সরলা দেবীর প্রবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধের শুরুতে আধুনিক সাহিত্য নিয়ে যতীন্দ্রমোহনের আপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যতীন্দ্রমোহনের মূল আপত্তির বিষয় ‘প্রেম’ নামক রোগটি, যা এ দেশে ছিল না, যেটিকে আধুনিক সাহিত্যিকরা বিলেত থেকে আমদানী করেছেন। যা দেশের পক্ষে, মূলত হিন্দু সমাজের জন্যে ক্ষতিকর।^{১০০} *বৃহদারণ্যক উপনিষদ* থেকে সরলা দেবী উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে ‘প্রেম’ নামক বিষয়টি আমাদের দেশে আবহমান কাল থেকে আছে, বস্তুত তা মানবিক বৈশিষ্ট্য। শুধু প্রেম নয়, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপরেও যতীন্দ্রমোহন চটা।^{১০১} সরলা দেবী বক্তব্য, সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা “মলিন পুকুরের জল সেবনে হয় না” এবং কোথায় কীভাবে সমাজ নামক পুকুরের জল দূষিত করা হচ্ছে, তা দেখিয়ে দেওয়াও সমাজ সেবাই^{১০২}। বাস্তবতাবাদ বিষয়ক বিতর্কে অংশগ্রহণ অপেক্ষা যে বাস্তবতা সাহিত্যে উপস্থাপিত হচ্ছে তা কেন যৌক্তিক তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন প্রাবন্ধিক। তবে পরোক্ষে তিনি আধুনিক সাহিত্যিকদের সমর্থন করেন এবং হিন্দু সমাজকে

‘পরম সুন্দর’ নিখুঁত বলে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টাকে ভৎসনা করেছেন। সরলা দেবী প্রশ্ন করেছেন প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা ও প্রচলিত বিশ্বাসকে।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ‘অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত প্রগতি পত্রিকায়। প্রবন্ধের শুরুতে বুদ্ধদেব বসু উল্লেখ করেন আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে মূলত দুটি অভিযোগ— এক, তাঁরা নর-নারীর যৌন জীবনকে সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন। দুই, তাঁদের রচনার বিষয়-বস্তু ও প্রতিবেশ অস্বাস্থ্যকর ঘৃণিত, যা কিনা পাঠকের মনে রিরংসা ও পাশবিক প্রবৃত্তি উদ্বেক করে^{১০০}। রক্ষণশীলদের একাংশ আধুনিক সাহিত্যকে ‘কামায়ণ’ নামে চিহ্নিত করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর মতে, সুনীতির চর্চা অপেক্ষা সাহিত্য সৃষ্টি করা অনেক বেশি দরকারী। নিম্নবিত্ত মানুষদের কঠোর ও কদর্য বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিপাত করতে চান আধুনিক সাহিত্যিকরা, যাদের বুদ্ধদেব বসু ‘পাঁকের পোকা’^{১০৪} হিসেবে অবিহিত করেছেন উক্ত প্রবন্ধে। দৃষ্টান্ত হিসেবে হাজির করছেন, যুবনাশ্বের (১৯০২-১৯৭৯) *পটলডাঙ্গার পাঁচালী*-র (১৯৫৬), যেখানে লেখক কুৎসিতকে জীবনের কথা তুলে ধরে গিয়ে পাঠকের ‘তথাকথিত Refind sensibility’^{১০৫}-কে রেয়াৎ করেননি। এবং কুৎসিতকে সুন্দর করে উপস্থাপিত করার মতো রোমান্টিক ভণ্ডামিও করেননি^{১০৬}। লক্ষণীয়, বুদ্ধদেব বসু জোরালো ভাষায় জানান দিলেন যে ‘অ-সুন্দর’ও সাহিত্যের বিষয় হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সহ একাংশের লেখকরা যেখানে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন প্রকৃত সাহিত্য মাত্রই ‘সুন্দর’ ও ‘মঙ্গল’-এর পূজারী, সেখানে এই মত প্রণিধান যোগ্য এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এমন কি বাস্তবতার পক্ষাবলম্বী শরৎচন্দ্রও ‘অ-সুন্দর’ ও ‘অমঙ্গলময়’ জগৎ ও জীবনকে নির্দিধায় সাহিত্যের বিষয় করতে ছিলেন দ্বিধাতুর। কেন আধুনিক সাহিত্যিকরা এমন জীবন ও জগতের কাহিনিকে তাঁদের আখ্যানের বিষয় ও প্রতিবেশ করলেন? বলাই বাহুল্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধই তার কারণ, যুদ্ধোত্তর (Post-war) সমাজ বাস্তবতা

ও সামাজিক চৈতন্য নির্মান করে ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যিক মনন। বুদ্ধদেব বসু স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সুজলা-সুফলা সোনার বাংলার সঙ্গে তাঁদের জগতের বিস্তর ফারাক।^{১০৭} সাবেক মঙ্গলময় ঈশ্বরের অনুপস্থিতির কারণে, আধুনিক সাহিত্যিকদের ‘অক্ষয় বিশ্বাস’ ও ‘অন্ধ ভক্তি’ প্রশ্নের মুখে। তাঁরা (আধুনিক সাহিত্যিকরা) বিশ্বাস করতে শিখেছেন কোনো কিছুই অবোধ্য নয়, সব কিছুরই হেতু ও উৎপত্তি রয়েছে। জগতের রহস্য যেহেতু উন্মোচিত আধুনিক সাহিত্যিকদের কাছে, ফলে কল্পনা অপেক্ষা যুক্তি, বাস্তবতা উঠে আসবে আধুনিকের আখ্যানে, সেকারণে আধুনিক খানিক ককর্শ, তিক্ত। এই দিক থেকে তাঁদেরকে ‘নাস্তিক’^{১০৮} বলে চিহ্নিত করা অস্বাভাবিক নয়। আধুনিকদের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ উঠেছিল— কিছু করতে হবে বলেই তাঁরা ‘Unconventional জিনিষের অবতারণা’^{১০৯} করেছেন। তাঁরা যা অনুভব করেছিলেন, ধারণ করেছিলেন চৈতন্যে তাই দিয়ে নির্মিত হয়েছে তাঁদের আখ্যানের জগৎ, ‘মঙ্গলময়’ সত্তা কিংবা আলোকপ্রাপ্তির সৌজন্যে প্রাপ্ত মানবতার আদর্শের অনুপস্থিতি-ই আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রণোদিত করেছিল তিক্ত আখ্যান রচনায়, হয়তো পূর্বজরা তা অনুভব ও অনুমান করতে পারেননি, তাই এই অভিযোগ করেছিলেন। ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যের সম্ভবত সবচেয়ে জোরালো, যৌক্তিক প্রস্তাবনাকার বুদ্ধদেব বসুও কী শেষাব্দি ঐশ্বরিকতাকে ছিন্ন করতে পেরেছিলেন? উক্ত প্রবন্ধেই একাধারে তিনি বলছেন যে, ‘পাঁকের পোকা’দের ক্লিষ্ট, ক্লোদাক্ত জীবনকে সাহিত্যে তুলে আনাই আধুনিক সাহিত্যিকদের কাজ, পরে অন্য রকম মন্তব্য করছেন যেখানে ক্লোদাক্ত জীবনকে অতিক্রম করে ‘পাঁকের পোকা’দের মধ্যে কীভাবে সুন্দরের অভিলাষ ফুটে উঠছে সেটি তুলে ধরতে চাইছেন আধুনিকেরা। এবং প্রবন্ধের শেষে জানাচ্ছেন—

“সাহিত্য যে বাঁচে, তা সম্পূর্ণ তার কতকগুলো artistic গুণে। পৃথিবীর সব লেখকের রচনাতেই তাঁর নিজের দেশের তৎসাময়িক অবস্থাগুলি ফুটে উঠেছে, কিন্তু লেখার সৌন্দর্যের মহিমায় কোনো-কোনো রচনা তৎসত্ত্বেও চিরকাল বেঁচে থাকে।”^{১১০}

খেয়াল করার বিষয়, বুদ্ধদেব বসুও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দাঁড়িয়ে ‘ঈশ্বর’ বিশ্বাস, ঐশ্বরিকতা, ধর্মীয় নৈতিকতাকে ‘প্রাক্তন বিশ্বাস’ বলে চিহ্নিত করছেন। সন্দর্ভের শুরুতে বলার চেষ্টা করেছিলাম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যে মঙ্গলময় সত্তার (ঈশ্বর) অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়, এক অর্থে খারিজ করে দেয়, সেই প্রস্তাবনার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কালান্তরের আশ্বর্ষ সম্পর্ক রচিত হয় ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যিকদের হাত ধরে। আমাদের প্রস্তাবনার সমর্থনও মেলে বুদ্ধদেব বসুর বয়ানে। কিংবা যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন, মানুষের মর্মে মর্মে বিরাজ করছে ‘সংক্রমিত মড়কের কীট’— সেই শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত যারা সচেতন তাদের দুরাবস্থা, অবিচ্ছিন্ন বেদনা, চৈতন্যের ‘অ-সুখ’ সম্পর্কে— যন্ত্রণাই যে জীবনের সত্য তা আধুনিকের অজানা নয়। সেই মৃত ‘ঈশ্বর’-এর রাজত্বে কিংবা ‘প্রাক্তন বিশ্বাস’-এর ভূমিতে দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেব বসুর চিন্তায় ফেরত আসে Godlyness জগতের কথা। সেই আশাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই হয়তো উপরোক্ত মন্তব্যগুলি করেন। নিশ্চিত করে আস্তিক বা নাস্তিক কোনো একটি দার্শনিক কোঠরে ফেলা যায় না হয়তো তাঁর অবস্থান কে। একথা বলা বলা অতুষ্টি হবে না যে বস্তুবাদের সঙ্গে বাস্তবতাবাদের একটি বিশেষ রীতির সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের সম্পর্ক-ই ছিল।

এই অধ্যায়ে ‘বাস্তবতা’ বিষয়ে বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা কী ভেবে ছিলেন, সে কথাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সূত্রে আস্তিক ও নাস্তিক দার্শনিক প্রস্থানের সঙ্গে সেই সকল সাহিত্যিকদের সম্পর্ক কেমন তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ‘বাস্তবতা’ সংক্রান্ত বিতর্ক প্রসঙ্গে অধ্যাপক আকিমুন রহমানের বক্তব্য, পাশ্চাত্য বাস্তবতাবাদ কেবল বস্তুবাদী দর্শন দ্বারাই

প্রভাবিত হয়নি, বাস্তবতাবাদের পরিভাষাটির সন্ধান দেয় বস্তুবাদী দর্শন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি^{১১}। একথা ঠিক যে, পাশ্চাত্যে রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজম যে ভাবে বিকশিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে তার মিল লক্ষ করা যায় না। বস্তুবাদী, নাস্তিক দর্শন প্রস্থানগুলি প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য ‘বাস্তববাদী’ সাহিত্যধারাকে প্রভাবিত, বিকশিত ও পরিণত করেছিল। বাংলা সাহিত্যের উপর ভারতীয় বস্তুবাদী, নাস্তিক/না-ঈশ্বরবাদী দর্শন প্রস্থানের প্রভাব তেমন নয়। আকিমুন রহমানের এই তুলনাটি খানিক একটেরে। অধ্যাপক রহমানের এই মতটির সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ সহমত নই। ইউরোপে সাহিত্য, দর্শনের গড়ে ওঠার সঙ্গে উপনিবেশের শিক্ষা, সংস্কৃতির গড়ে ওঠার মূলগত ফারাক রয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন অনেক বেশি পরম্পরা ভিত্তিক। তুলনায় ইউরোপীয় দর্শনের বিকাশে পরম্পরা অপেক্ষা ব্যক্তি দার্শনিকের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাচীন ভারতে জ্ঞানচর্চার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য হঠাৎ করে থমকে গেল কেন? প্রফুল্লচন্দ্র রায় *History of Hindu Chemistry* গ্রন্থে বলেছেন শঙ্করাচার্যের মায়াবাদী দর্শন ও জাতিভেদ প্রথাই তার কারণ। ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলি বস্তুজগতের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছে এবং প্রতিষ্ঠা করেছে পরমের ধারণা। ভারতীয় বস্তুবাদের বিকাশে ‘আস্তিক’ দর্শনগুলির যেভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে ইউরোপে তা হয়নি। তার প্রভাব যে এই উপমহাদেশের সংস্কৃতি জগতে পড়েনি তা নয়। বাংলা সাহিত্যে ‘বাস্তবতা’ বিষয়ক বিতর্কমূলক প্রবন্ধগুলি সে কথাই প্রমাণ করে। আর অধিকাংশ প্রাবন্ধিকের ‘বাস্তবতা’ সংক্রান্ত ধারণা আস্তিকবোধ প্রভাবিত। উপনিবেশের ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বস্তুবাদী ভাবনা চিন্তার জন্যে অনেকাংশে ইউরোপীয় ভাবনা-চিন্তার উপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক রহমানের এই মত গ্রহণীয় যে, পাশ্চাত্য ভাবনাই বাঙালির বাস্তবতা সংক্রান্ত সাহিত্য ভাবনাকে প্রভাবিত

করে। কিন্তু ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যের প্রতিপক্ষরা আধুনিক বাস্তবতাবাদকে সমালোচনার করার সময় আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রায় নাস্তিক পরম্পরাহীন হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন এবং কাঠাগোড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। এটিও এক অর্থে স্বীকৃতি। এই প্রভাবকে কেবলই পাশ্চাত্য প্রভাবিত বলে দেওয়া একটেরেই, কারণ উনিশ শতক থেকে ভারতীয় বাস্তবাদচর্চার প্রাচীন ধারাটি ধীর লয়ে হলেও সামনে আসছিল। বিশ শতকে প্রাচীন নাস্তিক দর্শনগুলি পুনরায় চর্চার বিষয় হয়ে উঠছিল, তা যে বাঙালি সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করেনি তা বলা যায় না। এই দিকটি অধ্যাপক রহমানের অগোচর থেকে গেছে। আস্তিক-নাস্তিক তর্ক, বঙ্কিমী, রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যকে অনেক বেশি বাস্তবানুগ করে তোলে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর অর্থ এই নয় যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ অলীক জগতের কথা তাঁদের আখ্যানে তুলে ধরতেন। উপন্যাস সংরূপটির সঙ্গে বাস্তবের নাড়ির যোগ। এই বিতর্ক বাংলা সাহিত্যকে অনেক বেশি জীবন যন্ত্রণার শরিক করে তোলে। ঐ বিতর্কে পক্ষ নির্ধারণে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সাধারণ জীবন আখ্যানের বিষয় হয়ে ওঠে। বাংলা আখ্যানে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্ককে ভিত্তি করে যে আখ্যান গড়ে ওঠার ধারাটি পুষ্ট হয় বাস্তবতাবাদীর সৌজন্যে, যার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল ব্যক্তি সাহিত্যিকদের অস্তি ও নাস্তি সম্বন্ধীয় বোধ। বঙ্কিমের উপন্যাসের মধ্যে বাস্তবতার যোগ সে অর্থে বিকশিত না হলেও রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে বাস্তবতার ধারাটি আকার পাচ্ছিল। বাস্তবতা ও অতি-আধুনিক’ সাহিত্য বিষয়ক বিতর্ক সেই ধারাটিকেই পুষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সেই ঐতিহ্যকে আধুনিক কথাকারে বাস্তবানুগ সাহিত্য সৃষ্টির কথা বলেছেন ঠিক, কিন্তু তাঁর নিরাবেগ ভাবে সাহিত্য চর্চা করতে পারেননি, তা বলাই বাহুল্য। ‘পাঁকের পোকা’দের জীবনকে সাহিত্যে স্থান দিলেও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ‘দেখা’ রোমান্টিক ভাবালুতা দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

অনেকক্ষেত্রেই তাঁরা আন্তিক দর্শনের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু কল্লোলের ধারা বহুলাংশে রোমান্টিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন। বরং ত্রিশের দশকের সাহিত্যিকরা অনেকবেশি নির্মোহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাস্তবজীবনকে নির্মোহভাবে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত অন্যতম পথিকৃৎ এবং পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্মরণীয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

- ^১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'উত্তরচরিত', *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬, পৃ- ১৮২
- ^২ ঐ, পৃ- ১৮৪
- ^৩ পূর্ণচন্দ্র বসু, 'শৈবলিনী', *আর্য্যদর্শন*, আষাঢ় ১২৮৪, পৃ- ১৩৩
- ^৪ আকিমুন রহমান, *বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দলিল (১৩১৮-১৩৫০বঙ্গাব্দ)*, ঢাকা : অক্ষুর প্রকাশনী, ২০১২, পৃ- ২১
এবং দ্রঃ আকিমুন রহমান, *বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা স্বরূপ (১৯২০-৫০)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ- ৫৭
- ^৫ বিপিনচন্দ্র পাল, *চরিত-কথা*, কলকাতা : শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৩২৩, পৃ- ২০১
- ^৬ ঐ, পৃ- ২০২
- ^৭ ঐ, পৃ- ২০৩
- ^৮ ঐ, পৃ- ২০৪
- ^৯ ঐ, পৃ- ২০৬
- ^{১০} ঐ
- ^{১১} ঐ, পৃ- ২১১-১২
- ^{১২} ঐ, পৃ- ২১৩
- ^{১৩} ঐ, পৃ- ২১৪
- ^{১৪} বানান পরিবর্তিত
- ^{১৫} বানান পরিবর্তিত
- ^{১৬} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা', *ভারতী*, শ্রাবণ, ১২৯২, পৃ- ১৯২-৯৩
- ^{১৭} অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন?', *প্রবাসী*, আষাঢ় ১৩১৯, পৃ- ৩০৪
- ^{১৮} ঐ, পৃ- ৩০৫
- ^{১৯} ঐ, পৃ- ৩০৮

- ^{২০} রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ‘লোকশিক্ষক বা জননায়ক’, *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, পৃ- ১৯৬ এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ‘লোকশিক্ষক বা জননায়ক’, *বর্তমান বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩৪১, পৃ- ৩৪-৩৫
- ^{২১} ঐ, পৃ- ২০১ ও ঐ, ৪৮-৪৯
- ^{২২} ঐ
- ^{২৩} ঐ, পৃ- ১৯৮ ও পৃ- ৪০
- ^{২৪} ঐ, পৃ- ২০২ ও পৃ- ৫২
- ^{২৫} ঐ, পৃ- ২০৩ ও পৃ- ৫৩
- ^{২৬} রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ‘সাহিত্যে বাস্তবতা’, *সবুজ পত্র*, মাঘ ১৩২১, পৃ- ৬৯৯ এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ‘সাহিত্যে বাস্তবতা’, *বর্তমান বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩৪১, পৃ- ১৭৬
- ^{২৭} ঐ
- ^{২৮} ঐ, পৃ- ৭০০ এবং পৃ- ১৭৮
- ^{২৯} ঐ, পৃ- ৬৯৯ এবং পৃ- ১৭৬
- ^{৩০} ঐ, পৃ- ৭০১-০২ এবং পৃ- ১৭৯
- ^{৩১} ওই, পৃ- ৭০২ এবং পৃ- ১৮০
- ^{৩২} ঐ
- ^{৩৩} প্রমথ চৌধুরী, ‘বস্তুতত্ত্বতা বস্তু কি?’, *সবুজ পত্র*, মাঘ ১৩২১, পৃ- ৭১৫
- ^{৩৪} ঐ, পৃ- ৭১৭
- ^{৩৫} ঐ
- ^{৩৬} ঐ, পৃ- ৭২২
- ^{৩৭} ঐ, পৃ- ৭২৮
- ^{৩৮} ঐ
- ^{৩৯} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘কবির কৈফিয়ত’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯, পৃ- ৪৮৬
- ^{৪০} স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *উপনিষদ*, ১ম ভাগ, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ- ৫৪১
- ^{৪১} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘কবির কৈফিয়ত’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯, পৃ- ৪৮৭
- ^{৪২} ঐ, পৃ- ৪৮৮
- ^{৪৩} John Keats, *The complete poetical works and letters of John Keats*, Cambridge : Houghton Mifflin and Company, 1899, p. 135
- কিটসের ‘Ode on a Grecian Urn’ কবিতাটির শেষ অংশটি—
- “O Attic shape! Fair attitude! with brede
Of marble men and maidens overwrought.
With forest branches and the trodden weed;
Thou, silent form, dost tease us out of thought
As doth eternity: Cold Pastoral!
When old age shall this generation waste,
Thou shalt remain, in midst of other woe
Than ours, a friend to man, to whom thou say'st,
'Beauty is truth, truth beauty,' — that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.” (বাঁকা হরফ আমার)

- ^{৪৪} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবির কৈফিয়ত', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯, পৃ- ৪৮৮
- ^{৪৫} শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮৩-১৯৬৪), যতীন্দ্রমোহন সিংহ (১৮৫৮-১৯৩৭)।
- ^{৪৬} আকিমুন রহমান, *বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দলিল (১৩১৮-১৩৫০বঙ্গাব্দ)*, ঢাকা : অক্ষুর প্রকাশনী, ২০১২, দ্রঃ সূচিপত্র
- ^{৪৭} বরদাচরণ গুপ্ত, 'সামাজিক সাহিত্য', *সবুজ পত্র*, চৈত্র ১৩২৫, পৃ- ৬৮৯
- ^{৪৮} ঐ, পৃ- ৬৯০
- ^{৪৯} ঐ, পৃ- ৬৯১-৯২
- ^{৫০} হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, *বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন*, কলকাতা : অবভাস, ২০০৮, পৃ- ৭৫
- ^{৫১} যতীন্দ্রমোহন সিংহ, 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা', *সাহিত্য*, বৈশাখ ১৩২৭, পৃ- ৬-৭
- ^{৫২} ঐ
- ^{৫৩} ঐ, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ- ২২৫
- ^{৫৪} ঐ, আশ্বিন ১৩২৭, পৃ- ৩৮৬-৮৭
- ^{৫৫} ঐ, পৌষ ও মাঘ ১৩২৭, পৃ- ৬৪৩-৪৪
- ^{৫৬} ঐ, ফাল্গুন ও চৈত্র, পৃ- ৭০৫
- ^{৫৭} যতীন্দ্রমোহন সিংহ, 'আটের অনুশাসন', *মানসী ও মন্মথবাণী*, চৈত্র ১৩৩১, পৃ- ১১২
- ^{৫৮} অমল হোম, 'অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য', *ভারতবর্ষ*, মাঘ ১৩৩৩, পৃ- ২৮৮
- ^{৫৯} মঙ্গলচন্দ্র শর্মা, 'মাসিক গল্প-সাহিত্য', *প্রবাসী*, শ্রাবণ ১৩৩১, পৃ- ৪৫৭
- ^{৬০} ঐ
- ^{৬১} ঐ, পৃ- ৪৫৭-৫৮
- ^{৬২} বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, 'সাহিত্য ও রস', *বঙ্গবাণী*, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ- ৪৫৫
- ^{৬৩} বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'মানস বিকাশ', *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬, পৃ- ৮৮৫-৮৮
- ^{৬৪} বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, 'সাহিত্য ও রস', *বঙ্গবাণী*, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ- ৪৫২
- ^{৬৫} সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, 'সাহিত্যের আবহাওয়া', *বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দলিল (১৩১৮-১৩৫০বঙ্গাব্দ)*, ঢাকা : অক্ষুর প্রকাশনী, ২০১২, পৃ- ৩৮৯
- ^{৬৬} ঐ
- ^{৬৭} ঐ
- ^{৬৮} ঐ
- ^{৬৯} সজনীকান্ত দাস, 'যুগ সাহিত্য', *বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দলিল (১৩১৮-১৩৫০বঙ্গাব্দ)*, ঢাকা : অক্ষুর প্রকাশনী, ২০১২, পৃ- ৪০৩
- ^{৭০} ঐ, পৃ- ৪০৫
- ^{৭১} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক কাব্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯, পৃ- ৫০১
- ^{৭২} ঐ
- ^{৭৩} সত্যেন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তাকে চারটি পর্বে ভাগ করেছেন। দ্রঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায়(সম্পা.), 'ভূমিকা', *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ সাহিত্যচিন্তা*, কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ২০১১, পৃ- ১৩
- ^{৭৪} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক কাব্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯, পৃ- ৫০৪
- ^{৭৫} দ্রঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), 'ভূমিকা', *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ সাহিত্যচিন্তা*, কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ২০১১, পৃ- ২৬

- ৭৬ সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (সং. ও সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন এক অমীমাংসিত সংলাপ*, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০১৭, পৃ- ৬৬
- ৭৭ ঐ
- ৭৮ ঐ
- ৭৯ ঐ, পৃ- ৬৮ ও ৭১
- ৮০ ঐ, পৃ- ৭০
- ৮১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তথ্য ও সত্য, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯, পৃ-৪৪৫-৪৬
- ৮২ ঐ, পৃ- ৪৪৯
- ৮৩ সত্যেন্দ্রনাথ রায়(সম্পা.), ‘ভূমিকা’, *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ সাহিত্যচিন্তা*, কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ২০১১, পৃ- ৪১
- ৮৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্য ধর্ম’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯, পৃ-৪৮০
- ৮৫ ঐ
- ৮৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যে নবত্ব’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯, পৃ-৪৮২
- ৮৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যরূপ’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯, পৃ- ৫৩১-৩২
- ৮৮ ঐ, পৃ- ৫৩২
- ৮৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যসমালোচনা’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯, পৃ- ৫৩৫
- ৯০ ঐ, পৃ- ৫৩৯
- ৯১ ঐ, পৃ- ৫৩৭-৩৮
- ৯২ আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ সংলাপ। পূর্বোক্ত।
- ৯৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত’, *শরৎ রচনাবলী*, ৫ম খণ্ড, কলকাতা : শরৎ সমিতি, ১৩৮৪, পৃ- ৫৪৯
- ৯৪ ঐ, পৃ- ৫৫০
- ৯৫ ঐ
- ৯৬ ঐ
- ৯৭ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘সাহিত্য ও নীতি’, *শরৎ রচনাবলী*, ৫ম খণ্ড, কলকাতা : শরৎ সমিতি, ১৩৮৪, পৃ- ৫৩৮
- ৯৮ ঐ, পৃ- ৫৩১
- ৯৯ দ্রঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘সাহিত্যের রীতি ও নীতি’, *শরৎ রচনাবলী*, ৫ম খণ্ড, কলকাতা : শরৎ সমিতি, ১৩৮৪, পৃ- ৫৫৩ ও ৫৫৫
- ১০০ সরলা দেবী, ‘সিংহের বিবরে’, *বঙ্গবাণী*, ফাল্গুন ১৩৩০, পৃ- ৩৯
- ১০১ ঐ, পৃ- ৪২
- ১০২ ঐ, পৃ- ৪৫
- ১০৩ বুদ্ধদেব বসু, ‘অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্য’, *বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দলিল (১৩১৮-১৩৫০বঙ্গাব্দ)*, আকিমুন রহমান (সম্পা.), ঢাকা : অক্ষুর প্রকাশনী, ২০১২, পৃ- ৪৮৭
- ১০৪ ঐ, পৃ- ৪৯০
- ১০৫ ঐ, পৃ- ৪৯০
- ১০৬ “কুৎসিতকে কুৎসিত করে আঁকতে গিয়ে পাঠকের তথ্য-কথিত Refiend sensibility-কে কোথাও একটু রেয়াৎ করেননি; Romanticism-এর আমেজে রঙীন করে তুলে কুৎসিতকে সুন্দর বলে চালানোর মত সাহিত্যিক ভণ্ডামিও

তাঁর মধ্যে নেই।” দ্রঃ বুদ্ধদেব বসু, ‘অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য’, *বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দলিল (১৩১৮-১৩৫০বঙ্গাব্দ)*, আকিমুন রহমান (সম্পা.), ঢাকা : অক্ষুর প্রকাশনী, ২০১২, পৃ- ৪৯০

^{১০৭} ঐ, পৃ- ৪৯৬

^{১০৮} “অন্ধ ভক্তির উপর আমাদের আর আস্থা নেই। ...যদি কেউ কষ্ট করে Statistic নিয়ে দেখেন, তাহলে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, ভগবান, ভূত ও ভালোবাসা— এই তিনটি জিনিসের উপর আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।” (বাঁকা হরফ আমার)।

^{১০৯} ঐ, পৃ- ৫০১

^{১১০} ঐ

^{১১১} দ্রঃ আকিমুন রহমান, *বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দলিল (১৩১৮-১৩৫০বঙ্গাব্দ)*, ঢাকা : অক্ষুর প্রকাশনী, ২০১২, পৃ-

১৬

উপসংহার

পাঁচ অধ্যায়ে পরিব্যাপ্ত আলোচনায় আমরা দেখার চেষ্টা করেছি বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাস ও সাহিত্যের ধারাকে ‘আস্তিক’-‘নাস্তিক’ বোধ ও প্রত্যয় কীভাবে প্রভাবিত করেছে। বস্তুত পক্ষে, ঈশ্বর আছেন? না নেই? তা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। সাহিত্যিকদের চৈতন্যকে অস্তি-নাস্তিবোধ কেমন ভাবে আলোড়িত করেছে তাই এই সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়, এবং সমকালীন সংকটকে দেখার, বোঝার ও উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে এই আস্তিক-নাস্তিক তর্কটির ভূমিকা কেমন, তা সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়। সন্দর্ভে আমাদের মুখ্য জিজ্ঞাসা ছিল— এক, অস্তি-নাস্তিবোধের সঙ্গে বাংলা আখ্যানের সম্পর্ক কেমন? সামাজিক সংকট ও ব্যক্তি উপন্যাসিকের চৈতন্যের সংকট ও উত্তোরণের সম্ভাবনার সঙ্গে অস্তি-নাস্তিবোধের সম্বন্ধ নির্ণয় করা। দুই, ‘আস্তিক’ ও ‘নাস্তিক’ শব্দদ্বয় কি দেশ-কাল নিরপেক্ষ কোনো ধারণার কথা বলে? না কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দ্যোতনা নিয়ে হাজির হয়? সময় ও পরিস্থিতির বদল ‘আস্তিক’-‘নাস্তিক’ শব্দ দুটির মধ্যে নতুন ধরনের ব্যঞ্জনা যুক্ত করেছে, তা বলা বাহুল্য। তিন, বাংলা সাহিত্যে ‘বাস্তবতা’ বিষয়ক বিতর্কের সঙ্গে ‘আস্তিক’ ও ‘নাস্তিক’ দার্শনিক প্রস্থানগুলির সম্পর্ক কেমন? বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা কী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সেদিকে এবার নজর দেবো।

সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশে কারা ‘আস্তিক’ এবং কারা ‘নাস্তিক’ সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ঐ অংশের শেষে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন প্রস্থানগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের প্রধান বিষয় উনিশ শতকে বাঙালির ঈশ্বর, যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতা চর্চা। সামগ্রিক ভাবে বাঙালির দর্শনচর্চার রূপরেখা দেওয়া এই

অংশের উদ্দেশ্য নয়। মূলত কয়েকটি বিতর্ক ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন মানুষ যাঁদের ঈশ্বর, যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতা বিষয়ক চর্চা বাঙালি মানসে প্রভাব ফেলেছে সেগুলির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একথা স্বীকার্য উনিশ শতকে নাস্তিকতার চর্চা সেভাবে বিকশিত হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ ও শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন এর ‘চারিটি অংশ’, আমাদের প্রস্তাব চতুরঙ্গ-এর দুটি অংশ— ‘জ্যাঠামশায়’ এবং না-জ্যাঠামশায়। আস্তিক-নাস্তিক দুই বিবদমান দার্শনিক প্রশ্নান চতুরঙ্গ-এর কেন্দ্রিয় সমস্যা-পট, যা শচীশ ও শ্রীবিলাসের হয়ে ওঠাকে সুনিশ্চিত করে, ভিন্ন ভিন্ন পথ খুঁজে নেয় তারা। শচীশ কোন পথ নেয়? নাস্তিক্য, ভক্তিবাদের পথ ছেড়ে শচীশ অরূপের সাধনায় নিমগ্ন। কিন্তু কী তার লক্ষ্য তা ঠিক বোঝা যায় না। ‘দামিনী’ অংশের পরিশিষ্টে উল্লেখিত রয়েছে— ‘কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না’^১। কোন পথ নেয় শ্রীবিলাস? লীলানন্দের ভক্তিবাদ নাকি জ্যাঠামশাইয়ের নাস্তিক্য? অথবা দুই দর্শনের মেলবন্ধনে সন্ধান পায় তৃতীয় কোনো ধারার? শ্রীবিলাসের ‘হয়ে ওঠা’ বস্তুত ‘জ্যাঠামশায়’-এর রিকগনিশন। আমাদের প্রস্তাব চতুরঙ্গ জ্যাঠামশাইয়ের রিকগনিশনের আখ্যান। কলকাতা শহরও শ্রীবিলাসের হয়ে ওঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুত পক্ষে কলকাতা এই উপন্যাসে একটি চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হচ্ছে। শ্রীবিলাসের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ডিপারচার পয়েন্ট বা পট-বদলের ইঙ্গিত হয়ে থাকে শহর কলকাতা। পাড়াগাঁর ছেলে শ্রীবিলাস এই শহরে পেয়েছে জ্যাঠামশাইয়ের সান্নিধ্য, হয়ে উঠেছে নাস্তিক। দীর্ঘদিন পরে চাটগাঁয়ে সন্ধান পায় প্রাণের দোসর শচীশের, প্রাথমিক দ্বিধা, জড়তা কাটিয়ে সেও ভক্তির ‘নেশা’য় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে ‘নেশা’য় ছেদ পড়ে কলকাতায় এসে। উপন্যাসে দ্বিতীয়বার কলকাতার উপস্থিতি শ্রীবিলাসের জীবনে আরেকটি ডিপারচার পয়েন্ট। কার্যত, একটি দার্শনিক অবস্থানকে খারিজ

করার জন্যে যেন কলকাতার আগমন কিংবা শ্রীবিলাসের কলকাতা আগমন। শেষবার কলকাতা উপস্থিত হয় যখন শ্রীবিলাস বিচিত্র, বিবিধ পথ পরিক্রমা করে নিজের পথ খুঁজে পায়। কলকাতাই তার কাছে হয়ে ওঠে বৃন্দাবন, বলাই বাহুল্য সে ‘বৃন্দাবন’ ভক্তের নয়, আধুনিকের, যে নভেল পড়তে ভালোবাসে, ‘সাত্ত্বিকতা’ অপেক্ষা ‘সত্য’-এ বেশি আগ্রহ যার, ভক্তির বিহীনতায় ‘আমি’কে ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন করে দিতে নারাজ যে। ভক্তিবাদী লীলানন্দ স্বামী ও জ্ঞানমার্গী শঙ্করাচার্যের পথকে খারিজ করে শ্রীবিলাস গ্রহণ করে মানবিক দর্শনের, যেখানে থাকবে দামিনীর উজ্জ্বল উপস্থিতি। আত্ম ও অপরের অস্তিত্বকে স্বীকার করবে তার দর্শন। কলকাতা শহরের স্মৃতি আর জ্যাঠামশাইয়ের ‘প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন’-এর মস্তুর মধ্যে মিলবে সেই রাস্তা। সেই অর্থে চতুরঙ্গ ‘জ্যাঠামশায়’-এর রিকগনিশনের আখ্যান।

দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষয় শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন। ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্য বিষয়ক তর্কের সঙ্গে শেষ প্রশ্ন-এর সম্বন্ধ এবং কেন আধুনিকতা বিষয়ক বয়ান হাজির করার জন্যে শরৎচন্দ্র আন্তিক-নাস্তিক তর্কটিকে বেছে নিলেন, সেটি আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল। শেষ প্রশ্ন উপন্যাসটি অনিয়মিত ভাবে ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম কিস্তি বেরোয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে এবং শেষ কিস্তি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। লক্ষণীয় ‘অতি-আধুনিক’ বাংলা সাহিত্য ও বাস্তবতা বিষয়ক বিতর্কের চলার মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসটি। শরৎচন্দ্রের মতে বাস্তবতা উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু বাস্তবতার নামে ‘নোঙরামি’— অর্থাৎ কিনা নর-নারীর যৌন জীবনের বর্ণনা— তাঁর না-পসন্দ। আধুনিকতা ও বাস্তবতা বিষয়ে দ্বিধা ও দোদুল্যমানতাই তাঁকে প্রণোদিত করে শেষ প্রশ্ন রচনায়। দিলীপকুমার রায়, রাধারাণী দেবী ও ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতকে লেখা চিঠিতে তিনি জানান যে, ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত তার নমুনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন শেষ প্রশ্ন-এ। সে কারণে ‘আন্তিক-

নাস্তিক’ তর্কটিকে উপন্যাসের কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করলেন। বস্তুত, বাস্তবতাবাদ ও আধুনিকতাবাদের সঙ্গে ঈশ্বর ও অস্তিত্ব-নাস্তিবোধের গভীর সম্পর্ক। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বস্তুত, এই তর্কের হাত ধরেই আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যের তর্কটিকে বুঝতে চেয়েছেন তিনি। এই তর্কের একপক্ষে ছিলেন অমল হোমরা যাঁদের সাহিত্য ভাবনার মধ্যে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়েছিল ভারতীয় আন্তিক দর্শন প্রস্থানের দৃষ্টিভঙ্গি। আরেকদিকে ছিলেন কল্লোল কালিকলম গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা যাঁরা অসুন্দরকে, আকাঁড়া জীবনকেই তুলে আনতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের ‘মন্দিরে’। শরৎচন্দ্র এই বিবাদ, বিসংবাদে প্রাথমিকভাবে ‘অতি-আধুনিক’দের পক্ষে থাকলেও, পরে তাঁর অবস্থান কিছুটা বদলান। এই তর্ক কেবল দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত বদল ঘটায় এই বিতর্ক, যার সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও আন্তিকতা-নাস্তিকতা বোধের গভীর সম্বন্ধ। এবং এই বিতর্ক শরৎচন্দ্রের চৈতন্যকে এক প্রকার আলোড়িত করে। নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করতে নির্মিত হয় শেষ প্রশ্ন। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার তর্ককে বুঝতে ও বিকল্প সাহিত্যিক নমুনা পেশ করতে পুরোনো আন্তিক-নাস্তিক তর্কটিকেই বেছে নিলেন শরৎচন্দ্র। শেষ প্রশ্ন-এ কেন প্রয়োজন পড়ল এমন একটি কৃচ্ছ্রসাধিকা অতি-আধুনিক চরিত্রের? যেহেতু ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মুখ্য আপত্তির কেন্দ্রে নৈতিকতা বোধ, সে কারণে তাঁর শিক্ষা ও রুচি মোতাবেক চরিত্রের আব্রুতা নিয়ে এই সতর্কতা। তাই ভারতীয় নারীর আদলে তৈরি করে নিলেন কমলকে। যে ঐতিহ্য ও পরম্পরা নিয়ে তর্ক করবে অথচ স্বভাবে, চর্যায় ভারতীয় নারীত্বকেই বরণ করে নেবে। কমলকে দিয়ে পশ্চিমী রীতিতে তর্ক চালালেও শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র মর্যালিটি ও এথিকসের প্রশ্নে আন্তিক্যবাদী ভারতীয় আদর্শকে ছেড়ে আসতে চাননি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস। সমালোচকদের বিচারে জগদীশ গুপ্ত নিয়তির কথাকার, তাঁর চরিত্রেরা অদৃষ্টের হাতের ‘ক্রীড়নক’। নিয়তি কিংবা ‘নামহীন হিংস্রতা’ ওৎ পেতে বসে আছে অসহায় মানুষের সর্বনাশ করবে বলে। তথাকথিত ‘মহৎ বৃত্তিগুলি’ যার উপরে সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে। এক ‘তামসী’ দুনিয়ার কথক তিনি। আমরা ভিন্ন প্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গে আমরা বুঝতে চেয়েছি কেন এতো ‘তিক্ত’ জগদীশ গুপ্ত? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে এই তামসী জগতের সম্পর্ক কেমন? বস্তুত পক্ষে, যুদ্ধ পূর্ববর্তী যুক্তিবোধ, মানবতাবোধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালকে। কারুর কাছে ঈশ্বর, যিনি সতত-ই মঙ্গলময়, কারুর কাছে এনলাইটেনমেন্টের যুক্তি ঈশ্বরত্ব উভয়ই সংশয়ের মধ্যে পড়ছে। নির্মিত হচ্ছে তিক্ত কাব্য, যা যাপন করছিল বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী। বস্তুত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধই বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি ভূমিতে মূলগত বদল ঘটায়। সত্তার সঙ্গে সত্তার সম্পর্ক, বন্ধন যখন পালটে যাচ্ছে; তখনই মানুষ হয়ে উঠছে অমানুষিক, জান্তব, জন্তবৎ। গ্রিক ট্রাজিডির সঙ্গে এই আখ্যানগুলি আপাত মিল লক্ষ করা গেলেও মূলগত ভাবে জগদীশ গুপ্ত ভিন্ন রুচি, রীতির ও গোত্রের কথক। আধুনিকতা সেখানে বিশেষ কিছু মাত্রা যোগ করে, যা নিয়তির ধারণাটাকেই পালটে দেয় এবং/অথবা চ্যালেঞ্জ করে। বলা ভালো, আধুনিক মানুষ পীড়নে ধস্ত হতে হতে পীড়ন ও তার কারণকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়। এ এক বিশেষ গোত্রের চাওয়া, যার মধ্যে দুঃখ ও পীড়নকে স্বীকার করে নেওয়া আছে। আর আছে দুঃখ ও পীড়নকে প্রত্যাখ্যান করার চাপা আর্তি। এখানেই তার অস্তিত্বের সার্থকতা। জীবন নামক যাত্রাটিকে অনিশ্চিত করে তুলেছে যুদ্ধ, যার প্রতিফলন ঘটে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে। সেটাই আলাদা করে দেয় গ্রিক নিয়তি ও আধুনিকের নিয়তিকে। গ্রিক ট্রাজিডির নায়করা জানেন যে নিয়তির হাত থেকে সে

রেহাই পাবে না। পরাজিত হওয়াই ভবিষ্যৎ। অজ্ঞাত নয় বলেই অনিশ্চয়তা নেই। এরপাশে আছে নিয়তিকে প্রতিহত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার গৌরবময় কাহিনি। জগদীশ গুপ্তের চরিত্রেরা জানেন না কেন তার এই পরিণতি? পরিণতি সম্পর্কে আধুনিক সচেতনই নয়, সে সুযোগও তার নেই। ফলত বীরত্ব নেই, আছে নিদারুণ পীড়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর সামাজিক চৈতন্য, মরণ-প্রণোদনা, সত্তার সঙ্গে সত্তার বিচ্ছিন্নতা হয়ে ওঠে নির্বিকল্প, সমকালীন বাঙালি পাঠকের কাছে যা ছিল অলীক কিংবা অসম্ভব। এমন এক বিস্ময়কর দার্শনিক বোধে পাঠকে পৌঁছে দেন লেখক, যখন মনে হয় স্বাভাবিকতা নামক বিষয়টি আদতে কোনো ছল বা ছদ্মবেশ, তথাকথিত স্বাভাবিকতাকে খারিজ করে; আরেকবার ফিরে তাকান জীবনের দিকে। নতুন ভাবে পড়তে চান বাস্তবতাকে, বুঝতে চান দার্শনিক সংশয়কে। আমাদের প্রস্তাব জগদীশ গুপ্ত এক অনিবার্য অনিশ্চয়তার জগতকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসে, ঐশ্বরিক বিশ্বাস ও যুক্তির সীমাবদ্ধতা বিষয়ে এক আশ্চর্য সন্দর্ভ তাঁর আখ্যানগুলি।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুলনাচের ইতিকথা*, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দেবযান* এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *যোগদ্রষ্ট*। মূলত ত্রিশের আখ্যানকারদের আন্তিকতা-নাস্তিকতা বোধ কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তাই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুলনাচের ইতিকথা* অধিকাংশ সমালোচকদের বিচারের নিয়তি নিয়ন্ত্রিত আখ্যান। এই সিদ্ধান্তের দিকে পাঠককেও খানিক প্ররোচিত করে ব্যাক কভারে প্রকাশকের বক্তব্য। শশী কি অদৃষ্টের হাতের পুতুল? এখানে প্রশ্ন ওঠে পুতুলের কি দায়িত্ববোধ^২ থাকে? আমাদের প্রস্তাব শশী-ডাক্তার বিষয়, অথচ দায়িত্ববোধে পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র একজন মানুষ, স্বাধীনও বটে। ‘অজানা শক্তি’, ‘অনিবার্য ইঙ্গিত’ শব্দগুচ্ছগুলি অধিকাংশ সমালোচকদের নিয়তিবাদী সিদ্ধান্তের প্রধান আশ্রয়। তাঁরা খেয়াল করেন না মানুষ নদীর

খেয়ালে চলতে পারে না, তাকে চলতে হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মেনে নিয়েই, তার মধ্যে অজানা শক্তির ইঙ্গিত থাকলেও, বস্তুত পক্ষে তা মাধ্যাকর্ষণের মতোই যুক্তি গ্রাহ্য ও চিরন্তন। ব্যক্তি শরীর আকাঙ্ক্ষা বারংবার বাধা পেয়েছে সমষ্টির দ্বারা। মনে হয়, যেন এক অজ্ঞাত শক্তির কাছে শরী পরাজিত হচ্ছে। তার যাবতীত লড়াই অনেকটা ট্রাজেডির মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু শেষ বাক্যটি তাঁদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। হারুর মৃত্যু ও বজ্রাহত বটগাছটির প্রসঙ্গ আরেকবার ফিরে আসে উপন্যাসে, যেমন ফিরে এসেছিল অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে। যে ঘটনা বিষণ্ণ শরীকে জীবনের লগ্ন করেছিল উপন্যাসের শুরুতে, শিথিয়েছিল মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে বাঁচা কার্যত জীবনী শক্তির বিপুল অপচয়;^৭ সেই স্মৃতি আরেকবার ফেরত আসে। বাজিতপুর থেকে মামলা করে ফেরার পথে সেই বোধ আরেকবার উপলব্ধি হল। এই নিয়মটি উপলব্ধিই করার অর্থ স্বাধীনতা^৮।

দেবযানকে পাঠক ‘ভূতুড়ে’ বা অবাস্তব ভেবে ফেলতে পারে এমন আশঙ্কা করেছিলেন বিভূতিভূষণ। দেবযান কি সত্যি একটি কল্পরাজ্যের কল্প-কথা, বাস্তবের কোনো ছোঁয়াই কি নেই সেখানে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই অংশে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পৃথিবীতে, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দেবযান রচনা, স্বর্গের মহিমা বর্ণনা কি বাস্তবের দিকে পেছন ফিরে থাকার নামান্তর? মঙ্গলবোধ যখন ধ্বংস হচ্ছে, মঙ্গলময় সাবেক ঈশ্বরের অস্তিত্ব যখন প্রশ্নের মুখোমুখি, কার্যত খারিজ হয়ে যাচ্ছে, তখন বিভূতিভূষণের এহেন আখ্যান রচনা কিসের প্রণোদনায়? সমালোচকদের কাছে দেবযান প্রশংসিত হয়নি খুব একটা। পারলৌকিক কাহিনি-ই হয়তো উপন্যাস পাঠের বাধা হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরলোকের গল্পো ফাঁদতে গিয়ে বিভূতিভূষণ শেষ পর্যন্ত ইহলোকের বোঝা-পড়ার ভিত্তিতেই পরলোক নির্মাণ করেন। দেবতার নয়, ব্যক্তি মানুষের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হয়েছে দেবযান-এ। দেবলোক

যতীন চায় না। এই প্রত্যাখ্যান কি নাস্তিক্যের চিহ্ন? না। একান্তভাবে আস্তিক্যের চাওয়া, কিন্তু সেই আস্তিক্য ‘মোক্ষ’ চায় না, চায় বারংবার মানবিক বন্ধন। মানবিক অনুভূতি, প্রকৃতি ও বস্তুজগতের সহাবস্থানে রচিত হয় এই আখ্যান। ঈশ্বর, স্বর্গলোক যে সেই মানবিক আকাঙ্ক্ষা ও মানবিক সত্তার সম্প্রসারণ তা অস্পষ্ট থাকে না পাঠকের কাছে। বস্তুত পক্ষে ঐহিক জীবনবোধ, ঐহিক জীবনের বিশেষ অভাববোধই পরলৌকিক জগতের নির্মাতা তা ঘোষিত হয় *দেবযান*-এ। ‘বাস্তব’-এর স্মৃতি ছাড়া পরলোকের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে না। ‘ব্যথা’-ই পরলৌকিক আখ্যান রচনার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে লেখকের কাছে। তাঁর অন্যান্য আখ্যানের মতো *দেবযান*-এ বাস্তবতা উপস্থিত না হলেও, তা বাস্তবতাবাদীর নির্মাণ। জাগতিক দুঃখবোধ-ই বাস্তবতার ভিত্তি। সেটিই যতীনকে ফিরিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে। আর জাগতিক প্রেম, স্মৃতি পুষ্পকে করে তুলেছে মর্ত্য পিপাসু, তার মধ্যে জন্মেছে ব্রহ্মলোকের প্রতি অনাকাঙ্ক্ষা। আস্তিক, পরলোক বিশ্বাসী ও ঈশ্বর বিশ্বাসী বিভূতিভূষণের পৃথিবীর প্রতি অফুরান আকর্ষণের পেছনে সদা ক্রিয়াশীল থাকে ‘ব্যথা’ নামক বোধ। হয়তো দুঃখেই পান স্বর্গীয় সুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মানুষতার সংকটের আরেক কিসিমের প্রতিক্রিয়া বোধহয় *দেবযান*। উপন্যাসে সেই সংকট, অ-সুখের অনুপস্থিতি জানান দেয় যুদ্ধের উপস্থিতিতেই। ধ্বংসের কালে দুঃখীর সঙ্গে দুঃখীর অদৃশ্য যোগ আদতে মানুষতার কাহিনি।

যোগদ্রষ্ট তারাক্ষরের চিন্তা ও বিশ্বাসের আখ্যান এবং বিশ্বাস ভঙ্গের বটে। ভূমিকায় জানাচ্ছেন যে, নতুন শতাব্দী তাঁর চিন্তায়, সংস্কার-বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে। যার ফলে সব কিছু ভেঙে ধুলিসাৎ হয়ে গেল। কোনো বিশ্বাস নেই, মঙ্গলের আশ্বাস নেই, চারদিকে শুধুই মরুভূমি। এমনকি ঈশ্বর বিশ্বাসও ভেঙে গেছে। জগৎ এখন নাস্তিময়, আর ঈশ্বর মৃত। সত্যি কি ঈশ্বর কখনো ছিলেন? এই চিন্তাও উদ্ভিত হয়েছে তাঁর মনে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র

সুদর্শন। যার চৈতন্যের সংকট ও আত্মজিজ্ঞাসা এই উপন্যাসের বিষয়। জীবনের বিবিধ পথ পেরিয়ে সুদর্শন মৃত্যুর মুখোমুখি। যার খোঁজে সে ব্যপ্ত ছিল— আমি কে? আমি কী?— তার উত্তর কি পেল শেষ পর্যন্ত? সন্ন্যাসী সুদর্শন একসময় বেছে নেয় নাস্তিক্যের পথ। কিন্তু তার বিশ্বাসের জগতটি নির্মিত হচ্ছে বর্তমানের সাপেক্ষে। সে মনে করে ঈশ্বর, ঐশ্বরিক মহিমা এককালে ছিল, ‘আজ’ আর তা নেই। বিশ শতকে ঈশ্বর মৃত, ‘পরম’ কোনো সত্তার অস্তিত্ব আর নেই। তা সে বেছে নেয় নাস্তিক্যের পথ। কিন্তু তার এই নতুন বীক্ষা নাস্তিক্যের বিশ্ববীক্ষা নয়, একান্তভাবে ‘অস্তিবোধ’ চালিত নাস্তিক্য। ফলে সুদর্শন নাস্তিকতার আরেক অর্থ করেছে অনৈতিকতা। নাস্তিক কি অনৈতিক? নীতি, মূল্যবোধ, স্নেহ, ভালোবাসা সবই কি মূল্যহীন নাস্তিক্যের কাছে? সে মনে করে নাস্তিক মানেই অনৈতিক, আস্তিক ধর্ম প্রচারকদের বিপরীতে রাখে ক্রুর শাসকদের। নাস্তিক প্রস্থান সম্পর্কে আস্তিক্যবাদী দার্শনিকদের অভিমত খানিক তাই। জীবনের প্রান্তে; মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আবার বিশ্বাসের পথে ফেরত যেতে চাইছে। কিন্তু তা কি নাস্তিক-সুদর্শনের পুনরায় আস্তিক্যে প্রত্যাবর্তন? সুদর্শনের নাস্তিক্য কি প্রকৃতই নাস্তিক্য? বস্তুত সুদর্শন কখনই প্রকৃত অর্থে নাস্তিক হয়ে উঠতে পারেনি, তার তথাকথিত নাস্তিক্য পর্বটি আদতে আস্তিক্যবোধ নিয়ন্ত্রিত।

পঞ্চম অধ্যায়ে ‘বাস্তবতা’ বিষয়ে বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা কী ভেবে ছিলেন, সে কথাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সূত্রে আস্তিক ও নাস্তিক দার্শনিক প্রস্থানের সঙ্গে সেই সকল সাহিত্যিকদের সম্পর্ক কেমন তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ‘বাস্তবতা’ সংক্রান্ত বিতর্ক প্রসঙ্গে অধ্যাপক আকিমুন রহমানের বক্তব্য, পাশ্চাত্য বাস্তবতাবাদ কেবল বস্তুবাদী দর্শন দ্বারাই প্রভাবিত হয়নি, বাস্তবতাবাদের পরিভাষাটির সন্ধান মেলে বস্তুবাদী দর্শন থেকে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি^৭। একথা ঠিক যে, পাশ্চাত্যে রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজম যে

ভাবে বিকশিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে তার মিল পাওয়া সম্ভব নয়। বস্তুবাদী, নাস্তিক দর্শন প্রস্থানগুলি প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য ‘বাস্তববাদী’ সাহিত্য ধারাকে প্রভাবিত, বিকশিত ও পরিণত করেছিল। বাংলা সাহিত্যের উপর ভারতীয় বস্তুবাদী, নাস্তিক/না-ঈশ্বরবাদী দর্শন প্রস্থানের প্রভাব তেমন নয়। ভারতীয় আন্তিক দর্শনগুলি বস্তুজগতের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছে এবং প্রতিষ্ঠা করেছে ‘পরম’-এর ধারণা। ভারতীয় বস্তুবাদের বিকাশে ‘আন্তিক’ দর্শনগুলির যেভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে ইউরোপে তা হয়নি। তার প্রভাব যে এই উপমহাদেশের সংস্কৃতি জগতে পড়েনি তা নয়। বাংলা সাহিত্যে ‘বাস্তবতা’ বিষয়ক বিতর্কমূলক প্রবন্ধগুলি সে কথাই প্রমাণ করে। অধিকাংশ প্রাবন্ধিকের ‘বাস্তবতা’ সংক্রান্ত ধারণা আন্তিকবোধ প্রভাবিত। উপনিবেশের ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বস্তুবাদী ভাবনা চিন্তার জন্যে অনেকাংশে ইউরোপীয় ভাবনা-চিন্তার উপর নির্ভরশীল। ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যের প্রতিপক্ষরা আধুনিক বাস্তবতাবাদকে সমালোচনার করার সময় আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রায় নাস্তিক পরম্পরাহীন হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন এবং কাঠাগোড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। এটিও এক অর্থে স্বীকৃতি। এই প্রভাবকে কেবলই পাশ্চাত্য প্রভাবিত বলে দেওয়া একটেরেই, কারণ উনিশ শতক থেকে ভারতীয় বস্তুবাদচর্চার প্রাচীন ধারাটি ধীর লয়ে হলেও বিকশিত হচ্ছিল। বিশ শতকে প্রাচীন নাস্তিক দর্শনগুলি পুনরায় চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে, তা যে বাঙালি সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করেনি তা বলা যায় না। আন্তিক-নাস্তিক তর্ক, বঙ্কিমী, রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যকে অনেক বেশি বাস্তবানুগ করে তোলে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর অর্থ এই নয় যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ অলীক জগতের কথা তাঁদের আখ্যানে তুলে ধরতেন। বস্তুত, উপন্যাস সংরূপটির সঙ্গে বাস্তবের নাড়ির যোগ। এই বিতর্ক বাংলা সাহিত্যকে অনেক বেশি জীবন যন্ত্রণার শরিক করে তোলে। আধুনিক কথাকারে বাস্তবানুগ সাহিত্য সৃষ্টির কথা

বলেছেন ঠিক, কিন্তু তাঁরা নিরাবেগ ভাবে সাহিত্য চর্চা করতে পারেননি, তা বলাই বাহুল্য। ‘পাঁকের পোকা’দের জীবনকে সাহিত্যে স্থান দিলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের ‘দেখা’ রোমান্টিক ভাবানুভূতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বিষয়ীর চৈতন্যই এর কারণ। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু কল্লোলের ধারা বহুলাংশে রোমান্টিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন। বরং ত্রিশের দশকের সাহিত্যিকরা অনেকবেশি নির্মোহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাস্তবজীবনকে নির্মোহভাবে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত অন্যতম পথিকৃৎ এবং পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্মরণীয়। আধুনিক সাহিত্যিকেরা বাস্তব জীবনের আকাঁড়া প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের মধ্যে। ফলে তাঁদের লেখার মধ্যে বাস্তব জীবনের ছবছ প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়। বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র অনুসারীরা ‘বাস্তবতা’ বিষয়ে বিকল্প আরেকটি বয়ান হাজির করেন। রবীন্দ্রনাথের অভিমত, ‘অহেতুক অনির্বচনীয়’ আনন্দের জগৎ সৃষ্টি করাই কবি/সাহিত্যিকের কাজ। বিজ্ঞান সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে সত্যকে উপস্থাপিত করে, বিপরীতে কবি/সাহিত্যিক অবিচ্ছিন্নভাবে সত্যকে উপলব্ধি করেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীর মতে, বাস্তবের অনুকৃতি কবি/সাহিত্যিকের কাজ নন, তিনি খণ্ড খণ্ড উপাদানকে জুড়ে এক গভীর বৃহৎ সত্যকে উপস্থিত করেন। বাস্তব ও ‘কবির বাস্তব এক নয়। আরেকদিকে ‘সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা’কারীদের প্রধান অভিযোগ আধুনিক সাহিত্যিকেরা সমাজকে কলুষিত করছেন এবং শাস্ত্রত আদর্শকে ভুলুষ্ঠিত করছেন। তাঁদের কাছে সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য। ‘বাস্তবতা’ ও ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্য বিষয়ক বিতর্ক একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার জন্ম দেয়। বাস্তব জীবনকে সাহিত্যে তুলে আনার ক্ষেত্রে সাহিত্যিকরা প্রাথমিকভাবে ন্যাচারালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের পুঞ্জানুপুঞ্জ বর্ণনা তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে উঠে এসেছিল। অস্তি-নাস্তিবোধ যা এই বিতর্কের

ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল তা বাংলা সাহিত্যকে শুধু বাস্তবিক-ই করে না, বস্তুত বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে বাস্তবতাবাদ ও আধুনিকতাবাদের দ্বার উন্মোচিত করে।

বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ কালপর্ব (১৯১৪-১৯৫০) সম্পর্কের প্রস্তাব হাজির করাই এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য। সন্দর্ভের শেষে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই রীতি, যে কোনো সিদ্ধান্ত বস্তুত পক্ষে একটি প্রস্তাব, বিভিন্ন উপাদান-উপকরণের সাহায্যে নির্মিত একটি বয়ান। কিন্তু কোনো প্রস্তাবই তর্কাতীত নয়। এই প্রস্তাব নিয়েও তেমনই কিছু তর্ক রয়ে যাবে, নিশ্চিত। সন্দর্ভের আমরা কী কী করেছি তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার কী কী সম্ভাবনা রয়ে গেল সে দিকে নজর দেবো। শিরোনামে উল্লেখিত কালপর্বের মধ্যে থাকা অনেকাংক সাহিত্যিকদের লেখা অনুল্লিখিত হয়ে গেছে। প্রথমেই উল্লেখ্য, কল্লোল যুগের আখ্যানকারদের কথা। অস্তি-নাস্তিবোধ যে তাঁদের সাহিত্য ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল তা আলোচিত হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। কিন্তু তাঁদের সাহিত্যকর্ম, বিশেষত উপন্যাস বিশ্লেষণ করা সুযোগ হয়নি। প্রাথমিকভাবে তাঁদের সাহিত্যকর্ম আমাদের ভাবনার মধ্যে ছিল, কিন্তু গবেষণার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই উপলব্ধি হয়েছে যে কল্লোল পর্ব আলাদা অভিনিবেশের দাবি রাখে। প্রত্যেকে অস্তি-নাস্তিবোধ দ্বারা প্রভাবিত হলেও বিভিন্ন লেখকদের ভিন্ন ভিন্ন লেখার মধ্যে নানান স্বর ও স্তর খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের প্রস্তাব, তা পৃথক গবেষণার বিষয় হতে পারে। গোকুল নাগ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের আখ্যানেও আস্তিক-নাস্তিক প্রতর্ক নানা ভাবে উঠে এসেছে। বুদ্ধদেব বসু, যিনি *প্রগতি* লেখক, তাঁর উপন্যাসে ঐশ্বরিক ভাবনা হয়তো নেই, কিন্তু গডলিনেসের ইঙ্গিত রয়েছে। আমরা মূলত প্রতিনিধি স্থানীয় লেখকদের মধ্যে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছি, কিন্তু এর বাইরে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদারের মতো অজস্র লেখক আছেন যাঁদের উপন্যাসকে আলোচনার মধ্যে আনা সম্ভব

হয়নি। সন্দর্ভের শেষে সেই সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আশা রাখি ভবিষ্যতে সেই নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হবে। সতীনাথ ভাদুড়ির সংকট আমাদের কালপর্বের মধ্যে না পড়লেও গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। তা প্রগতি ও আধুনিকতা সম্পর্কে প্রচলিত একমাত্রিক ধারণাটির প্রতিবাদ। সত্তার জিজ্ঞাসা সম্পর্কে আরেক किसিমের বয়ান। এবং আমাদের ‘জ্ঞান’ ও ‘জানা’ বিষয়ে আশ্চর্য সন্দর্ভ। বস্তুত পক্ষে, আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধ কেবলমাত্র বিশ শতকের প্রথমার্ধের সাহিত্যকেই প্রভাবিত করেনি, প্রকৃত প্রস্তাবে তা সাহিত্যের হয়ে ওঠা প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত এবং বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা আখ্যানের গড়ে ওঠাকেও তা প্রভাবিত করেছে, তা বলা বাহুল্য। শেষ কথা— প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিভূমিকেই কার্যত বদলে দেয়। যুদ্ধ মঙ্গলময় সাবেক ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলে, প্রশ্ন মুখে পড়ে ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির সৌজন্যে প্রাপ্ত যুক্তিবোধও। চৈতন্যের সংকট, মানবিক আকৃতিকে ঐ সময়ের আখ্যানকাররা তুলে ধরেছেন তাঁদের আখ্যানে। তা করতে গিয়ে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বিষয়ক ভাবনাকে আখ্যানের কেন্দ্রিয় সমস্যা-পট (Problem) হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

তথ্যসূত্র ও টীকা

^১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ৮ম খণ্ড, কলকাতা: পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৬, পৃ- ১৬৫

^২ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃ- ৪৯৫

^৩ ঐ, পৃ- ৩২৯

^৪ দ্রঃ আব্দুল কাফি, ‘স্বাধীনতার সুখদুঃখ : জ্ঞান স্মৃতি স্বাধীনতা আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ক খুচরো ভাবনা’, *পরিচয়*, ২০১৮, পৃ- ৭৭

^৫ দ্রঃ আকিমুন রহমান, *বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দলিল (১৩১৮-১৩৫০বঙ্গাব্দ)*, ঢাকা : অক্ষুর প্রকাশনী, ২০১২, পৃ- ১৬

গ্রন্থতালিকা, পত্রপত্রিকা

ক. আকর গ্রন্থ

আকিমুন রহমান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দলিল (১৩১৮-১৩৫০)*, ঢাকা: অক্ষুর প্রকাশনী, ২০১২

জগদীশ গুপ্ত, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৫

জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৯১

জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ২০০৩

জগদীশ গুপ্ত গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ২০১৫

জগদীশ গুপ্ত গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, অনুমুদ্রিত

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারাক্ষর-রচনাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৭

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, কলকাতা: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০০২

বিপিনচন্দ্র পাল, *চরিত-কথা*, কলকাতা: শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৩২৩

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেবযান*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪১২

স্মৃতির রেখা, কলকাতা: ক্যালকাতা পাবলিশার্স, ১৩৬৩

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র ১*, কলকাতা: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র ২, কলকাতা: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০১৩

লেখকের কথা, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৮১

সমগ্র প্রবন্ধ এবং শুভময় মণ্ডল ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬

রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯

সাহিত্য, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২২

সাহিত্যের পথে, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৫

রাজীব চৌধুরী (সং. ও সম্পা.), *দুশ্রীপা জগদীশ গুপ্ত ১*, কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০০৮

দুপ্পাপ্য জগদীশ গুপ্ত ২, কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১০

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বর্তমান বাংলা সাহিত্য, কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩৪১

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা: শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব

শরৎ রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, কলকাতা: শরৎ সমিতি, ১৩৮৪

খ. আকর প্রবন্ধ

অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্য্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন?', প্রবাসী, আষাঢ়

১৩১৯

অমল হোম, 'অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য', ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৩৩

পূর্ণচন্দ্র বসু, 'শৈবলিনী', আর্য্যদর্শন, আষাঢ় ১২৮৪

প্রমথ চৌধুরী, 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?', সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২১

বরদাচরণ গুপ্ত, 'সামাজিক সাহিত্য', সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২৫

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, 'সাহিত্য ও রস', বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

মঙ্গলচন্দ্র শর্মা, 'মাসিক গল্প-সাহিত্য', প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩১

যতীন্দ্রমোহন সিংহ, 'আটের অনুশাসন', মানসী ও মর্ম্মবাণী, চৈত্র ১৩৩১

যতীন্দ্রমোহন সিংহ, 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা', সাহিত্য, বৈশাখ ১৩২৭

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে বাস্তবতা', সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২১

সরলা দেবী, 'সিংহের বিবরে', বঙ্গবাণী, ফাল্গুন ১৩৩০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি', বঙ্গবাণী, আশ্বিন ১৩৩৪

গ. সহায়ক গ্রন্থ

গ. ১. বাংলা

অচ্যুত গোস্বামী, বাংলা উপন্যাসের ধারা, কলকাতা: পাঠভবন, ১৯৬১

অক্ষয় কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৪১৫

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৪২০ব

অনির্বাণ, বেদ মীমাংসা, ১ম খন্ড, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৫

অনিল আচার্য (সম্পা.) ও অরিন্দম চক্রবর্তী (অতিথি সম্পা.), বাঙালির ইউরোপ চর্চা, কলকাতা:

অনুষ্ঠাপ, ২০১৬

অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়, *ব্যক্তিচরিত্র এবং নৈতিকতা*, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশনা, ২০১৫

অমিতা চ্যাটার্জী (সম্পা.), *ভারতীয় ধর্মনীতি*, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০১৩
অমর্ত্য সেন, *তর্কপ্রিয় ভারতীয়*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০১২

ভারতের অতীত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, আশীষ নাহিড়ী (ত.), কলকাতা: দি এশিয়াটিক
সোসাইটি, ২০১৮

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন*, কলকাতা: সাধনা মন্দির, ১৩৮০

অরুণ সেন (সম্পা.), *বিভূতিভূষণ: আধুনিক জিজ্ঞাসা*, কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৪

অরিন্দম চক্রবর্তী, *দেহ থেকে সন্দেহ*, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৯

মনের মধু, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৪

এ তনু ভরিয়া দর্শন আপাদমস্তক, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০২০

ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস, কলকাতা:
অনুষ্টুপ, ২০১৩

দেহ গেহ বন্ধুত্ব ছিটি শারীরিক তর্ক, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১১

অশ্রুকুমার সিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *বাঙ্গালীর ধর্ম ও দর্শন চিন্তা*, কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন,
১৯৮০

আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথ*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৭৫

আমিনুল ইসলাম ভুইয়া (ত.), *প্রোতোগোরাস*, প্লেটো, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০১৫

পারমেনিদিজ, প্লেটো, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০২০

সফিস্ট, প্লেটো, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০১৯

সিম্পোজিয়াম, প্লেটো, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০১৭

আবু সয়ীদ আইয়ুব, *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫

আলোক ভট্টাচার্য, *আধুনিক দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা: ফার্মা কেএলএম, ১৯৮০

আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, *বেদান্ত দর্শন-অদ্বৈতবাদ*, কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২

আশীষ নাহিড়ী, *অক্ষয়কুমার দত্ত : আঁধার রাতে একলা পথিক*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং,
২০০৭

ভগবানের লেভি, কলকাতা: গাঙচিল, ২০০৯

ভদ্রলোকি যুক্তিবাদের দক্ষিণাবর্ত, কলকাতা: ঋতাক্ষর, ২০১৫

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙালির সেকিউলার বিবেক, কলকাতা: অবভাস, ২০১৪

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কল্পতরু*, কলকাতা: ক্যানিং লাইব্রেরী, ১২৮১

গ্রন্থাবলী, কলকাতা: নটবর চক্রবর্তী, ১৯৩২

ইন্দ্রমিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৬

উইল ডুরান্ট, *দি স্টোরি অফ ফিলোজফি*, ১ম খণ্ড, কলকাতা: দীপায়ন, ২০১৪

দি স্টোরি অফ ফিলোজফি, ২য় খণ্ড, কলকাতা: দীপায়ন, ২০১৪

উদয়কুমার চক্রবর্তী, *চতুরঙ্গ : সাধক কবির আলেখ্য*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতদর্শনসার*, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২০ব

কপিল, *সাজ্জ দর্শন (সাজ্জ্য প্রবচন-সূত্র)*, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ত.) কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭

কমলিকা রায়, *রবীন্দ্রনাথের সাধনা বক্তৃতামালা*, কলকাতা: কারিগর, ২০১২

কার্তিক লাহিড়ী, *বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৪

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, *ধর্ম প্রসঙ্গে*, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮১

কালিদাস নাগ, *কবির সঙ্গে একশো দিন*, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৩৯৪

কালিদাস ভট্টাচার্য, *ভারতীয় সংস্কৃতি ও অনেকান্ত বেদান্ত*, বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৪ব.

কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ন্যায়তত্ত্ব পরিক্রমা*, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮৬

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, *প্রবন্ধ সংকলন*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১১

কৌশিক জোয়ারদার, *চিত্তা*, কলকাতা: পত্রকথা, ২০১৫

ক্ষিতিমোহন সেন, *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন*, কলকাতা: পুনশ্চ, ২০০৯

গুণময় মান্না, *রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি*, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯৩

গোপালচন্দ্র রায় (সম্পা.), *শরৎ-পত্রাবলি*, কলকাতা: পারুল, ২০০০

গোপালচন্দ্র রায়, *শরৎচন্দ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য সদন, ১৯৬১

গোপাল হালদার, *গোপাল হালদার রচনা সমগ্র ১*, কলকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কোং, ২০০০

সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, কলকাতা: মনীষা, ১৯৮৬

গৌতম ভট্টাচার্য, *‘কল্লোলে রবীন্দ্রনাথ’*, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৩৯৪

গৌরচন্দ্র সাহা (সং.ও সম্পা.), *রবীন্দ্র পত্রাবলী: তথ্যপঞ্জী*, কলকাতা: দে'জ, ১৯৮৪

রবীন্দ্রনাথের চিঠি ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে, কলকাতা: পত্রলেখা,

২০১৩

চন্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল, *বিভূতিভূষণ: স্ববিরোধী সংবেদ*, দিল্লী: অক্সফোর্ড, ২০১৯

জগন্নাথ চক্রবর্তী, *‘গীতাঞ্জলি’ অস্তিত্ব বিরহ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৮

জয়দীপ ঘোষ, আশীষ লাহিড়ী, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ ও সেকুলার বাঙালির বিবেক,

কলকাতা: চার্বাক, ২০১২

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, সর্বদর্শন সংগ্রহ, কলকাতা: প্রকাশক অনুমল্লিখিত, ১৯২১ সংবৎ

জয়ন্ত ভট্ট, ন্যায়মঞ্জরী, অমিত ভট্টাচার্য (সম্পা.), কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৬

জিতেন্দ্র নাথ মহান্তি, আত্ম এবং তার অপর, দিল্লী: অক্সফোর্ড, ২০১৮

জিতেন্দ্র নাথ মহান্তি ও শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, দার্শনিকের খোঁজে দার্শনিক, কলকাতা: প্রতিভাস,

২০২১

জীবনানন্দ দাশ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা: ভারবি, ১৯৮৮

জীবেন্দ্র সিংহরায়, কল্লোলের কাল, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮

তপন রায়চৌধুরী, ইউরোপ পুনর্দর্শন, কলকাতা: আনন্দ, ২০১৫

তপোব্রত ঘোষ, শ্রীবিলাসের ডায়ারি, কলকাতা: ভারবি, ২০১৪

তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), শতবর্ষে মানিক-জিজ্ঞাসা, কলকাতা: পাল পাবলিশার্স, ২০১০

তারা চট্টোপাধ্যায়, গীতা-অনুচিন্তন নৈতিকতা ও ঈশ্বর, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৮

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, চার্বাক দর্শন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩

দেবদাস জোয়ারদার, দেবদাস জোয়ারদার রচনাসমগ্র ১, কলকাতা: টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট,

১৯৯৯

দেবব্রত ঘোষ ও সনৎকুমার নস্কর (সম্পা.), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শতবর্ষে ফিরে দেখা, কলকাতা: দীপ

প্রকাশন, ২০১৫

দেবীপদ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের কথা, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮২

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: এন.বি.এ, ২০০৩

ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১০

লোকায়ত দর্শন, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৪০৫

আধুনিক যুরোপীয় দর্শন, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৫৩

অগ্রস্থিত রচনা শিল্প ও সাহিত্য, কলকাতা: অবভাস, ২০১০

অগ্রস্থিত রচনা দর্শন বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব, কলকাতা: অবভাস, ২০১১

অগ্রস্থিত বিতর্ক, কলকাতা: অবভাস, ২০১২

সঙ্ঘৎ শরণৎ গচ্ছামি, কলকাতা: অবভাস, ২০১০

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), সুধীন্দ্রনাথ পাঠের ভূমিকা, কলকাতা: ভারত বুক এজেন্সি,

২০০২

দেবেশ রায়, উপন্যাস নিয়ে, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩

ধীরেন্দ্র দেবনাথ, *রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু*, কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১১

নরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *অভয়ের বিয়ে*, কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, প্রকাশকাল

অনুলিখিত

নলিনীনাথ রায় (ত.), *ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শন*, কলকাতা: বসুমতি সাহিত্য মন্দির, প্রকাশ কাল

অনুলিখিত

নরহরি কবিরাজ (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ*, কলকাতা: কে.পি. বাগচী, ১৯৮৪

নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ২০০৯

নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬

নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), *কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রচনা-সংগ্রহ*, কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৯৭

নির্মাল্য বাগচী, *রামমোহন চর্চা ইতিহাসে বঞ্চনা অবহেলা*, কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৯৪

পঞ্চগনন ভট্টাচার্য শাস্ত্রীণা, *চার্বাক-দর্শনম্*, ২৪ পরগনা: শ্রীসাম্যব্রত চক্রবর্তী, ১৩৯৪ব

পথিক বসু, *বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন*, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯৩

পরমেশ আচার্য, *বাঙালি প্রবুদ্ধ সমাজের সীমা ও বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য প্রবন্ধ*, কলকাতা:

অনুষ্টিপ, ২০০২

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১১

পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, *ছায়াপথ*, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা: কার্তিকচন্দ্র দে, ১৩০৫

ছায়াপথ, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা: রাধানাথ মিত্র, ১৩০৮

প্রদ্যোত কুমার মুখোপাধ্যায়, *বিংশ শতকে বাঙ্গালির দর্শন চর্চার রূপরেখা*, কলকাতা: সূত্রধর,

২০১৮

প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

প্রবাসজীবন চৌধুরী, *সৌন্দর্যদর্শন*, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯০২

প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য*, কলকাতা: ভাষাবন্ধন, ২০০৯

প্রমথনাথ তর্কভূষণ (ত.), *বেদান্তসূত্রম্*, কলকাতা: পাতাবাহার, ১৪১৭

প্রমথনাথ তর্কভূষণ, *মায়াবাদ*, কলকাতা: পাতাবাহার, ১৪২০

প্রলয় শূর, *গোরা ও চতুরঙ্গ*, কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০১৩

প্রশান্ত কুমার পাল, *রবিজীবনী*, ৩য় খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২৩

রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২১

রবিজীবনী, ৭ম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২০

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *ন্যায় দর্শন*, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬
বারিদররণ ঘোষ, *ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৯
বারিদররণ ঘোষ, (সং.ও সম্পা.), *কল্লোল প্রবন্ধ সংগ্রহ*, কলকাতা: পুনশ্চ, ২০১০

রবীন্দ্র রচিত ভূমিকা, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০০২

সাময়িকপত্রের আলোকে প্রথম মহাযুদ্ধ, কলকাতা: পারুল,

২০১৫

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, *দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস ১*, কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৬

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস ২, কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৬

বিধুশেখর ভট্টাচার্য, *উপনিষদ*, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৩ব

বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ১ম খন্ড, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৭৮

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খন্ড, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৭৮

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খন্ড, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮০

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খন্ড, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮০

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৫ম খন্ড, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮১

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৬ষ্ঠ খন্ড, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮৩

বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১১

বিপিনবিহারী গুপ্ত, *পুরাতন প্রসঙ্গ ও বিচিত্র প্রসঙ্গ*, প্রসাদ সেনগুপ্ত (সম্পা.), কলকাতা: কমলিনী,

১৪২২

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, *নীতি, যুক্তি ও ধর্ম*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২১

বিষ্ণু দে, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১১

প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০০

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যদর্শন ও অলংকারশাস্ত্র, কলকাতা: আনন্দ, ১৪১৫

বুদ্ধদেব বসু, *অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ দুটি কাব্যনাট্য*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২০

রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৪২০

বুদ্ধদেব বসু (সম্পা.), *আধুনিক বাংলা কবিতা*, কলকাতা: এম.সি সরকার, ২০১৩

বেলা দত্তগুপ্ত, *বঙ্গে ধ্রুববাদ*, কলকাতা: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), *রামমোহন গ্রন্থাবলী*, কলকাতা: বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৭

রামেন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা:

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৬

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), সাহিত্য-সাধক

চরিতমালা, ৩য় খণ্ড,

কলকাতা: বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষৎ, ২০১৬

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামমোহন রায়, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৭

ভবতোষ দত্ত, বাঙালিমানসে বেদান্ত, কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮৬

ভারতী রায় (সম্পা.ও সং.), নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স,

২০১২

ভি আই লেনিন, বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ বিচারবাদ, কলকাতা: বিবলিয়া, ২০১২

ভীষ্মদেব চৌধুরী, জগদীশ গুপ্তের গল্প পঞ্চ ও পঞ্চজ, ঢাকা: ফুলদল প্রকাশনী, ১৩৯৫

মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়, নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫

মনো মুখোপাধ্যায়, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে দার্শনিক চেতনা, কলকাতা: পুস্তক বিপণি,

১৯৯৮

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আত্মহত্যার অধিকার এবং অন্যান্য সনদ, কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১২

মালিনী ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮

মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্য-বিতান, কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, ১৩৫৬

যুগান্তর চক্রবর্তী, সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: দ্বন্দ্বের দুই মুখ, কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০০৮

যোগেশচন্দ্র বাগল ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, হিন্দুমেলায় ইতিবৃত্ত, কলকাতা: তালপাতা,

২০০৯

রণজিৎ গুহ, রচনা সংগ্রহ ১, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৯

দয়া, কলকাতা: তালপাতা, ২০১১

রণজিৎ সরখেল, ভারতীয় দর্শনে অনীশ্বরবাদ, কলকাতা: প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩

রণদীপম বসু, চার্বাকের খোঁজে ভারতীয় দর্শন, ঢাকা: রোদেলা, ২০১৭

রবিন পাল, কল্লোলের ছোটগল্প, কলকাতা: বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবির ভণিতা, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৭৫ব

কাব্যগ্রন্থ, ৭ম খণ্ড, এলাহাবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৬

চিঠিপত্র ২, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১৯

চিঠিপত্র ৬, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৯৩

চিঠিপত্র ৯, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১৮

ব্যক্তি, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ত.), কলকাতা: লোক সেবা শিবির, ২০১১

রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, মলিনা রায় (ত.), কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৭৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৩

রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯

রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, কলকাতা: পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯

রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২

রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০

রবীন্দ্র রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১

শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬

সাধনা, নীলা দাস (ত.), কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৯

সোনার তরী, কলকাতা, কালিদাস চক্রবর্তী, ১৩০০

রমেশচন্দ্র দত্ত, হিন্দুশাস্ত্র, কলকাতা: নিউ লাইট, ১৪০৮

রুশতী সেন (সম্পা.), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্মানে, কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৪

রাজশেখর বসু, শ্রীমদভগবদগীতা, কলকাতা: এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪২১

রামকমল ভট্টাচার্য, বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ, কলকাতা: প্রকাশক অনুলিখিত, ১৮৯১

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ইতিহাস: দর্শন: দর্শনের ইতিহাস, কলকাতা: পঃবঃ ইতিহাস সংসদ, ২০১৪

চার্বাকচর্চা, কলকাতা: সদেশ, ২০১০

দ্বন্দতত্ত্ব জিজ্ঞাসা, কলকাতা: অবভাস, ২০২১

বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৩

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব ২য় ভাগ, কলকাতা: অবভাস, ২০২০

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (ত.), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, কলকাতা: শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত,

১৩১৮ব

লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৮

লেভ তলস্তয়, ক্রেয়টজার সোনাটা, অজয় গুপ্ত (ত.), কলকাতা: অবভাস, ২০১১

লোকনাথ চক্রবর্তী, চাওয়ার চতুর্মুখ, কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৬

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পবিত্রকুমার রায় নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রদর্শন, কলকাতা:

বিশ্বভারতী, ১৩৭৫

শচীন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিভূতিভূষণ ন্যায়াচার্য (ত.), শঙ্করাচার্য গ্রন্থমালা, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা: বসুমতি

সাহিত্য মন্দির, প্রকাশকাল অনুলিখিত

শত্রুজিৎ দাসগুপ্ত ও শর্মিষ্ঠা রায় (ত.), *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, ১ম ভাগ, বার্ত্তাভ রাসেল,
কলকাতা: বাউলমন্, ১৯৯৮

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ২য় ভাগ, বার্ত্তাভ রাসেল,
কলকাতা: বাউলমন্, ২০০০

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ৩য় ভাগ, বার্ত্তাভ রাসেল,
কলকাতা: বাউলমন্, ২০০৩

শরদিন্দু শেখর রায় (সম্পা.), *বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান*, কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

শর্বাণী বসু (সম্পা.), *শংকরাচার্যকৃত মোহমুদগার*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৯

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শিল্পকলার রাজনীতি*, কলকাতা: সহজপাঠ ও যাপন, ২০১৬

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস*, কলকাতা: সুপ্রীম পাবলিশার্স, ১৯৯২

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *দশদিশ নিবন্ধকায়*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৪

আলিবারার গুপ্তভান্ডার, কলকাতা: গাঙচিল, ২০০৯

শিশির কুমার দাশ (ত.), *কাব্যতত্ত্ব আরিস্টটল*, কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০০৯

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সী, ২০০৬-০৭

শ্রীমোহন ভট্টাচার্য এবং দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতীয় দর্শন কোষ*, ১ম খন্ড, কলকাতা:

সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৮

ভারতীয় দর্শন কোষ, ২য় খন্ড, কলকাতা: সংস্কৃত
কলেজ, ১৯৭৭

ভারতীয় দর্শন কোষ, ৩য় খন্ড, ১ম ভাগ, কলকাতা:
সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮১

ভারতীয় দর্শন কোষ, ৩য় খন্ড, ২য় ভাগ, কলকাতা:
সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৪

শ্রীহরচন্দ্র বসু, *নাস্তিক প্রবোধ*, কলকাতা: প্রকাশক অনুমোদিত, ১৭৯৪ সংবৎ

শ্যামাপ্রসাদ দাস, *নরেশচন্দ্র জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা: শান্তি দাস, ১৯৮৩

সতী চট্টোপাধ্যায় ও দেবী রাণী ঘোষ (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র: নির্দেশিকা*, কলকাতা:

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ২০১২

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র: নির্দেশিকা ২, কলকাতা:

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ২০১২

সতীনাথ ভাদুড়ী, *নির্বাচিত রচনা*, ২য় খন্ড, কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২০১১

সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, *সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৩৮৩

- সায়ণ মাধবীয় সৰ্বদৰ্শন সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৩৮৬
- সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫
- সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাগজগত দর্শনচিন্তা*, কলকাতা: গ্রন্থালয়, ২০১১
- রবীন্দ্রনাথের চিন্তাগজগত ধর্মচিন্তা*, কলকাতা: গ্রন্থালয়, ২০১১
- সব্যসাচী ভট্টাচার্য, *বাংলায় সন্ধিক্ষণ*, দিল্লী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮
- সভ্যতার স্বরূপ ও ভারতে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা*, নিউ দিল্লী: অক্সফোর্ড, ২০১১
- সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), *জগদীশ গুপ্ত জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২
- সরকার আব্দুল মান্নান, *জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১
- সরদার ফজলুল করিম (ত.), *এন্টি ডুরিং*, ফ্রেডরিক এস্‌জেনস, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫
- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন (সম্পা.), *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড ১ম ভাগ, কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৬ব
- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮
- বাংলা উপন্যাস: দ্বন্দ্বিক দর্শন*, কলকাতাস: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৩
- সরোজ মোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৭
- সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ (সম্পা.), *ন্যায়বিন্দু (প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ)*, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩
- সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (সং.ও সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন এক অমীমাংসিত সংলাপ*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১৭
- সান্ত্বনা মজুমদার, *সত্তাবাদের প্রেক্ষিতে কিয়েরকিগার্দ, রবীন্দ্রনাথ ও সার্ত্র*, কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২
- সান্ত্বনা মজুমদার (সং.), *কালিদাস ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ*, শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৩৯৮
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ*, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮৩
- সুকুমার সেন, *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৮
- বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২
- বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০
- সুকুমারী ভট্টাচার্য, *নিয়তিবাদ: উদ্ভব ও বিকাশ*, কলকাতা: ক্যাম্প, ১৯৯৪

- প্রবন্ধসংগ্রহ ২, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১২
- বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য, কলকাতা: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯
- রবীন্দ্রকবিতায় মৃত্যু, কলকাতা: ক্যাম্প, ২০০৭
- সুখময় ভট্টাচার্য্য, পূর্বমীমাংসা দর্শন, কলকাতা: পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৬
- ন্যায় দর্শন, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৩
- সুজিৎ ঘোষ, মানিক সাহিত্যে অবচেতন, কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৭
- সুধাংশুশেখর ঘোষ (প্রকাশক), রবীন্দ্র-স্মারকগ্রন্থ, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৯১
- সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.), রবীন্দ্রনাথ বাকপতি বিশ্বমনা ১, কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১
- সুনীল দাস, ভারতী ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী, কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮৪
- সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পা.), জগদীশ গুপ্তের গল্প, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫
- সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তত্ত্বকথা, চট্টগ্রাম: হার্ডিঞ্জ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩২৪
- দার্শনিকী, কলকাতা: মিত্র এন্ড ঘোষ, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত
- ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ২০০৪
- রবি-দীপিতা, কলকাতা: মিত্র এন্ড ঘোষ, ১৩৬৭
- সৈয়দ আকরম হোসেন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেতনালোক ও শিল্পরূপ, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৮
- সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যুক্তিবাদ আধুনিকতা ও আনন্দমীমাংসা, কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪১৩
- স্বামী প্রেমেশানন্দ, পাতঞ্জল-যোগসূত্র, কলকাতা: উদ্বোধন, ১৪১০ব
- স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, ব্রহ্ম-সূত্র, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৬
- স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (ত.), উপনিষদ প্রথম ভাগ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩
- উপনিষদ দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২
- হিতেশ্বরজ্ঞান সান্যাল, বাংলার ভক্তি আন্দোলনে পরিবর্তনের ধারা, মন্ড্রা দাশগুপ্ত (ত.), নতুন দিল্লী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৯
- হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা: নবপত্র, ২০১২
- হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গীতায় ঈশ্বরবাদ, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১২
- হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, কলকাতা: অবভাস, ২০১৬
- প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ ও দর্শন, কলকাতা: বেদবিদ্যাকেন্দ্র রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩

বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন, কলকাতা: অবভাস, ২০০৮

সমাজ সাহিত্য ও দর্শন, কলকাতা: অবভাস, ২০১০

হেমন্তবালা দেবী, *কবিকে লেখা চিঠি*, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়ন্তী সান্যাল (সং. ও সম্পা.),
কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৯

গ. ২. ইংরাজি

Aristotle, *On the Art of Poetry*, Ingram Bywater (Trans.), Oxford: Oxford
Clarendon Press, 1976

Acharya Madhava, *Sarva-Darsana-Samgraha*, London: Trubner & Co., 1882

Ayyub Abu Sayeed, *Modernism and Tagore*, Delhi: Sahitya Akademi, 1995
Poetry & Truth, Kolkata: JU, 1970

Bandyopadhyay Sibaji, *Sibaji Bandyopadhyay Reader*, Delhi: Worldview
Publication, 2012

Bandopadhyay Tirthanath, *Morality and Practice*, Kolkata: Papyrus, 2002

Bhattacharya Ramkrishna, *Studies on the Carvaka/Lokayata*, Delhi: Anthem
Press, 2012

Bhattacharya Asit Kumar, *AkshayKumar Dutta*, Kolkata: Sahitya Akademi,
1996

Bhattacharjee Sukumari, *The Indian Theogony*, Kolkata: Farma KLM, 1978

Bose Buddhadeva, *An Acre of Green Grass*, Kolkata: Papyrus, 1997

Butler Christopher, *Mordenism*, Pondechery: Oxford, 2010s

Chakravarti Sudhindra Chandra, *Philosophical Foundation Bengal*
Vaishnavism, New Delhi: Munshiram
Manoharlal, 2004

Chatterjee Suniti Kumar, *World Literature & Tagore*, Shantiniketan:
Biswabharati, 1971

Chattopadhyaya Bankim Chandra, *Bankim Rachanavali*, Jogesh Chandra Bagal
(Ed.), Kolkata: Sahitya Samsad, 2011

Chattopadhyaya Brajadulal, *Kosambi*, New Delhi: OUP, 2009

- Chattopadhyaya Debiprasad, *Indian Philosophy*, Delhi: People's Publishing House, 2007
- Science & Philosophy in Ancient India*, Delhi: Aakar, 2013
- Indian Atheism*, New Delhi: People's Publishing House, 2012
- Lokayata*, Delhi: People's Publishing House, 2012
- What is living and what is dead in Indian Philosophy*, Delhi: People's Publishing House, 2015
- Chattopadhyaya Debiprasad (Ed.), *Carvaka/Lokayata*, New Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 2006
- Chattopadhyay Kanailal, *Brahmo Reform Movement*, Kolkata: Papyrus, 1983
- Choudhury Sukanta, *The Cambridge companion to Rabindranath Tagore*, Cambridge: CUP, 2020
- Cowell E.B. (trans.), *The Maitri or Maitrayaniya Upanishad*, London: Asiatic Society of Bengal, 1870
- Dasgupta Surendranath, *A History of Indian Philosophy*, Vol-I, Delhi: Motilal Banarsidass, 1975
- A History of Indian Philosophy*, Vol-II, Delhi: Motilal Banarsidass, 1988
- A History of Indian Philosophy*, Vol-III, Delhi: Motilal Banarsidass, 1988
- A History of Indian Philosophy*, Vol-IV, Delhi: Motilal Banarsidass, 1988
- A History of Indian Philosophy*, Vol-V, Delhi: Motilal Banarsidass, 1988
- Rabindranath the Poet & the Philosopher Vol. 1*, Kolkata: Mitra & Ghosh, 1948

- Religion and Rational Outlook*, Delhi: Motilal Banarsidass, 1974
- Indian Idealism*, Great Britain: CUP, 1933
- Das Sisir Kumar, *The Shadow of the Cross*, New Delhi: Munsiram Manoharlal Publisher's Pvt. Ltd., 1974
- Das; Sisir Kumar (Ed.), *The English Writings of Rabindranath Tagore*, Vol. 2, Delhi: Sahitya Akademi, 2012
- Dey Aidan, *Romanticism*, London: Routhledge, 2001
- Engels Friedrich, *Antiduhring*, Peking: Foreign Languages Press, 1976
- The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man*, New York: International Publisher, 1950
- Eagleton Terry, *Culture & the Death of God*, New Haven & London: YUP, 2014
- Ideology*, Great Britaion: Verso, 1991
- Reason, Faith & Revolution*, London: YUP, 2009
- Einstein Albert & Freud, Sigmund, *Why War?* , Dijon: League of Nation, 1933
- Fischer Ernst, *The Necessity of Art A Marxist Approach*, Anna Bostock (Trans.), London: Penguin Books, 1971
- Freud, Sigmund, *Beyond the Pleasure Principle*, James Strachey (Trans.), New York: W.W. Norton & Company, 1975
- Civilization and Its Discontents*, James Strachey (Trans.), New York: W.W. Norton & Company INC, 1962
- Gaarder, Jostein, *Sophie's World*, Tr. Paulette Moller, London: weidenfeld & Nicolson, 2015
- Ganguli Hemanta, *God Religion & Reason*, Kolkata: University of Culcutta, 1982
- Georg Lukacs, *The Theory of the Novel*, Delhi, Aakar, 2016
- Ghose Benoy, *Selection from English Periodicals of 19th Century Bengal*, Vol-III, Kolkata: Papyrus, 1980

- Goff Jacques and Nora Pierre, *Constructing the Past*, Paris: CUP, 2011
- Gokhale Pradeep P., *Lokayata/Carvaka*, New Delhi: OUP, 2015
- Goswami Subuddhicharan (Ed.), *Lokayata Philosophy: A Fresh Appraisal*,
Kolkata: The Asiatic Society, 2010
- Hatcher Brian A., *Idioms of Improvement Vidyasagar & Cultural encounter
in Bengal*, Delhi : Primus Books, 2020
Vidyasagar, New Delhi: Routledge, 2019
- Hiriyanna M., *Outlines of Indian Philosophy*, London: George Allen & Unwin
Ltd, 1932
- Hobsbawm Eric, *The Age of Extremes 1914-1991*, London: Abacus, 1995
The Age of Empire, London: Abacus, 2014
- House Humphry, *Aristotle's Poetics*, London: Rupert Hart-Havis, 1956
- Kaw R. K., *The Doctrine of Recognition*, Hoshiarpur: Vishveshvaranand
Institute, 1967
- John Keats, *The complete poetical works and letters of John Keats*,
Cambridge: Houghton Mifflin and Company, 1899
- Kenan Shlomith Rimmon, *Narrative Fiction*, New York: Routledge, 2002
- Kosambi D D, *Adventures into the Unknown*, Ramaswami Ram (Ed.), New
Delhi: Three Essays Collective, 2016
- Kosambi & Gokhale (Ed.), *The Subhasitaratnakosa of Vidyakara*, Cambridge:
Harvard University Press, 1957
- Lavine T. Z., *From Socrates to Sartre*, New York: Bantam Books, 1984
- Lukacs George, *The Theory of the Novel*, Delhi: Aakar, 2016
- Macnicol Nicol (Ed.), *Hindu Scriptures*, London: Everyman's Library, 1963
- Marx Karl, *Economic & Philosophic Manuscript of 1844*, Moscow: Progress
Publisher, 1977
- Marx & Engels, *on Literature & Art*, Moscow: Progress Publishers, 1976
Selected Correspondences, Moscow, 1953
- Mohanta Dilip Kumar, *Studies in Jayarasi Bhatta's Critique of Knowing from
Words*, Kolkata: The Asiatic Society, 2009

- Mohanty J., *Explorations in Philosophy*, New Delhi: OUP, 2001
- Mohanty Jitendra Nath, *Theory & Practice in Indian Philosophy*, Kolkata:
Centre for Studies in Social Sciences, Culcutta, 1994
- Motilal Bimal Krishna, *Ethics and Epics*, Ganeri Jonardon (Ed.), London:
OUP, 2002
- Motilal Bimal Krishna (Ed.), *Moral Dilemmas in the Mahabharata*, Delhi:
Indian Institute of Advanced Study & Motilal
Benarasidass, 1992
- Mukerji Dhurjati Prasad, *Tagore a Study*, Kolkata: Pachimbanga Bangal
Akademi, 2001
- Mukherjee Meenakshi, *Realism and Reality*, New Delhi: OUP, 1994
- Panini, *Ashtadhyayi*, tr. Srisa Chandra Vasu, Delhi: Motilal Banarsidass, 1962
- Poddar Arabinda, *Renaissance in Bengal Quests and Confrontations*, Simla:
Indian Institute of Advanced Study, 1970
- Poddar Arabinda, *Renaissance in Bengal Search for Identity*, Simla:
Indian Institute of Advanced Study, 1970
- Radhakrishnan S., *Indian Philosophy*, Vol. 1, New Delhi: OUP, 2016
- Radhakrishnan S., *Indian Philosophy*, Vol. 2, New Delhi: OUP, 2016
- Radhakrishnan S., *The Philosophy of Rabindranath Tagore*, London:
Macmillan and Co. Ltd., 1919
- Radhakrishnan S., *The Principal Upanisads*, Noida: Harper Collins, 2016
- Roy Pabitra Kumar, *Rabindranath Tagore*, New Delhi: Munshiram
Manoharlal, 2002
- Russell Bertrand, *History of Western Philosophy*, London: Routledge, 2004
- Sarkar Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal*, New Delhi: People's
Publishing House, 1994
- Sarkar Sumit, *Writing Social History*, New Delhi: OUP, 2011
- Sen Asok, *Iswar Chandra Vidyasagar & his elusive milestones*, New Delhi:

- Parmanent Black, 2016
- Sen Amiya P., *Rammohun Roy a Critical Biography*, New Delhi: Penguin Viking, 2012
- Religion & Rabindranath Tagore*, New Delhi: Oxford, 2014
- Shastri Dakshina Ranjan, *a Short History of Indian Materialism, Sensationalism and Hedonism*, Kolkata: Bookland Pvt. Ltd., 1930
- Shepherd Kancha Ilaiah, *God as Political Philosopher*, New Delhi: Sage & Samya, 2019
- Tagore Rabindranath, *Letters to a Friend*, London, Gorge Allen & Unwin Ltd, 1926
- The Religion of an Artist*, Kolkata: Visva-Bharati, 2000
- Nationalism*, Navi Mumbai: Penguin, 2009
- Williams Raymond, *Marxism & Literature*, Noida: OUP, 2010

ঘ. সহায়ক পত্রপত্রিকা

ঘ. ১. বাংলা

- অনুষ্ঠাপ, অনিল আচার্য (সম্পা.), শারদীয়া, ২০০৬
- অনুষ্ঠাপ, অনিল আচার্য (সম্পা.), শারদীয়া, ২০০৯
- অনুষ্ঠাপ, অনিল আচার্য (সম্পা.), শারদীয়া, ২০১৪
- আর্য্যদর্শন, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১২৮১
- আর্য্যদর্শন, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১২৮৩
- আর্য্যদর্শন, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১২৮৪
- এবং এই সময়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), বর্ষা সংখ্যা, ১৪১৮
- এক্ষণ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), কার্তিক-মাঘ, ১৩৭৯
- উজাগর, উত্তম পুরকাইত (সম্পা.), ১ম-২য় সংখ্যা, ১৪২৪
- জ্ঞানাকুর, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১২৮৯
- জ্ঞানাকুর, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১২৮০
- তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পা.), আষাঢ়, ১৮৩৪ শক.

দশদিশি, অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়, ২য় সংখ্যা, ২৯১৩-১৪

নতুন-সাহিত্য, অনিলকুমার সিংহ (সম্পা.), কার্তিক, ১৩৫৮

পত্না, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩০৫

পত্না, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩০৭

পত্না, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩০৯

পত্না, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১০

পত্না, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১৩

পত্না, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১৪

পত্না, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১৫

পত্না, রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, বারানসীবাসী মুখোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.),

বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২০

পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ১ম বর্ষ, ১৩৩৮-৩৯

পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ১৩৩৯-৪০

পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ৩য় বর্ষ, মাঘ-বৈশাখ, ১৩৪০-৪১

পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ৪র্থ বর্ষ, ১৩৪১-৪২

পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৪২

পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ৭ম বর্ষ, শ্রাবণ-আষাঢ়, ১৩৪৪-৪৫

পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ৮ম বর্ষ, শ্রাবণ-আষাঢ়, ১৩৪৫-৪৬

পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ৯ম বর্ষ, শ্রাবণ-আষাঢ়, ১৩৪৬-৪৭

পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হিরণকুমার সান্যাল (সম্পা.), ১০ম বর্ষ, শ্রাবণ-পৌষ, ১৩৪৭

পরিচয়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) কলকাতা, মে-জুন, ১৯৭৮

পরিচয়, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (সম্পা.), ৮৬ বর্ষ, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৪২৪

প্রবাসী সচিত্র মাসিকপত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), আষাঢ়, ১৩১৯

প্রবাসী সচিত্র মাসিকপত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), জৈষ্ঠ্য, ১৩২১

প্রবাসী সচিত্র মাসিকপত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), শ্রাবণ, ১৩৩১

বঙ্গবানী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), ফাল্গুন, ১৩৩০

বঙ্গবানী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), আশ্বিন, ১৩৩৪

ব্রহ্মবিদ্যা, পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ (সম্পা.), ১ম বর্ষ, ১৩১৯

ব্রহ্মবিদ্যা, পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ (সম্পা.), ১০ম বর্ষ, ১৩২৮

ব্রহ্মবিদ্যা, পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ (সম্পা.), ১২ বর্ষ, ১৩৩০

ব্রহ্মবিদ্যা, পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ (সম্পা.), ১৫ বর্ষ, ১৩৩৩
 বিশ্বভারতী, সুরজিৎ চন্দ্র সিংহ (সম্পা.), ২৯ বর্ষ, শ্রাবণ-চৈত্র, ১৩৮৩
 বিশ্বভারতী, সুরজিৎ চন্দ্র সিংহ (সম্পা.), বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৪
 বিশ্বভারতী, সুনীল রায় (সম্পা.), শ্রাবণ-চৈত্র, ১৩৭৬
 বিশ্বভারতী, সুনীল রায় (সম্পা.), বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৭
 বেদব্যাস, ভূধর চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), ৩য় বর্ষ, ১২৯৩
 বেদব্যাস, ভূধর চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), বৈশাখ-শ্রাবণ, ১২৯৬
 ভারতবর্ষ, জলধর সেন (সম্পা.), মাঘ, ১৩৩৩
 ভারতী, (সম্পা.), শ্রাবণ, ১২৯২
 মর্মবাণী, জগদীন্দ্রনাথ রায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (সম্পা.), ১ম বর্ষ, ১ম-২৫ সংখ্যা, ১৩২২
 মানসী ও মর্মবাণী, জগদীন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), চৈত্র, ১৩৩১
 সবুজ পত্র, প্রমথ চৌধুরী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২১
 সবুজ পত্র, প্রমথ চৌধুরী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২২
 সবুজ পত্র, প্রমথ চৌধুরী, (সম্পা.), কার্তিক-চৈত্র, ১৩২৫
 সাহিত্য, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২৭
 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, রমেনকুমার সর (সম্পা.), ১২৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২৬

ঙ. অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ

ঙ. ১. বাংলা

মুনমুন (দে) ভট্টাচার্য, 'সময়, সমাজ ও ঔপন্যাসিক জগদীশ গুপ্ত', আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০
 শকুন্তলা দাস, 'অস্তিত্ববাদী দর্শন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য', যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪
 হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা: জগদীশ গুপ্ত ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়',
 কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অনুলিখিত

ঙ. ২. ইংরাজি

Bagchi Dipankar, 'Modernity and Social Crisis in Bengali Poetry, 1920-1950',
 Jadavpur University, 2011
 Bhattacharyya Rama, 'a Critical Approach to the short stories of Jagadish
 Chandra Gupta', Gauhati University, 1989
 Gogineni Bina, 'God and the Novel in India', Columbia University, 2011

চ. অন্তর্জাল সূত্র

আব্দুল কাফি, ‘বিভূতিভূষণ ও তাঁর প্রিয় ‘দুঃখীদল’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী, নবম দিন, বিভূতিভূষণ ব্যানার্জি ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল আয়োজিত বক্তৃতামালায় প্রদত্ত ভাষণ, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০, শেষবার দেখেছি ৭মে, ২০২১,

দ্রঃ <https://www.youtube.com/watch?v=XxKlKnQQ6Zk>

বিচিত্রা: বৈদ্যুতিন রবীন্দ্র-রচনাসম্ভার Bichitra: Online Tagore Variorum: School of Cultural Texts and Records, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দ্রঃ <http://bichitra.jdvu.ac.in/>

তপোব্রত ভাদুড়ি, ‘বিভূতিভূষণের বিরহচেতনা: ভাবজীবন থেকে সাহিত্যে’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী, ৪র্থ দিন, বিভূতিভূষণ ব্যানার্জি ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল আয়োজিত বক্তৃতামালায় প্রদত্ত ভাষণ, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০, শেষবার দেখেছি ৭মে, ২০২১,

দ্রঃ <https://www.youtube.com/watch?v=XLBZXwmM438>

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সিগমুন্ড ফ্রয়েড সেশন ১’, জার্মান ইন্টেলেকচুয়াল ট্র্যাডিশন, দ্বিতীয় পর্ব, ম্যাক্সমুলার ভবন, কলকাতা আয়োজিত বক্তৃতামালায় প্রদত্ত ভাষণ, ১৪ এপ্রিল, ২০১৫, শেষবার দেখেছি ২ জুলাই, ২০২১

দ্রঃ <https://www.youtube.com/watch?v=AkeRPvxfUMU>

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সিগমুন্ড ফ্রয়েড সেশন ২’, জার্মান ইন্টেলেকচুয়াল ট্র্যাডিশন, দ্বিতীয় পর্ব, ম্যাক্সমুলার ভবন, কলকাতা আয়োজিত বক্তৃতামালায় প্রদত্ত ভাষণ, ১৪ এপ্রিল, ২০১৫, শেষবার দেখেছি ২ জুলাই, ২০২১

দ্রঃ <https://www.youtube.com/watch?v=kc2wBu4Y1OA>

udaya k. chakraborty.

Anand Pal.

৯ জুলাই, ২০২১

উদয়কুমার চক্রবর্তী

তত্ত্বাবধায়ক

৯ জুলাই, ২০২১

অনল পাল

গবেষক